প্রথম খণ্ড

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

লেখকের অন্যান্য বই

সমুদ্র মানুষ — রুদ্দোরে জ্যোৎস্নায়
একটি জলের রেখা — নীল তিমি
অলৌকিক জলযান — ধ্বনি প্রতিধ্বনি
শেষ দৃশ্য — ফোটা পদ্মের গভীরে
নগ্ন-ঈশ্বর — গম্বুজে হাতের স্পর্শ
পুতুল — একালের বাংলা গল্প
বিদেশিনী — সুখী রাজপুত্র
[illegible] — রাজা যায় বনবাসে
একজন দৈত্য একটি লাল গোলাপ

সোনালী বালির নদীর চরে রোদ হেলে পড়েছে। ঈশম শেখ ছইয়ের নিচে বসে তামাক টানছে। হেমন্তের বিকেল। নদীর পাড় ধরে কিছু গ্রামের মানুষ হাট করে ফিরছে। দূরে দূরে সব গ্রাম মাঠ দেখা যাচ্ছে। তরমুজের লতা এখন আকাশমুখো। তামাক টানতে টানতে ঈশম সব দেখছিল। কিছু ফড়িং উড়ছে বাতাসে। সোনালী ধানের গন্ধ মাঠময়। অঘ্রানের এই শেষ দিনগুলিতে জল নামছে খাল-বিল থেকে। জল নেমে নদীতে এসে পড়ছে। এই জল নামার শব্দ ওর কানে আসছে। সূর্য নেমে গেছে মাঠের ওপারে। বটের ছায়া বালির চর ঢেকে দিয়েছে। পাশে কিছু জলাজমি। ঠাণ্ডা পড়ছে। মাছেরা এখন আর শীতের জন্য তেমন জলে নড়ছে না। শুধু কিছু সোনাপোকার শব্দ। ওরা ধানখেতে উড়ছিল। আর কিছু পাখির ছায়া জলে। দক্ষিণের মাঠ থেকে ওরা ক্রমে সব নেমে আসছে। এ-সময় একদল মানুষ গ্রামের সড়ক থেকে নেমে এদিকে আসছিল—ওরা যেন কি বলাবলি করছে। যেন এক মানুষ জন্ম নিচ্ছে এই সংসারে, এখন এক খবর, ঠাকুরবাড়ির ধনকর্তার আঘুনের শেষ বেলাতে ছেলে হয়েছে।

ঈশম শেখ কথাটা শুনেই হুঁকোটা ছইয়ের বাতায় ঝুলিয়ে রাখল। কলকে উপুড় করে দিল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে বের হল। উপরে আকাশ, নিচে এই তরমুজের জমি আর সামনে সোনালী বালির নদী। জল, স্ফটিক জলের মতো। ঈশম এই ছায়াঘন পৃথিবীতে পশ্চিমমুখো হয়ে দাঁড়াল। বলল, সোভান আল্লা। শেষে আর সে দাঁড়াল না। নদীর পাড় অতিক্রম করে সড়ক ধরে হাঁটতে থাকল। ধনকর্তার ছেইলা হয়েছে—বড় আনন্দ, বড় আনন্দ। সব খুদার মেহেরবানি। সড়কের দু'ধারে ধান, শুধু ধান—কত দূরে এইসব ধানের জমি চলে গেছে। ঈশম চোখ তুলে দেখল সব। বিকেলের এইসব বিচিত্র রঙ দেখতে দেখতে তার মনে হল, পাশাপাশি এইসব গ্রাম—তার কত চেনা, কতকালের মেমান সব···নিচে খাল, মাছেরা জলে লাফাচ্ছে। সে সড়কের একধারে গামছা পাতল। নিচে ঘাস, গামছা ঘাসের শিশিরে ভিজে উঠছে। সে এসব লক্ষ্য করল না। সে দু'হাঁটু ভেঙে বসল। খালের জল নিয়ে অজু করল। সে দাড়িতে হাত বুলাল ক'বার। মাটিতে পর পর ক'বার মাথা ঠেকিয়ে আকাশ দেখতে দেখতে কেমন তন্ময় হয়ে গেল। অঘ্রানের শেষ বেলায় ঈশম নামাজ পড়ছে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে বলে ওর ছায়াটা কত দূরে চলে গেছে। খালের জল কাঁপছিল। ওর ছায়াটা জলে কাঁপছে। কিছু হলদে মতো রঙের ফড়িং উড়ছে মাথার উপর। সূর্যের

সোনালী রঙে ওর মুখ আশ্চর্যরকমের লাল দেখাচ্ছিল। যেন কোন ফেরেস্তার অলৌকিক আলো এই মানুষের মুখে এসে পড়েছে। সে নামাজ শেষ করে হাঁটতে থাকল। এবং পথে যাকে দেখল তাকেই বলল, আঘুনের শেষ ফজরে ধনকর্তার ছেইলা হইছে। ওকে দেখে মনে হয় তরমুজ খেত থেকে অথবা সোনালী বালির চর থেকে এমন একটি খবর সকলকে দেবার জন্য সে উঠে এসেছে। সে সড়ক অতিক্রম করে সুপারি বাগানে ঢুকে গেল। বৈঠকখানাতে লোকের ভিড়। বাইরে কেউ কেউ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। সে প্রায় সকলকেই আদাব দিল এবং ভিতরে ঢুকে নিজের জায়গাটিতে বসে তামাক সাজতে থাকল।

সোনালী বালির নদীতে সূর্য ডুবছে। কচ্ছপেরা ধানগাছের অন্ধকারে ঘাপটি মেরে আছে। এইসব কচ্ছপেরা এখন একটু শক্তমতো মাটি পেলেই পাড়ে উঠে ডিম পাড়তে শুরু করবে। অনেকগুলো শেয়াল ডাকল টোডারবাগের মাঠে। একটা দুটো জোনাকি জ্বলল জলার ধারে। জোনাকিরা অন্ধকারে ডানা মেলে উড়তে থাকল। পাখিদের শেষ দলটা গ্রামের উপর দিয়ে উড়ে গেল। নির্জন এবং নিরিবিলি এইসব গ্রাম মাঠ। অন্ধকারেও টের পাওয়া যায় মাথার উপর দিয়ে পাখি উড়ে যাচ্ছে। সে জানে ওরা কোথায় যায়। ওরা হাসান পীরের দরগাতে যায়। পীরের দরগায় ওরা রাত যাপন করে। শীতের পাহাড় নেমে এলে ওরা তখন দক্ষিণের বিলে চলে যাবে। ঈশম এবার উঠে পড়ল।

ঈশম ডাকল, ঠাইনদি আমি আইছি।

দরজার বাইরে এসে ছোটকর্তা দাঁড়ালেন।—ঈশম আইলি?

—হ, আইলাম। ধনকর্তারে খবর দিতে পাঠাইছেন? না পাঠাইলে আমারে পাঠান। খবর দিয়া আসি। একটা তুফান আদাই কইরা আসি।

ছোটকর্তা বললেন, যা তবে। ধনদাদারে কবি, কাইলই যেন রওনা দেয়। কোন চিন্তার কারণ নাই। ধনবৌ ভাল আছে।

—তা আর কমু না! কি যে কন! ঠাইনদি কই?

—মায় অসুস্থ ঘরে। তুই বরং বড় বৌঠাইনরে বল তরে ভাত দিতে।

ঈশম নিজেই কলাপাতা কাটল এবং নিজেই এক ঘটি জল নিয়ে অন্দরে খেতে বসে গেল।

বড়বৌ বলল, পাতাটা ধুয়ে নাও।

ঈশম পাতাটার উপর জল ছিটিয়ে নিল। বলল, হ্যান।

বড়বৌ ঈশমকে খেতে দিল। ঈশম যখন খায় বড় নিবিষ্ট মনে খায়। ভাত সে একটাও ফেলে না। এমন খাওয়া দেখতে বড়বৌর বড় ভাল লাগে। ঈশমকে দেখতে দেখতে ওর বিবির কথা মনে হল। ঈশমের ভাঙা ঘর, পঙ্গু

বিবি, নাড়ার বেড়া এবং জীর্ণ আবাসের কথা ভেবে বড়বৌ-এর কেমন মায়া হল। অন্যান্য অনেকদিনের মতো বলল, পেট ভরে খাও ঈশম। একটু ডাল দেব, মাছ? অনেক দূর যাবে, যেতে যেতে তোমার রাত পোহাবে।

ঈশম নিবিষ্ট মনে খাচ্ছে, আর হাত-দশেক দূরের অসুস্থ ঘরটা দেখছে। সেখানে ধনমামি আছেন, ঠানদি আছেন, ঈশম ঘরের কোণায় কোণায় বেলপাতা ঝুলতে দেখল। মটকিলা গাছের ডাল দেখল দরজাতে। ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। বাচ্চাটা দু'বার ট্যাঁও ট্যাঁও করে কাঁদল, ভিজা কাঠের গন্ধ, ধোঁয়ার গন্ধ, ধূপের গন্ধ মিলিয়ে এ বাড়িতে একজন নবজাতকের জন্ম। টিনকাঠের ঘর, কামরাঙা গাছের ছায়া…ধনমামি বড়মামি…এবং এ-বাড়ির বড়কর্তা পাগল, একথা মনে হতেই ঈশম বলল, বড়মামি, বড়মামারে দ্যাখতাছি না।

বড়বৌ বড় বড় চোখ নিয়ে ঈশমকে শুধু দেখল। কোন কথা বলল না। বললেই যেন চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসবে। ঈশম যেন এই চোখ দেখে ধরতে পেরেছে বড়মামা এখন বাড়িতে নেই। অথবা কোথায় থাকে, কই যায় কেউ খোঁজখবর রাখে না। রাখবার সময় হয় না। অথবা দরকার হয় না। ঈশম ডাল দিয়ে সবক'টা ভাত হাপুস করে মাকড়সার মতো গিলে ফেলল। বড়মামি এখন কাছে নেই। বৈঠকখানায় লোক পাতলা হয়ে আসছে। বড়মামির বড় ছেলে, ধনমামির বড় ছেলে রান্নাঘরে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিচ্ছে।

ঈশম বৈঠকখানা থেকে লাঠি নিল একটা, লণ্ঠন নিল হাতে। ঈশম মাথায় পাগড়ি বাঁধল গামছা দিয়ে। এই আঘুন মাসের ঠাণ্ডায় কাদাজল ভাঙতে হবে। খাল পার হতে হবে, বিল পার হতে হবে। গামছা মাথায় সে পাঁচ ক্রোশ পথ হাঁটবে। কোথাও খালের পাড়ে, কোথাও পুলের উপর দিয়ে, কখনও চুপচাপ, কখনও গাজির-গীত গাইতে গাইতে ঈশম দীর্ঘপথ হাঁটবে। ঈশম রান্নাঘর অতিক্রম করবার সময় দেখল কুয়োতলার ধারে বড়মামি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কার জন্য যেন প্রতীক্ষা করছেন। ঈশমকে দেখে বড়বৌ বলল, ঈশম, দেখবে তো তোমার বড়মামাকে ট্যাবার বটতলায় পাও কিনা, দেখবে। তুমি তো বটতলার পথেই যাবে।

ঈশম বাঁশঝাড় অতিক্রম করে মাঠের অন্ধকারে নেমে যাবার সময় বলল, আপনে বাড়ি যান। যাইতে যাইতে যদি পাই—পাঠাইয়া দিমু। এই বলে ঈশম ক্রমে অন্ধকার মাঠে মিশে যেতে থাকল। ঈশমকে আর দেখা যাচ্ছে না, শুধু মাঠের ভিতর লণ্ঠনটা দুলছে।

ঈশমের ডান হাতে লাঠি, বাঁ হাতে লণ্ঠন। অঘ্রান মাস। শিশির পড়ছে। এখনও ভাল করে ধানখেতের ভিতর আল পড়ে নি। সরু পথ খেতের পাশে পাশে। পথ থেকে বর্ষার জল নেমে গেছে—পথের মাটি ভিজা ভিজা,

কাদামাটিতে পা বসে যাবার উপক্রম। অথচ পা বসে যাচ্ছে না—কেমন নরম তাল তাল মাটির উপর দিয়ে ঈশম হেঁটে যাচ্ছে। গাঢ় অন্ধকার বলে ঈশম চারিদিকে শুধু লণ্ঠনের আলো এবং তার অস্তিত্ব ব্যতিরেকে অন্য কিছু প্রত্যক্ষ করতে পারল না। এ অঞ্চলে হেমন্তেই শীত পড়তে আরম্ভ করে। শীতের জন্য ঝোপজঙ্গলের কীট-পতঙ্গেরা কেমন চুপচাপ হয়ে আছে। ঈশম লণ্ঠন তুলে এবার উঁচু জমিতে উঠে এল। পাশে করলার জমি। উপরে ট্যাবার পুকুর আর সেই নির্দিষ্ট বটগাছ। এখানে অনেক রাত পর্যন্ত বড়কর্তা বসে থাকেন। এখানে বড়কর্তাকে অনেকদিন গভীর রাতে খুঁজে পাওয়া গেছে। ঈশম লণ্ঠন তুলে ঝোপেজঙ্গলে বড়কর্তাকে খুঁজল। ঝোপে ঝোপে জোনাকি। বটের জট মাটি পর্যন্ত নেমেছে। পুরানো জট বলে জটসকল ভিন্ন ভিন্ন ঘরের মতো ছায়া সৃষ্টি করছে। সে ডাক দিল, বড়মামা আছেন? সে কোন উত্তর পেল না। তবু লণ্ঠন তুলে গাছটার চারধারে খুঁজতে থাকল—তারপর যখন বুঝল তিনি এখানে নেই, তিনি অন্য কোথাও পদযাত্রায় বের হয়েছেন তখন ঈশম ফের নিচু জমিতে নেমে হাঁটবার সময় দূরে দূরে সব গ্রাম, গ্রামের আলো, হাসিমের মনিহারি দোকানে হ্যাজাকের আলো দেখতে দেখতে নালার ধারে কেমন মানুষের গলা পেল।

সে বলল, কে জাগে?

অন্ধকার থেকে জবাব এল, তুমি ক্যাডা?

—আমি ঈশম শেখ। সাকিম টোডারবাগ। ঈশম যেন বলতে চাইল, আমি গয়না নৌকার মাঝি ছিলাম। এখন ঠাকুরবাড়ির খেয়ে মানুষ। অন্ধকার মানি না। বাবু ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বাস। নদীর চরে তরমুজ খেত পাহারায় থাকি। ঠাকুরবাড়ির বান্দা আমি। বয়স বাড়ছে, গয়না নৌকা চালাতে আর পারি না।

—আমি আনধাইর রাইতে হাসিম ভুইঞা জাগি। সাকিম কলাগাইছা।

—অঃ, হাসিম ভাই। তা কি করতাছ?

—মাছ ধরতাছি। ছ্যাখছ না জল নামতাছে। আমি কৈ মাছের জাল পাইতা বইসা আছি। ঘুট-ঘুইটা আনধাইরে কই রওনা দিলা?

—যামু মুড়াপাড়া। ধনকর্তার পোলা হইছে। সেই খবর নিয়া যাইতাছি।

—ধনকর্তার কয় পোলা য্যান?

—এরে নিয়া দুই পোলা। তোমার কাছে কাঠি আছে, বিড়িটা আঙ্গাইতাম।

ঈশম বিড়ি ধরাল। ওর বড়কর্তার জন্য মনটা খচখচ করছে। বড়কর্তা রাতে বাড়ি না ফিরলে বড়মামি অন্ধকারে মানুষটার জন্য জেগে বসে থাকবে। সে বলল, বড়মামারে ছ্যাখছ?

—দুফরে ছ্যাখছিলাম—নদীর চরে হাঁইটা যাইতাছে।

ঈশম কেমন দুঃখের গলায় বলল, ভাইরে, তোমার আমার ছোটখাটো দুঃখ। ঈশম ফের হাঁটতে থাকল। সে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে। ফাওসার খাল পার হবার জন্য সে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে। হাট ভাঙবার আগে যেতে পারলে সে গুদারাঘাটে মাঝি পাবে। নতুবা এই শীতে সাঁতার কেটে খাল পার হতে হবে। ঠাণ্ডার কথা ভাবতেই ওর শরীরটা কেমন কুঁকড়ে গেল!

ইচ্ছা করলে ঈশম একটা সংক্ষিপ্ত পথ ধরে আরও আগে খালের পাড়ে পৌঁছাতে পারত। কিন্তু একটি অজ্ঞাত ভয়, বিশেষ করে বামন্দি-চকের বুড়ো শিমুল গাছটা এবং ওর দুটো বাজে পোড়া মরা ডাল বড় ভয়ের কারণ। নিচে কবর, আবহমানকাল ধরে মানুষের কবর, হাজার হবে, বেশিও হতে পারে—ঈশম ভয়ে সেই পথে খালের পাড়ে পৌঁছাতে পারছে না।

ঈশম হাতের লাঠিটা এবার আরও শক্ত করে ধরল। সে ভয় পেলেই আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকায়। আল্লা মেহেরবান। সে যেন আসমানে তার সেই মেহেরবানকে খুঁজতে থাকে। অজস্র তারা এখন বিন্দু বিন্দু হয়ে জ্বলছে। নিচে সেই এক শুধু গাঢ় অন্ধকার। দূরে দূরে সব গ্রামের আলো, হ্যাজাকের আলো—রশ্মিটা গাছের ফাঁকে এবং ঝোপজঙ্গলের ফাঁকে এখনও দেখা যাচ্ছে। পরাপরদীর পথ ধরে কিছু লোক যাচ্ছিল জল ভেঙে—ওদের হাতে কোন আলো নেই—জলে ওদের পায়ের শব্দ। কিছু কথাবার্তা ঈশমের কানে ভেসে আসতে থাকল।

সে ক্রমে খালের দিকে নেমে যাচ্ছিল। ওর হাঁটু পর্যন্ত ধানগাছের শিশিরে ভিজছে। ঈশম পরাপরদীর পথ থেকে ক্রমশ ডাইনে সরে যাচ্ছে। এ অঞ্চলে সে কোন মানুষের সাড়া পাচ্ছে না। নীরবে যেন একটা মাঠ গাভীন গরুর মতো অন্ধকারে শুয়ে আছে। পথ ধরে কোন হাটুরে ফিরছে না। ফসলের ভারে গাছগুলো পথের উপর এসে পড়েছে। সে লাঠি দিয়ে গাছগুলো দু'দিকে সরিয়ে দিচ্ছে এবং পথ করে নেমে যাচ্ছে। খালের পাড়ে গিয়ে দেখল গুদারা বন্ধ। মাঝি ওপারে নৌকা রেখে চলে গেছে। নৌকাটা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বাঁ পাশে সে কয়েক কদম হেঁটে গেল। অদূরে মনে হল আকাশের গায়ে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। ঈশম জানত, এ সময়ে জেলেনৌকা থাকবে—বর্ষার জল খাল-বিল ধরে নেমে যাচ্ছে। যে জল এ অঞ্চলে উঠে এসেছিল জোয়ারে—আঘুন মাসের টানে তা নেমে যাবে। জলের সঙ্গে মাছ এবং কচ্ছপ। জেলেরা এসেছে খড়া জাল নিয়ে। খালের ভিতর জাল পেতে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে আছে। ঈশম খালের পাড়ে সেই লণ্ঠনের আলো পর্যন্ত হেঁটে গেল। পাড়ে গিয়ে দাঁড়াল। ডাকল, আমি ঈশম। আমারে পার কইরা দ্যাও। আমি যাইতাছি এক খবর নিয়া। ধনকর্তার পোলা হইছে। তারপর সে চারিদিকে

তাকিয়ে ডাকল, বড়মামা আছেন, বড়মামা! বড়মামি আপনের লাইগা জাইগা বইসে আছে, বাড়ি যান। কোন উত্তর এল না। শুধু একটা নৌকা ওপার থেকে ভেসে এল। বলল, ধনকর্তার পোলা হইছে?

ঈশম বলল, হ।

—তবে কাইল যামু, একটা গরমা মাছ লইয়া যামু। মাছ দিয়া একটা পিরান চাইয়া নিমু। বলে সে পাটাতন তুলে অন্ধকারে একটা বড় মাছ টেনে বের করল। ঈশম লণ্ঠনের আলোতে নীল রঙের তাজা মাছটা পাটাতনে লাফাতে দেখল। চোখ দুটো বড় অবলা। যেন এক পাগল মানুষ নিরন্তর এইসব মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফুল-ফল পাখি দেখে বেড়াচ্ছে—এই চোখ দেখলে, পাগল মানুষটার চোখ শুধু ভাসে। বড়মামি বড় বড় চোখ নিয়ে প্রত্যাশায় বসে আছে, কখন ফিরবে মানুষটা। সে বলল, বড়মামারে ছাখছ?

মানুষটা বলল, বড়কর্তারে আইজ দেখি নাই।

ঈশম আর কোন কথা বলল না। এই সব মাঠে পাগল মানুষ দিন-রাত ঘুরে বেড়ান। কোন অন্ধকারে, কোথায় তিনি কার উদ্দেশে হেঁটে যাচ্ছেন, ঈশম টের করতে পারছে না। তাকে খাল পার করে দিলে, মাঠ ধরে হাঁটতে থাকল শুধু।

এখন সে পাটের জমি ভাঙছে। এখানে এখন কোন ফসল নেই। কলাই, খেসারি এসব থাকার কথা—কিন্তু কিছুই নেই। শুধু ফসলহীন মাঠ। শুধু খোঁচা খোঁচা দাড়ির মতো পাট গাছের গোড়া উঁকি মেরে আছে। যোগী-পাড়াতে এত রাতেও তাঁত বোনা হচ্ছে। মাঠেই সে তাঁতের শব্দ পেল। সে গ্রামে উঠে যাবার মতলবে কোণাকোণি হাঁটছে। জেলেদের নৌকাগুলি এখন আর দেখা যাচ্ছে না। শুধু খড়া জালের মাথায় বাঁশের ডগাতে লণ্ঠনের আলো প্রায় যেন এক ধ্রুবতারা—ওকে পথের নির্দেশ দিচ্ছে। সে কতটা পথ হেঁটে এল, এবং কোনদিকে উঠে যেতে হবে—অন্ধকারে সেই এক আলো তাকে সব বাতলে দিচ্ছে। এ মাঠের শেষেই সেই বুড়ো শিমুল গাছটা যেন ক্রমে অবয়ব পাচ্ছে। দিনের বেলাতে এ-জমি থেকে গাছটা স্পষ্টই দেখা যায়। সেই গাছটার পাশের গ্রামে একবার মড়ক লেগেছিল—ঈশম কেমন ভয়ে ভয়ে হাঁটছে! শিমুল গাছটার দূরত্ব ঈশমকে কিছুতেই ভয় থেকে রেহাই দিচ্ছে না। সে যত দূর দিয়ে যাচ্ছে তত মনে হচ্ছে গাছটা ওর দিকে হেঁটে আসছে। ডান পাশে প্রায় আধ ক্রোশ পথ হেঁটে গেলে সেই গাছ এবং নিচে তার কবরভূমি—যেহেতু টিলা জমি থেকে একবার সে গাছটাকে দেখতে পেয়েছিল, একদিন হাট ফেরত রাতে গাছটার মাথায় সে আলো জ্বলতে দেখেছিল···সেজন্য ঈশম ভয়ে দ্রুত পা চালিয়ে যোগীপাড়াতে উঠে এল। কেউ দেখে ফেললেই বলবে, এলাম সেই কবর ভেঙে—কারণ ঈশমের মতো সাহসী পুরুষ হয় না—এ তল্লাটে সে এমন

একজন সাহসী মানুষ। কিন্তু ঈশম কোনকালে তার ভয়ের কথা খুলে বলে না। সাহসী বলে সে রাতেবিরাতে পরানের ভিতর ভয় লুকিয়ে রেখে চোখ বুজে চলে যেতে থাকে। যোগীপাড়াতে উঠতেই মানুষের শব্দে, চরকার শব্দে এবং শানা মাকুর শব্দে ভয়টা কেটে গেল। তারপর পরিচিত মানুষের গলা পেয়ে বলল, আমীর চাচার গলা পাইতাছি।

—তুমি···?

—আমি ঈশম।

—এত রাইতে!

—যামু মুড়াপাড়া। ধনকর্তার পোলা হইছে—খবর লইয়া যাইতাছি। আপনের শরীর ক্যামন?

—ভাল নারে বাজান। ভাল না। একটু থেমে বলল, বড়কর্তার মাথাটা আর ঠিক হইল না?

—না চাচা।

—শোনলাম বুড়া কর্তা চক্ষে দেখতে পায় না।

—না। সারাদিন ঘরে বইসা থাকে। বড়মামি, বুড়া ঠাইরেন দেখাশুনা করে।

—পোলাটা পাগল হইল আর আমার কর্তার-অ চক্ষু গেল।

—হ চাচা।

—তা একটু বইস। তামুক খাও।

—আর একদিন চাচা। আইজ যাইতে ছান। ঈশম কথা বলতে বলতে সৈয়দ মিস্ত্রির শোলার মাচান অতিক্রম করে রামপদ যোগীর আমবাগানে ঢুকে গেল। তারপর গ্রামের মসজিদ পার হয়ে মাঠে পড়তেই শিমুল গাছটার কথা মনে হল। সে জোরে জোরে মনের ভিতর সাহস আনার জন্য বলল, এলাহী ভরসা। গাছটা যেন ক্রমে শয়তান হয়ে যাচ্ছে। শয়তানের মতো পিছু নিয়েছে। মাঝে-মাঝে হাতের লাঠিটা লণ্ঠনটা ভয়ানক ভারী-ভারী মনে হচ্ছে। সে ভাবল—এমন তো হবার কথা নয়। সে ভাবল, অনেক রাতে, অনেক দূরে সে কত মানুষের সুসংবাদ, দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে গেছে···অথচ আজ এখনও সে কাওসার চক ভাঙতে পারে নি। শিমুল গাছটা বড় কাছে মনে হচ্ছে। পেছনে তাড়া করছে, কখনও সামনে। সে দু'বার লাঠিটা মাথার উপর বন বন করে ঘোরাল। ওর পাইক খেলার কথা মনে হল—লাঠি খেলায় ওস্তাদ ঈশম এই মাঠে গাছটাকে প্রতিপক্ষ ভেবে মাঝে মাঝে লাঠি ঘোরাতে থাকল। লণ্ঠনটা সে বাঁ হাতে রেখে ডান হাতে লাঠি মাথার উপর ঘোরাচ্ছে এবং নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। যখন ধানগাছগুলো পা জড়িয়ে ধরছে, সে লাঠি দিয়ে ধানগাছ সরিয়ে ফের হাঁটছে। সে লাঠি দিয়ে মাঝে মাঝেই ধান

গাছ সরাচ্ছিল—কিছুটা নিজেকে অন্যমনস্ক করার জন্য, কিছুটা পথ পরিষ্কারের জন্য। মাঠে নেমেই শরীরটা ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে। ভয়ানক শক্ত সমর্থ শরীর ঈশমের। এই বুড়ো বয়সেও সে ঘাড়-গলা শক্ত রাখতে পেরেছে। অথচ এই রাত, অন্ধকার, বিশাল বিলেন মাঠ এবং যে শিমুল গাছটা এতক্ষণ ওকে তাড়া করছে—এই সব মিলে তাকে কেমন গোলমালের ভিতর ফেলে দিয়েছে। ঈশম লণ্ঠনের আলোতে যেন পথ দেখতে পাচ্ছে না। এই বিল ভেঙে উঠতে পারলেই ফের গ্রাম, ফের গ্রামের পথ, গোলাকান্দালের ভূতুড়ে পুল এবং পুরী-পূজার মাঠ। ফের গ্রামের পর গ্রাম, তারপর বুলতার দিঘি এবং নমশূদ্রপাড়া—পেড়াব, পোনাব, মাসাব গ্রাম।

অন্ধকার বলেই আকাশে এত বেশি তারা জ্বলজ্বল করছিল। বিলেন জমি নিচে নামতে-নামতে যেন পাতালে নেমে গেছে। আলপথগুলি এখনও ঠিক মতো পড়ে নি, অঘ্রান গেলে, পৌষ এলে এবং ধানকাটা হলে পথগুলো স্পষ্ট হবে। এই বিলে পথ চিনে অন্য পারে উঠে যাওয়া এখন বড় কষ্টকর।

অনেকক্ষণ ধরে ঈশম একটি পরিচিত আলপথের সন্ধান করল। যারা মেলাতে যায়, অথবা বান্নিতে, তারা এই আলপথে বিলের অন্য পাড়ে উঠে যায়। ধানজমির ফাঁকে-ফাঁকে কোথায় যেন পথটা লুকিয়ে আছে। সে সন্তর্পণে গাছ তুলে-তুলে দেখছে আর এগুচ্ছে। এই বুঝি সেই পথ, কিন্তু কিছু দূর গেলেই মনে হচ্ছে, না সে ঠিক পথে আসে নি—পথটা ওকে নিয়ে এই বিলের ভিতর লুকোচুরি খেলছে। তারপর ভাবল, বিলের জমির ধারে-ধারে হাঁটতে থাকলে সে নিশ্চয়ই পাশের গ্রামে গিয়ে উঠতে পারবে। মনে-মনে আবার উচ্চারণ করল, এলাহী ভরসা। তাকে এ-রাতে, এ-বিল, এ-মাঠ অতিক্রম করতেই হবে। অন্ধকারে পথ যত অপরিচিত হোক, শয়তানের চোখ যত ভয়ঙ্কর হোক—সে এ-মাঠ ঠেলে অন্য মাঠে গিয়ে পড়বেই। ধনকর্তাকে খবর দেবেই।

সে কখনও দৃঢ় হল। অথবা কখনও সংশয়ে ভুগে সে কেমন দুর্বল হয়ে পড়ছে। সে যেন ক্রমে এই বিলের ভিতর ডুবে যাচ্ছে। এবং মনে হচ্ছে তার, সে একই জায়গায় ঘুরে-ঘুরে ফিরে আসছে। সে আদৌ এগুতে পারছে না। সে এবার বলল, খুদা ভরসা। সে যে ঘুরে-ফিরে একই জায়গায় ফিরে আসছে পরখ করার জন্য হাতের লাঠিটা ধানগাছ সরিয়ে কাদামাটিতে পুঁতে দিল। সে সেই নির্দিষ্ট স্থানটি চিনে রাখার জন্য কিছু গাছ উপড়ে ফেলল। একটা ক্রুশের মতো করে গাছগুলোকে বিছিয়ে রাখল মাটিতে। তারপর গোলমতো চার পাশে একটা দাগ দিল।

অনেকক্ষণ ধরে এই বিল এবং পথ ওর সঙ্গে রসিকতা করছে। সে একটু সময় বসল। বিশ্বচরাচর নিঝুম। মনে হয় ঠিক যেন এই বিল সেই পাগল ঠাকুরের মতো রহস্যময়। সে নিজের মনে হাসবার চেষ্টা করল। অথচ গলা

শুকনো। ওর সামান্য কাশি উঠে এল গলা থেকে। দ্রুত সেই শব্দ বিলের চার-পাশে ছড়িয়ে পড়ছিল। অপরিচিত শব্দ কোথাও। সে কান পেতে রাখল। এখন এই মাঠ আর তার কাছে পাগল ঠাকুরের মতো রহস্যময় নয়, নিঃসঙ্গ মাঠ অঘ্রানের শিশিরে ভিজে ওর পঙ্গু স্ত্রীর মতো ঘুমাচ্ছে অথবা রাতের কীটপতঙ্গ সকল, ঝিঁঝি পোকা সকল শীতের মরসুমের জন্য আর্তনাদ করছে। কবে শীত আসবে, কবে শীত আসবে, মাঠ ফাঁকা হবে, শস্যদানা মাঠে পড়ে থাকবে, আমরা উড়ে উড়ে খাব, ঘুরব-ফিরব, নাচব-খেলব। সে যত এইসব শুনতে থাকল, যত এইসব চিন্তায় বিষণ্ণ হতে থাকল তত সেই ভয়াবহ শিমুল গাছটা মাথার আলো জ্বেলে ওর দিকে যেন এগিয়ে আসছে।

শিমুল গাছটার মাথায় আলোটা জ্বলছে আর নিভছে। অথবা নিভে গিয়ে আলেয়া হয়ে যাচ্ছে। দূরে-দূরে যেন বিলের এ-মাথা থেকে অন্য মাথায় আলেয়াটা ওকে নেচে-নেচে খেলা দেখাচ্ছে। সে বলল, ভালরে ভাল! এভাবে বসে থাকলে ভয়টা ওকে আরও পঙ্গু করে দেবে। সে দ্রুত উল্টো মুখে ছুটতে পারলেই কোন না কোন গ্রামে উঠে যেতে পারবে।

সুতরাং সে হাতের লণ্ঠন নিয়ে দ্রুত ছুটতে থাকল। হাতে লণ্ঠনটা দু'বার দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠল। লণ্ঠনটা নিভে যাবে ভয়ে সে দ্রুত ছুটে যেতে পারল না। সে দু' হাঁটতে আর শক্তি পাচ্ছে না। বার-বার কেবল পিছনের দিকে তাকাচ্ছে। সে এবার দেখল, স্পষ্ট দেখতে পেল শিমুল গাছটা যথার্থই এগিয়ে আসছে। সে দেখল গাছের মাথায় আলো আর ডালে ডালে মড়কের মৃতদেহ ঝুলছে। সে সেই গাছ দিয়ে ক্রস করা জায়গাটায় ফিরে এসেছে। শিমুল গাছটা সহসা জীবন্ত হয়ে গেল! এতক্ষণ তবে সে একই বৃত্তে ঘুরছে! ভয়ে বিবর্ণ ঈশম দস্যুর মতো লাথি মারল জমিতে। উপড়ানো গাছগুলো অন্ধকারে বিলের প্রচণ্ড হাওয়ায় উড়তে থাকল।

সে শয়তানকে উদ্দেশ্য করে বলল, শয়তানের পো ভাবছটা কি শুনি! বিলের পানিতে আমারে ডুবাইয়া মারতে চাও। বলেই সে লাঠিটা সামনে তুলে উপরের দিকে ঘোরাল। যেমন সে মহরমের দিন বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সামনে-পিছনে অথবা উপরে-নিচে ডাইনে-বাঁয়ে লাঠি ঘোরাতো, লাঠি এগিয়ে দিত, পিছিয়ে আনত, সে উপরের দিকে উঠে যাবার সময় তেমন সব খেলা দেখাতে থাকল। এই বিলের জমি এবং শিমুল গাছটার ভয়ে সে এখন মরিয়া। কিন্তু খেলা দেখালে হবে কি—কারা যেন ওকে পেছনে টানছে। চারপাশে হাঁটছে কারা। মনে হচ্ছে সারা বিলে মানুষের পায়ের শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছে। একদল অবয়বহীন শয়তান ওর সঙ্গে হাঁটছে অথচ কথা বলছে না। অন্ধকারে সে কেবল উপরে ওঠার পরিবর্তে নিচে নেমে যাচ্ছে। এবারে সে চিৎকার করে উঠল, খুদা এইটা কি হইল! ধনকর্তাগ, আমারে কানাওলায় ধরছে। সে লণ্ঠন ফেলে লাঠি ফেলে

বিলের আলে আলে ঘুরতে থাকল। ধানপাতা লেগে পা কেটে যাচ্ছে। সে বার-বার একই জায়গায় ঘুরে ঘুরে এসে হাজির হচ্ছে। আর এ সময়ই সে দেখল ভুতুড়ে আলোটা একেবারে চোখের সামনে জ্বলছে নিভছে। সেই আলো হাজার চোখ হয়ে গেল, অন্ধকারের ভিতর ভূতের মতো চোখগুলো জ্বলছে। ঈশম আর লড়তে পারল না, ধীরে ধীরে আলের উপর সংজ্ঞাহীন হয়ে গেল।

আগে সুন্দরআলি লণ্ঠন হাতে। পিছনে ধনকর্তা। সে চারদিন আগে ধনবৌর চিঠি পেয়েছে। ধনবৌ লিখেছে—শরীরটা আমার ভাল যাচ্ছে না, এ সময় তুমি যদি কাছে থাকতে। ধনবৌর চিঠি পেয়ে চন্দ্রনাথ আর দেরি করে নি। বড় কাচারি বাড়িতে মেজদা থাকেন, তাঁর কাছে গিয়ে বলল, দাদা আমি একবার বাড়ি যামু ভাবছি। আপনের বৌমা চিঠি দিছে। অর শরীর ভাল না—একবার তবে ঘুইরা আসি। ভূপেন্দ্রনাথ সঙ্গে সুন্দরআলিকে দিয়েছে। রাত হয়ে যাবে যেতে। সেরেস্তায় কাজের চাপ পড়েছে—নতুবা তিনি নিজেও বাড়ি যেতেন। ছেলে হয়েছে এমন খবর জানা থাকলে চন্দ্রনাথ এতটা বোধহয় উদ্বিগ্ন হত না। সে দ্রুত পা চালিয়ে হাঁটছে। সুন্দরআলিকে নিয়ে লণ্ঠন হাতে নেমে এসেছে। শীতলক্ষ্যার পাড়ে পাড়ে কিছু দূর এসে বাজার বাঁয়ে ফেলে মাসাব পোনাব হয়ে বুলতার দিঘি ধরে ক্রমশ এগিয়ে চলছে। পেয়াদা সুন্দরআলি মাঝে মাঝে কাশছিল। সে, সে-শব্দটাও করে নি। নির্ভয়ে নিঃশব্দে ওরা এ মাঠে এসে নেমেছে। মাঠ পার হলেই ফাওসার খাল, তারপর দু'ক্রোশ পথ। বাড়ি পৌঁছাতে দেরি নেই। এমন সময়ে সুন্দরআলি চিৎকার করে উঠল, নায়েব মশাই, খুন। হাত থেকে লণ্ঠনটা পড়ে যাবে যাবে ভাব হল সুন্দরআলির। সুন্দরআলি পেছনের দিকে ছুটে পালাতে চাইল।

ধনকর্তা হকচকিয়ে গেলেন, এখানে খুন-ডাকাতি!

সুন্দরআলি বলল, মাঠের উপর দিয়া আসেন কর্তা। নিচ দিয়া আমি যামু না।

ধনকর্তা এবার জোরে ধমক দিল, আয় ছাখি, কি খুন কে খুন ছাখি। ধনকর্তা লণ্ঠন তুলে সন্তর্পণে মানুষটার মুখের উপর ধরল। মানুষটা বড় চেনা যেন। সে নাড়তে থাকল ওকে। দেখল শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে। সে ডাকল, ঈশম, তর কি হইল? ঈশম, অঃ ঈশম! ঈশমের শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই—সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সব।

ঈশমের পাশে বসে ধনকর্তা চোখ টেনে দেখল। না সবই ঠিকঠাক আছে। এবার মনে হল—বিলেন মাঠে এমন আঁধারে ঈশম পথ হারিয়েছে। সে বিল থেকে জল আনল। রুমালে ভিজিয়ে ভিজিয়ে জল দিল চোখেমুখে। এবং একসময় জ্ঞান ফিরলে বলল, কিরে তর ডরে ধরছে। আমি তর ধনমামা।

ঈশম চোখ মেলে ধীরে ধীরে দেখল। প্রথমে বিশ্বাস করতে পারল না। তারপর কেমন অবিশ্বাসের গলায় ডাকল, ধনমামা! আপনে ধনমামা! ধনকর্তাকে দেখে সে কেঁদে ফেলল।—মামাগ, আমারে কানাওলায় ধরছে! সারাটা মাঠ, বিল, জমি ঘুরাইয়া মারছে। শরীরটা আর শরীর নাইগ মামা।

—আস্তে আস্তে হাঁট। বিলে তুই আইছিলি ক্যান?

এতক্ষণ পর ঈশমের সব মনে হল। কেন এসেছিল এই মাঠে, কোথায় যাবে, কি করবে, কি খবর দিতে হবে সব এক এক করে মনে পড়ল। ধনমামা, আপনের পোলা হইছে। আমিও আপনের কাছে যামু কইরা বাইর হইছি। পথে এই কাণ্ড—কানাওলা।

ধনকর্তা বিশাল বিলেন মাঠে আলো, আঁধারে দাঁড়িয়ে কি জবাব দিতে হবে ভেবে পেল না। আকাশে তেমনি হাজার নক্ষত্র জ্বলছে। ঠাণ্ডা হাওয়া ধানের গন্ধ বয়ে আনছে। ঈশম সে সময় বলল, চলেন মামা, আস্তে আস্তে হাঁটি। যেতে যেতে খুব সংকোচের সঙ্গে বলল, আমারে একটা তফন দিতে হইব।

ওরা হেঁটে হেঁটে একসময় ট্যাবার পুকুর পাড়ে এল। অশ্বত্থ গাছ পার হতে গিয়ে ঈশম ডাকল, বড়মামা আছেন, বড়মামা! কোন উত্তর এল না। পাড়ে ভীষণ ঝোপ-জঙ্গল। এত রাতে এই জঙ্গলে বসে থাকলে কিছুতেই ধরতে পারবে না। ভিতরে কেউ আছে কি নেই—দিনের বেলাতে টের পাওয়া যায় না। ঈশম অথবা চন্দ্রনাথ বৃথা আর ডাকাডাকি করল না। করলা খেত পার হয়ে ধানের জমিতে নেমে আসতেই টের পেল যেন খেতের ভিতর খচখচ শব্দ হচ্ছে। ধান খেতে সামান্য জল। পায়ের পাতা ডোবে কি ডোবে না। ঈশম লণ্ঠন তুলতেই দেখল—বড়কর্তা। ধান খেতের ভিতর বড়কর্তা কেমন উবু হয়ে আছেন। ঈশম খেতের ভিতর ঢুকে বলল, উঠ্যান। বাড়ি যাইতে হইব। বড়মামি আপনের লাইগা জাইগা আছে। কিন্তু বড়কর্তার মুখে কোন রেখা ফুটে উঠল না। যেমন বসেছিলেন তেমনি বসে থাকলেন। কিছুতেই উঠছেন না। কিসের উপর চেপে বসে আছেন। পায়ের নিচে অন্ধকার এবং ধান গাছ। খচখচ শব্দ। গাছগুলো নড়ছে। সে লণ্ঠনটা নিচে নামাতেই দেখল একটা বড় কাছিম। একটা প্রকাণ্ড কাছিম চিৎ করে তিনি উপরে বসে আছেন। কাছিমটা পা'গুলি বের করে মুখ বের করে কামড়াতে চাইছে। কিন্তু তাঁর পা নাগাল পাচ্ছে না। কেবল গাছগুলো নড়ছে। ঈশম কি বলতে যাচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে কাছিমের বুকে বসে বড়কর্তা হেঁকে উঠলেন, গ্যাৎচোরেৎশালা।

ঈশম বলল, বড়মামা, এইটা আপনে কি করছেন? এতবড় একটা কাছিম ধইরা বইসা আছেন। তারপর সে বলল, আপনে বাড়ি যান। ধনমামায় আইছে। ধনমামার পোলা হইছে।

ধনকর্তা বলল, উইঠা আসেন বড়দা। কাছিমটা ঈশম লইয়া যাইবখন।

বড়কর্তা ভাল মানুষের মতো ধনকর্তাকে অনুসরণ করলেন। বড়কর্তা কখন ছুটতে থাকবেন, কখন হাতে তালি বাজাবেন—এই সব ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার জন্য ধনকর্তা সন্তর্পণে পিছনে পিছনে হাঁটতে থাকলেন। বড়কর্তা অন্ধকারে ছুটতে চাইলে ধনকর্তা বলল, আমার হাতে লাঠি আছে বড়দা। ছুটবেন ত বাড়ি মারমু। ঠ্যাঙ ভাইঙ্গা দিমু।

চন্দ্রনাথের মুখে এমন কথা শুনে বড়কর্তা ঘুরে দাঁড়ালেন। আমাকে তুমি ভর্ৎসনা করছ চন্দ্রনাথ! এমন এক করুণ মুখ নিয়ে চন্দ্রনাথকে দেখতে থাকলেন। তিনি যেমন কোন কথা বলেন না, এখনও তেমনি কোন কথা না বলে অপলক চেয়ে থাকলেন। এমন চোখ দেখলেই মনে হয় এই উত্তর চল্লিশের মানুষ বুঝি এবার আকাশের প্রান্তে হাত তুলে তালি বাজাবেন। চাঁদের কাকজ্যোৎস্না এখন আকাশের সর্বত্র। যথার্থই এবার বড়কর্তা দু'হাত উপরে তুলে হাতে তালি বাজাতে থাকলেন, যেন আকাশের কোন প্রান্তে তাঁর পোষা হাজার হাজার নীলকণ্ঠ পাখি হারিয়ে গেছে। হাতের তালিতে তাদের ফেরানোর চেষ্টা। আর ধনকর্তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কিছু নতুন করে লক্ষ করল—বড়দার বড় বড় চোখ, লম্বা নাক, প্রশস্ত কপালের পাশে বড় আঁচিল, সবচেয়ে সেই সূর্যের মতো আশ্চর্য রঙ শরীরের এবং সাড়ে ছয় ফুটের উপর শরীরের ঋজুতা। দেখলে মনে হবে মধ্যযুগীয় কোন নাইট রাতের অন্ধকারে পাপ অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। চন্দ্রনাথ দেখল, বড় এবং গভীর চোখ দুটো সারাদিন উপবাসে কোটরাগত। দুঃখে চন্দ্রনাথ চোখের জল রোধ করতে পারল না। বলল, বড়দা, আপনে আর কত কষ্ট পাইবেন, সবাইরে আর কত কষ্ট দিবেন!

বড়কর্তা ওরকে মণীন্দ্রনাথ শুধু বলল, গ্যাৎচোরেৎশালা। ফের তিনি আকাশের প্রান্তে তালি বাজাতে থাকলেন। সেই তালির শব্দ এত বড় মাঠে কেমন এক বিস্ময়কর শব্দ সৃষ্টি করছে। এইসব শব্দ গ্রাম মাঠ পার হয়ে সোনালী বালির নদীর চর পার হয়ে তরমুজ খেতের উপর এখন যেন ঝুলছে। মণীন্দ্রনাথের বড় ইচ্ছা, জীবনের হারানো সব নীলকণ্ঠ পাখিরা ফিরে এসে রাতের নির্জনতায় মিশে থাক—কিন্তু তারা নামছে না—বড় কষ্টদায়ক এই ভাবটুকু। তিনি এবার চন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে ঘরের দিকে চলতে চলতে যেন বলতে চাইলেন, চন্দ্র, তোমার ছেলে হয়েছে, বড় আনন্দ। অথচ কথার অবয়বে শুধু এক প্রকাশ, গ্যাৎচোরেৎশালা। এবার তিনি নিজের এই অপ্রকাশের দুঃখে কেমন দুঃখিত হলেন—এত নক্ষত্র আকাশে অথচ তাঁর পাগল চিন্তার সমভাগী কেউ হতে চাইছে না। সকলেই যেন তাঁর ঠ্যাঙ ভেঙে দিতে চাইছে। মণীন্দ্রনাথ আর কোন কথা না বলে সেজভাইকে শুধু অনুসরণ করে হাঁটতে থাকলেন।

ঢাক-ঢোলের বাজনা শোনা যাচ্ছে। ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছে—মনে হয় কেউ দামামা বাজাচ্ছে। এক দল লোক ঢাক-ঢোল বাজিয়ে গোপাট ধরে উঠে আসছে। শচীন্দ্রনাথ পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে সেই শব্দ শুনছিল। বুঝি ফেলু ফিরছে নারাণগঞ্জ থেকে। ফেলুর গলায় কালো তার বাঁধা। সে হা-ডু-ডু খেলে ফিরছে। কাপ-মেডেল কালো একটা কাপড়ে ঢাকা।

এবারেও ফেলু তবে গোপালদির বাবুদের বিপক্ষে খেলে এসেছে। মুখের উপর ফেলুর চাপদাড়ি আছে বলে আর কাঁধে সব সময় গামছা ফেলে রাখে বলে গেঞ্জির উপর বুকের ছাতিটা কাছিমের মতো, কত প্রশস্ত মাপা যায় না। কিন্তু কাছে এলে দলটা মনে হল—না, ফেলুর দল নয়, অন্য দল। তবে কি ফেলু এবারে হেরে এল। ওর দলবল ফিরছে না কেন? এই প্রথম তবে ফেলু হেরে গেছে! ফেলুর যৌবন চলে যাচ্ছে তবে। যখন ওর যৌবন ছিল—তখন এই তল্লাটে দুই আদমি, ফেলু আর সাবু—দুই বড় খেলোয়াড়, হা-ডু-ডু খেলোয়াড়। তখন এই তল্লাটে বিশ্বাসপাড়া, নয়াপাড়া এমন কি দশ-বিশ ক্রোশ দূরে অথবা গোপালদির মাঠে এবং নদী পার হয়ে সেই মেঘনার চরে ওদের খেলা দেখার জন্য কাতারে-কাতারে লোক—ফেলু হা-রে···রে···ডু···ডু বলে যখন দাগের উপর বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ত—যখন ফাইনাল খেলার দামামা বাজত, ব্যাগ-পাইপ বাজত, তখন ফেলুর মুখ দেখলে মনে হতো ফেলু বড় কুশলী খেলোয়াড়। তখন কত মেডেল গলায় ঝুলত তার।

কত কাপ এনে দিয়েছে সে তার দলের হয়ে। দিন নাই রাত নাই, ফেলু বিশ-পঁচিশ ক্রোশ পথ হেঁটে খেলতে চলে গেছে। একবার বড় শহরে খেলতে গিয়েছিল, ফেরার পথে পালকিতে। জয়-জয়কার ফেলুর। পালকির দু'পাশে দু'মানুষের মাথায় দুই বড় কাপ, ডে-লাইট জ্বালিয়ে দামামা বাজিয়ে ওরা শহর থেকে গ্রামে ফিরেছিল। লাঙলবন্দের মাঠ এবং নদী পার হলে গ্রামের মানুষেরা বৌ-বিবিরা সেই যে দাঁড়িয়ে গেল দেখতে, আর শেষ নেই। ওরা ফেলুকে দেখছিল, দুই বড় কাপ দেখছিল, কালো তার গলায় দলের হা-ডু-ডু খেলোয়াড়-দের দেখছিল—য্যান ঢাকার ঝুলনযাত্রা যায়। সেই ফেলু তবে এবারে হেরে গেছে! অন্য দলের মানুষেরা জয় গোপালদির বাবুদের কি জয়···বলতে-বলতে যাচ্ছে। শচীন্দ্রনাথের কেন জানি এ সময়ে ফেলুর মুখটা দেখতে ইচ্ছা হল। ফেলু হয়তো হেরে গিয়ে আগে আগে বাড়ি চলে এসেছে। আর কিছু না পেরে হয়তো বিবি আন্নুকে ধরে পেটাচ্ছে।

চন্দ্রনাথ এ-সময় তাঁর জাতক দেখছেন। অস্থূজ ঘরে শশীবালা চন্দ্রনাথকে আর একটু ঝুঁকতে বলল। ধনবৌ পান খেয়েছে। ঠোঁট লাল। এ'কদিন

সিঁদুর দিতে নেই কপালে—কপাল শাদা। ঘরের ভিতর ভিজা কাঠ জ্বলছে। কিছু শতচ্ছিন্ন নেকড়া। এক কোণায় আগুনটা গনগন করছিল। দু-হাতে ধনবৌ জাতককে সামনে তুলে ধরলো, চন্দ্রনাথ ছেলে না দেখে ধনবৌর মুখ দেখল, কেমন শাদা হয়ে গেছে মুখটা—শালুক পাতার মতো রঙ মুখে। ধনবৌর চোখ, আবার মা হতে পেরেছে বলে জ্বলজ্বল করছিল। হাতের নোয়া লালপেড়ে কাপড়, দু'হাতে জাতককে তুলে ধরার ভঙ্গি সবটুকু মিলে ফিসফিস করে বলার মতো—কেমন ছাখছ। কার মতো হইব! তোমার মতো, না আমার মতো?

তখন মণীন্দ্রনাথ একটা অশ্বত্থ গাছের নিচে এসে দাঁড়ালেন। এই পথ দিয়ে হা-ডু-ডু খেলার দলটা চলে গেছে। তিনি কাপ মেডেল এবং মানুষের উল্লাস দেখার জন্য ওদের পিছনে পিছনে বের হয়ে পড়েছিলেন—এখন তারা নয়াপাড়ার মাঠে নেমে গেছে। তিনি তাদের সঙ্গে অতদূর গেলেন না। এই অশ্বত্থ গাছটার নিচে এলেই দূরের এক যেন দুর্গ দেখতে পান। দুর্গে হয়তো অশ্বারোহী কিছু যুবক এখন কদম দিচ্ছে। দুর্গের দরজা খুলে গেলে যেমন হাজার সেনা বের হয়ে মাঠে চত্বরে খেলা দেখায়—এখন যেন তেমনি গাছের উপরে হাজার গাঙশালিখ মাথার উপর উড়ে-উড়ে খেলা দেখাচ্ছে। যারা নদী থেকে ফিরে আসে নি, যারা খুঁটে-খুঁটে নদীর চরে অথবা বিলে পোকা-মাকড় খাচ্ছে, তারা এবারে ফিরে আসবে। ফিরে এলেই তিনি এই গাছের নিচে বসে আপন মনে এক মনোরম জগৎ বানিয়ে বসে থাকবেন।

গাছটার নিচে কিছু মটকিলার গাছ, কিছু বেতপাতার ঝোপ এবং বনকাশের জঙ্গল। কিছু ছাতার পাখি অনবরত ঝোপে জঙ্গলে নেচে-নেচে বেড়াচ্ছে। মণীন্দ্রনাথ গাছটাকে প্রদক্ষিণ করার মতো ঝোপ-জঙ্গলের চারপাশে ঘুরতে থাকলেন। এত বড় গাছ! ঈশ্বরের মতো এই গাছ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে যেন। এবং তিনি ঈশ্বরকেই যেন প্রদক্ষিণ করছেন এমন একটা ভাব তাঁর চোখে মুখে। মুখ উঁচু করে গাছটা দেখছেন আর কি যেন বিড়বিড় করে বকছেন। তখন মুসলমান গ্রামের পুরুষেরা যেতে-যেতে আদাব দিল। বলল, কি মানুষ কি হইয়া গ্যাল! ওরা বলল, বাড়ি চলেন—দিয়া আসি। মণীন্দ্রনাথ ওদের কথায় বালকের মতো হাসতে-হাসতে গড়িয়ে পড়ল। তারপর ওরা যেই চলে গেল—সন্তর্পণে ঢুকে ঝোপের ভিতর বসে গেল। চুপচাপ ঝোপের ভিতর বসে মটকিলার ডাল ভেঙে দাঁত মাজতে থাকল। কত দিন যেন দাঁত মাজেন নি, কতকাল সব ভুলে বসেছিলেন যেন—তিনি মুখের দুর্গন্ধ দূর করার নিমিত্ত দাঁত ঘষে-ঘষে সাদা করে তুলছেন। আবেদালি উঠে আসছিল গ্রামে, সে দেখল ঝোপের ভিতর পাগল ঠাকুর। সে বলল, কর্তা, বাড়ি যান। আসমানের অবস্থা ভাল না।

মণীন্দ্রনাথ ঝোপের ভিতর থেকে আবেদালির কথা শুনেও হাসল। মুসলমান

বিবিরা শালুক তুলে বাড়ি ফিরছিল। ওরা ঝোপের ভিতর খচখচ শব্দ শুনে উঁকি দিল। শিশুর মতো পাগল ঠাকুর ঝোপের ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে কি যেন অন্বেষণ করছেন। বিবিরা বলল, কর্তাগ, বাড়ি যান। মা-ঠাইরেন চিন্তা করব—আসমান বড় টান-টান ধরছে।

আবেদালি বাড়ি উঠে ভাবল—কর্তারে ধইরা নিয়া গ্যালে হয়। কিন্তু বুড়ো ঠাকুরুণ শশীবালার কথা মনে করে কেমন সঙ্কুচিত হয়ে গেল। যদি তিনি অসন্তুষ্ট হন, যদি বলেন, তুই ক্যান অরে ধইরা আনলি। আবার অরে সান করান লাগব, এই সব ভেবে উঠোনে আর দাঁড়াল না। সে চন্দদের নৌকায় কাজ করে। নদীতে নৌকা থাকে। ক'দিন পর বাড়ি ফিরেছে—ক্লান্ত এবং অবসন্ন। তবু কি এক কষ্টের কথা ভেবে আসমানের দিকে তাকিয়ে ওর ডর ধরে গেল। ঝড়-জল আসমান ফেটে নামলে মানুষটা ভিজে-ভিজে মরে যাবে। সে মাঠে নেমে গেল। এবং নদীর চরে ঈশমের ছই, সে ছইয়ের দিকে হাঁটতে থাকল। ঈশমকে খবরটা দিয়ে ঘরে ফিরবে।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। আকাশের অবস্থা দেখে মাঠ থেকে মানুষেরা গ্রামে উঠে গেল। গরু-বাছুর নিয়ে গৃহস্থেরা ফিরে এল বাড়ি। ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে, শিলাবৃষ্টি হতে পারে, আকাশটা ক্রমে কালো হয়ে গেল। দুটো-একটা সাদা বক ইতস্তত উড়ে উড়ে নিরুদ্দেশে চলে যাচ্ছিল। খুব থমথমে ভাব। গাছপালা একটা নড়ছে না। মুসলমান গ্রামে মোরগেরা ডাকতে থাকল। যত আকাশ কালো হচ্ছে, যত এই পৃথিবী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে মণীন্দ্রনাথ তত উল্লাসে ফেটে পড়ছেন। কি উল্লাস, কি উল্লাস! তিনি যেন ঘুরে-ফিরে নাচছিলেন। তিনি যেন আকাশ দেখে, পাগলপারা আকাশ দেখে যেমন খুশি হলে তালি বাজান, ভুবনময় তালি বাজে—তিনি নেচে-নেচে তালি বাজাতে থাকলেন। টুপটাপ বৃষ্টি, গাছপাতা ভিজে যাচ্ছে। গরমে মাথা শক্ত হয়ে যাচ্ছে—এই টুপটাপ বৃষ্টি, আকাশের ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব ওকে সামান্য সহজ করে তুলছিল। কিন্তু এক্ষুণি শচি আসতে পারে, চন্দ্রনাথ আসতে পারে। ওরা এসে তাকে জোর করে নিয়ে যেতে পারে। ঈশ্বরের মতো গাছটার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারে ভাবতেই তিনি কাপড়ের আঁচলে গাছের ডালে নানা রকমের গিঁট দিতে থাকলেন। ঝড়ে ওঁকে ঠেলতে পারবে না, গ্রামের মানুষেরা ধরে নিয়ে যেতে পারবে না। তিনি কাপড়টা গোটা খুলে গাছের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেললেন।

টোডারবাগ থেকে নেমে আবেদালি সড়ক ধরে হাঁটতে থাকল। বাড়ির কাজ ফেলে, নমাজ ফেলে সে ঈশমের জন্য নদীর চরে নেমে যাচ্ছে। ছইয়ের নিচে কোন লণ্ঠন জ্বলতে দেখল না। সে আলে দাঁড়িয়ে ডাকল, অ, ঈশম চাচা, আছেন নাকি? বৃষ্টি পড়ায় আবেদালির শরীর ভিজে উঠছে। ঠাণ্ডা হাওয়ার

জন্য শীত করছে। সুতরাং সে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারল না। সে নিজের গাঁয়ে ফিরে ঘরে ওঠার মুখে ডাকল, জব্বরের মা, আমি আইছি। দরজা খোল্। অথচ কোন সাড়া না পেয়ে সে কেমন ক্ষেপে গেল। সে চিৎকার করে ডাকল, তরা মইরা আছিস নাকি!

বৃষ্টির শব্দের জন্যই হোক অথবা অন্য কোন কারণে—জব্বর দরজা খুলতে দেরি করছে। আবেদালি বার বার ঝাঁপের দরজায় ধাক্কা মারতে থাকল। জব্বর দরজা খুললে সে কেমন পাগলের মতো চিৎকার করে বলল, তর মায় কই রে?

—মায় গ্যাছে সামুগ বাড়ি।

—ক্যান গ্যাল! আবেদালি তক্ন দিয়ে শরীর মুখ মুছল।

—সামুগ বাড়িতে জাল্সা আছে।

আবেদালি তিন-চারদিন পর বাড়ি ফিরেছে। সুতরাং গ্রামের কোথায় কি হচ্ছে জানার কথা নয়। আবেদালি চন্দদের বড় নৌকা নিয়ে নারাণগঞ্জে সওদা করতে গিয়েছিল। দন্দির বাজারে চন্দদের মুদির দোকান। আবেদালি চন্দদের বড় নৌকার মাঝি। ঘরে বসে সে কেমন শান্তি পাচ্ছিল না। ওর মনটা কেবল খচখচ করছে। এখনও হয়তো বড়কর্তা ঝোপে বসে আছেন। বাড়ির মানুষেরা মানুষটার জন্য ভাবছে। হয়তো কেউ কেউ খুঁজতে বের হয়ে গেছে। সে এবার ছেলের দিকে তাকাল—বলল, জব্বর, একটা কাম করবি বা'জান।

জব্বর কেমন ঝাঁঝের গলায় বলল, কারণ এখন কত কথা এই বয়স্ক মানুষটা তাকে বলতে পারে, যাও মাঠের খেড় তুইলা আন। পানিতে ভিজা গেলে গরুতে খাইব না।—কি করতে কন!

প্রথম ভাবল বিবির কথা বলবে। সে এসেছে—কোথায় বিবি এসে তাকে এখন খানাপিনার অথবা মর্জি মোতাবেক কিছু কথাবার্তা—তা না, জালসায় পরাণ খুইলা দিছে। সে বিরক্ত হয়ে বলল, তর মায়রে ডাক দিনি।

—মায় কি অখন আইব?

—আইব না ক্যান রে! তিনদিন ধইরা লগি বাইছি—এই জানডার লাগি তগ মায়া-মমতা নাই রে!

—আর বেশিদিন কষ্ট করতে হইব না বা'জান।

এমন কথায় আবেদালি কি যেন টের পেয়ে বলল, হ, চুপ কর।

জব্বর চুপ করে ছেঁড়া মাদুরটার এক পাশে বসে থাকল। সহসা বলল, হুঁকা খাইবেন বা'জান?

আবেদালি বুঝল, জব্বরও এসময় একটু হুঁকা খেতে চায়। মনটাতে খোস-মেজাজ এনে দেবার জন্য বলল, সাজা।

জব্বর হুঁকা সাজল। বাপকে দিল। তারপর নিজেও দু'টান দিয়ে বলল, আপনে নামাজ পড়েন, আমি ভাতটা বাড়তাছি।

—নামাজ পড়মু না! আবেদালি এবার উঠল। বৃষ্টির জলে বদনা ভরল। এবং হাতে মুখে জল দিল। বাইরে জোর বর্ষণ হচ্ছে। মাঝে মাঝে আকাশটা চিরে যাচ্ছে। যেন কে মাঝে মাঝে আসমানের গায়ে স্বর্ণলতা ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে—ফালা ফালা আকাশে গর্জন উঠছিল—আবেদালির ঘরটা যেন পড়ে যাবে। শণের চাল পচে গেছে। টুঁই দিয়ে জল গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে। পাটকাঠির বেড়া পচে গেছে। বাঁশের উপর ছেঁড়া পাটি এবং কাঁথা বালিশ, নিচে ছেঁড়া চাটাই। আবেদালি ছেঁড়া চাটাইয়ের উপর খেতে বসল। বৃষ্টির সঙ্গে হাওয়া দিচ্ছে, মাঁদার গাছের একটা ডাল ভেঙে পড়ল। আবেদালি ডাকল, অঃ, জব্বর! জব্বর! খুব ধীরে এবং সোহাগের গলায় ডাকল।

—কিছু কন আমারে?

—একটা কাম করতে পারস?

—কি কাম?

—তুই একবার বা'জান ঠাকুরবাড়িতে গিয়া ক'দিনি, বড়কর্তা গোরস্থানের বটগাছটার নিচে বইসা আছে। বা'জানরে, বড় কষ্ট বড়কর্তার—যা, একবার গিয়া কর্তার বাড়িতে খবর দে।

—আমি পারমু না বা'জান। আমারে অন্য কামের কথা কন।

আবেদালি এবার খাবার ফেলে উঠে পড়ল। সে জব্বরের মুখের সামনে গিয়ে খেঁকিয়ে উঠল—যেন সে জব্বরকে মেরেই ফেলবে—পা'টা পিঠের কাছে নিয়ে কি ভেবে সরিয়ে আনল। বলল হালার পো হালা, তুমি আমার বাপজান। তোমার কথায় আমি চলুম?

জব্বর তেমনি মাথা নিচু করে বসে থাকল।—আমারে অন্য কামের কথা কন। সে যেন কি স্থির করে রেখেছে মনে-মনে। সুখে এবং স্বচ্ছন্দে দিন যায় না—বাপ তার কত দিন পর ঘরে ফিরে এসেছে। এসে কোথায় মিষ্টি কথা বলবে—তা না কেবল খ্যাক-খ্যাক করছে খাটাশের মতো। সে ভিতরে-ভিতরে এতক্ষণ যা প্রকাশ করতে চাইছিল না, বাপের মর্জি দেখে, বাপের এই নিষ্ঠুর চেহারা দেখে মরিয়া হয়ে উঠল—যেন বাপ ফের বললে সে মুখের উপর বলেই দেবে।

—কি যাবি না!

—না। আমারে অন্য কামের কথা কন।

—তা হইলে আমার কথা থাকব না।

—না!

—ক্যান, কি হইছে! আবেদালি এবার স্বর নামাল।

—আমি লীগে নাম লেখাইছি।

—ত হইছে ডা কি! হইছে ডা কি ক! নাম লেখাইয়া বা'জানের কোরানশরিফ শুদ্ধ কইরা দিছ!

—কি হইব আবার। হিন্দুরা আমাগ ছ্যাখলে ছ্যাপ ফালায়, আমরা-অ ছ্যাপ ফ্যালামু।

—জাল্‌সাতে বুঝি এডাই হইতাছে।

জব্বর এবার চুপ করে থাকল।

বাপ বেটা এবার দু'জনেই চুপ। আবেদালি ফের খেতে বসে গেল। মাথা নিচু করে খেতে বসে গেল। ঝালে—কি ছেলের কথায় চোখ ছলছল করছে বোঝা যাচ্ছে না। সে চোখের এই দুঃখটুকু সামলাবার জন্য জল খেতে থাকল। তারপর খুব ধীরে ধীরে যেন অনেক দূর থেকে বলার মতো বলল, বড় কর্তা পানিতে ভিজতাছে, তুই না গেলে আমি যামু। আবেদালি বদনার নল মুখে পুরে দিল এবং হাঁসের মতো কোৎ করে জলটা যেন গিলে ফেলল। তারপর বাকি জলটা মুখে রেখে অনেকক্ষণ কুলকুচা করল। দাঁতের ফাঁকে যা কিছু ভোজ্য দ্রব্য—সমান-সমান অংশে দাঁতের ফাঁকে লেগে আছে—সে জিভ দিয়ে দাঁতের ফাঁক থেকে বাকি খাদ্যবস্তুর স্বাদ নিতে নিতে কেমন নিষ্ঠুর চোখে ফের জব্বরের দিকে তাকাল। বলল, তুমি আমার ভাত পাইবা না, কাইল থাইক্যা তোমার ভাত বন্ধ। আবেদালি মরিয়া হয়ে উঠল। পুত্রের এমন সম্মান-অসম্মানবোধ ওর ভাল লাগল না। তিন দিনের পরিশ্রম এবং এ-সময়ে ঘরে বিবির অনুপস্থিতি ওকে পাগল করে দিল। একবার ইচ্ছা হল ঘরের কোণ থেকে সড়কিটা নিয়ে পেটে একটা খোঁচা মারে—কিন্তু কি ভেবে সে বলল, আল্লা, দ্যাশে এডা কি শুরু হইল!

আবেদালির কাঁচা-পাকা দাড়ি বেয়ে কিছু জল গড়িয়ে পড়ল। কুপির আলোতে আবেদালির মুখ ভয়ানক উদ্বিগ্ন। ঢাকায় রায়ট লেগেছে—এসব কথা কেন জানি বার বার মনে পড়ছে। হিন্দু-মুসলমান উভয়ই জবাই হচ্ছে। সব কচুকাটা। মুসলমান জবাই হলেই সে কেমন উত্তেজিত হয়ে পড়ে—কিন্তু বড়কর্তা ধনকর্তার এবং পাশের গ্রামের অন্যান্য অনেক হিন্দুর উদারতা, পুরুষানুক্রমের আত্মীয় সম্পর্ক সব দুঃখ, উত্তেজনা মুছে দেয়। দরজার ভিতর থেকেই হাত বাড়াল আবেদালি। একটা মাথলা মাথায় টেনে অন্ধকার পথে নেমে গেল।

শচি হাঁটছিল। আগে ঈশম যাচ্ছে। হাঁটতে-হাঁটতে, সংসারে যে নানা রকমের দুঃখ জেগে থাকে—এই যে বড়কর্তা বিকেল থেকে নিরুদ্দেশে চলে গেল—কই গেল—ঝড়ে জলে এখন কোথায় আছে—এসব বলছিল। শত্রুর য্যান এমন না হয়! অশান্তি, অশান্তি! মারা গ্যালে-অ ভাবতাম, গ্যাছে। কতকাল এই দেখতে হবে ঈশ্বর জানে।

শচি এই ঝড়-বৃষ্টিতে এবং শীতের হাওয়ায় কাঁপতে থাকল। ঈশমও শীতে কাঁপছে। ঝড়জলের ভিতর ওরা দ্রুত পা চালিয়ে হাঁটছিল। ওরা অনেকগুলি জমি অতিক্রম করে মুসলমান পাড়ার ভিতর ঢুকতেই, দেখল, ইস্‌মতালির বড় ছেলে মনজুর বারান্দায় বসে আছে। সামনে কোরানশরিফ—উপরে দড়ি দিয়ে বাঁধা লণ্ঠন। ঝড়জল কমে গেছে। সে যেমন সাঁজ হলে রোজ পড়তে বসে তেমনি পড়তে বসার সময় দেখেছে—ঝড়জলে গ্রাম ভেসে যাচ্ছে। সে গরুগুলি গোয়ালে তুলে, হাঁসগুলি খোঁয়াড়ে রেখে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে বসেছিল। ঝড়জল থামতেই দরজা জানালা খুলে দিয়েছে। আকাশ তেমন গর্জন করছে না। সুতরাং সে পা দুটো ভাঁজ করে অনেকটা নামাজ পড়ার ভঙ্গীতে বসার সময় দেখল লাউমাচানে আলো এসে পড়ছে। তারপর আলোটা বাড়ির দিকে উঠে এলে দেখল—ঠাকুরবাড়ির ছোট কর্তা—শচি ঠাকুর। সঙ্গে ঈশম। ওরা এত রাতে—এ-পাড়ায়! সে তাড়াতাড়ি নেমে গেল। বলল, কর্তা, এই ম্যাঘলা দিনে বাইর হইছেন।

—বড়দারে দ্যাখছস এদিকে ?

—না-গ কর্তা। তাইনত আইজ ইদিকে আসে নাই।

মনজুর হ্যারিকেনটা হাতে নিল। বলল, আপনে বসেন! আমরা পাড়াটা খুইজা দ্যাখতাছি।

শচি বলল, তুই আবার এই বৃষ্টিতে যাবি কি করতে! সকলে কষ্ট কইরা লাভ নাই। বলে হাঁটতে থাকল। মনজুর কোন কথা বলল না। শুধু সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে থাকল। এ-সময় গ্রামে কিছু কুকুর ডেকে উঠল। ফেলুর বাড়িটা বাঁশঝাড়ের নিচে অন্ধকারে ডুবে আছে। শচির ইচ্ছা হল বলতে, ফেলু কি হাইরা গ্যাছে। ফেলুর বাড়িতে এত অন্ধকার! কুপি জ্বালাইয়া অর বিবিটা ত নলীতে সুতা ভরে! আইজ সারাশব্দ পাই না ক্যান। কিন্তু বলতে পারল না। কুল গাছে ফুলের গন্ধ। বৃষ্টি এবং ঝড়ের জন্য কিছু ফুল মাটিতে পড়ে আছে। শচি এসব মাড়িয়ে সহসা দেখতে পেল বড় রকমের একটা লাইট জ্বলছে সামুদের বাড়ি। বড় টিন-কাঠের ঘর, চওড়া বারান্দা, মুলি বাঁশের বেড়া, এবং ঠিক দরজার মুখে বাঁশে আলোটা জ্বলছে। সামনে সামিয়ানা টাঙানো ছিল, খুলে ফেলা হয়েছে। ঝড়জল একেবারে থেমে গেলে ফের সামিয়ানা টাঙানো হবে। এখন লোকগুলো ঘরে, বারান্দায় এবং বৈঠকখানায় গিজগিজ করছে। অন্ধকার গ্রামে সহসা এই আলো শচিকে বিস্মিত করল।

মনজুর যেন টের পেয়ে গেছে। কর্তার মনে সংশয়। কর্তা কি যেন ভাবছেন। সে বলল, খুলেই বলল, জালসা কর্তা। শুনছি ইখানে সামসুদ্দিন লীগের একটা অফিস খুলব। ঢাকা থাইকা আইসা সামু আমাগ লীগের পাণ্ডা হইয়া গ্যাল।

শচি কোন উত্তর করল না। সামুর এই ব্যাপারটা শচির ভাল লাগল না।

মনজুর বলল, সামুরে ডাকি কর্তা। আপনে আইছেন।

শচি বলল, না, দরকার নাই। ব্যস্ত আছে, ডাইকা ব্যতিব্যস্ত কইরা লাভ নাই।

তবু খবর দিল মনজুর। ছোটকর্তা তোমার বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছে তুমি বসে-বসে জালসা করছ, একবার যাও। কর্তারে কও বইতে, পান-তামুক খাইতে।

খবর পেয়ে সামসুদ্দিন তাড়াতাড়ি বের হয়ে এল। বলল, আদাব কর্তা।

—ক্যামন আছ সামু?

—ভাল নাই কর্তা। ধনকর্তার নাকি পোলা হইছে?

—হ।

—তবে মিষ্টি খাওয়ান লাগব। যামু একদিন।

শচি এতক্ষণ যা বলবে না ভাবছিল, অন্য কথা বলবে ভাবছিল, কিন্তু মনের ভিতরে কি রকম গোলমাল শুরু করে দিল। বলল, চ্যালা-ফ্যালা যোগাড় হইছে! খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথাটা বলল শচি।—হঠাৎ পাণ্ডা সাজলা! আগে না আজাদের খুব ভক্ত আছিলা।

সামসুদ্দিন খুব বিব্রত বোধ করল। সে অন্য কথায় চলে আসতে চাইল। বলল, কর্তা, বইসা যান।

মনজুর বলল, বড় কর্তারে খুঁজতে বাইর হইছে।

এবার সামসুদ্দিন শচির সঙ্গে চলতে থাকল। যেন একটা কি নৈতিক দায়িত্ব এইসব মানুষের ভিতর। সংসারে এ-যে এক মানুষ, অমন মানুষ হয় না—পাগল হয়ে যাচ্ছে। সব ফেলে—যা কিছু প্রিয়, যা কিছু সুখের—সব ফেলে মানুষটা কেবল নিরুদ্দেশে চলে যেতে চাইছে। সবাই সুতরাং চুপচাপ হাঁটছে। ঘরগুলো পরস্পর এত বেশি সংলগ্ন যে শচিকে প্রায় সময়ই নুয়ে পথ পার হতে হচ্ছিল, একটু সোজা হয়ে দাঁড়ালেই চালা এসে মাথায় ঠেকছে। এই বাড়িঘরের যেন কোন নির্দিষ্ট সীমানা নেই—একটা বাড়ির সঙ্গে আর একটা বাড়ি লেগে আছে—কার কোন ঘর, কে কোন বাড়ির মালিক মাঝে-মাঝে শচির পক্ষে নির্দিষ্ট করা কঠিন হয়ে পড়ে। শেষ বাড়িটা আবেদালির। বাড়ির উঠোনে আর একটা ঘর উঠছে। শচি বলল, আবেদালির দিদি জোটন নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে। ঘরটা দেখলেই সে টের করতে পারে। টের করতে পারে কিছুদিন আগে জোটন বিবি ছিল, এখন বেওয়া হয়েছে। জোটনের সব সমেত তিনবার নিকাহ। শচি হিসাব করে দেখল—এবারটা নিয়ে চারবার হবে। তালাক অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর জোটন প্রতিবার আবেদালির কাছে চলে আসে। আবেদালি তখন লতা এবং খড়ের সাহায্যে উত্তর দুয়ারি

ছোট্ট খুপরি ঘরটা তুলে দেয়—এই পর্যন্ত আবেদালির সঙ্গে জোটনের সম্পর্ক। তারপর কিছুদিন ধরে জোটনের জীবনসংগ্রাম। ধান ভেনে দেওয়া চিড়া কুটে দেওয়া পাড়াপ্রতিবেশীদের এবং যখন বর্ষাকাল শেষ হয়, যখন হিন্দু গৃহস্থঘরে পূজা-পার্বণ শেষ, তখন জোটন অনেক দুঃখী ইমানদারের সঙ্গে ভাতের হাঁড়িটা ধুয়ে-পাকলে জলে নেমে পড়ে। এবং সব পাট খেত চষে বেড়াতে থাকে শালুকের জন্য। শালুক শেষ হলে আবেদালির কাছে নালিশ—ছ্যাশে কি পুরুষ মানুষ নাইরে আবেদালি। সেই জোটন উঠানের উপর আলো দেখে মুখ বার করল। দেখল, শচি কর্তা হাঁইটা যায় উঠানের উপর দিয়া। সে একবার ডাকবে ভাবল, কিন্তু এত বড় মানুষকে ডাকতে সাহস পেল না।

শচি নেমে যাচ্ছিল, তখন আবেদালির দরজা খুলে গেল। ওরা পা টিপে-টিপে হাঁটছিল। জব্বর দরজা খুলতেই শচি দাঁড়াল। সব মাতব্বরদের দেখে জব্বর কিঞ্চিৎ ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল। প্রথম কি বলবে ভেবে পেল না। পরে সামুকে দেখে যেন কিঞ্চিৎ সাহস পেল। বলল, বা'জী আপনেগ বাড়ি গ্যাছে কর্তা।

—ক্যান রে?

—বড় কর্তার খবর দিতে। বড় কর্তা গোরস্থানে বইসা আছে।

ওরা আর দেরি করল না। তাড়াতাড়ি উঠোন থেকে নেমে সড়কের উদ্দেশ্যে হাঁটতে থাকল। জব্বর সকলকে দেখে ঘরে আর থাকতে পারল না। সেও ওদের পেছনে-পেছনে হাঁটতে থাকল। বৃষ্টি ধরে এসেছে। ঝড়ো হাওয়া আর বইছে না। গাছের মাথায়, ঝোপে-জঙ্গলে আবার তেমনি জোনাকি জ্বলতে শুরু করেছে। রাতের অন্ধকারে এই পাঁচটি প্রাণী মাঠে নেমে সেই গোরস্থানের বট গাছটার দিকে চোখ তুলে তাকাল।

ঈশম যেন সকলের আগে পৌঁছাতে চায়। সে বলল, কর্তা, পা চালাইয়া হাঁটেন।

অঘ্রানের প্রথম শীত বলেই জোনাকির এই অল্প-অল্প আলো, প্রথম শীত বলেই কোড়া পাখি এত রাতেও ডাকছে না, ঘাস মাটি বৃষ্টিতে ভিজে সব জল শুষে নিয়েছে। শক্ত মাটি। সড়কে কোথাও পথ পিচ্ছিল নয়—বরং শান্ত স্নিগ্ধ এক ভাব। অনেক দিন পর বৃষ্টি হওয়ায় ধানের পক্ষে ভাল হবে—সুদিন আসবে, দুর্দিন থাকবে না। ঈশম বড় বড় পা ফেলে হাঁটছে। কেউ কোন কথা বলছিল না, যেন শচি ওদের সব দুষ্টবুদ্ধি ধরতে পেরেছে—যেন পুরুষানুক্রমিক আত্মীয়বোধটুকুতে দুঃখ ও বেদনা সঞ্চারিত হচ্ছে। সামসুদ্দিন মনে-মনে কেমন এক অপরাধবোধে পীড়িত—যার জন্য সে প্রায় চুপচাপ হাঁটছিল।

লণ্ঠন তুলে বটগাছটার নিচে খুঁজতেই দেখল, বড়কর্তা ফাঁসির মতো ঝুলে আছেন। ফাঁসটা গলায় নয়, কোমরে। ধনুকের মত বেঁকে আছেন। অথবা সার্কাসের তাঁবুতে খেলোয়াড় যেমন খেলা দেখায় তেমনি তিনি পিককের খেলা

দেখাতে চাইছেন। ঝড়-বৃষ্টি শরীরের উপর সাদা-সাদা চিহ্ন রেখে গেছে। শরীরের ভিতর কোথাও এক যন্ত্রণা, ভালবাসার যন্ত্রণা অথবা স্বপ্নের ভিতর এক মঞ্জিল আছে, মঞ্জিলে জাদুর পাখি আছে—সেই পাখি তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেছে। এখন তিনি তার সন্ধানে আছেন। মনে হয়, পাখি উড়ে গেছে, তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, সওদাগরের দেশ পেরিয়ে কোথায় জলপরীদের দেশ আছে, পাখি এখন সেখানে দুঃখী রাজপুত্রের মাথায় বসে কাঁদছে। তখনই ভিতরে বড়কর্তার কি যেন কষ্ট হয়—নিজের হাত নিজে কামড়াতে থাকেন। ওরা দেখল মানুষটা হাত কামড়ে ফালা-ফালা করে দিয়েছে। এবং ডালের উপর ঝুলে আছেন।

ঈশম মটকিলার জঙ্গলে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল। সে এ-গাছ—ও-গাছ করে বড়কর্তাকে জঙ্গলের ভিতর থেকে মুক্ত করল। ঠাণ্ডায় বড়কর্তার চোখ-মুখ বসে গেছে। অথবা যেন তিনি নিশিদিন জলের নিচে ডুবে ছিলেন—জল থেকে কারা তাকে তুলে এনে এই ঝোপে-জঙ্গলে ফেলে গেছে। হাত পা সাদা ফ্যাকাসে। ঈশম জঙ্গল থেকে বের হয়ে কাপড়টা ভাল করে পরিয়ে দিল। বড়-কর্তা নিজের কব্জি থেকে নিজেই মাংস তুলে নিয়েছেন। হাত-মুখ রক্তাক্ত; বড়কর্তার শরীর মুখ এ-মুহূর্তে বীভৎস মনে হচ্ছে। চাপ-চাপ রক্তের দাগ। গাছের ডালে-ডালে পাখিদের আর্তনাদ—নির্জন মাঠ, সকলকে সহসা বড় ক্লান্ত করছে যেন।

শচি লণ্ঠন তুলে মুখ এবং কব্জি দেখতেই বড়কর্তা হেসে দিলেন। শিশুর মতো সরল হাসি। শচি তাকাতে পারছে না। তাড়াতাড়ি এখন বাড়ি নিয়ে যেতে হয়। দুর্বা ঘাস তুলে সেই ক্ষতস্থানে রস ঢেলে দিল শচি। জ্বালা এবং যন্ত্রণায় মুখটা কুঁচকে যাচ্ছে। তিনি কিছু বলছেন না। চিৎকার করছেন না। সবার সঙ্গে এখন আউলের মতো হেলে-দুলে হাঁটছেন শুধু।

সামসুদ্দিন হাঁটতে হাঁটতে বলল, কর্তারে লইয়া কাশী, গয়া, মথুরা ঘুইরা আইলেন—কেউ কিছু করতে পারল না! ভাল করতে পারল না!

মনজুর বলল, কইলকাতায় লইয়া গেলেন—বড় ডাক্তার দেখাইলেন, কেউ কিছু করতে পারল না?

শচির গলাতে অন্ধকারেও হতাশা ফুটে উঠতে থাকল। বলল, কেউ কিছু করতে পারল না। দশ-বার বছর ধইরা কত দেশ-বিদেশ করলাম।

মনজুর বলল, হাসান পীরের দরগায় সিন্নি দিলাম—না, কিছু হইল না।

শচি আর কথাই বলছে না। সকলেই এ দুঃখে যেন কাতর। যেন এই দুঃখ পাশাপাশি সব গ্রামকে বিপর্যস্ত করছে। বড়কর্তাকে নিয়ে একদা এই সব পাশাপাশি গ্রামের কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা। কত দিন থেকে বড় কর্তার অবিস্মরণীয় মেধাশক্তির পরিচয় পেয়ে এ-অঞ্চলের মানুষেরা গৌরব

বোধে আচ্ছন্ন। আমাদের অঞ্চলেও একজন আছেন, আমরা একজনকে সবার সামনে রাজকীয় সম্মানে হাজির করতে পারি। সবার প্রীতি এবং স্নেহ যেন এই ক্ষণজন্মা পুরুষকে এতদিন অতি-আদরে মনের ভিতরে সংগোপনে লালন করছে—সেই মানুষ দিন-দিন কি হয়ে যাচ্ছে!

মনজুর এ-সময়ে শচিকে প্রশ্ন করল, আইচ্ছা কর্তা, বা'জী আমারে কয়, বুড়া কর্তা নাকি জীবনে মিছা কথা কয় নাই!

শচি বলল, শুনছি, লোকে তাই কয়।

—তবে এত বড় একটা শোক পাইল ক্যান?

শচি উত্তর করতে পারল না। আকাশে যে মেঘ ছিল বাতাসে কেটে যাচ্ছে। ওরা গোপাট ধরে পুকুর পাড়ে উঠে এল না, ওরা নরেন দাসের গয়া গাছটার নিচ দিয়ে পথ সংক্ষিপ্ত করল। নরেন দাসের উঠোনে উঠে দেখল, কোন আলো জ্বলছে না। নরেন দাসের তাঁত ঘরেও কোন শব্দ নেই। এত তাড়াতাড়ি সকলে শুয়ে পড়েছে! সামসুদ্দিন ভাবল—নরেন দাসের বোনটা বিধবা হয়ে ফিরে এসেছে—সুতরাং দুঃখ এ-বাড়ির আনাচে-কানাচে ছমছম করছে। সে একদিন দূর থেকে মালতীকে দেখেছে। বিধবা হবার পর থেকে মালতী ব্লাউজ পরে না। মালতীর কোন সন্তান নেই। যে সালে বিলের জলে কুমীর আটকা পড়ল সে সালেই মালতীর বিয়ে হল। নরেন দাস বিয়েতে খরচ-পত্তর করেছিল। সুতরাং চার মাস হবে মালতী এই গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়েছিল। ফুটফুটে রাজপুত্রের মতো বর। ছোটখাটো মানুষের চোখ দুটো ইচ্ছা করলে সামু এখনও মনে করতে পারে। নরেন দাস নসিন্দি থেকে চারটা ডে-লাইট এনে ঘরে-বাইরে সকল স্থানে আলো জেলে, আলোময় করে, নরেন দাস চোখের জল ফেলতে-ফেলতে বলছিল বরের হাত ধরে, মালতীর মা নাই, বাপ নাই, তুমি অর সব। নরেন দাস অনেকক্ষণ চৌকিতে পড়ে কেঁদেছিল। সকলে চলে গেল, বাড়ি ফাঁকা ঠেকল। তবু নরেন দাস দু'দিন তক্তপোশ থেকে উঠল না। ছোট বোনটা এ-বাড়ির যেন প্রজাপতির মতো ছিল। শুধু সারা দিন উড়ত, উড়ত। গাছের ছায়ায়, পুকুরের পাড়ে-পাড়ে লটকন গাছের ডালে-ডালে মেয়েটা যেন নীলকণ্ঠ পাখি খুঁজে বেড়াত। সামু, রঞ্জিত ছিল বড় কাছের মানুষ তখন।—ওরা কতদিন চুকৈর আনতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে। মালতী বিধবা হয়ে ফিরলে সে আর কথা বলতে পারে নি। কারণ ঢাকার রায়টে স্বামী তার কাটা গেছে।

বাড়িতে ঢুকে শচি ডাকল, মা জল ছাও।

কাকার গলা পেয়ে লালটু বৈঠকখানা থেকে বের হয়ে এল। চন্দ্রনাথ বের হয়ে এল। শশীবালা স্বামীর পায়ের কাছে বসেছিল এতক্ষণ, উঠোনে শচির গলা পেয়েই নেমে এল। মহেন্দ্রনাথ ছেলের জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন। আজকাল

মণির নূতন উপসর্গ হয়েছে। কিছু না বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়া। এতদিন সে বৈঠকখানায় শুধু বসে থাকত—অথবা পুকুর পাড়ে পায়চারি করতে করতে গাছপালা পাখির সঙ্গে কি যেন বিড়বিড় করে বকত। ছেলে ফিরেছে শুনেই কম্বলটা হাতড়ে মুখের উপর দিয়ে কেমন কাত হয়ে শুয়ে পড়লেন। মনের ভিতর যে উদ্বিগ্ন ভাবটা ছিল সেটা কেটে গেছে।

শশীবালা উঠোনে নেমে অনেক লোকজন দেখতে পেয়ে বলল, তরা!

—আমি সামু, ঠাইরেন।

—আমি মনজুর, ঠাইরেন।

বড় বৌ জানালা দিয়ে সব দেখছে। স্বামীর দীর্ঘ চেহারা এবং বলিষ্ঠ মুখ আর কি যেন তার ভিতরে এক আত্মপ্রত্যয়ের ছবি—সে-ছবি মাঝে মাঝে হাওয়ায় দুলতে থাকলে—বড় বৌ হাত তুলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে—ঈশ্বর আমার এই মানুষকে তুমি দেখে রেখো, উঠোনে মানুষজন বলে সে নেমে আসতে পারল না।

শশীবালা সকলকে বসতে বলে ঠাকুরঘরে ঢুকে গেল। সামান্য জল, তুলসী-পাতা এবং চরণামৃত এনে শচি আর মণির শরীরে ছিটিয়ে দিল। জল আনাল এক বালতি। চন্দ্রনাথ ফালি কাপড় বের করে আনল। ক্ষতস্থানে গাঁদা পাতার রস দিয়ে হাতটা বেঁধে দিল।

সামসুদ্দিন বলল, ঠাইরেন আমরা যাই।

—যাও? রাইত অনেক হইছে। সাবধানে যাইও। তারপর কি ভেবে শশীবালা উঠোনের মাঝখানে এস বলল, সামু, চাইর পাঁচদিন ধইরা তর মায়রে ত্যাখি না।

—মার কমরে ব্যাদনা হইছে। উঠতে পারতাছে না। বাতের ব্যাদনা মনে হয়।

—খাড়। বলে তিনি ঘরে ঢুকে একটা পুরানো শিশি বের করে আনলেন। বললেন, শিশিডা নিয়া যা সামু। কমরে ত্যাল মালিশ করতে কবি।

ওরা চলে গেল। ঈশম লণ্ঠন হাতে তরমুজ ক্ষেতে নেমে গেল। সোনালী বালির নদীর চরে তরমুজ ক্ষেতে ছইয়ের ভিতর সারা রাত সে বসে থাকবে। খরগোশ অথবা ইঁদুর কচি তরমুজের লতা কেটে দেয়। রাতে সে বসে টিনের ভিতর ডংকা বাজাবে। অনেক দূর থেকে কেউ প্রহরে জেগে গেলে সেই ডংকা শুনতে পায়, শুনতে পেলেই ধরতে পারে—ঈশম, ঠাকুরবাড়ির বান্দা লোক, ঈশম এখন তরমুজ ক্ষেতে ডংকা বাজাচ্ছে। ডংকা বাজিয়ে ইঁদুর বাদুড় সব তাড়িয়ে দিচ্ছে।

ছোটকর্তা শচীন্দ্রনাথ নিজের ঘরে বসে এখন দৈনন্দিন বাজার হিসাব লিখছেন। বড়কর্তাকে হাতমুখ পরিষ্কার করে রান্নাঘরে নিয়ে যাওয়া হল।

তিনি ডাল দিলে ডাল খেলেন, ভাত দিলে শুধু ভাত, মাছ অথবা মাংস খাওয়ার সময় হাড়গুলি গিলে ফেললেন। কেমন বড় বড় চোখে তিনি রান্না-ঘরটা দেখতে থাকলেন। তখন শশীবালা বলল, মণিরে, আর কষ্ট দিও না। তরকারি ভাতের লগে মাইখা খাও।

মার এমন কথায় মণীন্দ্রনাথ কীটসের একটি প্রেমের কবিতা পূর্বাপর ঠিক রেখে গভীর এবং ঘন গলায় আবৃত্তি করে শোনালেন। মা অথবা চন্দ্রনাথ কেউ তার একবর্ণ বুঝল না। বলতে বলতে তিনি বড় বৌর দিকে অপলক তাকিয়ে থাকলেন। যেন নিদারুণ কোন যন্ত্রণার কথা তিনি বার বার এইসব কবিতার ভিতর পুনরাবৃত্তি করতে চাইছেন। যেন এই পৃথিবী নিরন্তর অসহিষ্ণুতায় ভুগছে। মণীন্দ্রনাথ এ সময় নিজের কপালে এবং মাথায় হাত বোলাতে থাকলেন, মাগো, তোমরা আমাকে আদর করো, এমন ভাব মণীন্দ্রনাথের চোখেমুখে। তার অপলক দৃষ্টি যেন বলছে—আমার বড় কষ্ট, বড় যন্ত্রণা!

সম্পর্কে জোটন বিবি আবেদালির দিদি হয়।

সেই জোটন শোলার ছোট্ট ঝাপটা টেনে ঘর থেকে মুখ বার করল। এখনও ভোর হয় নি। সারা রাত জোটনের চোখে ঘুম নেই। মসজিদে সামু আজান দিচ্ছে, জোটন ঘরে বসে অন্ধকারে ছেঁড়া হোগলা এবং ছেঁড়া-কাঁথাটা ভাঁজ করে এক পাশে রেখে দিল। অন্ধকার কাটছে না, সুতরাং ঘরের আসবাবপত্র অস্পষ্ট—শিকাতে দুটো হাঁড়ি, দুটো সরা—দু'দিন থেকে জোটনের ভাত নেই, দু'দিন ধরে জোটন শালুক সিদ্ধ করে খাচ্ছে। জোটন সরা তুলে হাত দিল এবং অনুভব করতে পারল, কিছু শালুক সিদ্ধ এখনও হাঁড়িতে আছে। সে অন্ধকারে বসেই শালুকগুলো খেতে থাকল। শুকনো বলে গলায় আটকাচ্ছে—একটু জল খেল জোটন। আবার দরজা ফাঁক করে যখন আকাশ দেখল—আকাশ পরিষ্কার, মোরগেরা ডাকছে—জোটন দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। মসজিদের ও-পাশটায় সূর্য উঠছে। আবেদালি বদনা হাতে মাঠ থেকে উঠে এল। আবেদালির বিবি জালালি পাতা দিয়ে উঠোনের এক কোণায় ভাত রান্না করছে। আবেদালিকে দাওয়ায় বসতে দেখে জোটন বলল, কি রে, মানুষটা ত কাইল আইল না।

—না আইলে আমি কি করমু! আবেদালি জোটনের এই ইচ্ছায় বিরক্ত। তিন তিনবারের পর ফের নিকাহের শখ।

দু'দিন না খেয়ে জোটনও ভয়ানক হয়ে উঠেছে। সে আবেদালিকে বলল, দদি যাওনের সময় মানুষটার খোঁজ কইরা যাবি। মানুষটা বাইচা আছে না মরছে, কবি আইয়া।

—কমু গ কমু ! আবেদালি দেখল জোটনের মুখ ভয়ানক শুকনো। দু'দিন না খেতে পেয়ে জোটনের চোখ কোটরাগত। —তুই দুফরে আমার ঘরে খাইস। আবেদালি এবার জালালির মুখটা দেখল। সূর্য উঠছে বলে রোদের রঙ জালালির খড়খড়ে মুখটা আরও খড়খড়ে করে দিচ্ছে এবং আবেদালির এমত কথায় জালালির মুখটা ফোটকা মাছের মতো ফুলতে থাকল। —আরে, আরে, করতাছস কি ! তর গাল যে ফাইট্টা যাইব।

জোটন বুঝতে পেরে বলল, না রে থাউক। আমার খাওনের লগে কি আছে।

আবেদালি বুঝল জোটন খাবে না। সে দেখল, জোটন উঠোন থেকে নেমে যাচ্ছে। জোটন রাস্তায় নেমে গেল এবং সড়ক ধরে হাঁটল না। যেখানে এখনও ধান ক্ষেতে জল আছে অথবা ক্ষেতের আল জাগছে সেই সব পথ ধরে কি যেন খুঁজতে খুঁজতে চলেছে।

জোটন এই সব নরম মাটির আশ্রয়ে কচ্ছপের ডিম খুঁজছে। এ সময়ে কচ্ছপেরা ডিম পাড়বে মাটির আলে। জোটন এ-সময়ে এই সব মাটির আশ্রয় থেকে ডিম বের করে পশ্চিমপাড়া উঠে যাবে ভাবল এবং ডিমগুলি দিয়ে বলবে, আমারে এক টুকরি চাইল দিয়েন। সে এক দু' করে বিলের জমির অনেক আল ভাঙতে থাকল। সূর্য বিশ্বাসপাড়ার ফাঁক দিয়ে অনেক উপরে উঠে যাচ্ছে। ধান গাছের শিশির, ঘাসের শিশির, কলাই ক্ষেতের শিশির সব বিন্দুবৎ হয়ে পড়ছে এবং ইতস্তত রোদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। মানুষটা গতকাল এল না, সে পুঁটলি বেঁধে বসে ছিল, মৌলভি সাবকে বলা ছিল, সাক্ষী ঠিক ছিল— অথচ মানুষটা এল না। মুশকিলাসান নিয়ে মানুষটা উঠোনে উঠে ডেকেছিল একদিন, এটা আবেদালির বাড়ি না ? আবেদালি, জালালি এবং সকলে ফোঁটা নিয়েছিল—জোটনও উঠেছিল, ফোঁটা নিয়েছিল—পীরের দরগায় লোকটা থাকে। উঁচু, লম্বা, গোটা গোটা চোখ—নাভির নিচে সাদা দাড়ি নেমে গেছে, গায়ে শতচ্ছিন্ন জোব্বা, মাথায় ফেটি এবং গলায় বিচিত্র রকমের মালা-তাবিজ। জোটন, ফকির মানুষটার মহব্বতের জন্য প্রথম দর্শনে বিস্মিত এবং শীতের নরম রোদ যেন তাকে গভীর রাত পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেদিন।

জোটন আলের ধারে ধারে তীক্ষ্ণ নজর রেখে হাঁটছে। কচ্ছপের ডিম এখানে নেই, সে হাঁটতে থাকল। সে ইতস্তত তাকাল এবং কয়েক গুচ্ছ ধানের ছড়া কাপড়ের নিচে লুকিয়ে ফেলল। ওর পাশ দিয়ে কামলারা অন্য জমিতে উঠে যাচ্ছে—জোটন বসে পড়ল—যেন সে যথার্থই কচ্ছপের ডিম সংগ্রহ করছে। সে উঠছে না। কামলারা অন্য জমিতে এখন ধান কাটছে। জোটন ধান কাটছে না। হাতের ধারাল শামুকটা সে পেটের নিচে গুঁজে

রেখেছে। জোটন অন্য জমিতে কামলাগুলোকে দেখার জন্য গোড়ালিতে ভর করে উঁকি দিল—জমিটা কার স্থির করার ইচ্ছায়। দূরে, গরুগুলোকে জলে নেমে যেতে দেখল—মানুষটা এল না, সেই মুশকিলাসানের মানুষটা। তেরটি সন্তানের জননী জোটন আবার মা হবার জন্য এই আলে দাঁড়িয়ে কেমন ছটফট করতে থাকল। চল্লিশ বছরের রমণী জোটন খোদাকে যেন এই ধানের জমিতে খুঁজছে—খোদার মাশুল উঠছে না গতর থেকে এমন ভাব এখন।

দু'দিন পেটে ভাত নেই—আফসোস। দু'দিন হাজারদির বিলে গ্রামের অন্য অনেক দুঃখী ইমানদারদের সঙ্গে শালুক তুলেছে, দুঃখী হলেই ইমানদার হবে, খোদাকে স্মরণ করবে—এমনও একটা বিশ্বাস আছে জোটনের। এই যে এখন জোটন শামুকের ধারাল মুখটা দিয়ে কট করে আর একটা ধানের ছড়া কাটল এবং কোঁচড়ে লুকিয়ে ফেলল—যেন পেটের খিদে ভয়ানক দুঃসহ, খোদার কাছে নিজের গোনাগারের জন্য জোটন মোনাজাত করল—হায় রে, খোদা, পেটের জ্বালায়, গতরের জ্বালায় সব হয়। সুতরাং জমির মালিককে যেন বলার ইচ্ছা, ভয় করবার কিছু নেই, আর কিছু না হোক, জোটনের ইমান আছে। তোমার শক্ত ধানের ছড়া কাটছি না, আলের উপর যেসব ছড়া নুয়ে আছে শামুকের ধারাল মুখে তাই আশ্রয় পাচ্ছে। হাসিমের বাপ নয়াপাড়ার নিমগাছ অতিক্রম করলে জোটন কট করে আরও একটা ধানের ছড়া কেটে কোঁচড়ে লুকাল। এবং এ-সময় মালতীর কথা মনে হল। নরেন দাসের ছোট বোন মালতী বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি ফিরে এসেছে। মালতীর দুঃখবোধে জোটন পুবের বাড়ির বোন্না গাছটার ফাঁক দিয়ে নরেন দাসের তাঁতঘর দেখল। তাঁতের শব্দ শুনতে পাচ্ছে—মাকুর শব্দ এবং চরকার শব্দ। জোটন কট করে অন্য একটা ধানের ছড়া কাটতেই পিছন থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠল—এই জুটি, মাথার খুলি ভাইঙ্গা দিমু।

জোটন মুখ ঘুরিয়ে দেখল ঈশম আসছে। সে কাঁচুমাচু হয়ে বলল, না ঈশম ভাই, আমি এহানে কিছু করতাছি না।

—তুমি আসমান ছাখতাছ। যা বাড়ি যা। কথা বাড়াইস না।

সুতরাং বাড়ি উঠে যাওয়ার মতো করেই জোটন হাঁটতে থাকল, কিন্তু যেই ঈশম মসজিদের কুয়াতে জল তোলার জন্য বালতি নামাল—জোটন টুক্ করে আলের পরে বসে ধান গাছের ছায়ায় নিজেকে ঢেকে ফেলল। তারপর হামগুড়ি দিয়ে যেতে যেতে দেখল এক জায়গায় হাত লেগে মাটি সরে গেছে এবং সাদা গোল গোল ডিম বের হয়ে পড়ল। মুখ উজ্জ্বল করে জোটন এবার উঠে দাঁড়াল। ইমান এবং মুশকিলাসানের লম্ফটা ওকে উষ্ণ করছে। দূরে দূরে সব ধান কাটা হচ্ছে। ধানের আঁটি বাঁধছে মুনিষেরা, ওরা গাজীর গীদ গাইছে। দূরে দূরে গানের স্বর-তরঙ্গ, নরেন দাসের বিধবা বোন মালতী এবং গত রাতের নিষ্ফল

প্রতীক্ষা জোটনকে নিদারুণ তীব্র যন্ত্রণায় কাতর করছে। মালতীর বিয়ে হবে না, বাকি জীবন গতর কোন মাশুল দেবে না—আল্লা নারাজ হবে। এই গতর মাটির মতো, পতিত ফেলে রাখলে গুনাহ। জোটন এইজন্যই মালতীর জীবনকে, ধর্মকে না-হক কাফেরের মতো ভাববার ইচ্ছায় শরীরের জড়তা কাটাতে গিয়ে দেখল, বোন্না গাছের নিচে মালতী দাঁড়িয়ে আছে—চুপ এবং নিঃসঙ্গ। ওর শরীরের সাদা থান ভোরের হাওয়ায় উড়ছে। জোটন মালতীকে দেখে তাড়াতাড়ি সব ক'টা ডিম ভিজা মাটির ভিতর থেকে তুলে আঁচলে বেঁধে ফেলল।

অন্যদিন হলে জোটন মালতীর সঙ্গে অন্তত কিছু কথা বলত। কিন্তু আজ মালতীর এই নিঃসঙ্গতা যথার্থই ওকে পীড়িত করছে। এক অহেতুক অপরাধবোধে মালতীর সঙ্গে সে কোন কথাই বলতে পারল না জোটন এই পথ ধরেই গেল—অপরিচিতের মতো তামুকের খেতে উঠে গেল। দেখল, মালতী বোন্না গাছ পার হয়ে লটকন গাছের নিচ দিয়ে পুকুর পাড়ে দাঁড়াল এবং হাঁসগুলোকে জলে সাঁতার কাটতে দেখে কেমন আনমনা হয়ে গেল।

জোটন আর দাঁড়াল না। এখানে দাঁড়ালে কষ্টটা বাড়বে। তারপর শালুক খেয়ে শরীরে শক্তি পাচ্ছে না। সে তাড়াতাড়ি নরেন দাসের বাড়ি পার হয়ে গ্রামের রাস্তায় হাঁটতে থাকল। বকুল গাছটা অতিক্রম করে ঠাকুরবাড়ির সুপারি বাগান। সে সন্তর্পণে বাগানে ঢুকে গাছতলায় সুপারি খুঁজতে থাকল। সে খুঁজে খুঁজে কোথাও যখন একটাও সুপারি পেল না, সে গাছের মাথার দিকে তাকাল এবং প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল, আল্লা, একটা গুয়া দ্যা। সব গাছগুলোর মাথায় সুপারি ঘন এবং হলুদ রঙের। হলুদ রঙের এই সুপারির খোসা ছাড়িয়ে একটা শাঁস মুখে দেবার বড় সখ জোটনের। সে দেখল একটা কাঠঠোকরা পাখি এ-গাছ, ও-গাছ করছে। আহা রে, আল্লা রে, একটা দ্যা না রে। তখনই বুড়ো ঠাকরুনের গলা শুনতে পেল সে। জোটন চুপচাপ বাগানের পাশে ঘন চন্দ্রই গাছের জঙ্গলে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল। জোটন অনেকক্ষণ এই ঝোপের ভিতর পাখিটার বদান্যতার জন্য বসে থাকল। পাখিটা উড়ছে, জোটন ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখতে দেখতে উত্তেজিত হতে থাকল। পাখিটা সুপারির ওপর এবার ঘন হয়ে বসল, দুটো ঠোকর মারল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিন চারটা সুপারি গাছের গোড়ায় ছড়িয়ে পড়ল—য্যান মাণিক্য। যেন জোটনের সমস্ত দিনের ইচ্ছা এখন এই গাছটার ছায়ায় রূপ পাচ্ছে। জোটন চারপাশটা ভাল করে দেখল। পুকুরঘাটে বুড়ো ঠাকুরুন স্নান করছে। সে সব দেখছে, অথচ তাকে কেউ দেখতে পেল না। সে তাড়াতাড়ি গাছটার নিচে ছুটে গেল। সুপারি তিনটা আঁচলে বেঁধে সে হাঁটছে। সে বৈঠকখানা পার হয়ে ঠাকুরবাড়ির ভিতরে

ঢুকে গেল। ডাক দিল—বড় মামী আছেন নাকি? বলতে বলতে সে পাছ দুয়ারে ঢুকে অম্বুজঘরের সামনে দাঁড়াল। বলল, ধনমামী, একবার মানিক রে দ্যাখান। মানিকের লাইগ্যা কাছিমের ডিম আনছি। বড় মামীকে দেখে বলল, কাছিমের ডিম রাইখ্যা এক টুকরি চাইল দ্যান। চাল পেলে বলল, দুইডা পান নিমু বড় মামী।

—নে গা। গাছতলায় মেলা পান পইড়া আছে।

জোটন চালগুলো আঁচলে বাঁধল। এবং বড়ঘরের পিছনে ঢুকে আলকুশী লতার কাঁটা ঝোপ পার হয়ে একটা শ্যাওড়া গাছের নিচে দাঁড়াল। পানের লতা গাছটাকে জড়িয়ে আছে, সে দু হাতে যতটা পারল পান কুড়িয়ে নিল, ছিঁড়ে নিল। সে বাড়ির ওপর দিয়ে গেল না। সে আলকুশী লতার ঝোপ ভেঙে মাঠে নেমে গেল। জল-কাদা ভেঙে ফের পুবের বাড়ির পুকুর পাড় ধরে ধান ক্ষেতের আলে উঠে যাবার সময় দেখল, মালতী আকাশ দেখছে। জোটন এবার মালতীকে ফেলে চলে যেতে পারল না। সে একটু হেঁটে এসে মালতীর পাশে চুপ করে বসল। ডাকল—মালতী!

মালতী' কথা বলল না। মালতী কাঁদল। জোটন মালতীর মুখ দেখতে পাচ্ছে না অথচ বুঝল মালতী চোখের জল ফেলছে। জোটন ফের ডাকল, মালতী, কান্দিস না। কাইন্দা কি করবি। সব নসিব রে, মালতী।

জোটন উঠে পড়ল। মেয়েটা শোকে কাঁদছে, কাঁদুক। ওর তিন নম্বর খসমের কথা স্মরণ করতে গিয়ে গলা বেয়ে একটা শোকের কান্না উঠে আসতে থাকল। বেলা বাড়ছে। পেটে ভয়ানক খিদে। যে চাল আছে জোটনের দু' ওক্ত হয়ে যাবে। সে হাঁটবার সময় গোপাট থেকে কিছু গিমা শাক সংগ্রহ করল। তারপর আবেদালির ঘর অতিক্রম করে উঠোনে উঠেই তাজ্জব বনে গেল—যে মানুষটা কাল রাতে আসেনি, যে মানুষটার জন্য সে প্রায় সমস্ত রাত জেগে বসে ছিল, সেই মানুষটা ছেঁড়া মাদুরে নামাজের ভঙ্গিতে বসে তফন সেলাই করছে। নীল কাঁথার মতো ঝোলা, মুশকিলাসানের লম্ফ, ভিন্ন ভিন্ন সব তাবিজের মালা, কুচ ফলের মালা, এবং পুঁতির হার—এই সব বিচিত্র বস্তুর সমন্বয়ে এখন ফকির সাব যেন ঘোড়দৌড়ের পীরের মতো।

জোটন ফকির সাবকে উদ্দেশ্য করে বলল, সালেমালে কুম।

ফকির সাব এতক্ষণে জোটনকে দেখতে পেল এবং বলল, ওয়ালেকুম সেলাম।

জালালি ঘরের কোণে ঘোমটা টেনে বসে আছে। জোটনেরও ইচ্ছা হল এ সময় বড় ঘোমটা টেনে ছোট ঘরটায় বসে থাকে। কিন্তু খিদমতের অসুবিধা হবে ভেবেই যেন শরমের জন্য দিল খুলে দিতে পারল না। সে জালালির ঘরে ঢুকে বলল, মানুষটা খাইব, কি যে খাওয়ামু!

জোটনের এই গোপনীয় কথা ফকির সাব শুনতে পেলেন। —আমার জন্য ভাইবেন না। দুইডা শাক-ভাত কইরা গ্যান। দেখেন, নিশ্চিন্তে ক্যামনে খাইয়া উঠি।

জোটন বলল, জালালি, দুইটা পুটির সুঁটকি দ্যা।

জোটন রান্নার জন্য, শোলার-পারা থেকে এক আঁটি শোলা নামিয়ে আনল। ঘরের পিছনে শোলাগুলোকে মড়-মড় করে ভাঙল এবং ভাঁজ করে ঘরে ঢুকতে দেখল—ফকির সাব এখনও তফনে তালি মারছেন বসে, বেড়ার ফাঁক দিয়ে জোটন ফকির সাবের প্রশস্ত বুক এবং কব্জি দেখে—গতরে খোদার মাশুল উসুল হতে বেশি সময় নেবে না—সুতরাং, সুতরাং সুখী মনে জোটন রান্না করতে বসল। দু' সাল হল গতর বেশরমভাবে প্রায় রাতে বেইমান করতে চাইছে। রাতে যতবার এমন হত জোটন ছেঁড়া মাদুরে বসে আল্লাকে স্মরণ করে গতরের এই সব বেওয়ারিশ ইচ্ছাকে তাড়াতে চাইত। তিন তিনবার তালাক পেয়ে জোটন যেন বুঝতে শিখেছে ওর শরীরের খাক মেটাবার শক্তি পুরুষ মানুষের ছিল না—সুতরাং তালাক দিল—বলল, ইবলিশের গতর কেবল খাই-খাই। সে ফের উনুনে কিছু শোলা গুঁজে দিল এবং ফকির সাবের শরীর দেখল বেড়ার ফাঁক দিয়ে। সমস্ত চালটাই সে রান্না করছে। দু'জনের মতো ভাত। সে সুঁটকি মাছ দুটোকে আগুনে পুড়িয়ে নিচ্ছে, সে অনেকগুলো লাল চাটগাই লঙ্কা বেটে নিচ্ছে পাথরে, বড় বড় দুটো পেঁয়াজ কেটে সুঁটকি দুটোকে মড়-মড় করে সানকির এক পাশে গুঁড়ো করে রাখল। তারপর লঙ্কা, পেঁয়াজ নুন এবং সুঁটকির বর্তা বানাতে গিয়ে জিভে জল এল, এখন সে ইচ্ছা করলে দু'জনের ভাত যেন একা খেয়ে নিতে পারে। কিন্তু বাড়িতে মেহমান—সে তার ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করল কিছুক্ষণের জন্য। ভাতের ফ্যানা টগবগ করে ফুটছে। সোঁদা সোঁদা গন্ধ ভাতের। সে ফ্যানটা গেলে একটা সানকিতে যত্ন করে রাখল, নুন মেশাল—সবটা ফ্যান পিছন ফিরে চুকচুক করে গিলতে থাকল—আহাঃ, এতক্ষণে যেন চোখ তার দৃশ্যমান বস্তুগুলোকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, ফকির সাবকে পীরের মত মনে হল—দরগার পীর এই ফকির সাহেব। জোটন নিজের শরীরের দিকে নজর দিয়ে বুঝল, এ শরীরও ভয়ানক শক্তসমর্থ। ফকির সাবকে কাবু করতে খুব একটা আদা নুন লাগবে না। জোটন মনে মনে হাসল। বেড়ার ফাঁক দিয়ে ডাকল, ফকির সাব, সান করতে যান। আমার খানা পাকান হইয়া গ্যাছে।

ফকির সাব সব তল্পিতল্পা সঙ্গে নিয়েই ঘাটে গেল, এমন কি মুশকিলাসানের আঁধারটাও। জোটন এই ঘরে বসে কাকের শব্দ পেল, আকাশে রোদ, গাছে এবং শাখা-প্রশাখায় রোদ। জাফরি রঙের ছায়া ঘরের পিছনে। বেত ঝোপে বোলতার চাক—নিচে বোন্না গাছের ঘন জঙ্গল, ফকির সাব হাসিমদের পুকুরে

স্নান করতে গেছে। জোটন বিবি গাজীর গীদ ধরল গুন-গুন করে। জোটন বিবির স্বপ্ন জাগছে চোখে, বেত ঝোপে বেথুনের মতো এই স্বপ্ন কবে টসটস করে পাকবে···জোটন রঙের ছবি ভাবতে পারছে না···স্বপ্নটা গাজীর গীদে গায়ানদারের হাতের ছড়ি য্যান; চাঁদের মতো মুখ করে চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা নাকে চোখে জোটনের সকল সুখকে ত্যাখতাছে।

জোটন তাড়াতাড়ি পাশের একটা গর্ত থেকে ডুব দিয়ে এল। চুলের জল ঝেড়ে ভাঙা আয়নায় ডুরে শাড়ি পরে নিজের সুন্দর মুখটি দেখল। উজ্জ্বল দাঁতের পাটি দেখে রাতে পীরের দরগায় সুখের হীরামন পাখির কথা মনে করে কেমন বিহ্বল হতে থাকল।

ফকির সাহেব ছেঁড়া মাদুরে বেশ পরিপাটি করে খেতে বসলেন। ভিজা লুঙ্গি সিম লতার মাচানে শুকোচ্ছে। তিনি খেতে বসে দু'বার আল্লা উচ্চারণ করে আকাশ দেখলেন—আকাশ পরিষ্কার, বড় তকতকে এই উঠোনে ঝকঝকে আকাশের নিচে বসে গবগব করে খেতে পারলেন না। যেমন পরিপাটি করে বসেছেন তেমন ধীরে সুস্থে এক সানকি মোটা ভাত সুঁটকির বর্তা দিয়ে কিঞ্চিৎ মেখে মেখে বেশ তারিয়ে তারিয়ে খেতে থাকলেন। নিচে দুটো-একটা ভাত পড়ছে—তিনি আঙুলের ডগায় তুলে সন্তর্পণে মুখে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন, যেন এই মোটা ভাত ফুরিয়ে গেলে আর পাওয়া যাবে না—আল্লার বড় অমূল্য ধন। সানকির ভাতটা শেষ করতেই দেখলেন, জোটন আর এক সানকি ভাত এনে সামনে রেখেছে। তিনি সে ভাতটাও পরিপাটি করে শেষ করলেন। এবং ভাতের অপেক্ষায় ফের বসে থাকলেন। সহসা আবিষ্কারের ভঙ্গিতে তিনি মাদুরের এবং সানকির সংলগ্ন ভাতটিও আঙুলের চাপে মুখে তুলে দিয়ে বসে থাকলেন। নামাজের ভঙ্গিতে এই বসে থাকা ভাবটুকু ফকির সাবের বড় আরামদায়ক। এই সব জোটন ঘরের ভিতর থেকে লক্ষ্য করে শরমে মরে যাচ্ছে। সে হাঁড়ির ভিতর হাত দিল। শেষ দু'মুঠো ভাত সানকিতে তুলে শেষ বর্তাটুকু তার কিনারে রেখে মাদুরের উপর রেখে দিল। ফকির সাব বললেন, বস্, হইব। ইবারে আপনে গিয়া খান।

জোটন ঘরের এক কোণায় বসে থাকল। ওর মাথাটা ঘুরছে। সে খুঁটিতে হেলান দিল। কোমর থেকে ডুরে শাড়িটা খসে পড়ছে। আবেদালি নেই, জব্বর নেই, থাকলে বলত, আমার ঘরটা বন্ধক রাইখ্যা এক প্যাট ভাত দ্যা। সে ক্ষুধার যন্ত্রণায় থাকতে না পেরে গিমা শাকগুলো সিদ্ধ করল এবং খেল। সে কিছু অকালপক্ক বেথুন এনে খেল। এ সময় উঠোনে গাছের ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে। কাক, শালিকেরা প্রায় সকলে ডালে, ঝোপে জঙ্গলে যেন ঝিমোচ্ছে। ফকির সাব ছেঁড়া মাদুরে পড়ে ঘুমোচ্ছেন। জোটন আর বসে থাকতে পারল না। শরীরের জড়তায় সে ডুরে শাড়ির আঁচল পেতে মেঝের ওপর পেট রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

বিকেল বেলাতে যখন উঠোনের ওপর দিয়ে পাখিরা ডেকে গেল, যখন সাত-ভাই-চম্পা পাখিরা লাউ মাচানের নিচে কিচকিচ করল অথবা ধানের আঁটি নিয়ে কামলারা সড়কের ওপর কদম দিচ্ছে তখন জোটন ক্লান্ত এবং উদ্বিগ্ন শরীরটাকে টেনে টেনে তুলল। ফকির সাব হুঁকা খাচ্ছেন বসে। সব পোটলা-পুঁটলি যত্ন করে বাঁধা, যেন তিনি এখন উঠবেন, শুধু হুঁকা খাওয়াটা বাকি। জোটন এবার থাকতে পারল না। ঘর থেকেই বলল, ফকির সাব, আমারে লইয়া যাইবেন না।

ফকির সাব ঝোলাঝুলি কাঁধে নিতে নিতে বললেন, আইজ না। অন্যদিন হইব। কোরবান শেখের সিন্নিতে যামু। কবে ফিরমু ঠিক নাই। উঠোন থেকে নেমে যাওয়ার সময় দরজার ফাঁকে জোটনের শীর্ণ মুখে দুঃসহ ব্যথার চিহ্ন ধরতে পেরে উচ্চারণ করলেন—আল্লা রসুল, আহা, এই ইচ্ছার সংসারে আমরা কতদূর যাব, আর কতদূর যেতে পারি। ফকির সাহেব ওইমত চিন্তা করলেন। তিনি হাঁটতে হাঁটতে ধরতে পারলেন, জোটনের চোখ দুটো এখনও ওকে অনুসরণ করছে অথবা যেন জোটন দেখল হাঁসের পালক মালতীর শরীরে—ইচ্ছার জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে অথবা পীরের শরীর গাজীর গীদের গায়ানদারের লাঠি ব্যান···হাঁটতাছে···হাঁটতাছে···চাঁদের মতো মুখ করে চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা নাকে চোখে জোটনের সকল দুঃখকে দ্যাখতাছে। জোটন এবার ডুকরে কেঁদে উঠল—আল্লা রে, তর দুনিয়ায় আমার লাইগ্যা কেয় বুজি নাই রে!

একটা হাড়গিলে পাখি অনবরত সেই থেকে ডাকছে। বাড়িটার উত্তরে মোত্রা ঘাসের জঙ্গল। এখন সেখানে নানারকমের কীটপতঙ্গ উড়ে বেড়াচ্ছে। বড় বড় কুমীরের মতো দুটো গোসাপ গড়িয়ে ঝোপের ভিতর ঢুকে গেল। পাখিটা তবু ডাকছে, অনবরত ডাকছে। মালতী আতাফল গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে সব শুনল। সে আরো নিচে নেমে যেতে সাহস পাচ্ছে না। একাদশীর পরদিন, বেশ ঝালটাল খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। বেতের ডগা সেদ্ধ খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। নরম নরম ডগা একটু সর্ষের তেল এবং কাঁচা লঙ্কা হলে তো কথাই নেই। মালতী নরম বেতের ডগা কাটার জন্য আতাফল গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে থাকল। বেতঝোপে বোলতার চাক, ঝোপের ভিতর পাখিটা ডাকছে অথবা সাপে যদি ছানা খায়, পাখি গিলে খায়—এমন ভয়ে মালতী গাছটার নিচ থেকে নড়তে পারল না। মালতীর হাতে একটা লম্বা বাঁশ। বাঁশের ডগায় সে একটা পাতলা দা বেঁধে রেখেছে। সে কেবল ইতস্তত করছিল। গাছে আতাফুলের গন্ধ।

ছোট একটা বেগুন খেত অতিক্রম করে আভারানীর রান্নাঘর। নরেন দাসের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁতের ঘরে অমূল্য তাঁত বুনছে। মাঝে মাঝে ওর গান ভেসে আসছিল। নরেন দাসের বৌ আভারানী বারান্দায় বসে ডাঁটা কুটছে। মালতী এখনও বেতের ডগা নিয়ে ফিরছে না—সে ডাকল, মালতী, অ মালতী, ব্যালা বাড়ে না কমে!

মালতী আতাফুলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে কি শুনল। ঝোপের ভিতর পাখিটার কেমন থেকে থেকে কান্না। দূরে জব্বর হাল চাষ করছে জমিতে। এটা কি মাস, ফাল্গুন হতে পারে, মাঘের শেষ হতে পারে। মালতী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হিসেব করল। এখন জব্বর না হক উঠে আসতে পারে, এসে বলতে পারে, মালতী দিদি, এক বদনা পানি দ্যান। মালতী এমন সব দৃশ্য দেখতে দেখতে অথবা শুনতে শুনতে হাঁকল, বৌদি, আমার জঙ্গলে ঢুকতে ডর করে। হাড়গিলা পাখিটা সেই থাইকা ডাকতাছে।

—হাড়গিলা পাখি ডাকতাছে ত তর কি?

—মনে হয় পাখিটারে সাপে গিলতাছে।

—তরে কইছে!

মালতী আর কথা বাড়াল না। দেখল মালতী, গোপাট পার হয়ে সামু এদিকে হেঁটে আসছে। এসে একটা কাগজের মতো কিছু ফেলুকে দিয়ে গাছের গুঁড়িতে সেঁটে দিচ্ছে। মালতী ডাকল, সা···মু···উ···, অ···সা···মু···উ।

সামু বুঝল মালতী স্বামীর শোক ভুলে যাচ্ছে। বুঝল শৈশবে মালতী যেমন ওকে দিয়ে ঝোপজঙ্গল থেকে চুকৈর ফল আনিয়েছে, বেত ফল আনিয়েছে অথবা শাপলা-শালুকের দিনে যেমন সামু কত ফুল ফল তুলে দিত, তেমনি আজ হয়তো কিছু তুলে আনতে বলবে—সে গাছের নিচ থেকেই হাত তুলে জবাব দিল। বলল, আইতাছি। ইস্তাহারটা ঝুলাইতে দে।

মালতী সেই আগের মতো গলা ছেড়ে কথা বলল, কিসের ইস্তাহার রে সামু?

—লীগের ইস্তাহার।

—অরে আমার লীগ রে। আগে শোনত, পরে লীগ লীগ করবি।

সামু কাছে এলে বলল, দুইটা বেতের আগা কাইটা দে। বলে দা এবং বাঁশটা সে সামুকে এগিয়ে দিল।

সামসুদ্দিন দাটা বাঁশের আগায় শক্ত করে বাঁধল। তারপর ঝোপের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। হাড়গিলে পাখিটা এখন আর দ্রুত ডাকছে না। থেকে থেকে অনেকক্ষণ পর পর ডাকছে। ঝোপজঙ্গল ভেঙে ভিতরে ঢুকলে কিছু পোকা উড়ল এবং মুখে শরীরে বসল। সে পোকামাকড় শরীর থেকে উড়িয়ে দিয়ে দুটো কচি বেতের ডগা কেটে আনল।—দ্যাখ, আর লাগব নাকি?

—না। মালতী দাটা এবং বাঁশটা সামুকে মাটিতে রাখতে বলল।

সামু বাঁশটা মাটিতে রেখে দিল। মালতী আলগা করে তুলে নিয়ে হাঁটছে। সামু পেছনে পেছনে আসছে, মালতী মুখ না ঘুরিয়েও তা টের পেল। দাটা সামু বাড়ি রেখে যাক—মালতীর এমন ইচ্ছা। যেতে যেতে মালতীর মনে হল শরীরে ব্লাউজ নেই—খালি হাত, অনেকদূর পর্যন্ত খালি, বার বার সে কাপড় সামলেও যেন শরীর ঢেকে রাখতে পারছে না। মানুষটা পেছনে আসতে আসতে ওর শরীর থেকে—আতাফুলের সুবাস নিচ্ছে, সুবাস নিতে নিতে মানুষটা কতদূর পর্যন্ত যাবে টের পাচ্ছে না। মালতী তাড়াতাড়ি কাপড়ের আঁচলটা চাদরের মত করে শরীর ঢেকে দিল। পেছনে সামু আসছে ভাবতেই, শরীরে কি যে এক কোড়াপাখি আছে—সময়ে অসময়ে কেবল ডাকে, কোড়াপাখিটা ডেকে উঠতেই মালতীর গা কাঁটা দিল। সুতরাং সে পিছনের দিকে না তাকিয়েই বলল, সামুরে, সামু, তর আর আসতে হইব না। তুই বাড়ি যা।

সামু নিঃশব্দে দাটা নরেন দাসের বারান্দায় রেখে মাঠে নেমে গেল। মালতী বেতের খোল তুলতে তুলতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। কচি কচি নরম শাঁস। সেদ্ধ দিলে একেবারে মাখনের মতো নরম। আতপ চালের সুগন্ধ, সামান্য ঘি আর বেতের ডগা সেদ্ধ বৈধব্যের এক মনোরম ভোজ্যদ্রব্য। একাদশীর পরদিন এমন নরম ডগা পেয়ে মালতীর জিভে জল এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শৈশবের কিছু ছবি ওর চোখের উপর ভেসে উঠল। সামসুদ্দিন, রসো, রঞ্জিত কতদিন মালতীকে মাঠ থেকে মেজেন্টা রঙের চুকৈর ফল এনে দিয়েছে। তারপর কোন কোন ঋতুতে বেতফল, লটকন ফল, এমন কি বকুল ফল সংগ্রহের জন্য ওরা পরস্পর প্রতিযোগিতা করত। এমন সব সুখ-স্মৃতিতে দিনটা কাটলেও রাত কাটতে চায় না মালতীর। জানালা খোলা রেখে কেবল সাদা জ্যোৎস্নায় মাঠ দেখতে ভালবাসে। মাঝে মাঝে সেই জ্যোৎস্নায় এক দানবের মত মহাকাল —কি যে কয়, কি যে তার মুখব্যাদান, রাঙা জবার লাখান চক্ষে ঠোঁট ব্যাদান কইরা রাখে—রাক্ষুসি এক তারে তাড়া কইরা মারে। সারারাত তখন ঘুম আসে না মালতীর। শেষরাতের দিকে ঘুম আসে। যখন ঘুম ভাঙে তখন ভোরের সূর্য অনেক উপরে। আভারানী ডেকে ডেকে হয়রান। নরেন দাস তাঁত-ঘর থেকে হাঁকবে—অরে ঘুমাইতে দ্যাও। এত বড় শোকটা অরে ভুলতে দ্যাও। ঘুমের ভিতর এক সুখপাখি মালতীর কেবল কাইন্দা কাইন্দা মরে—জলে নাও ভাসাওরে, আমারে লইয়া যাও বিলের জলে, ডুইবা মরি আনধাইরে।

মালতী আতা বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখল, সামু নিঃশব্দে কখন চলে গেছে। তাঁতঘরে চরকার শব্দ, মাকুর শব্দ। উঠোনে কলাইর মলন দিচ্ছে মনজুর। চারটা বড় বড় মেলার গরু মলনে তুলে দিচ্ছে।

দীর্ঘ দু'মাস পর মালতীর চোখ এই আকাশ এবং ধরণীকে প্রীতিময় ভেবে খুশী। ভোরে সেজন্য সামুকে চিৎকার করে ডাকতে পারল। কতকাল পর যেন সে এই মাটির মতো ফের সুজলা সুফলা অথবা যেন দুঃখের ভারে নিয়ত ভুগতে নেই—সে খুশী খুশী মুখে অনেকদিন পর আঁচলে মুখ মুছল। অনেকদিন পর সে ছুটে গেল পুকুরের পাড়ে, পেয়ারা গাছের নিচে। গাব গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দেখল গাছে কোন পাকা গাব আছে কিনা—থাকলে সে কোটা দিয়ে গাব পাড়বে, তারপর গাবের বিচি চুষতে চুষতে স্বামীর ঠোঁট অথবা জিভে কি ভয়ঙ্কর স্বাদ—সে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে একটা পাকা গাব খুঁজে পেলে ফুৎফাৎ বিচি বাতাসে ওড়াবে। গাবের পাকা পিছল বিচি আর স্বামীর ঠাণ্ডা জিভ চুষতে যেন এক রকমের। একটা পাকা গাব খাবার জন্য ওর সুন্দর কচি মুখটা কেমন লাল হয়ে উঠল। বিধবা মালতী গাছের নিচে দাঁড়িয়ে এখন গাছ দেখছে কি পাখি দেখছে বোঝা যাচ্ছে না।

না, গাছে একটা পাকা গাব নেই। শীতকাল শেষ হলে পাকা গাব আর গাছে থাকে না। সে বাড়ি উঠে এলে দেখল, আভারানী মালতী কি খাবে, কি খেতে ভালবাসে—বিধবা মানুষের কি আর রান্না, তবু যত্ন নিয়ে সাদা পাথরে মালতীর জন্য তরকারী কুটে রাখছে। মালতী চুপচাপ বৌদির পাশে ঘন হয়ে বসল, বলল—সামু আগের মতই আছে বৌদি। ডাকলাম আর দৌড়াইয়া আইয়া পড়ল। বেতের আগা কাইটা দিল।

আভারানী বলল, সামু কি একটা পাশ দিল না ল?

সামু অর মামার বাসায় থাইকা পাশ দিল। তোমাগ জামাইর কাছে কত দিন ঘুরছে একটা চাকরির লাইগা। চাকরি একটা দেখছিল, কিন্তু বৌদি কি যে হইল···মালতী এই পর্যন্ত বলে আর প্রকাশ করতে পারল না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল—বৌদি আমার যে আর বাঁচতে ইচ্ছা হয় না।

আভারানী বলল, কান্দিস না।

মালতী বৌদিকে কাজে সাহায্য করছে। ধীরে ধীরে সে কিছু বেতের ডগা কুচি করে দিল। এইসব করতে করতে মনের ভিতর সেইসব বিসদৃশ ঘটনা উঁকি মারলে চুপচাপ হয়ে যায় মালতী। বড় বড় চোখে সংসারের সব কিছু দেখে। এবং বড় অর্থহীন মনে হয়। চুপচাপ বসে থাকলেই স্বামীর নানারকমের ছোটখাট মান-অভিমানের কথা মনে হয়। জলে চোখের কোণটা ভিজে যায়। মালতীর তখন আর কিছুই ভাল লাগল না। সুতরাং বারান্দা থেকে উঠে ফের বেগুন ক্ষেত অতিক্রম করে যেখানে হাড়গিলে পাখিটা ডাকছিল সেদিকে হেঁটে গেল। নির্জন এই জায়গাটুকু ওর ভাল লাগছে। সে অন্যমনস্কভাবেই লেবু গাছ থেকে দুটো পাতা ছিঁড়ল। পাতা দুটো মুচড়ে নাকের উপর ধরে চিন্তা করল। এবং অহেতুক বসে প্রিয়তমের চোখ মুখ ভাবতে

ভাবতে, আহাঃ, কত বিচিত্র সব মধুর স্মৃতি—শেষে আরও কি সব ভেবে ভেবে উদাস।

এখান থেকে হিজল গাছটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পথ ধরে যারা গেল তারা সকলেই ইস্তাহারটা ঝুলতে দেখল। যারা পড়তে পারছে, তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইস্তাহারটা পড়ছে। সামু বেকার, সুতরাং লীগের পাণ্ডা। সামু গাছে গাছে, মুসলমান গাঁয়ে গাঁয়ে এই ইস্তাহার ঝুলিয়ে শান্তি পাচ্ছে। মালতীর বড় ভয়ঙ্কর ইচ্ছা ইস্তাহারটা পড়ে দেখে—সামু ইস্তাহারে কি লিখেছে অথবা ধীরে ধীরে গিয়ে সকলের অলক্ষ্যে সন্তর্পণে ছিঁড়ে দেয়। ছিঁড়ে দিলে কেউ টের পাবে না! সামু টের পেলে শুধু বলবে, এডা করলি ক্যান?

—ক্যান করুম না। দেশটা কেবল তর জাতভাইদের?

—ক্যান আমার জাতভাইদের হইব। দেশডা তর আমার সকলের।

—তবে কেবল ইসলাম ইসলাম করস ক্যান?

—করি আমার জাতভাইরা বড় বেশি গরু-ঘোড়া হইয়া আছে। একবার চোখ তুইল্যা ছাখ, চাকরি তগ, জমি তগ, জমিদারী তগ। শিক্ষা দীক্ষা সব হিন্দুদের।

—হইছে। মনে মনেই মালতী ফয়সলা করে ইস্তাহারটার দিকে হাঁটতে থাকল। ইস্তাহারটা ঝুলছে। সামনের দুটো ধানজমি পার হলেই গাছটা। গাছটা নরেন দাসের। যেন এই গাছে ইস্তাহার ঝোলানোর উদ্দেশ্য, মালতীও একবার পড়ে দেখুক—ইসলাম বিপন্ন। এই বিপন্ন সময় থেকে জাতিকে উদ্ধার করতে হবে।

এখন মাঠ ফাঁকা। ধান গাছ, কলাই গাছ, এমন কি মটরের জমি ফাঁকা। কিছু তামাকের ক্ষেত, পেঁয়াজের ক্ষেত। সে হেঁটে যাবার জন্য আলে আলে গেল না। সবাই জমি চাষ করে রেখেছে। শুকনো জমি। বড় বড় ডেলা মাটির। সোজা জমি ভেঙে সে হেঁটে গেল। হাঁটুর উপর কাপড় তুলে, দ্রুত হাঁটার জন্য কাপড় তুলে ছুটছে। মাটিতে পায়ের ছাপ, এবং আকাশ কতদিন পর নীল স্বচ্ছ। মালতী গাছটার দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। হাওয়ায় চুল উড়ছে মালতীর। পাশের জমিতে একদা রসো এবং বুড়ি ডুবে মরেছিল এমন এক স্মৃতির উদয় হতে সে স্বল্প সময়ের জন্য এখানে দাঁড়াল। যেন কোন এক অশ্রুজল নিরপেক্ষ ভালবাসার বৃত্ত এই জমিতে দীর্ঘদিন পত্তন করে রেখেছে মানুষেরা।

সে হাঁটতে থাকল। ইস্তাহারটা এখনও বাতাসে নড়ছে। গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে মালতী ইস্তাহারটা পড়তে পড়তে উত্তেজিত। হক সাহেব নতুন নতুন কথা বলছেন। নাজিমুদ্দিন সাহেবের একটা ছবি ইস্তাহারের এক কোণে। মালতী এ-সময় দেখল দূরের সব জমিতে হাল চাষ হচ্ছে। ওরা

হাল চাষ করছে এবং গান গাইছে। সামসুদ্দিনের এই বিদ্বেষটুকু যথার্থই মালতীর ভাল লাগল না। সে এদিক ওদিক তাকিয়ে সন্তর্পণে ইস্তাহারটা গাছ থেকে টেনে তুলে ফেলল। তারপর হনহন করে বাড়িতে উঠে এসে যেখানে হাড়গিলে পাখিটা সেই সকাল থেকে ডাকছে—সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল। স্বামীর মুখ মনে হতেই সে চিৎকার করে বলতে চাইল—আমি ঠিক করছি। সামুরে, তর সর্দারি আমার ভাল লাগে না। তুই ত ভাল মানুষ আছিলি রে!

হাড়গিলে পাখিটা আবার ডাকতে শুরু করেছে! কুহক্ কুহক্ ডাকছে। ঝোপের কোথায় যে শব্দটা উঠছে—কিসের জন্য যে পাখিটা অনবরত ডাকছে মালতী বুঝতে পারল না। শব্দটা মনে হয় বড় দূর থেকে ভেসে আসছে। মোত্রাঘাসের জঙ্গলে জল নেই। জল নেমে গেছে, গাছের গুঁড়িতে হলদে মতো দাগ। সে ডাকটা কোথায় উঠছে, কেন পাখিটা নিরন্তর ডেকে চলেছে দেখার জন্য বেগুন খেতে বসে ঝোপের ভিতর উঁকি দিল। পাখিটা ডাকছে, অনবরত ডাকছে—নিশ্চয়ই ওর কোন অসহ্য কষ্ট। সে নানাভাবে উঁকি দিতে থাকল—কখনও বেত পাতা সরিয়ে, কখনও উঁচু ডালে ভর করে, কখনও মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে ঝোপে জঙ্গলে পাখিটা কোথায় আছে দেখার জন্য উদগ্রীব হল। সে মোত্রাঘাসের জঙ্গলে ঢুকে গোড়ালি তুলে উঁকি দিল—ওখানে নেই পাখিটা, শব্দটা যেন ঝোপের গহন অবস্থান থেকে আসছে। সে বাড়ি থেকে কোটা এনে ভিতরটা খোঁচা দিয়ে দেখবে এই ভেবে চোখ ফেরাতেই দেখল ভীষণ কালো রঙের একটা পানস সাপ ঠেলে ঠেলে ঘন ঝোপে ঢুকে যাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু নড়তে পারছে না। কেমন লাল ঠিক বেদানার কোয়ার মতো চোখ নিয়ে মালতীকে দেখছে। পাখিটার প্রায় অর্ধেকটা শরীর সাপটার মুখে এবং গলায়। এতবড় পাখিটাকে কি করে গিলছে ছাখ! মালতী ভয়ে চিৎকার করে উঠল, বৌদি, ছাখেন আইসা কাণ্ড। হাড়গিলা পাখিরে পানস সাপটা কি কইরা গিলতাছে।

—আ ল মরা, তরে ত খাইব! বলে আভারানী ছুটে এসে হাত ধরে টেনে উপরে তুলে আনল মালতীকে। আর মালতী উপরে উঠতেই দেখল সামু এদিকেই হনহন করে আসছে। মুখে ওর কার্তিকের মত সরু গোঁফ এবং সমস্ত অবয়বে অভিমানের চিহ্ন। সামসুদ্দিন মালতীর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। নরেন দাসের বৌ অদূরে ভীত-সন্ত্রস্ত। অথচ দেখল সামু অত্যন্ত বিনীত। অথচ অভিমানে আহত, এমন স্বর গলায়—বলছে, তুই ইস্তাহারটা ছিঁড়লি ক্যান মালতী!

—ছিঁড়লাম ত হইছেডা কি?

—তুই জানস না, ঢাকা থাইকা কত কষ্ট কইরা এগুলি আনাইতে হয়। কোনদিন আর ছিঁড়বি না।

—ছিঁড়ুম, একশবার ছিড়ুম, এমন কথা বলার ইচ্ছা হল মালতীর। কিন্তু সামুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে পারল না। সে এবার কি ভেবে বলল, গ্যাখছস, কতবড় হাড়গিলা পাখিটারে সাপটা ধইরা খাইতাছে।

সামসুদ্দিন তাড়াতাড়ি একটু ঘুরে দাঁড়াল। এবং দেখল, সাপটা এবার পাখিটাকে প্রায় গিলে এনেছে এবং গিলে ফেলতে পারলেই টেনে টেনে শরীরটা এদিকে নিয়ে আসবে। আর যদি কোন কারণে সাপের মুখ থেকে পাখি ফসকে যায়—তবে আর নিস্তার নেই। সামু, এবার ধমক দিল, এই ছেরি, ভয়-ডর নাই? যা, বাড়ি যা।

—অরে আমার শাসকরে। মালতী কিঞ্চিৎ দজ্জাল মেয়েমানুষের মতো গলায় স্বর করতে চাইল কিন্তু না পেরে হোহো করে হেসে দিল।

—হিটকানি থাকব না মালতী। মুখ থাইক্যা আহার ছুইটা গেলে সাপের মাথা ঠিক থাকে না!

—মানুষের মাথা ঠিক থাকে?

সামসুদ্দিন কেমন চোখ ছোট ছোট করে তাকাল। মালতীকে দেখল। মালতীর শরীরে পুবের দেশ থেকে বন্যা আসার মত অথবা উজানি নদীর মতো রূপলাবণ্যের ঢল নেমেছে। বিধবা হইলে কি যুবতী মাইয়ার শরীর রূপের সাগরে ভাইস্যা যায়! মালতীকে সামু শেষপর্যন্ত বলল, যা বাড়ি যা। জঙ্গলে আর খাড়াইয়া থাকতে হইব না।

মালতী নড়ল না। মালতী ফের ঝোপটার ভিতর উঁকি দিল। একটা শুকনো ডালে সাপটা শরীর পেঁচিয়ে রেখেছে। লাল চোখ দুটো বেদানার কোয়ার মতো উজ্জ্বল। ওরা একটু দূরে এসে দাঁড়াল। ওরা এখন কথা বলছে না—পাখিটাকে সাপের গলায় অন্তর্হিত হতে দেখছে। গলাটা ফুলে ফুলে সহসা সরু হয়ে গেল। তারপর সাপটা মৃতের মত ডালে ঝুলতে থাকল একসময়।

পরদিন ভোরে মালতী সকাল সকাল উঠে হাঁসগুলোকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে পুকুরে ফেলল। একটা গাছের গুঁড়িতে বসে জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখল। শরীরে সাদা থান, শরীরের লাবণ্য এই কাপড়ের বিসদৃশ রঙে চাপা পড়ছে না। মালতীর সোনার শরীর—প্রজাপতির মতো মন অথচ রাতে গভীর ঘুমের জন্য এ-সময় গাছের গুঁড়িটার মতো মনটা বড় নির্বোধ। পায়ের পাতা ডুবিয়ে গাছের গুঁড়িতে বসে আছে। হাঁসগুলি জলে নেমেই এখন সাঁতার কাটবে, এবং এক রকমের খেলা—ওরা জলে ভেসে ভেসে অথবা ডুবে ডুবে অনেক নিচে চলে যাচ্ছে এবং ভেসে উঠেই পুরুষ হাঁসটা অন্য হাঁসগুলোকে তাড়া করছে অথবা পুরুষ হাঁসটা ছুটে ছুটে—যেমন তার মানুষ তাকে ছুটে ছুটে ঘরের ভিতর অথবা বাগানের ভিতর এবং রাত অন্ধকার হলে লুকোচুরি খেলা—ছুঁই-ছুঁই খেলা—খেলতে খেলতে যখন আর ছুটতে পারত না তখন মানুষটা

তাকে সাপ্টে ধরত এবং পাঁজাকোলা করে নিয়ে যেন কোন এক পাহাড়ে অথবা নদীর পাড়ে চলে যেতে চাইত—কি যে সুখ সুখ খেলা—হাঁসগুলো এখন তেমনি সুখ সুখ খেলা খেলছে। মালতীর পা ক্রমে স্থির হয়ে আসছে—শরীর শক্ত হয়ে আসছে। সুন্দর পা ওর জলের নিচে মাছরাঙার মতো ক্রমে ডুবে যাচ্ছিল। কেবল থেকে থেকে রঞ্জিতের কথা মনে পড়ছে। সে তখন বালক ছিল। ঠাকুরবাড়ির বড়বৌর ছোট ভাই। সে এখন কোথায় আছে কে জানে! শুনেছে, সে এখন নিরুদ্দেশ। কেউ তার খোঁজ রাখে না।

পুকুরের ও-পাশের ঝোপটায় একটা বড় মাছ নড়ে উঠল। কৈশোরে মালতী মাছ ধরত—যখন বর্ষাকাল, যখন গয়না নৌকায় বাদাম উড়ত, ঝোপেজঙ্গলে টুনি ফুল ফুটে থাকত, তখন এই ঘাটে কত যে চেলা মাছ, ডারকীনা মাছ এবং শাড়ি-পরা পুঁটি মাছ—মালতী সরু ছিপ দিয়ে বর্ষাকালে শাড়ি-পরা পুঁটি মাছ ধরত। একদিন নির্জন বিকেলে রঞ্জিত পাশে দাঁড়িয়ে মাছ ধরতে ধরতে ফিসফিস করে বলেছিল—যাবি? যাবি মালতী?

মালতী জানত রঞ্জিত এই কথায় কি বলতে চায়। সে অবুঝের মতো চোখেমুখে এক বোকা বোকা ভাব ছড়িয়ে রাখত। রঞ্জিত আর বলতে সাহস পেত না।

মালতী গাছের গুঁড়িতে বসে থাকল। উঠতে ইচ্ছা করছে না। পুকুরের জল নিচে নেমে গেছে। সুতরাং গাছের গুঁড়িটাকেও গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে নামানো হয়েছে। গাছের গুঁড়িটা ছিল সিঁড়ির মতো—সেই কবে গুঁড়িটা এখানে ছিল। রসো, রঞ্জিত, সামু বর্ষায় গুঁড়ি থেকে জলে লাফ দিয়ে পড়ত, ডুবত, ভাসত অথবা সাঁতার কেটে বর্ষার জলে ঝোপে জঙ্গলে লুকিয়ে মালতীকে ভয় দেখাত। রাতের কিছু কিছু স্বপ্ন, পুকুরের জল, হাঁসগুলোর সুখী জীবন, সামনের মাঠ এবং যব-গমের ক্ষেত, কিছু কৃষকের এক সুরে ফসল কাটার গান সব মিলে মালতীকে কেমন আচ্ছন্ন করে রাখছে। রাতের কিছু স্বপ্ন অস্পষ্ট স্মৃতির মতো—প্রিয়তমের মুখ গন্ধপাদালের ঝোপ থেকে যেন উঁকি মারছে। প্রকৃতির নীরবতা এবং ভোরের এই মাধুর্য মালতীকে ক্লিষ্ট করছে—হিজল গাছে সামু ইস্তাহার ঝোলাল। দেশটা দিন দিন কি যেন হয়ে যাচ্ছে। মালতী এবার পুকুর থেকে হাতমুখ ধুয়ে উঠে এল। প্রিয়তমের মুখ স্মৃতির অতল থেকে তুলে এনে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতে গিয়ে দেখল চোখে জল মালতীর।

নরেন দাস ফিরছে পশ্চিম পাড়া থেকে। ওর হাতে গলদা চিংড়ি। সে দেখল, মালতী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেমন নিবিষ্ট মনে হাঁসগুলির সাঁতার কাটা দেখছে। কেমন অন্যমনস্ক মালতী। নরেন দাস ইচ্ছা করেই গলায় এক রকমের উপস্থিতির শব্দ করল এবং যখন দেখল সংকোচে মালতী এতটুকু হয়ে গেছে—কি যেন তার ধরা পড়ে গেছে ভাব—এই যে খেলা, হাঁসের খেলা—খেলা তার

ইহজীবনে আর বুঝি হবে না—সব শেষ। কেমন সে বিহ্বলভাবে তাকাল। নরেন দাসও কেমন সরল বালকের মতো, যেন সে কিছু বুঝতে পারে নি এমন এক চোখ নিয়ে তাকাল। বলল, ছাখ ছাখ, কতবড় ইছা মাছ ধইরা আনলাম। মাছগুলি ভাতে সিদ্ধ দেইস। কিন্তু তখনই মনে হল, দাসের বোন মালতী বিধবা। সে একটা বড় দীর্ঘশ্বাস চেপে বাড়িতে উঠে গেল।

মালতী দাদার সঙ্গে পুকুর পাড় থেকে উঠে যাবার সময় বলল, দাদারে, সামু হিজল গাছটাতে ইস্তাহার ঝোলায়, অরে বারণ কইরা দেইস।

—বারণ কইরা দিলে অন্যখানে ঝোলাইব।

মালতী বুঝল প্রতিবাদে নরেন দাস যথার্থই অক্ষম। সুতরাং মাসখানেক পর সামসুদ্দিন যখন ফের ইস্তাহার ঝোলাতে এল, মালতী মাঠ পার হয়ে নেমে গেল। বলল, ইস্তাহার ঝুলাইবি না।

—ক্যান?

—গাছটা আমার দাদার।

—তা হইছে কি!

—তর গাছ থাকলে সেখানে ঝুলাইয়া দে।

—আমার গাছ এডা। তুই যা করতে পারস করবি।

—বড় বড় কথা কইবি না সামু। অদিনের পোলা, অখনই মাতব্বর হইয়া গেছস। নাকে তর দুধের গন্ধ আছে।

—তর নাকে কিয়ের গন্ধ ল ছেরি। বলে ইস্তাহারটাকে গাছে উঠে অনেক উপরে ঝুলিয়ে দিল। —নে পাড়। ছাখি তর ক্ষ্যামতা কেমন!

—আইচ্ছা! মালতী হনহন করে বাড়ি উঠে গেল। গাব গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল।

সামু মালতীর এই রাগ দেখে মনে মনে হাসল। মালতী আগের মতই জেদী মালতী। কিন্তু মনের ভিতর কি এক শপথ সবসময় কাজ করছে। গাঁয়ে উঠে যাবার সময় ওর চোখমুখ দৃঢ় দেখাল। অথচ গাঁয়ের সবুজ বন ঝোপ দেখে মনটা আর্দ্র হয়ে উঠছে। মালতীর শস্য দানার মতো রঙ শরীরের—তা ছাড়া শৈশবের কিছু কিছু প্রীতিপূর্ণ ঘটনা, স্বামীর সাম্প্রদায়িক মৃত্যু এবং বৈধব্য বেশ, সব মিলে মনে এক অপার বেদনা সঞ্চার করছে সামুর। এই উগ্র জাতীয়তাবোধ ওর ভাল লাগল না। সে ছুটতে থাকল। সে আর হিজল গাছে ইস্তাহার ঝোলাবে না, অন্য কোনখানে গিয়ে ইস্তাহারটা টাঙিয়ে দেবে। সে ছুটে মাঠে নেমে দেখল, হিজল গাছের নিচে মালতী—একটা লম্বা বাঁশ দিয়ে—মনে হয় ওর সেই বাঁশটা, যা দিয়ে বেতের ডগা কেটে দিয়েছিল—মালতী টেনে টেনে ইস্তাহারটা নামাচ্ছে। কেমন পায়ের রক্ত সব সামুর মাথায় উঠে এল। উত্তেজনায় অধীর সামু স্থির থাকতে পারল না। কাছে এসে

রুষ্ট মুখে দাঁড়াতেই মালতী হেসে দিল।—কি, ছাখলি, পাড়তে পারি কিনা।

মালতীর এই উচ্ছলতাকে অপমান করার স্পৃহা সামুর। এই প্রবঞ্চনামূলক ঘটনাতে সে নিজের দুর্বলতাকে দায়ী করে অত্যন্ত দৃঢ় এবং রুক্ষ কণ্ঠে বলল, তুই না বিধবা হইছস্ মালতী। এই হাসি ত তর মুখে ভাল লাগে না।

—সা···মু···রে! মালতী ইস্তাহারটা সহ ঢলে পড়ার মতো গাছের গুঁড়িতে বসে পড়ল। এক শিশুসুলভ কান্নায় ভেঙে পড়ছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বিধবা মানুষের হাসতে নেই। মালতী বিধবা, সামু বার বার কথাটা যেন মনে করিয়ে দিল। সামু মালতীর এমন চোখমুখ সহ্য করতে না পেরে গাঁয়ের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। মালতী ক্রমে শান্ত হয়ে এল। পায়ের কাছে ইস্তাহার। মাঠ ফাঁকা। সে এবার মুখ তুলে দেখল সামু নেই—দূরে সে গ্রামের দিকে উঠে যাচ্ছে। কিছু মেলার গরু যাচ্ছে। গলায় ওদের ঘণ্টা বাজছে। কিছু লটকন গাছ, এখন বসন্তকাল বলে গাছে কোন ফল নেই। নানারকম পাখি উড়ে এসেছে এ-দেশটায়। বিলের জল কমে গেছে, সেই বড় বিলে, বাবুদের হাতি আসার কথা, কারণ এ-সময়ে বিলের জলে নানারকমের হাঁস উড়ে আসবে। ওর মনে হল, অনেক দিন ধরে সে সেই হাতি, মুড়াপাড়ার হাতির গলায় ঘণ্টা বাজতে শুনছে না। এই হাতি দেখলে সে সাহস পায়।

তারপর এ অঞ্চলের ঘাস ফুল পাখি চৈত্রের গরম বাতাস সহ্য করে কাল-বৈশাখীর অপেক্ষাতে থাকল। এখন মাঠ খাঁ খাঁ করছে। আকাশ কাঁসার বাসনের মতো রঙে ধূসর হয়ে আছে। কিছু পাখপাখালি আকাশে উড়লে মনে হয় খড়কুটো উড়ছে। যেন এই মাঠ এবং নদী আর তরমুজ ক্ষেত সব পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। সূর্যের রঙ কমলার খোসার মতো। পলাশ গাছ নেড়া নেড়া। শিমুল গাছে নতুন পাতা এসেছে। ধানের ক্ষেত, কলাইর ক্ষেত সব এখন চাষবাসের উপযোগী। এ-সময়ে চাষ দিয়ে রাখলে ফলন ভাল হবে, আগাছা জন্মাবে না। ঠাকুরবাড়ির ছোট ঠাকুর জমিতে হালচাষ কেমন হচ্ছে দেখে ফিরছে। মালতী ঠাকুরবাড়ির ধনকর্তার ছোট ছেলে সোনাকে কোলে নিয়ে অ আ করে তু তা করে, কি আমার সোনারে ধনরে বলে, গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বিকেলের হাওয়া খাচ্ছিল। মাঝি বাড়ির শ্রীশ চন্দ দন্দির হাটে যাবে, নরেন দাসকে এক বাণ্ডিল সুতা কিনে দেবে—সেসব জেনে যাবার জন্য এদিক হেঁটে আসছে। মালতীকে দেখে বলল, তর দাদায় কই। মালতী বলল, দাদায় তানা হাঁটতাছে। আপনের শরীর ভাল ত কাকা?

জবাবে শ্রীশ চন্দ বলল, এই আছে একরকম। হাটের সুখ এখন নাই ল মা। পরাপরদীর বাজারে সব মুসলমানরা এককাট্টা। অরা ঠিক করছে হিন্দুগ দোকান থাইকা কিছু আর কিনব না।

—কি যে হইল দেশটাতে! মালতী একটা পলাশ গাছ দেখতে দেখতে এমন ভাবল। সোনা ওর বুকে লেপ্টে আছে। ঘুমাবে বোধহয়। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে সর্বত্র। শরীর ঠাণ্ডা হচ্ছে। শরীর এবং মন দুই-ই হাল্‌কা বোধ হচ্ছে। সামু ঢাকা গেছে। এ-পাড়াতে সামু অনেকদিন আসছে না। হয়তো অনুশোচনার জন্য আসছে না। এমন যখন ভাবছিল মালতী তখন দেখল একজন মিঞা মাতব্বর গোছের মানুষ হিজল গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল। লম্বা একটা ইস্তাহার গাছে ঝুলিয়ে দিল।

মিঞার পরনে তফন, গায়ে জোব্বা এবং গালে দাড়ি। মালতী বাড়ির শেষ সীমানা পর্যন্ত এল অথচ মাঠে নেমে যেতে সাহস পেল না। ইস্তাহারটি ঝুলিয়ে মানুষটি নিজের গাঁয়ে উঠে গেল না। কে এই মানুষ! মালতী দূর থেকে কিছুতেই চিনতে পারল না। ইস্তাহারটি এখন গাছের উপর নিশানের মতো উড়ছে। মানুষটা মালতীদের বাড়ির দিকে উঠে আসছে। নরেন দাসের ভিতর বাড়ির রাস্তা ধরে উঠে আসছে। মালতী ভাবল, দাদাকে ডাকবে। বলবে, ছাখছস দাদা, একটা মিঞা মানুষ বাড়িতে উইঠা আইতাছে! কিন্তু কাছে আসতেই···ওমা! একি তাজ্জব! সামু ওর কার্তিক ঠাকুরের মতো গোঁফ চেঁচে ফেলে গোটা গালে মৌলবী-সাবের মতো দাড়ি রেখেছে। মালতী সহসা কোন কথা বলতে পারল না। সামুকে আর সামু বলে চেনা যাচ্ছে না। সে যেন কেমন ওর কাছে একেবারে অপরিচিত মানুষ হয়ে গেছে। সামু পর্যন্ত মালতীকে চিনছে না এমন ভাব চোখেমুখে। সে সোজা উঠে আসছিল, কথা বলছিল না। চোখমুখ শক্ত। সে কেমন বুক ফুলিয়ে হেঁটে গেল। মালতী এবার রাগে দুঃখে চিৎকার করে উঠল, দাদারে, দেইখ্যা যা—কোন-খানকার এক মিঞা বাড়ির ভিতর দিয়া যাইতাছে।

নরেন দাস দূরে তানা হাঁটছিল। সে দূর থেকে কে মানুষটা চিনতে পারল না। সে ফ্রেমটা মাটিতে রেখে গাবগাছটার নিচে তাকাতেই দেখল, যথার্থই একজন মিঞা মানুষ মোত্রাঘাসের জঙ্গল পার হয়ে বাড়ির দিকে উঠে আসছে। সে চিৎকার করে ডাকল, অঃ মিঞা, ঠ্যাং ভাইঙা দিমু। পথ দেইখা হাঁটতে পার না। সদর অন্দর নাই তোমার!

আর মালতী গাবগাছের গুঁড়িতে দাঁড়িয়ে হা-হা করে হেসে উঠল। মালতী প্রতিশোধের ভঙ্গিতে গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সারা মুখে মনে প্রতিশোধের স্পৃহা। সোনা সেই হাসি শুনে কেমন চমকে গেল ঘুমের ভিতর। সে কোলের ভিতর ধড়ফড় করে জেগে উঠল। সোনা এখন কাঁদছে। এবং কয়েকমাস আগে এই জঙ্গলে একটা পানস সাপ একটা হাড়গিলে পাখিকে গিলে অনেকক্ষণ শুকনো ডালে মৃতের মতো পড়েছিল। এইসব দৃশ্য মনে হওয়ায় মালতীর আকাশ দেখার ইচ্ছা হল—নিচে এই মাঠ,

ধরণীর সুখ-দুঃখ, মৃত পলাশের ডাল আর কোলে ধনকর্তার ছোট ছেলে সোনা সব মিলে মালতীকে কেমন অসহায় করে তুলছে। সামসুদ্দিন ততক্ষণে সদর রাস্তায় উঠে গেছে। সে একবার ফিরে পর্যন্ত তাকাল না। মালতীর মনে হল অনেকদিন পর বড় মাঠ পার হতে গিয়ে সে পথ হারিয়ে ফেলেছে।

এ-ভাবে এ-দেশে বর্ষাকাল এসে গেল। বর্ষাকাল এলেই যত জমি-জায়গা, খাল-বিল নদী সব ডুবে যায়। শুধু গ্রামগুলো দ্বীপের মতো ভাসতে থাকে। বর্ষাকাল এলেই গ্রাম থেকে বড় বড় নৌকা যায় উজানে। খাল-বিল-মাঠে বড় বড় মাছ উঠে আসে। ধানক্ষেতে কোড়া পাখি ডিম পাড়ার জন্য বাসা বানায়। আত্মীয় কুটুম যা কিছু এ-অঞ্চলের এ-সময় বাড়ি বাড়ি আসতে থাকে। শাপলা শালুক ফুটে থাকে জলে। জলপিপি ফুলের উপর সন্তর্পণে এক পা তুলে শিকারের আশায় জলের দিকে চেয়ে থাকে।

বর্ষাকাল এলেই বুড়োকর্তা মহেন্দ্রনাথ ঘরে আর বসে থাকতে পারেন না। তিনি ধীরে ধীরে বৈঠকখানার বারান্দায় এসে বসেন। একটা হরিণের চামড়ার উপর বসে বিকেলবেলাটা কাটিয়ে দেন। বয়স তাঁর আশির উপর। চোখে আজকাল আর একেবারেই দেখতে পান না। তবু বাড়ির উঠোনে, শেফালি গাছে এবং বাগানে যেসব নানারকম গাছ আছে, কোথায় কোন গাছ আছে, কি ফুল ফুটে আছে তিনি এখানে এসে বসলেই তা টের পান। তিনি এখানে বসলেই ধনবৌ সোনাকে রেখে যায় পাশে। একটা মাদুরের উপর সোনা হাত পা নেড়ে খেলে। মহেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে কথা বলেন। ওর কোমরে রুপোর টায়রা, হাতে সোনার বালা, এই ছেলে হেসে হেসে বৃদ্ধকে নানা বয়সের ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়। তিনি এই অতি পরিচিত বিকেলের গন্ধ নিতে নিতে সোনার সঙ্গে বিগত দিনের গল্প করেন—প্রায় যেন সমবয়সী মানুষ, একে অপরের অসহায় অবস্থা বোঝে। সোনা অ···আ···ত···ত করে আর বুড়ো মানুষটা তখন যেন দেখতে পান, পাটকাঠির আঁটি উঠোনের উপর দাঁড় করানো। উঠোন পার হলে দক্ষিণের ঘর। তার দরজা। ফড়িঙেরা নিশ্চয়ই এ বাদলা দিনে উড়ছে। এটা শরৎকাল। শরৎকাল এলেই ভূপেন্দ্রনাথ নৌকা পাঠাবে মুড়াপাড়া থেকে। অষ্টমীর দিন সে, মহাপ্রসাদের আস্ত একটা কাটা পাঁঠার ছাল ছাড়ানো মাংস নিয়ে আসবে।

তখন বড়বৌ এদিকে এল। হাতে গরম দুধ। শ্বশুরের সামনে দুধের বাটি রেখে পায়ের কাছে বসল। সামনে পুকুর। আম-জাম গাছের ছায়া। তারপর মাঠ। বর্ষাকাল বলে শুধু জল আর জল। যেখানে পাটের জমি—পাট কাটা হয়ে গেছে বলে সমুদ্রের মতো অথবা বড় বিলের মতো, যেন সেই এক বিল—রূপকথার রাজকন্যা জলে ভেইসে যায়। বড়বৌ নদী মাঠ এবং জল দেখলে এইসব

মনে করতে পারে। বড় বিলের কথা মনে হয়—বিয়ের দিন বড় নৌকা করে সে এ-অঞ্চলে এসেছিল। এত বড় বিলে পড়ে বড়বৌর বুকটা ধড়ফড় করে উঠলে, কারা যেন এ-বিলের কথা বলতে বলতে যায়—কিংবদন্তীর পাঁচালির মতো বলতে বলতে যায়—এক সোনার নৌকা রুপোর বৈঠা এ-বিলের তলায় ডুবে আছে, এক রাজকন্যা ডুবে আছে। রাজকন্যার নাম সোনাই বিবি। বড়বৌ এখন মেঘলা আকাশ দেখতে দেখতে সেই প্রথম দিন স্বামীর মুখে বিলের গল্প মনে করতে পেরে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। স্বামীর মাথার ভিতর কি গণ্ডগোলের পোকা তখনই ঢুকে গেছিল। নতুবা বাদলা দিনে হাটুরে মানুষের মতো এমন গল্প বলবে কেন!

বড়বৌ সোনার মুখের আদলটা দেখল ভাল করে। দেখতে দেখতে মনে হল এই মুখ বাপের মতো নয়, মার মতো নয়। এ-মুখ বাড়ির পাগল মানুষটার মতো। বড়বৌ কলকাতায় বড় হয়েছে, কিছুকাল কনভেণ্টে পড়েছে। পাগল ঠাকুরকে তার এখন আর পাগল বলে মনে হয় না। যেন সে তার কাছে এখন প্রায় মোজেসের মতো অথবা কোন গ্রীক পুরাণের বীর নায়ক—যুদ্ধক্ষেত্রে হেরে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে। বড়বৌ বলল, সোনার মুখ আপনার বড়ছেলের মতো হবে বাবা।

মহেন্দ্রনাথ একটু হাসলেন। তারপর কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেলেন। বললেন, মণির সাড়াশব্দ পাইতেছি না।

—পুকুর পাড়ে বসে আছে।

মহেন্দ্রনাথ অনেকদিন থেকেই একটা কথা বলবেন বলে ভাবছিলেন। বড়বৌকে কিছু বলার ইচ্ছা ছিল। যেন বড়বৌর বাপের বাড়ির দিকের মানুষদের একটা ধারণা—হয়তো মনে মনে বড়বৌ নিজেও সেটা বিশ্বাস করে, কিন্তু আমি তো জীবনে মিছা কথা কই নাই, তঞ্চকতা করি নাই। আমি এই বয়সে তোমারে একটা কথা কই—বিশ্বাস কর, না কর, কই। এমন ভেবে বললেন, বড়বৌমা, আমার ত সময় ফুরাইছে। তোমারে একটা কথা কমু ভাবছিলাম বৌমা।

বড়বৌ সামান্য হাসল। বলল, বলুন না।

—জান বৌমা, মণি যখন ছুটি নিয়ে বাড়ি আসত আমি গর্বে বুক ফুলাইয়া থাকতাম। এ-তল্লাটে এমন উপযুক্ত পোলা আর কার আছে কও। সুতরাং আমি তোমার বাবারে কথা দিলাম। মাইনসে কয় আমার পোলা পাগল হইছে আমি নাকি বিয়ার আগেই জানতাম।

বড়বৌ কোন জবাব দিল না। সে বৃদ্ধের পাশে সোনাকে কোলে নিয়ে বসে থাকল।

—বোঝলা বৌমা, মণি যে-বারে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় জলপানি পাইয়া প্রথম

হইল—সব্বাইরে কইলাম, নারায়ণ আমার মুখ রাখছে। আর বিয়ার পরই যখন পাগল হইল তখন কইলাম নারায়ণ আমার তামাশা দেখছে। তিনি যেন এ-সময় কি খুঁজতে থাকলেন হাত বাড়িয়ে।

চক্ষু স্থির, ঘোলা ঘোলা চোখ। চুল এত সাদা, গালের দাড়ি এত সাদা যে মানুষটাকে সান্তাক্লজের মতো মনে হয়। চামড়া শিথিল। বড়বৌ বলল, আপনার লাঠিটা দেব?

—না বৌমা, তোমার হাতটা ছাও।

বড়বৌ হাতটা বাড়িয়ে দিলে বৃদ্ধ সেই হাত দু'হাতে চেপে ধরে বললেন, বৌমা, তুমি অন্তত বিশ্বাস কইর মণি তোমার বিয়ার আগে পাগল হয় নাই। জাইনা শুইনা আমি পাগলের সঙ্গে তোমারে ঘর করতে আনি নাই। বলে বৃদ্ধ একেবারে চুপ মেরে গেলেন। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। মুখের রেখাতে এতটুকু ভাঁজ নেই। এক ভাবলেশহীন মুখ, মুখে কোন আর ইচ্ছার রেখা ফুটে নেই, শুধু উদাস আর উদাস। মৃত্যুর যাত্রী হবার জন্য যেন পৃথিবীর এক পান্থশালায় জলছত্র খুলে বসে আছেন, সারাজীবন ধরে সকলকে জল দিয়েছেন, অবশেষে সেই জলের তলানিটুকু দিয়ে হাতমুখ প্রক্ষালন করে দূরের তীর্থযাত্রী হবার জন্য উন্মুখ। বৃদ্ধ অনেক দূর থেকে যেন কথা বলছেন, মণির মার কথা শুনলে বুঝি এমন হইত না! ত্যাখ বড়বৌ, আমি বাড়ির কর্তা, মণি আমার বড় পোলা—সে কিনা ভাব কইরা ম্লেচ্ছ মাইয়া বিয়া করব—ঠিক না বৌমা। এইটা ঠিক কথা না।

বড়বৌ এ-সব কথা শুনলে আর স্থির থাকতে পারে না। চোখ ভার হয়ে আসে। সোনার টুকরো ছেলে ভালবেসে পাগল। কথা বললেই যেন এখন দরদর করে চোখের জল চলে আসবে। সে অন্য কথা বলল, চলুন বাবা, আপনাকে ঘরে দিয়ে আসি।

—আমি আর একটু বসি বৌমা। বসলে মনটা ভাল থাকে। বারান্দায় বইসা থাকলে বর্ষার শাপলা শালুকের গন্ধ পাই। মনে হয় তখন ঈশ্বরের খুব কাছাকাছি আছি। তোমার মায় কই?

—মা গেছেন পদ্মপুরাণ শুনতে। আপনার পদ্মপুরাণ শুনতে ইচ্ছা হয় না বাবা?

—পদ্মপুরাণ ত আমি নিজেই। মাগো—সারাজীবন আমি চাঁদ সদাগরের পাঠ করছি, তুই বেহুলার। বৃদ্ধ এবার টেনে টেনে বললেন, যেন এই বয়সে কেবল বর দেওয়া যায়—এখন এমন এক বয়স তার, এমন এক মানুষ সে—সংসারে, এ-মানুষ প্রায় ঈশ্বরের সামিল যেন—তিনি টেনে টেনে যেন অনেক দূর থেকে বলছেন—বৌমা, তুমি আমার সতী সাবিত্রী। তুই আমার বেহুলা। শাঁখা সিঁদুর অক্ষয় হউক মা তর।

গভীর রাতে বড়বৌ ঘুমে আচ্ছন্ন। একটা আলো ঘরে নিবু নিবু হয়ে জ্বলছে। জানালা খোলা। বর্ষার জলজ বাতাস ঘরে ঢুকে বড়বৌর বসন ভূষণ আলগা করে দিচ্ছে। বড়বৌ হাত দুটো বুকের উপর প্রায় প্রার্থনার ভঙ্গিতে রেখেছে। দেখলে মনে হবে, সে ঘুমের ভিতরও তার মানুষের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে। তখন মণীন্দ্রনাথ ঘরে পায়চারি করছিলেন। ওর চোখে ঘুম নেই। তিনি দরজা খুলে ফেললেন সহসা। নদীর ও পাড়ে তিনি কাকে যেন ফেলে এসেছেন মনে হল।

আকাশে এখনও কিছু কিছু নক্ষত্র জেগে আছে। ঠাকুরঘরের পাশেই সেই শেফালি গাছ, ফুলেরা ঝরছে, ঝরে আছে এবং কিছু কিছু বোঁটায় সংলগ্ন। ওরা ভোরের জন্য অথবা রোদের জন্য প্রতীক্ষা করছে। মণীন্দ্রনাথ দুই হাতে গাছের নিচ থেকে কিছু ফুল সংগ্রহ করে বোঁটার হলুদ রঙ হাতে মুখে মাখলেন। রাত নিঃশেষ হয়ে আসছে। তিনি কি ভেবে এবার বাঁশ-ঝাড়ের নিচে এসে দাঁড়ালেন। সামনে ঘাট—বর্ষার জল উঠোনে উঠে আসবে বুঝি, তিনি ছোট কোষা নৌকায় উঠে লগিতে ভর দিতেই নৌকাটা জলে নেমে গেল—কিছু গ্রাম মাঠ ঘুরে সেই নদীর পাড়ে চলে যাবেন—যেখানে তাঁর অন্য ভুবন নিঃসঙ্গ নির্জন নদীতীরে খেলা করে বেড়াচ্ছে।

মাথার ভিতর এক অ-দৃষ্ট যন্ত্রণা মণীন্দ্রনাথকে সর্বদা নিদারুণ করে রাখে। মণীন্দ্রনাথ কেবল নির্জনতা চান।

কোষা নৌকা ক্রমশ গ্রাম মাঠ এবং ধানক্ষেত অতিক্রম করে বিশাল বিলেন জলে অদৃশ্য হচ্ছে। চারিদিকের গ্রামগুলো খুব ছোট মনে হচ্ছে। আকাশের সঙ্গে সব গ্রামগুলো যেন ছবির মতো হয়ে ফুটে আছে। কোন শব্দ নেই—ভয়ানক নির্জন নিঃসঙ্গ প্রান্তর। দূরে সোনালী বালির নদীর রেখা অল্পে অল্পে দৃশ্যমান হচ্ছে। মণীন্দ্রনাথ পদ্মাসন করে বসে থাকলেন—সাধুপুরুষের মতো ভাব চোখেমুখে। বিলেন জমিতে গভীর জল—এক লগির চেয়ে বেশি হবে। মণীন্দ্রনাথ চুপচাপ বসে এই জলের ভিতর পলিনের মুখ যেন দেখতে পাচ্ছেন। পলিন কি করে যেন তার নদীর জলে হারিয়ে গেল। নদীর পাড়ে খেলা ছিল, কত খেলা। হায়, তখন কেবল সেই দুর্গের কথা মনে হয়! বড় মাঠ, মাঠের পাশে দুর্গ, দুর্গে কেবল থেকে থেকে জালালি কবুতর উড়ত। মণীন্দ্রনাথ এবার গলা ছেড়ে পরমপুরুষের মতো কবিতা আবৃত্তি করতে থাকলেন কবিতার অবয়বে সেই এক স্মরণচিহ্ন—কীটস নামে এক কবি ছিলেন—তিনি বেঁচে নেই। পলিন মণীন্দ্রনাথের মুখে কবিতার আবৃত্তি শুনতে শুনতে এক সময় দুর্গের গম্বুজের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে যেত।

কিছু হিজল গাছ অতিক্রম করলে নন্দীদের ঘাট। ঘাট পার হলে মুসলমান গাঁ। অনেকদিন পর যেন তিনি এই ঘাটে নৌকা বাঁধলেন। সর্বত্র

পাট পচানো হয়েছে—পচা গন্ধ উঠছে, ইতস্তত কচুরিপানার ঝাঁক—নীল সাদা রঙের কচুরি ফুল এবং পাতিহাঁস ঘাটে নড়ছে। ঘাটে ঘাটে কুমড়োর মাচান, মাচানের নিচে কুমড়োলতা নেমে গেছে। তিনি সব কিছু দেখে শুনে সতর্ক পা ফেলে উপরে উঠে গেলেন। এক তকতকে উঠোনে উঠে যেতেই গোলার ফাঁক থেকে হামিদ বের হয়ে এল। বলল—সব বলাই নিরর্থক, তবু এত বড় মানুষটা, মানুষটার আর বয়স কত, সেই যে, যবে একবার হামিদ হাসান পীরের দরগতে এই মানুষকে বসে থাকতে দেখেছিল—মানুষটা যেন চোখের ওপর শৈশব পার করে যৌবনে পা দিয়েছে, যৌবন থেকে কিছুতেই নড়ছে না, শক্ত বাঁধুনি, শরীরের গঠন একেবারে আস্ত একটা দ্রুতগামী অশ্বের মতো—সে বলল, আমাগ কথা এতদিনে মনে হইল বড়ভাই!

মণীন্দ্রনাথ বড় বড় চোখে হামিদকে দেখলেন। একটু হাসলেন।

হামিদ বলল, একটু বইসা যান বড়ভাই।

মণীন্দ্রনাথ ওর উঠোনে উঠে গেলে হামিদ একটা জলচৌকি দিল বসতে।—বসেন বড়ভাই। সে সকলকে ডেকে বলল, কে কোন-খানে আছ, ছাখ্‌ আইসা, বড়ভাই আইছেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে হামিদের মা এল, হামিদের দুই বিবি এসে হাজির হল। বেটা, বিবিরা সকলে। এবং গ্রামে যেন বার্তা রটি গেল—সকলে এসে ঘিরে দাঁড়াল মণীন্দ্রনাথকে। সকলে আদাব দিল। মণীন্দ্রনাথ কোন কথা বলছেন না, যতক্ষণ না বলেন ততক্ষণই ভাল। একসময় হামিদ ভিড়টাকে সরে যেতে বলল। মণীন্দ্রনাথ সকলের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছেন। হামিদ তখন তার ছোট বিবিকে বলল, বড়ভাইয়ের নৌকায় একটা কুমড়া তুইলা দিঅ। যেন গাছের যা কিছু ভাল, নতুন যা কিছু, এই মানুষকে না দিয়ে খেতে নেই।

গ্রামের উপর দিয়ে এক সময় হাঁটতে থাকলেন মণীন্দ্রনাথ। পিছনে গাঁয়ের ছোট বড় উলঙ্গ শিশুরা এবং বালক বালিকারা আথ খেতে খেতে মণীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করছে। তিনি ওদের কিছু বলছেন না। ছোট-বড় গর্ত, বাঁশঝাড় এবং কর্দমময় পিচ্ছিল পথ অতিক্রম করে তিনি হাজি সাহেবের বাড়ির সামনে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধ হাজি সাহেব হুঁকোর নলে মুখ রেখে কোলাহল শুনে ধরতে পারলেন, পাগল ঠাকুর আজ এ-গাঁয়ে অনেকদিন পর উঠে এসেছে। হাজি সাহেব হুঁকো ফেলে ছুটে এলেন। বললেন, ঠাকুর বৈসা যাও। এদিকে আর আস না। হাজি সাহেব জানেন, এইসব কথা পাগল ঠাকুরের সঙ্গে নিরর্থক। তবু এত বড় মানী ঘরের ছেলে—কোন কথা বলবেন না তিনি—পাগল ঠাকুর এই পথ ধরে চলে যাবে—কেমন যেন ঠেকছে।

মণীন্দ্রনাথ এখানে বসলেন না। কয়েকবার চোখ তুলে হাজি সাহেবকে দেখলেন তারপর সেই এক উচ্চারণ—গ্যাৎচোরেৎশালা।

হাজি সাহেব হাসলেন এবং চাকরকে ডেকে বললেন, পাগল ঠাকুরের নৌকায় তুই ফানা সবরীকলা রাইখা আসবি। হাজি সাহেব মণীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে যেন বলতে চাইলেন—ঠাকুর, কলাগুলি নিয়া যাও, পাকলে খাইয়। গাছের কলা—তোমারে না দিয়া খাইলে মনটা খুঁতখুঁত করব। তারপর হাজি সাহেব আল্লার কাছে যেন নালিশের ভঙ্গীতে বলতে থাকলেন, বুড়া কর্তার কপালে এই আছিল খোদা!

বর্ষাকাল। ঘন ঘন বৃষ্টি হচ্ছিল বলে পথ ভয়ানক কর্দমাক্ত। কোথাও হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে—সুতরাং মণীন্দ্রনাথের কষ্ট হচ্ছিল হাঁটতে। পথের দু'পাশে আবর্জনা, মলমূত্রের দুর্গন্ধ। মণীন্দ্রনাথ এ সবের কিছুই টের করতে পারছেন না। গ্রামের মুসলমান বিবিরা পাগল ঠাকুরকে দেখে পলকে ঘরে নিজেদের আড়াল করে দিচ্ছে। ওরা বড় নিঃস্ব। সুতরাং শরীরে পর্যাপ্ত আবরণ নেই। পুরুষেরা এখন প্রায় সকলেই মাঠে অথবা অন্যত্র পাট কাটতে গেছে। ওরা বিকেলে ফিরবে। মণীন্দ্রনাথ গ্রামটাকে চক্কর মেরে ফের ঘাটে এসে বসলেন নৌকায়। তারপর উদ্যোগী পুরুষের মতো সংগৃহীত বস্তুসকলকে এক পাশে সাজিয়ে রেখে নৌকা বাইতে থাকলেন বর্ষার জলে। ঘাটে উলঙ্গ শিশুরা, বালক-বালিকারা পাগল ঠাকুরকে দুঃখের সঙ্গে যেন বিদায় জানাল। আর এ-সময়ই তিনি মনে করতে পারলেন বড়বৌ অপেক্ষা করতে থাকবে এবং বড়বৌর জন্য মনটা কেমন করে উঠছে। বড়বৌর সেই গভীর চোখ মণীন্দ্রনাথকে বাড়িমুখো করে তুলল। অথচ বিলের ভিতর পড়েই মণীন্দ্রনাথের বাড়ি ফেরার স্পৃহা উবে গেল। তিনি বিলের ভিতর চুপচাপ বসে থাকলেন। কতক্ষণ এ-ভাবে বসে থাকলেন, কতক্ষণ তিনি সকালের সূর্য দেখলেন, বিশ্বাসপাড়া, নয়াপাড়ার উপর একদল কাকের উপদ্রব এবং ধানখেতে কোড়া পাখির ঢুব ঢুব শব্দ কতক্ষণ তাঁকে অন্যমনস্ক করে রেখেছিল তিনি জানেন না। তিনি জলে নেমে গেলেন এবং স্বচ্ছ জলে সাঁতরাতে থাকলেন, শরীরের সর্বত্র গরম—এতবার ডুব দিয়েও তিনি তাঁর শরীরের ভিতরে যে কষ্ট, কষ্টটাকে দূর করতে পারছেন না। এই নির্জন বিলে এসে চুপচাপ বসে থেকে তিনি কতবার ভেবেছেন অপরিচিত সব শব্দ অথবা অশ্লীল উচ্চারণ থেকে বিরত হবেন। কিন্তু পারছেন না। সব কেমন ক্রমশ ভুল হয়ে যাচ্ছে। সব কেমন স্মৃতির অতলে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। জীবনধারণের জন্য কি করা কর্তব্য—অনেক ভেবেও কোন পথ ঠিক করতে পারছেন না। তখন ভয়ঙ্কর বিরক্তভাব ওঁকে আরও প্রকট করে তোলে। দু'হাত ওপরে তুলে চিৎকার করতে থাকেন—আমি রাজা হব।

বিকেলের দিকে ভূপেন্দ্রনাথ এল কর্মস্থল থেকে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ক'দিন থেকেই বাপের জন্য মনটা কেমন উদবিগ্ন লাগছে। বুড়ো মানুষটার জন্য ভূপেন্দ্রনাথের বড় টান। এখনও যেন তিনি সকলকে আগলে আছেন। প্রথম

বয়সে ভূপেন্দ্রনাথের কিছু আদর্শ ছিল। এখন আর তা নেই। স্বাধীনতা আসবে, স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন চোখে ভাসত। কিন্তু বড়দা পাগল হয়ে গেল—এত বড় সংসার শুধু জমি এবং যজমানিতে চলে না, ভূপেন্দ্রনাথ স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেল। বুড়ো মানুষটার জন্য, এত বড় সংসারের জন্য সে পায়ে হেঁটে নতুন ধানের ছড়া আনতে চলে গেল। সংসারে তাঁর জীবন প্রায় এক উৎসর্গীকৃত প্রাণ যেন। বিবাহ করা হয়ে উঠল না। চন্দ্রনাথকে বিয়ে দিল; এখন শুধু কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই দেশে চলে আসা এবং বুড়ো মানুষটার পাশে সংসারের গল্প, জোতজমির গল্প, কোন জমিতে কোন ফসল দিলে ভাল হবে—এমন সব পরামর্শ। মনেই হয় না মানুষটার জীবনে অন্য কিছুর প্রয়োজন আছে।

ভূপেন্দ্রনাথ নৌকা থেকে নামতেই বাড়ির সকলে যেন টের পেয়ে গেল—মুড়াপাড়া থেকে নৌকা এসেছে, চাল, চিনি, কলা, কদমা এবং এখন বর্ষাকাল বলে বড় বড় আখ এসেছে। ধনবৌ তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে ঘরে ঢুকে গেল। তিনি এখন এ-পথেই উঠে আসবেন।

সে প্রথমেই বাড়িতে উঠে ছড়িটা বারান্দায় রেখে যে ঘরে বুড়ো মানুষটা চুপচাপ বসে থাকেন সেখানে উঠে গেল। বাবাকে, মাকে গড় হয়ে প্রণাম করল। বুড়ো মানুষটা কুশল প্রশ্ন করলেন। মনিবের কুশল নিলেন। শরীর কেমন, এ-সব জিজ্ঞাসাবাদের পর মনে হল উঠোনে কে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝি বড়বৌ। বড়বৌকে প্রণাম করতে হয়। উঠোনে নেমে বাড়িটার কি কি পরিবর্তন হয়েছে লক্ষ্য করতে গিয়ে মনে হল বাড়িটার সেই শুকনো ভাবটা নেই। বাড়ির চারিদিকে ঝোপঝাড়গুলি বেড়ে উঠেছে। উত্তরের ঘর পার হয়ে কামরাঙা গাছের পাশে ছোট একটা মাচান। মাচানে কিছু শসার লতানে গাছ, হলদে ফুল। কচি শসা দুটো-একটা ঝুলছে। পাশে ঝিঙের মাচান, করলার মাচান। চন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই ওগুলো লাগিয়ে গেছে। সেই দুই নাবালককে খুঁজতে থাকল। ওরা এখন বাড়িতে নেই—কোথায় গেল! গোটা বাড়িটা এই দুই নাবালক—লালটু পলটু চিৎকার চেঁচামেচি করে জাগিয়ে রাখে। ওদের জন্য সে হলদে রঙের পুরুষ্ট আখ এনেছে। মোটা এবং সরস। নরম এই আখ ওদের খুব প্রিয়। নিজে ভেঙে দিতে পারলে কেমন যেন মনটা ওর ভরে যায়। অরা গেল কৈ! এমন একটা প্রশ্ন মনে মনে।

সেই দুই বালক তখন ছুটছিল। মেজকাকা এসেছে! পলটুর মেজকাকা, লালটুর মেজ-জ্যাঠামশাই—ওরা গ্রামের ওপর দিয়ে ছুটছে। ওরা খবর পেয়ে গেছে মুড়াপাড়া থেকে নৌকা এসেছে। নৌকা আসা মানে ওদের জন্য আখ এসেছে, কমলার দিনে কমলা, তিলা কদমার দিনে তিলা-কদমা। অথবা আম-জাম-জামরুলের দিনে নানারকমের ফল। ওরা এসে দেখল, অলিমদ্দি মাথায় করে

সব চাল-ডাল-তেল অথবা করলা-ঝিঙে নামাচ্ছে। একটা বড় মাছ এনেছেন, সেটা গলুইর নিচে, লালটু পলটু দু'জনে মাছটাকে টেনে তুলে আনছে। প্রায় এখন যেন উৎসবের মতো বাড়ি। কেবল বড়বৌ বিষণ্ণ চোখে চারিদিকে কাকে যেন সারাদিন থেকে খুঁজছে। কে যেন তার চলে গেছে, আসার কথা, আসছে না। বড়বৌর বড় বড় চোখ দেখে ভূপেন্দ্রনাথ ধরতে পারল—বড়দা আবার নিরুদ্দেশে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে যেন ভিতরে কি এক কষ্ট ভেসে উঠল। বড়বৌর মুখের দিকে আর তাকাতে পারল না।

বিকেলের দিকে বুড়ো মানুষটা ভূপেন্দ্রনাথের কাছ থেকে নানারকম খবর নেবার জন্য বারান্দায় বসে থাকলেন। ভূপেন্দ্রনাথ পায়ের কাছে বসে সব বলছিল—এটা স্বভাব তাঁর। মুড়াপাড়া থেকে এলেই বাবাকে পৃথিবীর সব খবর দিতে হয়। বাবুরা অর্ধসাপ্তাহিক আনন্দবাজার কাগজ পড়েন। বাবুদের পড়া হয়ে গেলে ভূপেন্দ্রনাথ প্রায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব মুখস্থ করে ফেলে। কেউ এলে তখন পত্রিকার খবর, যেন তার নখদর্পণে এই জগৎসংসার। বাড়িতে এলে প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মতো দেশের অবস্থার কথা সে বর্ণনা করে। কাগজ থেকে কিছু খবরের কথা উল্লেখ করে বলল, এবারে লীগপন্থীরা যে-ভাবে উইঠাপইড়া লাগছে তাতে আবার রায়ট লাগল বইলা।

বৃদ্ধ অত্যন্ত আস্তে আস্তে বললেন, হাফিজদ্দির পোলা সামুরে ত তুই চিনস। সে নাকি টোডারবাগে লীগের ডেরা করছে। গাছে গাছে ইস্তাহার ঝুলাইতাছে। দেশটা দিন দিন কি হইয়া যাইতাছে বুঝি না!

ভূপেন্দ্রনাথ বলল, বাবা, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাখলাম, গারো পাহাড় থেকে শহরে একজন সন্ন্যাসী আইছে। ভূত-ভবিষ্যৎ সব কইতে পারে। ভাবছিলাম বড়দারে নিয়া যামু।

—যাও, যা ভাল বোঝ, কর।

—সঙ্গে ঈশম চলুক।

বড়বৌ ঘরের ভিতর বসে চাল, প্রায় দু'বস্তা চাল, ঝেড়ে তুলে রাখছে। সবজি যা এসেছে সাজিয়ে রাখছে। পাগল মানুষটাকে নিয়ে যাবে ওরা। সামান্য আশার আলো মনের ভিতর জলে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই কেমন তা নিভে গেল। মানুষটাকে নিরাময় করার জন্য কত চেষ্টা—দেখতে দেখতে প্রায় দশ বছর কেটে গেল। মানুষটা কিছুতেই ভাল হচ্ছে না।

—আজকাল ত মণি দুই তিনদিন বাড়ি আসে না। কই থাকে, খায় ঈশ্বরই জানে।

ভূপেন্দ্রনাথ যেন বলতে চেয়েছিল—এ-ভাবে না খেয়ে ঘুরছে, কোথায় থাকছে, কোথায় রাত কাটাচ্ছে কেউ কিছু বলতে পারছে না—বরং বেঁধে রাখা ভাল। কিন্তু বলতে পারল না, কারণ এই ঘরে এখন মা আছেন, বড়বৌ আছে

—ওরা সকলে এমন কথা বিশ্বাসই করতে পারবে না তা'হলে যেন বাবা যে দু'দিন আরও বাঁচতেন তাও বাঁচবেন না। সুতরাং সে অন্য কথা বলল, সোনারে আনেন দেখি, ছাখতে কেমন হইল ছাখি।

বড়বৌ সোনাকে কোলে দিলে কেমন তাজ্জব হয়ে গেল সে। একেবারে বড়দার মুখ পেয়েছে। কাঁধে করে বারবাড়িতে চলে এল। সোনা যেমন অ-আ ত ত করে কথা বলে তেমনি কথা বলছিল। অপরিচিত মানুষ দেখে সে এতটুকু কাঁদে নি। বরং মাঝে মাঝে কুটুস কুটুস দাঁতে কামড়াচ্ছিল। সোনার দুটো ছোট ছোট ইঁদুরের মতো দাঁত উঠেছে। —পোলা, তোমার অসুখ হইব ছাখতাছি। বলে দাঁতে দুটো টোকা দিল। যেন এই শিশুকে দাঁতে আঘাত করে ওর কঠিন অসুখ থেকে রক্ষা করছে ভূপেন্দ্রনাথ। সোনা ভয়ঙ্করভাবে কেঁদে উঠতেই পাশের বাড়ির দীনবন্ধু পিছন থেকে ডাকল, মাইজা ভাই, ঢাকায় নাকি আবার রায়ট লাগব শুনছি।

—তা লাগতে পারে।

—কেডা জিতব মনে হয়?

—কি কইরা কই? হার জিতের কি আছে ক?

—কি দুর্ধর্ষ ছাখেন, দুধের পোলা, হালার হালা কথা নাই বার্তা নাই চাকু চালায়।

—তুই ছাখছস নাকি?

—তা ছাখমু না ক্যান। মালতীর বিয়ার সময় একবার ঢাকা শহরে গেছিলাম। ঘুইরা ফিরা ছাখলাম শহরটা। এলাহি কাণ্ড—না!—রমনার মাঠে গ্যালাম, সদর ঘাটের কামান ছাখলাম।

সন্ধ্যার পর ধনবৌ পশ্চিমের ঘরে হ্যারিকেন জেলে রেখে গেল। হাত-পা ধোওয়ার জল রেখে গেল। একটা জলচৌকি, ঘটি এবং গামছা রেখে দিল। সে হাত-পা ধুয়ে ঘরে ঢুকে যাবে। আর বের হবে না। কারণ গ্রামে খবরটা রটে গেছে। মুড়াপাড়া থেকে মাইজা কর্তা এসেছে। বিশ্বের খবর তার জানা আছে। গ্রামের পালবাড়ি থেকে মাঝিবাড়ি অথবা চন্দদের বাড়ি থেকে প্রৌঢ়গণ হাতে লাঠি এবং লণ্ঠন নিয়ে খড়ম পায়ে ঠাকুরবাড়ি এসে ডাকল, ভূপেন আছ? মাইজাকর্তা আছেন?

ভূপেন্দ্রনাথ তখন হয়তো তক্তপোশে বসে ঈশ্বরের নাম নিচ্ছিল অথবা ঈশমের কুশলবার্তা। তখন সে এক দুই করে খড়মের শব্দ শুনতে পেল। গ্রামের বয়স্ক মানুষেরা এখন এসে ভিড় করবে। আড্ডা দেবে, এবং পত্রিকার খবর নেবে। দেশের খবর, বিদেশের খবর, গান্ধীজী কি ভাবছেন, এমন সব খবরের জন্য ওরা উন্মুখ থাকে। তিনি তখন এই আড্ডার প্রাণ।

সে তখন ঈশ্বরের চেয়েও বড়, তার কথা এদের কাছে ঈশ্বরের সামিল—এই বিশ্বাস লোকগুলির মনে। সে তখন বলবে, দেশের বড় দুরবস্থা হারান।

—ক্যান কাকা?

—কাইল সারা বাজার ঘুইরা বাবুরহাটের একটা শাড়ি পাইলাম না।

—ক্যান এমন হইল?

—কি জানি! মহালে তর আদাই নাই। এদিকে তোমার সারা ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন চালাইতেছেন গান্ধী। ইংরাজরাও ছাইড়া কথা কইতাছে না। লাঠি চালাইতাছে। গুলি করতাছে। এদিকে তোমার বিলাতের প্রধানমন্ত্রী লীগের পক্ষ নিছে। সুতরাং বুঝতেই পারছ লীগের পোয়াবার।

মাঝি বাড়ির শ্রীশচন্দ্র বলল, ঘোর কলিকাল আইসা গেল মাইজা ভাই।

ভূপেন্দ্রনাথ বলল, চারিদিকে তর একটা ষড়যন্ত্র। আনন্দময়ী কালীবাড়ির পাশে বনজঙ্গলের ভিতর পুরান একটা বাড়ি আছে, একটা দিঘি আছে। কেউ খবর রাখে না। এখন তর চরের মৌলভি-সাব কয় ওটা নাকি মসজিদ। মুসলমানরা কয় নামাজ পড়ব।

—তা হইলে গণ্ডগোল একটা লাগব কন!

—বাবুরা কি ছাইড়া দিব? জায়গাটা অমর্তবাবুর। পাশে আনন্দময়ী কালীবাড়ি। আগুন জ্বলতে কতক্ষণ।

—অঃ, আমার হোমন্দির পো' রে, দেশে আর বিচার নাই! আমাগ জাত-ধর্ম নাই। পূজা-পার্বণ নাই। মাকালী নিব্বংশ কইরা দিব। তখনই সে দেখল উঠোনে ঈশম বসে তামাক টানছে। মাইজা কর্তা এলে একটু দেরি করে সে তরমুজ খেতে নেমে যায়। ঈশমকে দেখে সে কেমন জিভে কামড় দিয়ে ফেলল। উঠোনে মানুষটা বসে আছে সে খেয়ালই করে নি। এবার কেমন গলা নামিয়ে দুঃখের সঙ্গে বলল, আমার দোকান থাইকা এখন মাইজা ভাই মুসলমান খরিদ্দার সওদা করতে চায় না। কতদিনের সব খরিদ্দার। কত বিশ্বাসের সব—অরা সরিবদ্দির দোকানে যায়।

এ-সময় সকলেই চুপ হয়ে গেল। কেউ কোন কথা বলতে পারল না। শ্রীশচন্দ্র তার দুঃখের কথা বলে চুপ হয়ে গেছে। ভূপেন্দ্রনাথ হুঁকা টানছে। জোর হাওয়ার জন্য আলোটা মৃদু-মৃদু কাঁপছিল। দূরে সোনালী বালির নদী থেকে গয়না নৌকার হাঁক আসছে। শচীন্দ্রনাথ ঠাকুরঘরে শীতল ভোগ দিচ্ছে। ঘণ্টার শব্দ, গয়না নৌকার হাঁক এবং ঈশমের দুঃখজনক চোখ সকলকেই কেমন পীড়িত করছে। বুড়ো মানুষটা ঘরে শুয়ে শুয়ে কাঁদছেন। কোথায় এখন তাঁর পাগল ছেলে হেঁটে বেড়াচ্ছে অথবা গাছের নিচে শুয়ে আছে কে জানে। বড়বৌ পুবের ঘরের জানালা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে কামরাঙা গাছ, গাছ পার হলে বেতের ঝোপ এবং ডুমুরের গাছটা পার হলে মাঠ। বড় চাঁদ উঠে আসছে

গাছটার মাথায়। এখন সাদা জ্যোৎস্না সর্বত্র। গাছগুলো স্পষ্ট। ফাঁকা মাঠে ধানগাছে সামান্য কুয়াশার পাতলা আবরণ। সে পথের দিকে তাকিয়ে আছে—যদি কোন মানুষের ছায়া এই পথে উঠে আসে, যদি মানুষটা লগি বাইতে থাকে সামনের মাঠে অথবা নৌকার শব্দ পেলেই সে চমকে ওঠে—এই বুঝি এল, সাধু-সন্ন্যাসীর মতো এক উদাসীন মানুষ বুঝি বাড়ি ফিরে এল। পাগল মানুষটার প্রতীক্ষাতে বড়বৌ জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। ওর মানুষটার জন্য কেন জানি কেবল কান্না পাচ্ছিল।

কিছুদূর এসেই মণীন্দ্রনাথের বাড়ি ফেরার স্পৃহা উবে গেল। তিনি বার বার ধানখেতের চারপাশে ঘুরতে থাকলেন এবং মাঝে মাঝে নৌকাটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে লগিটাকে মাথার উপর লাঠিখেলার মতো ঘোরাতে থাকলেন। এই যে নক্ষত্রপুঞ্জ আছে, আকাশ রয়েছে এবং বিলের জলে কোড়া পাখি ডাকছে সব কিছুর ভিতর কোন এক অদৃশ্য সংগ্রাম তাঁর। পাটাতনে লাফ দিচ্ছিলেন। হাতে ধরে কি যেন আয়ত্তে এনেছেন, তারপর গলা টিপে হত্যা। যত তিনি লগিটা ঘোরাচ্ছিলেন তত বন-বন শব্দ হচ্ছে। দূরে যারা পাট কাটছিল তারা দেখল বিলের জলে নৌকা ভাসছে আর পাগলঠাকুর মাথার ওপর লগি ঘোরাচ্ছে।—কি মানুষটা কি হইয়া গ্যাল এমন সব চিন্তা।

তিনি অনেক দূরে চলে এসেছিলেন নৌকা বাইতে বাইতে। সুতরাং ঘরে ফিরতে বেশ দেরী হবে। বড়বৌর বড় এবং গভীর চোখ দুটো তাকে এখন কষ্ট দিচ্ছে। এই ভেবে যখন ধানখেত ভেঙে ঘরে ফেরার স্পৃহাতে লগি তুলছেন তখনই দেখতে পেলেন, সোনালী বালির নদীর বুকে একটা বড় পানসী নাও। তার কেন জানি মনে হল—এই নৌকায় পলিন আছে। পলিনকে নিয়ে এই নাও কোন এক অদৃশ্যলোকে হারিয়ে যাচ্ছে। সে পাটাতনের নিচ থেকে এবার বৈঠা বের করে জলে বড় বড় ঢেউ তুলতেই নৌকাটি গিয়ে হুমড়ি খেয়ে নদীতে পড়ল। স্রোতের মুখে সেও ভেসে চলেছে। এখন কোন বেগ পেতে হচ্ছে না মণীন্দ্রনাথকে—তিনি পানসী নৌকাটার পেছনে হাল ধরে শুধু বসে আছেন।

পানসী নৌকার মানুষেরা দেখল পিছনে পিছনে একটা নৌকা আসছে। হালে বসে আছে উদোম গায়ে গৌরবর্ণ দীর্ঘ এক সুপুরুষ। রোদে পুড়ে রঙটা একটু তামাটে হয়ে গেছে। হালে মানুষটা প্রায় যেন চোখ বুজে আছে। এই বর্ষা এবং তার স্রোত যেদিকে নিয়ে যায় যাবে—মানুষগুলো দেখে হাসাহাসি করছিল। ভিতরে জমিদার পুত্র এবং বাঈজী বিলাসী একঘরে এক বিছানায়। গান শেষে কিছু কিছু কৌতুককর কথাবার্তা। এবং সরোদের টুংটাং শব্দ। বিলাসী তারে হাত রেখে পা দুটো ছড়িয়ে—হায় সজনিয়া, এমন এক ভঙ্গী টেনে

পড়ে আছে। চোখমুখ জড়িয়ে আসছিল, নেশায় ওরা পরস্পর তাকাতে পারছে না। মণীন্দ্রনাথ এই দীর্ঘপথ ওদের কেবল অনুসরণ করলেন। তিনি সরোদের গম্ভীর আওয়াজের ভিতর কেবল যেন এক মেয়ের মুখ দেখতে পান—তিনি পলিনের অবয়ব এবং তার মুখ, তার প্রেম সম্পর্কিত সকল ঘটনা এই ধানখেতের ফাঁকে ফাঁকে সোনালী বালির নদীর চরে, জলে, সর্বত্র দেখতে পাচ্ছেন। অথচ এক সময় আবার সবই কেমন গুলিয়ে গেল। কেন এত দীর্ঘ পথ পানসী নৌকার পিছনে ছুটে ছুটে আসছেন, কোন পথ ধরে ঘরে ফিরতে হবে সব যেন ভুলে গেলেন। তিনি এবার নদী থেকে চরে উঠে আসার জন্য নৌকার মুখ ফেরালেন, কাশবনের ভিতর ঢুকে আর পথ পেলেন না। সূর্য পশ্চিমে হেলে গেছে—এবার সূর্যাস্ত হবে—কিছু গগনভেরী পাখির আর্তনাদ আকাশের প্রান্তে শোনা যাচ্ছিল এবং দূরে হাটফেরত মানুষেরা ঘরে ফিরছে। তিনি নৌকার পাটাতনে এবার শুয়ে পড়লেন। শরীরের কোথাও কি যেন কষ্ট। তিনি তৃষ্ণার্ত এবং ক্ষুধার্ত। অথচ কি করলে এই কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাবেন বুঝতে পারছেন না। সুতরাং চুপচাপ শুয়ে থেকে গগনভেরী পাখির আর্তনাদ কোথায় কোন আকাশে হচ্ছে খুঁজতে থাকলেন। আকাশ একেবারে নিঃসঙ্গ। কোথাও একটা পাখি একটা ফড়িঙ পর্যন্ত উড়ছে না। তিনি ক্লান্তগলায় যেন বলতে চাইলেন পলিন, আমি তোমার কাছে যাব।

দূরে কোন গ্রাম—সেখান থেকে কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসছে। কোন মুসলমান গ্রাম থেকে আজানের শব্দ। কিছু কিছু নক্ষত্র আকাশে ফুলের মতো ফুটে উঠছে। এখন আকাশটাকে তত আর নিঃসঙ্গ মনে হয় না। কতদূর এইসব নক্ষত্রের জগৎ—ইচ্ছা করলে ওদের ধরা যায় না! এইসব নক্ষত্রের জগতে অথবা নীহারিকাপুঞ্জে নৌকায় পাল তুলে ঘুমিয়ে থাকলে কেমন হয়! তিনি কত বিচিত্র চিন্তা করতে করতে সবকিছুর খেই হারিয়ে সহসা কেমন উত্তেজনা বোধ করেন।

কিছু জোনাকি জ্বলছে ধানগাছের পাতার আড়ালে। জ্যোৎস্নায় এই ধরণী শান্ত এবং স্থির। অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছে। সমস্ত দিনের ক্লান্তি এই মিষ্টি হাওয়ায় কেমন উবে গেল। ফের পলিনের মুখ মনে পড়ছে। মণীন্দ্রনাথ কাত হয়ে শুয়েছিলেন এবং বিড়বিড় করে বকছিলেন। দেখলে মনে হবে না—তিনি এখন সুদূর কলকাতায় কোন ইউরোপীয় পরিবারের সঙ্গে আলাপ করছেন। মনে হবে বিড়বিড় করে শুধু কি বকে যাচ্ছেন। জোরে জোরে উচ্চারণ করলে ইংরেজীর স্পষ্ট উচ্চারণে সব ধরা পড়ত, কিন্তু হাতের ওপর মাথা রেখে অযথা এইসব কথা তাকে শুধু পাগল বলেই প্রতিপন্ন করছে। আমি পলিনকে ভালবাসি—এই উক্তি পরিবারের সকলের কাছে চিৎকার করে বলতে পারলে যেন খুশি হতেন। অথচ অঘটন ঘটে গেল। মণীন্দ্রনাথ যেন পিতৃসত্য পালনে

বনবাসে গমন করলেন। পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য করতে গিয়ে দ্বিধা এবং দ্বন্দ্বে অবশেষে বলেই ফেললেন, গ্যাৎচোরেৎশালা।

মণীন্দ্রনাথ যখন দেখলেন মাঠে অথবা নদীর জলে কোথাও কোন নৌকায় শব্দ উঠছে না তখন তিনি দাঁড়িয়ে বলতে চাইলেন, পলিন, আমি পাগল হই নি। আমাকে সবাই অযথা পাগল বলছে। আমি তোমার কাছে গেলেই ভাল হয়ে যাব। এইসব কথা এখন মাঠে মাঠে জলে জলে বনে বনে ঘাসে ঘাসে সর্বত্র প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরছে—আমি পাগল হই নি। সবাই অযথা আমাকে পাগল বলছে।

রাত বাড়ছে। লালটু পলটু পড়ছে দক্ষিণের ঘরে। ঈশম আজ বুঝি তরমুজ খেতে যাবে না, গেলেও রাত করে যাবে। সে দক্ষিণের ঘরে মাদুর পেতে শুয়ে আছে। ধনবৌ হেঁশেলে। শশীবালা দরজায় বসে, কোলে সোনা ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি তালপাতার পাখা নাড়ছেন। গরম পড়েছে বেশ। পশ্চিমের ঘরে যারা এতক্ষণ বসে রাজাউজির মারছিল, রাত গভীর হলে এক এক করে সকলে চলে গেল। দীনবন্ধু কেবল যায় নি। সে মেজকর্তার পায়ের কাছে বসে হুঁকো টানছিল এবং জমিদারী সেরেস্তার গল্প শুনে কর্তার মন জয় করার তালে ছিল। দীনবন্ধু এতদিন যে জমিটা ভোগ করছে ভাগে, সে কর্তাকে খুশী করে জমিটার ভোগদখল চাইছে।

শশীবালা রান্না হলে সকলকে খেতে ডাকল। বড়বৌ কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি পেতে দিল। লালটু পলটুর জন্য ছোট পিঁড়ি। জল দিল। বড় দোচালা ঘর। মুলি বাঁশের বেড়া, সিমেন্ট বাঁধানো মেঝে। শশীবালা এখন দরজার কাঠে হেলান দিয়ে ছেলেদের খাওয়া দেখবে। বড়বৌ পরিবেশন করবে, ধনবৌ হেঁশেলে ঘোমটা টেনে বসে থাকবে—মাঝে মাঝে কানের কাছে কথা ধনবৌর, ফিসফিস করে কথা—এটা ওটা বড়বৌকে এগিয়ে দেবে।

খেতে বসেই ভূপেন্দ্রনাথের মনটা ভারি হয়ে উঠল। বড়দার আসন পড়ে নি। একটা দিক খালি। সেদিকে তাকিয়ে ভূপেন্দ্রনাথ বলল, বড়দা কখন বাইর হইছে।

শচীন্দ্রনাথ পঞ্চদেবতার উদ্দেশে নিবেদন করছিল তখন, জলটা গণ্ডূষ করবে, ঠিক তখন মুখ তুলে তাকাল। তার এখন খেয়াল থাকে না—বড়দার আসন খালি, সে জলটা গণ্ডূষ করে বলল, পরশু ভোরে বৌদি উইঠা দেখে দরজা খোলা। ঘাটে গিয়া দেখি কোষাটা নাই। হাসিমের বাপ কইছে তাইন নাকি দুফরে বিলের দিকে নৌকা বাইতে বাইতে নাইমা গ্যাছে।

—কাইল একবার চল দেখি—অলিমদ্দিরে লইয়া যাই।

—চলেন। তবে মনে হয় পাইবেন না। কই থাকে কই যায় কেউ জানে না।

বড়বৌ কোন কথা বলছিল না। বসে বসে সব শুনছিল। এবং চোখে জল এসে গেলে ঘোমটা সামান্য টেনে দিল। কোন নালিশ নেই এমন ভাব চোখে-মুখে। কোনদিন সুপুরুষ লোকটি আদর করে কথা বলে নি। কোন প্রেম সম্পর্কিত সুখী ঘটনা ইদানীং আর ঘটছেই না। শুধু মাঝে মাঝে, তাও কচিৎ কখনো বুকের কাছে টেনে এনে দস্যুর মতো কি এক আদিম প্রেরণা যেন, চোখমুখ ঘোলা ঘোলা—মানুষ বলে চেনা যায় না। বুকের কাছে নিয়ে একেবারে বন্যজীবের মতো করতে থাকে। বড়বৌ শরীর ছেড়ে দেয়—যা খুশি করুক—পাগল মানুষটাকে সে শিশুর মতো, অথবা সন্তানের মতো, অথবা তুমি যে এক আদিম মানুষ সে কথা তুমি কি করে ভুলে যাও—আমাকে ত্যাখো, খেলা কর। বন্যজীবের মত বুকের কাছে টেনে নেবার ঘটনাও সে আঙুলে গুনে বলতে পারে—কত দিন, কতবার—জ্যোৎস্না রাত ছিল, না অন্ধকার রাত ছিল, সব বলে দিতে পারে।

দু'দিনের ওপর হয়ে গেছে। মানুষটাও ফিরছে না। বড়বৌ পাগলঠাকুরকে আপনার ধন বলে জানে। মণীন্দ্রনাথ নামক ব্যক্তিটি বড় অপরিচিত। বিয়ের পিঁড়িতে সে যেন এই পাগল মানুষকেই দেখেছিল। অশান্ত পুরুষ, জীবন থেকে যেন তাঁর সোনার হরিণ হারিয়ে গেছে—মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন, অভিশাপ দেবার বাসনা যেন এবং মনে হচ্ছিল তিনি এই লাবণ্যময়ীকে এবার গিলে খাবেন। এত লোকজন, এত আলো আর সমারোহ, তবু বড়বৌর সেদিন ভয় করছিল। রাতে দিদিকে ডেকে বলেছিল, দিদি, আমার বড় ভয় করছে। মানুষটা যেন আমাকে গিলে ফেলবে। আমাকে তোমরা কি দেখে বিয়ে দিলে! এমন গ্রাম জায়গায় আমি থাকব কি করে! পরে বড়বৌ বুঝেছিল,—মানুষটি নিরীহ এবং মস্তিষ্ক বিকৃতি আছে। ততদিনে সে এই সুপুরুষ ব্যক্তিটিকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবেসে ফেলেছে। সুতরাং দুঃখকে জীবনের নিত্য অনুগামী ভেবে আজকাল আর নিজের জন্য আদৌ ভাবে না—মানুষটার জন্য রাতে কেবল ঘুম আসে না, কেবল জেগে বসে থাকে মানুষটা কখন ফিরবে।

রাত ঘন হচ্ছিল। ঘাটে বড়বৌ বাসন মাজছে। সোনা কাঁদছিল বলে ধনবৌকে পাঠিয়ে দিয়েছে। সে এখন একা এই ঘাটে। শশীবালা খেয়েদেয়ে এইমাত্র বড় ঘরে ঢুকে গেছেন। নির্জন রাতে এমন কি বুড়ো মানুষটির কাশির শব্দও ভেসে আসছে না। বোধ হয় এখন সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। নৌকাটা অলিমদ্দি ঘাটে রাখে নি। সামনের জলে নৌকা বেঁধে লগিতে, ঘুমিয়ে পড়েছে। বড়বৌর বাসন মাজা হয়ে গেছে, তবু উঠতে ইচ্ছা করছে না। ঘাটের একপাশে লণ্ঠনের আলোতে বড়বৌর মুখ বিষণ্ণ। জ্যোৎস্না রাত বলে দূরের মাঠ দিয়ে নৌকা গেলে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আজ

আর কুয়াশা ভাবটা নেই। বড়বৌ এই ঘাটে সেই নিরুদ্দিষ্ট মানুষের জন্য বসে আছে। তিনি হয়তো আসছেন, এক্ষুণি এসে পড়বেন। বড়বৌর কথা মনে ভেসে উঠলে মানুষটা পাগলের মত ঘরের দিকে ছুটতে থাকেন।

রাত বাড়ছে। একা একা ঘাটে বসে থাকতে আর সাহস পেল না বড়বৌ। শুধু ঝোপ-জঙ্গলে কিছু অপরিচিত পাখ-পাখালি, কীট-পতঙ্গ রাতের প্রহর ঘোষণায় মত্ত। আলকুশি লতার ঝোপে ঢুব-ঢুব আওয়াজ। গন্ধপাদাল ঝোপে ঝিঁঝিপোকা ডাকছে। রাত গভীর হলে, নিশীথের প্রাণীরা কত হাজার হবে, লক্ষ হবে এবং লক্ষ কোটি প্রাণের সাড়া এই ভুবনময়। গভীর রাতে জেগে থেকে টের পায় বড়বৌ যেন মানুষটা এখন নিশীথের জীব হয়ে জলে-জঙ্গলে ঘোরাফেরা করছে।

রান্নাঘরে বাসনকোসন রেখে পুবের ঘরে উঠে যাবার মুখেই মনে হল ঘাটে লগির শব্দ। বড়বৌর বুকটা কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি ছুটে গেল ঘাটে। মানুষটা নুয়ে নৌকা থেকে নামছে। নৌকাটাকে টেনে প্রায় জমিতে তুলে ফেলল। কোন দিকে দৃক্‌পাত নেই। লম্বা উঁচু মানুষটা—কি যে লম্বা আর কি যে রহস্যময় চোখ—এই সুদৃশ্য জ্যোৎস্নায় যেন এক দেবদূত আকাশ থেকে নেমে এসেছেন। বড়বৌ দেখল মানুষটার শরীরে কোন বসন নেই। একেবারে প্রায় উলঙ্গ এবং শিশুর মতো বড়বৌকে জেগে থাকতে দেখে হাসছে। নৌকায় কচু-কুমড়া-কলা। যার যা কিছু প্রথম গাছে, মানুষটাকে দিয়ে দিয়েছে। বড়বৌ প্রথম কোনো কথা বলতে পারল না। যেন এক সন্ন্যাসী দীর্ঘ দিন তীর্থ-ভ্রমণের পর নিজের ডেরাতে হাজির হয়েছে। অন্যদিন হলে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে কাপড় পেড়ে আনত। আজ কিছুই ইচ্ছা হল না। এই সাদা জ্যোৎস্নায় এমন এক শিশুর মতো যুবকটিকে নিয়ে কেবল খেলা করে বেড়াতে ইচ্ছা হচ্ছে।

ানুষের জন্য
র কথা মনে
না বড়বৌ।
াতের প্রহর
গন্ধপাদাল
কত হাজার
ভীর রাতে
জীব হয়ে
ঃ মনে হল
ছুটে গেল
ায় জমিতে
—কি যে
 দেবদূত
কোন বসন
গ থাকতে
থম গাছে,
না। যেন
। হয়েছে।
কছুই ইচ্ছা
য়ে কেবল

তখন বিকেলবেলা। বর্ষার জল মাঠে থইথই করছে। জোটন গোপাট ধরে জল ভাঙতে থাকল। সে সাঁতার কেটে পাশের গ্রামে উঠে যাবে। সে জলজ ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে ঝোপ-জঙ্গল অতিক্রম করে কেবল সাঁতার কাটছে। সে সাঁতার কেটে ঠাকুরবাড়ির সুপুরি বাগানে উঠে দেখল একটাও সুপারি পড়ে নেই। ঘাটে একটা তেমাল্লা নৌকা বাঁধা। ছই-এর নিচে দুই মাঝি নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। জলে সে সারাক্ষণ সাঁতার কেটেছে। শাড়ি ভিজে গেছে। জবাফুল গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে সন্তর্পণে শাড়িটাকে খুলে চিপে ফেলল। তারপর ফের প্যাঁচ দিয়ে পরতেই মনে হল—কোথায় যেন কারা চিঁড়া কুটছে। তালের বড়া ভাজছে। সে নাক টেনে গন্ধ নিল। চিঁড়া কোটার শব্দ ভেসে আসছিল। মামাদের এখন ভাদ্রমাস। ভিটা জমিতে আউশ ধান, আউশ ধানের চিঁড়া—সে ভাবল, চিঁড়া কুটে দিলে ওর নসিবটা খুলে যাবে।

সে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল। দেখল, মাইজা কর্তা পশ্চিমের ঘরে তক্তপোশে বসে একটা মোটা পুঁথি পড়ছেন। জোটন মাইজা কর্তাকে দেখেই দরজার সামনে দাঁড়াল। কে দাঁড়িয়ে আছে! চোখ তুলতেই দেখল আবেদালির দিদি জোটন। জোটনের শরীরটা একটু রুগ্ন দেখাচ্ছে। চুল জোটনের নেই বললেই হয় এবং শণের মতো। মুখে কোন কমনীয়তা নেই। ওর শরীরের গঠনটা কেমন যেন ভেঙে যাচ্ছে। গালে মেচেতা সুতরাং মুখটি কুৎসিত দেখাচ্ছিল। ভূপেন্দ্রনাথ বলল, কিরে জুটি, তুই!

—হ কর্তা, আমি। আবার ফিরা আইছি?

—আবার তরে তালাক দিল।

—হ। কিন্তু নির্বংশায় না দিল পোলা, না দিল এক ফালি ত্যানা।

—পোলা না দিছে ভাল করছে। পোলা আইনা খাওয়াইবি কি!

জোটন সেটা ভাল করে বোঝে বলে অন্য কথা আর বলল না। মাইজা কর্তা আবার বড় পুঁথিতে মন দিয়েছেন। চশমার ভিতর কর্তার সহৃদয় মুখ দেখে বলতে ইচ্ছে হল, মাইজাকর্তা, আমারে পুরান-ধুরান যা হয় একখানা ঠিক কইরা দ্যান। কিন্তু বলতে পারল না। যেন বললে শোনাত—সেই ফকিরসাব এসেছিল, কষ্টের যা-কিছু সঞ্চয় ছিল, মোটা ভাত একটু শুকনো মাছের বাটা দিয়ে মানুষটা সবক'টা ভাত খেয়ে সেই যে চলে গেল আর এল না। যেন জোটন এই দরজায় দাঁড়িয়ে মনে করতে পারে—ফকিরসাব হুঁকো খাচ্ছিলেন, সব পোটলা-পুটলি যত্ন করে বাঁধা। যেন তিনি উঠবেন, শুধু হুঁকো খাওয়াটা বাকি। জোটন ধৈর্য ধরে বসে থাকতে পারে নি। সে বলেছিল—ফকিরসাব,

আমারে লইয়া যাইবেন না। ফকিরসাব ঝোলাঝুলি কাঁধে নিতে নিতে বলেছিলেন—আইজ না। অন্য দিন হইব। কোরবান শেখের সিন্নিতে যামু। কবে ফিরমু ঠিক নাই। সেই যে বলে চলে গেল আর এলেন না মানুষটা। আর আসবেন কিনা ঠিক নেই। তাকে একটা মানুষ ঠিক করে দেবার জন্য সে যেন দোরে দোরে ঘুরছে।

আমারে একটা পুরান-ধুরান যা হয় ঠিক করিয়া দ্যান—বলতে সাহস পেল না। তিনবার তালাক এই শরীরকে যেন দুর্গন্ধময় করে রেখেছে। মাইজা কর্তা বলল, কিছু কবি!

—কি কমু গ কর্তা। আমার চলে কি কইরা!

—আবার তর পাগলামি আরম্ভ হইছে। এইটা ঠিক না। মাইজা কর্তা বুঝতে পারছিল, সেই মানুষ ঠিক করে দেবার কথাটা সে বলতে এসেছে। জোটন কর্তার মুখে এমন কথা শুনে আর দাঁড়াল না। আতাবেড়ার পাশ দিয়ে ভিতর বাড়িতে ঢুকে গেল।

ধনমামী বড়মামী দাঁড়িয়ে আছেন। হারান পালের বৌ চিঁড়া কুটে দিচ্ছে। মালতী সঙ্গে আছে। জোটন বলল, দ্যান, আমি চিঁড়া কুটি।

জোটন অতি অল্প সময়ে চিঁড়া কুটে খোলায় ছড়িয়ে দেখাল। সে যে ভাল চিঁড়া কুটতে পারে, চিঁড়াগুলো ওর বেশ বড় বড় হয়—খোলায় ছড়িয়ে যেন সকলকে দেখাতে চাইল। জোটন ওর চিঁড়াগুলি অন্য একটা বেতের ঢাকিতে রাখল। শশীবালা এই চিঁড়া দেখলে খুশী হবে। যাবার সময় এক খোলা চিঁড়া ওর আঁচলে ঢেলে দেবে।

ধনবৌ বলল, তর নাকি আবার বিয়া বসনের শখ হইছে।

—অঃ আল্লা, এডা এতদিনে জানলেন! কিন্তু পাইতেছি কই।

—তর ক্ষমতা আছে জুটি!

—কি যে কন আপনারা। সরমের কথা আর কইয়েন না। এডা গতরের কথা। আপনের-অ আছে, আমার-অ আছে। আপনে সুখ পান কথা কন না, কর্তা আসে যায়। আমার মানুষ নাই, মানুষ আসে না যায় না। সুখ পাই না, কথা কই। এইসব বলে জোটন চিঁড়া কুটতে থাকলে ফের, ওর মুখে একরকমের শব্দ; শব্দটা কোড়াপাখির ডাকের মতো। ভাদ্র মাস বলেই এত গরম এবং তালের পিঠা হচ্ছে বাড়ি বাড়ি—তার গন্ধ গ্রামময়। মাঠময়। হারান চন্দের বৌ ধান খোলাতে ভাজছে, শুকনো কাঠ গুঁজে দিচ্ছে শশীবালা। সকলেই কোন না কোন কাজে ব্যস্ত। জোটন একটু জল চাইল। বড় বৌ জল আনতে গেছে কুয়াতে। আর এ-সময় জাম গাছে একটা ইষ্টিকুটুম পাখি ডাকল। দু'ধারে বস্তা পাতার সময় সে চোখ তুলে দেখল—গাছে পাখিটা ডাকছে। সে বলল, ধনমামী, গাছে ইষ্টিকুটুম পাখি। মেমান আসব।

রান্নাঘরে পবন কর্তার বৌ, তার ছেলেপেলে, সবাই বেড়াতে এসেছে। শশীবালা এই বর্ষাকালটা সব নায়রীদের জন্য যেন প্রতীক্ষায় বসে থাকে। সারা বর্ষাকাল কুটুম আর কুটুম। ধনবৌ তখন নিঃশ্বাস ফেলতে পারে না। বড়বৌকে সারাদিন হেঁশেলে পড়ে থাকতে হয়। মুখ ফসকে কথাটা বলে ফেলেছিল আর কি—আর কুটুম না। কিন্তু ঘরে পবন কর্তার বৌ। সে বলতে পারল না, পাখিটারে উড়াইয়া দে জুটি। সারা বর্ষাকাল কুটুম আর কুটুম। দিন-রাইত নাই, আইতাছে যাইতাছে। অথচ বুড়ো ঠাকুরুন শশীবালার বড় শখ কুটুমের। কোন্ কুটুম কোন্ জিনিস খেতে পছন্দ করে—শশীবালার সব মুখস্থ।

এ-সময় মেঘনা-পদ্মাতে ইলিশের ঝাঁক উঠে আসবে। জোটন জানত, এ-সময় ঠাকুরুন কুটুমের জন্য ভাল-মন্দ খাবার অথবা নাইয়র নাইয়রীরা ঘুরে বেড়াবে ঘরময়, উঠোনময় শিশুদের কোলাহল, ঘাটে ঘাটে নৌকা বাঁধা—এইসব দৃশ্য, আর জোটন তখন দেখল হারান পাল নৌকা থেকে এক গণ্ডা ইলিশ নামাচ্ছে। বড় বড় ইলিশ—রুপোর মতো উজ্জ্বল রঙ অবেলার রোদে চিকচিক করছিল। জোটন ইলিশমাছগুলো দেখে চোখ নামাতে পারছে না।

ওর ইলিশমাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকা—খুব করুণ অথবা রহস্যময় মনে হয়—যেন কতদিন এইসব মাছের স্বাদ ভুলে গেছে জোটন। শশীবালা এসব লক্ষ্য করে বলল, রাইতে খাইয়া যাইস জুটি। জুটির চোখদুটো কেমন সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বললে, ঠাইনদি, মাছগুলির প্যাটে ডিম হইব মনে হয়।

—তবে ডিম ভাজা দিতে কমু।

সে আর কি বলবে ভেবে পেল না। একমনে আবার চিঁড়া কুটতে থাকল! সেই কোড়াপাখির ডাকটা ওর ভিতর থেকে এখনও উঠছে। ওর পরনের শতচ্ছিন্ন শাড়িটা এতক্ষণে শুকিয়ে উঠছে। বড়বৌ জোটনকে এক খোলা চিঁড়া দিল খেতে, সে খেল না। আঁচলে পোঁটলা বেঁধে নিল। পলটু এনে ক'টা কাঁচা সুপারি দিল। আঁচলে তা বেঁধে নিল। রাত হয়ে যাচ্ছিল অনেক। সে কলাপাতা ধুয়ে বসে থাকল—রান্না হলেই সে খেতে পাবে।

জোটন খেতে বসে বেশ করে খেল। চেটেপুটে খেল। বড় যত্নের সঙ্গে ভাত ক'টি খেল। বেগুনের সঙ্গে ইলিশমাছের স্বাদ এবং আউশ ধানের মোটা ভাত জোটনকে এই পরিবারের সহৃদয়তা সম্বন্ধে অভিভূত করছে। বুড়ো ঠাকুরুন, বড়বৌ, ধনবৌর উদারতা যেন এই পরিবারের পাগল ঠাকুরের মতো। এই ভোজনের সঙ্গে রাতের জ্যোৎস্না এবং এক পাগল মানুষের অস্তিত্ব, বুড়ো কর্তার সাত্ত্বিক ধারণা, ভূপেন্দ্রনাথের সততা, সব মিলে জোটনকে সুখ দিচ্ছে। আর কতকালের মেমান যেন এইসব পরিবার। সে বড়বৌকে উদ্দেশ করে বলল, মামী গ, অনেকদিন পরে দুইডা প্যাট ভইরা ভাত খাইলাম। এই খাওয়নের কথা ভুলতে পারি না।

বড়বৌ ওর দুঃখের কথা শুনে বলল, তুই যে বললি কোন্ দরগার এক ফকিরসাব তোকে নিকা করতে চায়!

—কি যে কন মামী! খোয়াব ত কত ছাখলাম গ মামী। কিন্তু আল্লার মর্জি না হইলে আপনে আমি কি করমু!

—কেন, আবেদালি যে বলে গেল ফকিরসাব এসেছিল।

—আইছিল। প্যাট ভইরা ভাত গিলছিল। গিল্যা আমারে কয় কি, আপনে থাকেন, আমি কোরবান শেখের সিন্নিতে যামু। ফিরনের সময় আপনারে লইয়া ফিরমু। এই বইলা নির্বৈংশায় আইজ-অ গ্যাছে কাইল-অ গ্যাছে মামী।

—যখন বলে গেছে তখন ঠিকই আসবে।

জোটন আর কোন কথা বলল না। সে কলাপাতায় সব এঁটোকাঁটা তুলে জামগাছের অন্ধকার অতিক্রম করে বড়ঘরের পিছনে এসে দাঁড়াল। গন্ধপাদালের ঝোপ ছাড়িয়ে সে তার এঁটোকাঁটা নিক্ষেপ করল। জ্যোৎস্না রাত বলে এই ঝোপ-জঙ্গল, দূরের মাঠ, সবুজ ধানখেতের অস্পষ্ট ছবি তার ভাল লাগে। সে হিসাব করে বুঝল প্রায় দু'সাল হবে গতর আল্লার মাশুল তুলছে না। বিশেষ করে এই রাত এবং ঝোপজঙ্গলের ইতস্তত অন্ধকারের ছবি, অথবা আকণ্ঠ ভোজনে এক তীক্ষ্ণ ইচ্ছা জোটনকে কেমন কাতর করছে। ফকিরসাবকে এ-সময় বড় বেশি মনে পড়ছিল।

সে বড় মামীর কাছ থেকে একটা পান চেয়ে নিল। কাঁচা সুপারি একটা আস্ত চিবোতে চিবোতে বাগানের ভিতর ঢুকে গেল। এক মন্ত্রবৎ ইচ্ছাশক্তি এই বাগানের ভিতর ওকে কিছুক্ষণ রেখে দিল—যদি একটা পাকা সুপারি, গাছ থেকে টুপ্—এই শব্দ ঘাসের ভিতর, সে কান খাড়া করে রাখল—কোথায় টুপ্, এই শব্দ জেগে উঠবে—কখন বাদুড়েরা উড়ে আসবে। কিন্তু একটা বাদুড় উড়ে এল না। টুপ্ শব্দ হল না। শুধু কাঁচা সুপারির রসে মাথাটা কেমন ভারী ভারী, নেশার মতো মনে হল। সে এখন জলে নেমে যাবে। সাঁতার কেটে গ্রামে উঠে যেতে হবে। জ্যোৎস্না রাত। জলে সাদা জ্যোৎস্না এবং জোটন জলে নেমে যাচ্ছিল, ধীরে ধীরে সে কাপড় হাঁটুর উপর তুলে ফেলল। যত জলে নেমে নেমে যেতে লাগল, তত সে কাপড় ক্রমে উপরে তুলে তুলে এক সময় কোমরের কাছে নিয়ে এল। না, জল কেবল বাড়ছে। সে কাপড় খুলে মাথার উপর তুলে একটা গোসাপের মতো জলে ভেসে পড়ল। এক কাপড় জোটনের। ভিজা কাপড়ে রাত্রিবাস বড় কষ্টের।

ঝোপ-জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে জোটন দেখল নরেন দাসের বারান্দায় একটা কুপি জ্বলছে। পুবের ঘরে কোন তাঁতের শব্দ হচ্ছে না। অমূল্য ওদের তাঁত চালায়। অমূল্য বাড়ি গেলে তাঁত বন্ধ থাকে। তা'ছাড়া সূতা পাওয়া যাচ্ছে না।

বাজারে। তার জন্যও নরেন দাস রাতে তাঁত বন্ধ করে রাখতে পারে। এখন আর জোটন নলী ভরতে পারছে না। জোটন অনেক কষ্টে একটা চরকা কিনে যখন বেশ দু'পয়সা কামাচ্ছিল, যখন ভাবল হিন্দু বাড়ির বৌদের মতো ছোট একটা কাঁসার থালা কিনে বড়লোক হবে এবং যখন সুতার মোড়া দু'পয়সা থেকে চার পয়সা হয়ে গেল এবং একজন ফকিরকে পোষার ক্ষমতা হচ্ছে তখন কিনা—বাজারে সুতা পাওয়া যাচ্ছে না।

জোটন জল কাটছিল। দু'হাতে ব্যাঙের মতো জলের ওপর ভেসে ভেসে যাচ্ছে। হাত-পা জলের ভিতর ফুটকরি তুলছে। এই গরমে জলের ঠাণ্ডাটুকু, আকাশের স্বাচ্ছন্দ্যটুকু এবং পুব দিকের বড় চান্দের হাসি জোটনের ভিতর কতদিন পর মাশুল তুলতে বলছে। আকণ্ঠ খেয়ে শরীরে এখন কত রকমের শখ জাগছে। দূরের মাঠে একটা আলোর ফুলকি। সামনে সব পাটের জমি। পাট কাটা হয়ে গেছে—জল স্বচ্ছ। হাওয়ায় জল থইথই করছে চারিদিকে। স্বচ্ছ জলে জোটন শরীরের উত্তাপ ঢালছিল—য্যান কতকাল গাজীর গীদের বায়ানদারের মতো সূর্যের উত্তাপ না পেয়ে অবসন্ন। সে এসময় একমুখ জল নিয়ে আকাশমুখো ছুঁড়ে দিল। বলল, আল্লা, তর দুনিয়ায় আমার কি কামডা থাকল ক'দিনি!

আকাশে আলো রয়েছে। জলে শাপলা-শালুক রয়েছে আর মাঠ শেষে আম-জামের ছায়া প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করছে। শাপলাফুলের মতো সে জল থেকে মুখটা তুলে দুটো মান্দার গাছ অতিক্রম করতেই দেখল, গোপাটের বটগাছটার নিচে একটা হ্যারিকেন এবং নৌকার ছায়া। একটা মানুষেরও যেন। সে তাড়াতাড়ি জলের ভিতর হারিয়ে যাবার জন্য ঘাসের বনে শরীর ঢেকে দিল। কিন্তু পালাবার সময় জলে শব্দ। বুঝি একটা মাছ পালাচ্ছে। অথবা বড়শীতে, বোয়ালের বড়শীতে বড় বোয়াল মাছ আটকে গেছে। মানুষটা নৌকা নিয়ে মাছের খোঁজে এসে দেখল কে এক মানুষের মতো ঝোপে-জঙ্গলে জলের ভিতর ভেসে যাচ্ছে। জোটন তাড়াতাড়ি গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে ঘাসের বনে শরীর লুকাতে চাইল—কিন্তু পারল না। ওর মুখের ওপর লণ্ঠন তুলে মনজুর বলছে তখন, জোটন, তুই!

জোটন শরমে চোখ বুজে ফেলল। চোখ বুজেই বলল, হ আমি!

—কই গ্যাছিলি?

—গ্যাছিলাম ঠাকুরবাড়ি। পথ ছাড়, যাই।

মনজুর জলের ভিতর ওর অবস্থা বুঝে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। সে মুখ ফেরাল না। অথচ বলল, আমি ভাবলাম বুঝি বড় একটা মাছ বড়শীতে ধরা পড়েছে।

—আর কিছু ভাবস নাই।

—আর কি ভাবমু। বলে সে নৌকাটার উপর বসল।

—ক্যান, অন্য কিছু ভাবন যায় না। তুই ইদিকে ক্যান! বলে জোটন চোখ খুলল। কথাবার্তায় যেন সব সঙ্কোচ কেটে গেছে। দেখল, মনজুর খালি গায়ে। পরনে অত্যন্ত মিহি গামছা। তাও জলে ভিজে খানিকটা উপরে উঠে গেছে। মনজুর কিছুতেই জোটনের দিকে তাকাচ্ছে না। জোটনের ভারি হাসি পেল। তর ত ম্যালা পয়সা। একটা বড় গামছা কিনতে পারস না।

মনজুর বলল, তুই যা দিনি।

—যামুনা ত, কি করবি। জোটনের ভিতর ইচ্ছাটা বড় চাড়া দিচ্ছে!

—কি আবার করমু! সে তার এই উপস্থিতির জন্য অজুহাত দেখাল। বলল, হাইজাদি গ্যাছিলাম। অষুধ আনতে। ফিরতে রাইত হইয়া গ্যাল। গোপাটে আইছি বড়শীতে মাছ লাগছে কিনা দ্যাখতে। আইয়া দ্যাখি তর এই কাণ্ড। জ্যোৎস্না রাইতে জায়গাটারে আনধাইর কইরা আছস। তর লগে দ্যাখা হইব জানলে তফন পইরা আইতাম।

মনজুর জোটনের সমবয়সী। কিছু কিছু শিশু বয়সের ঘটনা উভয়ে এ-সময় স্মরণ করতে পারল। একদা শৈশবে এইসব পাটখেতের আলে-আলে ওরা ঘুরে বেড়িয়েছে। জোটন সেইসব স্মৃতির কথা স্মরণ করতে চাইল অথচ সঙ্কোচবোধে উভয়ে পরস্পর কিছু বলতে পারছে না। দু'সালের অধিক এই শরীর জলে-জলে খা-খা করছে। জোটন কাতর গলায় বলল, পথ দে। যাই।

—তরে ধইরা রাখছি আমি!

জোটন এই জল দেখে, রাতের জ্যোৎস্না দেখে এবং আকণ্ঠ ভোজনে কি যে তৃপ্তি শরীরে—জোটন কিছুতেই নৌকা অতিক্রম করে সাঁতার কাটতে পারল না। শরীর ওর ক্রমে কেমন জলের ওপর ভেসে উঠছিল। জলের ওপর ব্যাঙের মতো যেন একটা সোনালী ব্যাঙ জোনাকি খাবার জন্য জলে ভেসে হাঁ করে আছে। মনজুর কোন কথা বলছে না দেখে সেই বলল, আসমানের চান্দের লাখান তর মুখখান। কিন্তু দেইখা ত এখনে মনে হয় আমাবস্যার আনধাইর রাইত। য্যান শুকাইয়া গ্যাছে।

—শুকাইয়া গ্যাছে! তরে কইছে!

মনজুর ওর রুগ্ন বিবির মুখটা স্মরণে এনে কিঞ্চিৎ বিব্রত হয়ে পড়ল। দীর্ঘদিন বিবির রুগ্ন শরীর ওর গরম কলজের ভিতর জল ছিটাতে পারে নি। শুধু মনজুর জলছে, জলছে। একটা, সাদির যে শখ ছিল না—তা নয়, তবু মনজুর বিবিকে যথার্থই ভালবাসে। মনজুর অনেক কষ্টে যেন বলল, পারবি আনধাইর রাইত আলো করতে! এবং মনজুর মুখ ফেরাতেই আবার শরীরটাকে জলের ভিতর জোটন ডুবিয়ে দিল। সামনে পিছনে জলজ ঘাস। বেশ আব্রু সৃষ্টি করেছে। জোটন এই জলজ ঘাসের ভিতর মনজুরকে নিয়ে ডুব দিতে চাইল। আর মনজুর সহ্য করতে না পেরে দু'হাতে যেন একটা মরা

মাছ নৌকায় তুলে আনছে—টানতে-টানতে নৌকার পাটাতনে তুলে ফেলল।

কিছুক্ষণ পর পাটখেতের ফাঁক দিয়ে কেমন একটা কান্নার শব্দ গ্রাম থেকে ভেসে আসতে থাকল। জোটন শুনতে পাচ্ছে, মনজুর শুনতে পাচ্ছে। নৌকার ওপর কিছু পোকা উড়ছিল। ধানের জমিতে চাঁদের আলো বড় মায়াময়। সুখ অথবা আনন্দ এই পাটাতনে এখন গড়াগড়ি খাচ্ছে। সব দুঃখ ভেসে যাচ্ছিল জলে, সব উত্তাপ চাঁদের আলোর মতো গলে-গলে পড়ছে। ইচ্ছার সংসারে মনজুর পুতুল সেজে বিবির মরা মুখ দেখতে দেখতে বলল, ক্যাডা ক্যান্দে ল।

—মনে হয় তগ বাড়ি থাইক্যা আইতাছে।

—তবে বিবিডা বুঝি গ্যাল।

জোটন দেখল পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগীর মতো মনজুরের মুখ। সব উত্তাপ এখানে ফেলে দিয়ে মনজুর হাউহাউ করে কাঁদছে আর নৌকাটা বাইছে।

কুকুরটাকে ফেলে দিয়ে গেছে কারা। জলের ভিতর ফেলে দিয়ে নৌকা নিয়ে পালিয়ে গেছে। কুকুরটা আপ্রাণ বাঁচার জন্য জলে সাঁতার কাটছে। কোনরকমে নাকটা জাগিয়ে রেখেছে জলে। তারপর মনে হল টানমতো জায়গা। কুকুরটা সামান্য উঠে দাঁড়াল। না, দূরে কোন গ্রাম দেখা যাচ্ছে না। হতাশায় চোখ-মুখ উদ্‌বিগ্ন। শেষ বর্ষা এখন। জল, ধানখেত থেকে পাটখেত থেকে নেমে যাচ্ছে।

পাগল ঠাকুর তখন নৌকাটাকে আলে আলে টেনে নিচ্ছিলেন। সোনা পাটাতনে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে। ধানগাছ হেলে পড়েছে। শ্রাবণ-ভাদ্রের সেই স্বচ্ছ ভাবটুকু আর নেই। জল ঘোলা। জলে পচা গন্ধ উঠছে। দু'ধারে কাদা জল, শামুক পচা, দুর্গন্ধময় জলজ ঘাস। নৌকাটাকে সরকারদের জমিতে ঢুকিয়ে দিতেই মনে হল একটা কুকুর দাঁড়িয়ে আছে। চোখে-মুখে উদ্বিগ্ন চেহারা। কুকুরটা পাগল ঠাকুরকে দেখে বলল, ঘেউ।

পাগল ঠাকুর দাঁড়ালেন। তারপর পুরানো কায়দায় হাত কচলে বললেন, গ্যাৎচোরেৎশালা।

কুকুরটা ফের বলল, ঘেউ!

পাগল ঠাকুর বললেন, গ্যাৎচোরেৎশালা।

জল কম বলেই আলের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে কুকুরটা। একপাশে দাঁড়িয়ে ওদের যাওয়ার মতো জায়গা করে দিয়েছে। কুকুরের এই ভদ্রতাটুকু পাগল ঠাকুরের খুব ভাল লাগল। তিনি আর তাকে মন্দ কথা বললেন না। তিনি পাশ কাটিয়ে নৌকো টেনে নেবার

সহসাই কি মনে হতে পেছনে তাকালেন—কুকুরটা অবোধ বালকের মতো তাকিয়ে আছে। তিনি এবার আদর করার ভঙ্গীতে মুখে এক ধরনের শব্দ করতেই, জলের ভিতর ছপছপ শব্দ তুলে কুকুরটা পাশে এসে দাঁড়াল। পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ কুকুরটার মুখে চুমু খেলেন এবং নৌকোয় তুলে বললেন, গ্যাৎচোরেৎশালা।

কুকুরটা পাটাতনের এক পাশে দাঁড়াল। গা ঝাড়ল। তারপর লম্বা হয়ে আড়মোড়া ভাঙল এবং জিভটা বের করে রাখল কিছুক্ষণের জন্য। পাগল ঠাকুর এবং সোনাকে দেখতে দেখতে হাঁপাচ্ছে। কুকুরটা লেজ নাড়ছে অনবরত। মণীন্দ্রনাথ তখন লগি মারছেন।

মণীন্দ্রনাথ শালুকের ফল তুলে খেলেন। ফল ভেঙে সোনাকে খেতে দিলেন। সোনা শক্ত জিনিস এখনও খেতে পারে না। সে খেতে গিয়ে বিষম খেল। ওর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে। সে কাঁদছে এখন। তিনি ওকে কোলে নিয়ে একটু আদর করলেন।

দুটো জমি পার হলে হাসান পীরের দরগা। শীতের শেষে তিনি এখানে ঘুরে গেছেন। তখন পীরের মেলা ছিল, সিন্নি ছিল। গ্রাম মাঠ বেয়ে মানুষেরা এসেছিল এবং মোমবাতি জ্বেলে সওদা করে ঘরে ফিরেছিল। এখন কোন মানুষের সাড়া-শব্দ নেই। শুধু ভাঙা-মসজিদ এবং পীরসাহেবের কবরের পাঁচিলে কয়েকটা কাক অনবরত উড়ছে, সোনার কিছুতেই কান্না থামছে না। তিনি এক হাতে সোনাকে বুকে নিয়ে অন্য হাতে লগি বাইতে থাকলেন। হাসান পীরের নির্জন দরগাতে নৌকা ভিড়িয়ে এক সময় ভিতরে উঠে এলেন।

কাকগুলি পাঁচিলের ওপর চিৎকার করছে। পীরসাহেবের কবরের পাশে পলাশ গাছটা এখনও তেমনি আছে। পাগল মানুষটাকে দেখে কাকগুলি পলাশ গাছটার উপর এসে বসল। ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দূরের মাইনর স্কুলটা দেখা যাচ্ছে। মণীন্দ্রনাথ হেঁটে-হেঁটে একদা এই বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করতে আসতেন।

ভিটেমাটির মতো এই জমিটা উঁচু। কয়েকটা আমগাছ, কিছু পাখপাখালি, বেতঝোপ, কাঁকড়া, সাপ এবং মোত্রাঘাসের জঙ্গল নিয়ে পীরসাহেব কবরের নিচে ঘুমোচ্ছেন। সামান্য বর্ষার জল পীরসাহেবকে ছুঁতে পারে না। তখন অদূরের নদী-নালার কচ্ছপেরা পর্যন্ত নরম মাটির খোঁজে পীরসাহেবের কাছে চলে আসত। ডিম পাড়ার জন্য আশ্রয় চায়, ডিমে তা দেবার জন্য আশ্রয় চায়। অঘ্রান মাস, বেলা পরতে দেরি নেই। সোনা তখনও কাঁদছিল। কুকুরটা ওদের পায়ে পায়ে হাঁটছে। কবরখানায় দুটো-একটা পাতা ঝরে পড়ল। হেমন্তের শীত-শীত ভাবটা সকল ঘাস পাখি এবং পীরসাহেবের পাঁচিলের গায়ে জড়িয়ে আছে। পাঁচিলের নিচে কতরকমের গর্ত। কবরের বেদী থেকে ভাঙা কাঁচ উঠে এসেছে।

মণীন্দ্রনাথ সোনাকে কোলে নিয়ে এই পাঁচিলের চারদিকে ঘুরতে থাকলেন। কাকগুলো নির্জন নিঃসঙ্গ দরগায় সহসা মানুষ দেখে কেমন ক্ষেপে গেল। ওরা মণীন্দ্রনাথের মাথার ওপর ঘুরে-ঘুরে উড়তে থাকল। কতদিন অথবা দীর্ঘ সময় বাদে মণীন্দ্রনাথ পীরসাহেবের দরগাতে এসেছেন, কতদিন অথবা দীর্ঘ সময় বাদে মণীন্দ্রনাথ পীরসাহেবকে গলায় দড়ি দিয়ে মরার কারণটা জিজ্ঞাসা করতে চাইলেন।

সোনা এখন আর কাঁদছে না। পাগল ঠাকুর সোনাকে ঘাসের উপর শুইয়ে দিলেন। কুকুরটা এতক্ষণ পায়ে-পায়ে ঘুরছিল। মণীন্দ্রনাথ সোনাকে রেখে একটু হেঁটে গেলেন সামনে। কুকুরটা সোনার পাশে বসে থাকল। এতটুকু নড়ল না। ঘাসের ওপর শুয়ে সোনা হাত-পা ছড়িয়ে এখন খেলছে। মণীন্দ্রনাথ যেন কোথায় যাচ্ছেন। তিনি পাঁচিলের দরজা টপকে ভিতরে ঢুকে গেলেন এবং বললেন, গ্যাৎচোরেৎশালা। যেন বলতে চাইলেন, পীরসাহেব, তোমার দরগাতে মেলা বসেছে, তুমি হিন্দু-মুসলমান সকল মানুষের পীর, তুমি গলায় দড়ি দিলে কেন, বলে বেদীটার পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং একটা শুকনো ডাল এ-সময় পাঁচিলের অন্য পাশে ভেঙে পড়ায় তিনি দেখলেন, ছাতিম গাছের মগডালে কিছু শকুন বাসা বেঁধেছে।

পাগল মানুষ বললেন, গ্যাৎচোরেৎশালা। বলার ইচ্ছা যেন পীরসাহেব ভিতরে আছেন? তিনি বেদীটার পাশে বসলেন এবং কান পাতলেন মাটিতে—পীরসাহেবের মুখটা মনে করতে পারছেন, বুড়ো অথর্ব তখন পীরসাহেব। মণীন্দ্রনাথ দূরের বিদ্যালয় থেকে পাঠ নিয়ে ফেরার পথে এই দরগায় এসে পীরসাহেবের দাড়ি-গোঁফবিহীন মুখটা দেখতেন। এবং সেই পীরসাহেব একদিন কেন যে রাত্রে গলায় দড়ি দিয়ে ছাতিম গাছটায় ঝুলে থাকলেন! হায়, ঈশ্বর জানেন, এমন মানুষ হয় না এবং কথিত ছিল পীরসাহেবের আহারের প্রয়োজন হত না। পীরসাহেবের হুঁকো-কল্কে কোমরে বাঁধা থাকত। তিনি এই দরগার চারপাশে ঘুরতেন শুধু এবং রাত্রের অন্ধকারে যখন দূরে-দূরে শুধু ইতস্তত গয়না নৌকার আলো, দূরে-দূরে সব গ্রাম গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তখন তিনি শাক পাতা অথবা পুরনো ছাতিম গাছের ডাল বেয়ে উঠে শকুনের ডিম অন্বেষণ করতেন, কচ্ছপেরা এই দরগাতে অথবা খালের ধারে হেমন্তের শেষে, শীতের প্রথমে ডিম পেড়ে রেখে যেত—তাও অন্বেষণ করে ঘরে তুলে রাখতেন।

এখন আর সেসব শাক-পাতার গাছ এই দরগাতে নেই। হেজে মজে গেছে। বর্ষাকাল গেছে বলেই দরগার চারধারে নানারকমের আগাছার জঙ্গল—কিছু ঘাসের চিহ্ন। নরম ঘাসে সোনা ঘুমোচ্ছে—এই সময় সোনার কথা মনে হওয়ায় তিনি পাঁচিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন। যখন দেখলেন, সোনা

ঘাসের ওপর শুয়ে ঘুমোচ্ছে, কুকুরটাও পাহারায় আছে, তখন তিনি চলে এলেন। পাঁচিলটার ভিতরের দিকে প্রচুর জায়গা। বড় বড় গর্ত, কবর থেকে যেন ঢাকনা খুলে কারা মানুষ তুলে নিয়ে গেছে। বড় বড় শান পড়ে আছে। শান দিয়ে ঢেকে দিলেই একটা মানুষ গায়েব। কেউ জানবে না শানের নিচে একটা মানুষ আটকা পড়েছে। প্রচুর জায়গা দেখে, ঘর করে এখন কেমন এই দরগায় বসবাসের ইচ্ছা মণীন্দ্রনাথের। মেলার সময় যেখানে মোমবাতি জ্বেলে দেওয়া হয়, পীরসাহেবের নামে সিন্নি চড়ানো হয় সেই জায়গাটুকু শুধু পরিষ্কার। সেই জায়গাটুকুতে দূর্বাঘাস এবং সেই জায়গাটুকুতেই একটা কুঁড়েঘর ছিল, ভাঙা হাঁড়ি কলসি ছিল, কিছু দ্রব্যগুণ ছিল পীরসাহেবের—যার দৌলতে হাসান চোর ফকির হল এবং এক সময় পীর বনে গেল। মালা, তাবিজ, নানারকমের হাড় সংগ্রহের বাতিক ছিল হাসানের। গোর দেবার সময় সবই ওর কবরে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন লম্বা বেদীর ওপর শকুনেরা শুধু হাগছেই। কাক এবং অন্য পাখ-পাখালি—যেমন শালিখের কথাই ধরা যাক, বড় বেশি ভিড় করছে এই দরগাতে। আর এই হাসান পীরই বলেছিলেন, তর যা চক্ষুমণি, চক্ষুতে কয় তুই পাগল বইনা যাবি

—কি যে কন পীরসাহেব!

—আমি ঠিক কথাই কই ঠাকুর। তর সব লিখাপড়া মিছা। পীর-পয়গম্বর হইতে হইলে তর মত চক্ষু লাগে, তর মত শরীর মুখ লাগে। তর মত চক্ষু না থাকলে পাগল হওন যায় না, পাগল করণ যায় না।

আর ফোর্ট উইলিয়ামের রেমপার্টে বসে পলিন বলত, তোমার চোখ বড় গভীর, বড় বিষণ্ণ মণি। ইউর আইজ আর গ্লুমি। অথবা বোটানিকেলের পুরনো বটের ছায়ায় পলিন ববকাটা চুলে বিলি কেটে মিহি ইংরাজীতে উচ্চারণ করত, এস, আমরা দু'জনে একসঙ্গে বসে কীটসের কবিতা আবৃত্তি করি। 'দেয়রস নান আই গ্রীভ টু লিভ বিহাইণ্ড, বাট ওনলি, ওনলি দি'। তখন দূরের নারকেল গাছ অথবা গঙ্গাবক্ষে জাহাজের বাঁশি এবং সমুদ্র থেকে আগত সব পাখিদের পাখার শব্দ উভয়কে অন্যমনস্ক করত। ওরা তখন পরস্পর নিবিষ্টভাবে পরস্পরকে দেখত। কবিতা উচ্চারণের পর পাখির পালকের মতো উভয়ে হাল্কা এক বিষণ্ণতায় ডুবে থেকে কথা বলত না।

পলিন বলত, চলো, এইসব জাহাজে উঠে আমরা অন্য কোন সমুদ্রে চলে যাই। মণীন্দ্রনাথ এই দরগায় বসে সেইসব স্মৃতিতে এখন উদ্বিগ্ন হচ্ছিলেন। তাঁর ইচ্ছার ঘরে পলিন···১৯২৫-২৬ সাল, পলিন তখন তরুণী, প্রথম মহাযুদ্ধে পলিনের দাদার মৃত্যু এবং সেই পরিবারে কোন রাতের আঁধারে মোমবাতির সামনে যীশুখ্রীস্টের ছবি, হাঁটু গেড়ে পলিনের বসে থাকা—কি সব স্মৃতি যেন বার বার মাথার ভিতর ভেসে ওঠে, আবার মিলিয়ে যায়। মণীন্দ্রনাথ কিছু মনে

দেখলেন, সোনা হামাগুড়ি দিচ্ছে আর কাঁদছে। কুকুরটা পাশে পাশে থাকছে। অনবরত কান্নায় ভেঙে আসছে গলা। শুধু গলাতে এখন একটা হিক্কার শব্দ। পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি সোনাকে বুকে তুলে নিলেন এবং আদর করতে থাকলেন। সোনার হাত মুখ স্পর্শ করে, অক্ষত সোনার শরীরের জন্য এক অপার আনন্দ—ধনবৌর মুখ, ব্যথিত সংসার আর কুকুরটাকে কাছে টেনে এক নতুন সংসার—বার বার তিনি কৃতজ্ঞতায় কুকুরটাকে চুমু খেয়ে কেমন পাগলের মতো ছুটে গিয়ে কোষা নৌকাটাতে উঠতেই শুনলেন, এক দল ধূর্ত শেয়াল পাঁচিলের অন্য পাশে হুক্কাহুয়া করছে। তিনি আকাশ এবং দরগার ভাঙা কাচের স্বচ্ছ ভাবকে মথিত করে হেসে উঠলেন। কুকুরকে বললেন, আকাশ দেখো, সোনাকে বললেন, নক্ষত্র গ্যাখো—ঘাস-ফড়িং-ফুল-পাখি গ্যাখো, জন্মভূমি গ্যাখো। তারপর নিজে দেখলেন আকাশের গায়ে লেখা রয়েছে—সোনার মুখ, পলিনের চোখ। কুকুরটা পাটাতনে দাঁড়িয়ে নীরবে লেজ নাড়ছে।

আরও কিছুকাল পরে। সোনা নিবিষ্ট মনে তরমুজ খেতে বসে মাটি খুঁড়ছিল। বেলে মাটি, সুতরাং সে অনেকটা মাটি তুলে ফেলল। সোনালি বালির চর এখন শুকনো। চর পার হলে নদীর জল পাতলা চাদরের মতো, তিরতির করে কাঁপছে। স্বচ্ছ জলে ছোট ছোট মালিনী মাছ ভেসে বেড়াচ্ছে। সোনা ছোট একটা নারকেলের মালার সাহায্যে জল নিয়ে এল নদী থেকে। ছোট গর্তটা জলে ভরে দিল। যেহেতু নদীতে হাঁটুজল, পার হয় গরু, পার হয় গাড়ি, সেজন্য হাঁটুজলে নেমে একটা মালিনী মাছ ধরল সোনা। মাছটা অঞ্জলিতে রেখে সে নদী থেকে প্রথম গর্তটার সামনে এসে দাঁড়াল। জলে মাছটা ছেড়ে খরগোশের মতো মাথা উঁচু করে দিল তরমুজ-পাতার ভিতর থেকে; দেখল, দূরে ছই-এর নিচে বসে ঈশম তামাক খাচ্ছে। সোনার প্রতি অথবা তরমুজের প্রতি যেন সে লক্ষ্য রাখছে। সোনা তরমুজ পাতার আড়ালে নিজেকে আর একটু ঢেকে ফেলল। ছোট শরীর সোনার। শরীরের রঙ বালির চরের মতো। সোনার পা খালি এবং এটা বসন্তকাল। নদীর চর থেকে বসন্তকালীন হাওয়া উঠে আসছে। বাতাস জোর বইছিল বলে তরমুজের পাতা ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য পাতার ফাঁকে সোনার শরীর স্পষ্ট। পাতার ফাঁকে সোনাকে নিবিষ্ট মনে বসে থাকতে দেখে ঈষৎ চিন্তিত হল ঈশম। সে ভাবল—সোনাডা আবার বইসা বইসা তরমুজের লতা উপড়াইতাছে না ত! সে ছই-এর ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হল। ডাকল, সোনা কর্তা কই গ্যালেন?

সোনা তাড়াতাড়ি পাতার ভিতর আরও লুকিয়ে গেল। প্রথমত, সে একা একা বাড়ি থেকে এ জগতে চলে এসেছে, দ্বিতীয়ত, সে একটা গর্ত করে নদী থেকে জল এনে পুকুর তৈরি করেছে। পুকুর তৈরি করতে গিয়ে দুটো তরমুজের

লতা উঠে এসেছে। এসব অপরাধবোধ ওর মনে কাজ করছে। সে একবার পাতার ফাঁক দিয়ে মাথা উঁচু করে দেখল, ঈশম সোনাকে খোঁজবার জন্য এদিকেই আসছে। সোনা তাড়াতাড়ি পাতার ফাঁকে মাটির সঙ্গে মিশে হামাগুড়ি দিতে থাকল। যত ঈশম ওর দিকে এগিয়ে আসছে তত সে জমির আড়ালে আড়ালে উপরে উঠে যব খেতের ভিতর ঢুকে গেল এবং চুপচাপ বসে থাকল।

ঈশম যেখানে সোনাকে বসে থাকতে দেখছিল এখন সেসব জায়গা নির্জন। দুটো তরমুজের লতা উপড়ানো। একটা ছোট গর্তে কিছু জল এবং একটা মালিনী মাছ ভেসে বেড়াচ্ছে। জলটা ক্রমশ কমে আসছে। মাছটা যেন উঁকি দিয়ে ঈশমকে দেখতে পেয়ে জলের ঘোলাটে অন্ধকারে লুকাল। ঈশম ফের ডাকল, সোনা কর্তা আমার। কই গ্যালেন?

যেখানে নদীর পাড় ক্রমশ উঁচু হয়ে গ্রামের সঙ্গে মিশে গেছে সেখানে যবের খেত, গমের খেত। এখন যব গম কাটার সময়। কিছু গাঙশালিখ যব গম খেতে উড়ছে। ঈশম ফের ডাকল, সোনা কর্তা কই গ্যালেন গ! আমি আপনের লগে পারি! আইয়েন কর্তা, আইলে কান্দে লইয়া নদী পার হমু।

সোনা ডাক শুনতে পেল কিন্তু আড়াল ছেড়ে এতটুকু নড়ল না। ঈশমের সঙ্গে এখন ওর পলাপলি খেলার শখ যেন। সে যব খেতের ভিতর আরও ঘন হয়ে বসল। সে বসে বসে শুকনো ঘাস ছিঁড়তে থাকল। যব গাছ নড়ছিল। ঈশম জমির আল থেকে টের করতে পারছে সব। সে দ্রুত হেঁটে এসে যব খেতে ঢুকে সোনাকে সাপটে ধরল এবং বলল, এহনে যাইবেন কইগ কর্তা?

সোনা হাত পা ছুঁড়ছিল যব খেতের ভিতর। ওর চিৎকারে যব গম খেত থেকে সব গাঙশালিখেরা বিকেলের রোদে উড়ে গেল। ওরা উড়ে উড়ে নদীর চরে নেমে গেল। সোনা বলল, না যামু না। আমারে ছাইড়া গ্যান।

—আপনেরে আমি কিছু কইছি? আইয়েন আমার লগে। ছই-এর নিচে বমু, আসমান গ্যাখমু। বলে, সোনাকে কাঁধে তুলে হাঁটতে থাকল ঈশম।

সোনার এখন আর পরাজিত ভাবটুকু নেই। সে কাঁধে পা দোলাতে থাকল। সোনালী বালির নদীতে জল, কিছু নৌকা, কিছু গ্রামের মানুষ দেখল সোনা। বসন্তের বাতাস এখন যব গম খেতে ঢুকে অদৃশ্য হচ্ছে। নদীর পাড় ধরে যতদূর চোখ গেল শুধু যব গমের পাকা শীষ, কিছু হিজল গাছ এবং তার ফুল গাছের নিচে বিছানো শতরঞ্চের মতো। সোনা বলল, রাইতে আপনের একলা ডর করে না?

—না গ কর্তা। আল্লা ভরসা। ডরে ধরলে আল্লার নাম লই।

—নিশিতে যদি ধইরা লইয়া যায়?

—আমারে নিব না।

—নিব, দেইখেন। নিশিতে ধরলে আপনে ট্যার-অ পাইবেন না।

—আমারে নিব না। নিশি ব্যাডা আমার মিতা।

—তবে মায় য্যা কয়, তুমি একলা কোনখানে যাইঅ না সোনা, নিশিতে ধইরা লইয়া যাইব-অ। নিশি নাকি মার মত হইতে পারে, আপনের মত হইতে পারে।

—তা হইতে পারে।

—আমি একলা কোনখানে যামু না।

—আর যাইয়েন না।

এবার সোনা ঈশমের মুখ দেখার চেষ্টা করল। চারপাশে মাঠ। ওর নানা রকমের ভয়ডরের কথা মনে হল। যবের শীষ, গমের শীষ ওর শরীরে লাগছে। ওর শরীর চুলকাচ্ছিল। সে ঈশমের কাঁধ থেকে নেমে তরমুজ খেতের ভিতরে ঢুকে গেল। সে বলল, আমি একলা যামু না বাড়িতে। আপনের লগে যামু ঈশম দাদা। তারপর সে তার প্রিয় মাছটিকে খুঁজতে থাকল। ঈশমকে বলল, আপনে যান ছই-এর ভিতর, আমি পরে আইতাছি। সে একটা তরমুজের ওপর বসে গর্তের ভিতর মাছটাকে খুঁজতে থাকল। জলের নিচে মাছটা এখন লুকোচুরি খেলছে। সে গ্রামের দিকে তাকাল, বেলা পড়ে আসছে। তরমুজ গাছের ফাঁকে ফাঁকে রোদ জলের রেখার মতো বেয়ে বেয়ে নামছে। সে দেখল একটা বড় তরমুজ, পাতার ওপরে উঠে গেছে। সে দীর্ঘ সময় নদীর জলে সূর্যের আলো পড়তে দেখল। সে দীর্ঘ সময় বড় তরমুজটার ওপর বসে আকাশের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে মেঘের ছায়া দেখল এবং বিচিত্র রকমের সব পাখিদের গ্রামের দিকে উড়ে যেতে দেখল। ওর এখন উঠতে ইচ্ছা হচ্ছে না। ঈশম বার বার ছই-এর ভিতর থেকে ডাকছিল, তামাকের গন্ধ এদিকে নেমে আসছে, কিছু বালিহাঁসের শব্দ পেল সোনা, তবু সে উঠল না। সে নিবিষ্ট মনে নদীর চর দেখছে। বড় নির্জন এই অঞ্চলটা। একটা ভালুকের মুখ সে যব গমের খেতে দেখতে পেল। সে তাড়াতাড়ি ছই-এর দিকে হেঁটে যাবার সময়ই মনে করতে পারল ভালুকের মুখটা একটা ছবির বইয়ে দেখা। সুতরাং ভীত হবার মতো কোন ঘটনাই যেন নেই। ছই-এর ভিতর ঢুকে সোনা বলল, নিশি ব্যাডা আমার-অ মিতা। আমি কেয়রে ডরাই না।

সোনা ছই-এর নিচে ঢুকে কিছুক্ষণ লাফাল। মাচানের নিচে মালসাতে তামাক খাবার জন্য ঈশম আগুন ধরে রেখেছে। ধোঁয়া উঠছিল।—বাইরে আইয়া বন, আসমানের নিচে কত সুখ দ্যাখেন। ঈশম বলল।

ঈশম পা ছড়িয়ে বসল তরমুজ খেতে। সোনা ওর কোলে বসে বলল, আমারে যে কইলেন কান্দে কইরা নদী পার করব্যান, কই করল্যান না-ত! দীর্ঘদিন থেকে সোনার নদী পার হবার ইচ্ছা। কিন্তু ঈশম ওর কথায় রা করল

না বলে মনে মনে অভিমান হতে থাকল। দূরে দূরে নদীর জল পাতলা চাদরের মতো কাঁপছিল। দু'জন বোরখা পরা বিবিকে দেখল নদীর পাড় ধরে যব গম খেতের ফাঁকে চরে নেমে আসছে। সে এবার যথার্থই ভীত হল। সে এবার ঈশমের কাছে খুব ঘন হয় বসল। ঈশম দাদার সেই সব ভূতের গল্প মনে পড়ছে—দু' চোখ সাদা, অন্য কোন অবয়ব নেই। রাত্রিবেলা মায়ের বর্ণিত সেই সব রাক্ষস খোক্কসের গন্ধ বালির চরে সন্তর্পণে নেমে আসছে যেন! সে খুব বিনীতভাবে বলল, ঈশম দাদা, আমি মার কাছে যামু।

—যাইয়েন, আমার লগে যাইয়েন।

—না, আমি এখন যামু।

দু'জন বোরখা পরা বিবি নদীতে নেমে যাচ্ছে। পিছনে নয়াবাড়ির বড় মিঞা। সে বুঝল বড় মিঞার দুই বিবি। সুতরাং সে হাত তুলে ডাকল, অঃ বড় মিঞা, বড় মি···ঞা! বড় মিঞাকে ধরবার জন্য সে সোনাকে কাঁধে নিয়ে তরমুজ খেত অতিক্রম করতে থাকল।

নদীর পাড় ধরে বড় মিঞা এগিয়ে আসছে। ঈশম এখন বালির চর অতিক্রম করছে। এইসব ঘটনায় সোনা ভীত এবং বিব্রত। সে শুধু বলছে, আমি যামু না, মার কাছে যামু। অথচ সে দেখল ঈশমের গলার আওয়াজে সেই অবয়ব-বিহীন অন্ধকার-রঙের বস্তু দুটো পুতুলের মতো স্থির। সে বুঝল, ক্রমশ ওরা পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হচ্ছে। সে আবার বলল, আমার ডর করতাছে, আমি বাড়ি যামু।

ঈশম বলল, অঃ বড় মিঞা, ইট্টু খাড়ও। তোমার বিবিগ দ্যাখাইয়া লইয়া যাও। বোরখা পইরা যাইতেছে দেইখা সোনা কর্তার ডরে ধরছে।

বড় মিঞার কুৎসিত বীভৎস মুখ; বসন্তের দাগ মুখে, একটা চোখ সাদা এবং মৃত।

সোনা এবার ঈশমকে খুব শক্তভাবে জড়িয়ে ধরল। বলল, আমি দুষ্টামী করমু না। আমারে ছাইড়া দ্যান।

সোনার এমন কথায় বড় মিঞা না হেসে পারল না। বলল, ধন কর্তার পোলা?

—হ। ঈশমও হাসল। ডরান ক্যান। আপনেগ পুরান আমলের চাকর।

এখন সোনালি বালির নদীর জলে সূর্যের শেষ আলো সোনার রাজহাঁসের মতো দেখাচ্ছে। সেই কালো অবয়ব-বিহীন বস্তু দুটো নীরব এবং নিশ্চল, যেন কোন জাদুকরের মন্ত্রগুণ এই দুই অপরিচিত প্রেতাত্মাকে বেঁধে রেখে ভূতের খেলা দেখাচ্ছে। সোনা ঈশমকে শেষবারের মতো শক্ত করে জড়িয়ে ধরল—সার্কাসে সিংহের খেলা দেখার মতো এক অযাচিত ভয়, রোমাঞ্চকর সব দৃশ্য। বিসদৃশ অবয়ব-বিহীন অন্ধকার রঙের বস্তু দুটো এগিয়ে আসছে।

ঈশম বলল, এইবার আপনের দুই লবেজান বিবিরে ছাখান। সোনা-কর্তার ডরডা ভাঙাইয়া ছান। ছাখছেন মুখে রা নাই।

চারিদিকে যব গমের খেত। পাড়ে পাড়ে লটকন গাছ আর তেমনি গাছে গাছে নীলকণ্ঠ পাখিদের মতো শালিখেরা আশ্রয় নিয়েছে। কিচিরমিচির শব্দ। দূরে গাভীর ডাক। সূর্যের আলো তেমনি যেন সোনার রাজহাঁস। সেই আশ্চর্য বিস্ময়-মুগ্ধ প্রকৃতির নীরবতার ভিতর বড় মিঞা তার দুই বিবির বোরখা তুলে দিল—আশ্চর্য মুখ এবং পাতলা গড়ন যুবতীদের—বড় মিঞার দুই বিবি—দুগ্‌গা ঠাকুরের মতো মুখ, গড়ন, নাকে নথ এবং পায়ের মলে ঝমঝম শব্দ। সোনার কাতর চোখ দুটো এখন নদীর জলে আঁধার রাতে নৌকার আলো যেন—বিস্ময়ে চকচক করছে।

ছোট বিবি বলল, আইয়েন কর্তা, কোলে আইয়েন। বলে ঈশমের কোল থেকে সোনাকে নিজের কোলে তুলে নিল এবং মুখের কাছে মুখ রেখে বলল, কি ছাখতাছেন বড় বড় চক্ষু দিয়া?

সোনা কোন জবাব দিতে পারল না। সে ছোট বিবির মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। ঈশমকে দেখল। ঈশম এখন বড় মিঞার সঙ্গে ফসলের গল্প করছে।

বড় বিবি বলল, কর্তা, চলেন আমাগ লগে।

সোনা চোখমুখ বুজে বলল, না।

সোনা ফের ছোট বিবির মুখের দিকে তাকালে, বলল, আমারে আপনের খুব পছন্দ লাগছে! হা গ বড় মিঞা, সোনা কর্তায় য্যা আমারে চক্ষু দিতাছে। বলে, খিলখিল করে হেসে উঠল।

হাসি শুনে ঈশম বলল, তর হাসিডা আগের মতই আছে। সহসা মনে পড়ার ভঙ্গিতে ঈশম বলল, জাবিদা, তর মায় ক্যামন আছে ল?

—ভালই আছে ভাইসাব।

ছোট বিবি সোনার চিবুক ধরে বলল, কর্তা, আমারে নিকা করতে হইলে গালে বড় বড় দাড়ি রাখন লাগব। দাড়ি না হইলে শখ মজাইতে পারবেন না। বড় বড় চক্ষু হইছে, ভারি ভারি নাক মুখ হইছে, নদীর চরের মত শরীরের রঙ হইছে—সব হইছে গ করতা, বড় খুবসুরত হয়েছেন। কিন্তু দাড়ি নাই গ গালে। বলে, আড়চোখে বড় মিঞার দিকে তাকাল। বড় মিঞার মৃত চোখটা পর্যন্ত এমন কথায় সজাগ হয়ে উঠল। ছোট বিবির চোখে তখন মানিক জ্বলছিল। হেসে বলল, ডর নাই। এবং সোনাকে বুকের সঙ্গোপনে রেখে ভাবল : আল্লা, সোনা কর্তার মত একডা পোলা ছান।

বড় মিঞা বলল, যাই ঈশম ভাই। ব্যালা পইড়া গ্যাছে। ঘরে ফিরতে রাইত হইব। সময় পাইলে যাইয়েন।

ছোট বিবি বলল, ভাইসাব, ছ্যান আপনের কর্তারে। বলে ছোট বিবি সোনাকে নিচে নামিয়ে রেখে মুখে বোরখা নামিয়ে দিল। তারপর ওরা চলতে থাকল। ওরা নদীতে নেমে যাচ্ছে। ওরা জল অতিক্রম করে ওপারে উঠে গেল। বড় মিঞা আগে, ছোট বিবি বড় বিবির পিছনে এবং সঙ্গে যেন ওদের রোদের ছায়া হেঁটে যাচ্ছে। সোনা ঈশমের হাত ধরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। বড় বিবি ছোট বিবির প্রতিবিম্ব জলে ভাসছে। ওরা নদীর পাড় ধরে হাঁটছিল—ওরা সরে যাচ্ছে ক্রমশ। সোনার কষ্ট হতে থাকল—বড় বড় চোখ, দুগ্‌গা ঠাকুরের মতো নাকমুখ, নাকে নথ, পায়ে খাড়ু, এখনও ঝমঝম শব্দটা কানে বাজছে। তারপর সেই ছবির ভালুকটা আবার চোখের ওপর ভেসে উঠল সোনার। সে ঈশমকে বলল, মায় কইছে আমারে একটা বন্দুক কিনা দিব।

ঈশমও যেন এতক্ষণ কি সব ভাবছিল। বড় বিবির যৌবনকাল অথবা অন্য কোন ছোট ঘটনা, যৌবনে হয়তো, ওকে কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক করে রেখেছিল। এবং এও হতে পারে—সূর্য ডুবছে, গাভীসকলের শব্দ এখন শোনা যাচ্ছে না, ঘাস নিয়ে মাঠ থেকে কামলা ফিরছে, সুতরাং ঘরে ফেরার সময় হলেই পঙ্গু বিবির কথা মনে হয়। বড় মিঞার কপালে সুখ, দুই বিবিকে নিয়ে ঘরে ফিরছে। তখন সোনা বলছে, বন্দুকটা দিয়া আমি একটা ভালুক মারমু।

ঈশম এবারও কোন জবাব দিল না। সে সোনার হাত ধরে তরমুজ খেতের ভিতর ঢুকে গেল। কয়েকটা বড় বড় তরমুজ তুলে ছই-এর ভিতর রেখে দিল, তারপর ঝাঁপ বন্ধ করে বলল, লন যাই।

সোনা মাচানের নিচে নেমে বলল, আমারে কান্দে লইয়া নদী পার হইবেন না?

—আইজ থাকুক। সন্ধ্যা হইয়া আইতেছে, ধনমামী খোঁজাখুঁজি করব। তাড়াতাড়ি লন, বাড়ি যাই।

তরমুজ খেত অতিক্রম করতেই সোনার মনে পড়ল ওর প্রিয় মালিনী মাছটা একা পড়ে আছে তরমুজের জমিতে। সে বলল, ইট্টু খাড়ন, মাছটারে নদীর জলে ছাইড়া দিয়া আসি।

সোনা লাফ দিয়ে দিয়ে তরমুজের পাতা এবং ফল ডিঙিয়ে গেল। সে খুঁজে খুঁজে যখন নির্দিষ্ট জায়গাটুকু পেল না, তখন হতাশ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল তরমুজের জমিতে। ঈশম বার বার ডেকেও সাড়া পেল না। কাছে এলে কেমন ভারি গলায় সোনা বলল, মালিনী মাছটারে পাইতাছি না।

ঈশম সোনার হাত ধরে গর্তটার সামনে নিয়ে দাঁড় করাল। গর্তটাতে এখন জল নেই। মালিনী মাছটা বালি মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সোনা

গর্তটার পাশে বসল। হাতের তালুতে মাছটাকে রেখে উল্টে পাল্টে যখন যথার্থই বুঝল মাছটা মরে গেছে, কেমন এক দুঃখিত চোখ নিয়ে চারিদিকে তখন তাকাতে থাকল। ওর উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না এখন। মালিনী মাছের চোখ ওকে পীড়িত করছে অথবা যেন ছোট বিবির মুখ···! সে এবার ধীরে ধীরে মাছটাকে বালি মাটিতে শুইয়ে দিল। পাড়ের মাটি দিয়ে মাছটার শরীর মুখ ঢেকে দিল। এবং একটা ছোট্ট তরমুজ পাতা ছিঁড়ে ওর কবরের ওপর ছাউনির মতো করে রেখে দিল। তারপর ঈশ্বরের কাছে ছোট এই মাছের জন্য প্রার্থনা করার সময় দেখল, যব গম খেতের ফাঁকে বড় মিঞা তার সাদা মৃত চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে। যেন বলছে, হাউ মাউ কাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ। অথচ সোনা দেখল সেই এক মাঠ—যব গম খেত, চরের বালিতে তরমুজের ঘন রঙ এবং নদীর জলে অবেলার শেষ রোদ আর নদীর ওপার থেকে বড় নিঃশব্দে সেই একটি মৃত চোখ—মুখে দাড়ি নিয়ে এগিয়ে আসছে। সুতরাং সব ফেলে, ঈশমকে ফেলে, চরের জমি ভেঙে কেবল ছুটতে থাকল সোনা। কেবল মনে হচ্ছে ওকে নিশিতে পেয়েছে। নিশির ডাকে সে এই সব নির্জন জায়গায় চলে এসেছে। সে ঈশমকে পর্যন্ত গরুর ছানা ভেবে এই অপরিচিত জায়গা থেকে পালাতে চাইল। সে ছুটছে ছুটছে। কিন্তু বেশি দূর ছুটতে পারল না। যব গম খেতের আলে পথ হারিয়ে ফেলল। ওর ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল। সে উচ্চস্বরে কাঁদতে পারল না পর্যন্ত। সে ভয়ে বিবর্ণ, চারিদিকে যব গমের শীষ, ওর শরীর দেখা যাচ্ছে না।

সে ভয়ে চোখ বুজে যখন পথ খুঁজছিল, যখন যথার্থই অন্ধকার নেমে গেছে মাঠে এবং আশেপাশে শেয়ালেরা ডাকতে আরম্ভ করেছে তখন ঈশম সোনাকে বুকের কোমল উষ্ণতায় ভরে দিল। বলল, কর্তা, আপনে আমারে ফালাইয়া যাইবেন কই?

এবার চোখ খুলল সোনা। দেখল সেই পরিচিত জায়গা, সেই প্রিয় বকুল গাছ—গাছের ছায়ায় অজস্র বকুল ফুলের গন্ধ। সোনা এবার নির্ভয়ে বলল, আমি কোনখানে যামু না ঈশম দাদা। আপনেরে রাইখা কোনখানে যামু না।

ক্রমে কিছু সময় কেটে গেল। কিছু বছর কেটে গেল।

মাঠের শেষ শস্যকণা ঘরে উঠে গেছে। এখন চৈত্রের মাঝামাঝি।

মাঠ এখন ধু-ধু করছে। শুকনো জমিতে হাল বসছে না। সর্বত্র চাষবাসের একটা বন্ধ্যা সময়। যতদূর চোখে পড়ছে, সামনে সাদা ধোঁয়াটে ভাব। শুকনো কঠিন জমি পাথরের মতো উঁচু হয়ে আছে। পাখ-পাখালি যেন সব অদৃশ্য অথবা সব জ্বলে পুড়ে গেছে। মনেই হয় না এই সব জমিতে সোনার ফসল ফলে, মনেই হয় না এখানে কোন দিন বর্ষায় প্লাবন আসে। ঝোপ-জঙ্গল ফাঁকা ফাঁকা। গরীব দুঃখীরা ঝরাপাতা সংগ্রহ করছে। মুসলমান চাষীবৌরা এইসব ঝরাপাতা সংগ্রহের সময় আকাশ দেখছিল।

জোটনও আকাশ দেখছিল কারণ তার এখন দুর্দিন। ফকিরসাব সেই যে নাস্তা করে পাঁচ বছর আগে সিন্নির নাম করে গেছে আর ফিরে আসে নি। আবেদালিও আকাশ দেখছিল কারণ চাষবাসের কাজ একেবারেই বন্ধ। নৌকার কাজ বন্ধ। গয়না নৌকার কাজ শীতের মরশুমেই বন্ধ হয়ে গেছে। বৃষ্টি হলে নতুন শাকপাতা মাটি থেকে বের হবে, সেজন্য জোটন আকাশ দেখছিল। বৃষ্টি হলে চাষবাসের কাজ আরম্ভ হবে, সেজন্য আবেদালি আকাশ দেখছিল। এই অঞ্চলে আকাশ দেখা এখন সকলের অভ্যাস। কচি কাঁচা ঘাস, নতুন নতুন পাতা এবং ভিজে ভিজে গন্ধ বৃষ্টির—আহা মজাদার গাঁঙে নাইয়র যাওয়নের লাখান। জোটন বলল, বর্ষা আইলে আবেদালি, তুই আমারে নাইয়র লইয়া যাবি।

আবেদালি বলল, তর নাইয়র যাওনের জায়গাটা কোনখানে?

—ক্যান, আমার পোলারা বাইচ্যা নাই?

—আছে, তর সবই আছে। কিন্তু কে-অ তরে খোঁজ-খবর করে না।

জোটন আবেদালির এই দুঃখজনক কথার কোন উত্তর দিল না। গতকাল আবেদালির কোন কাজ ছিল না। আজ সারাদিন হিন্দুপাড়া ঘুরে ঘুরে একটা কাজ সংগ্রহ করতে পারে নি। এখন চৈত্র মাস। সব কিছুতে টান পড়েছে। আবেদালি, গৌর সরকারের শনের চালে নতুন শন লাগিয়ে দিয়েছে। যা মিলবে—সামান্য যা কিছু। সে পয়সার কথা বলে নি। আবেদালি সারাটা দিন কাজ করেছে—যেহেতু কামলার সংখ্যা প্রচুর এবং মুসলমানপাড়াতে রুজি-রোজগার বন্ধ, যার গরু আছে সে দুধ বেচে একবেলা ভাত, অন্য বেলা মিষ্টি আলু সেদ্ধ খাচ্ছে। আবেদালির গরু নেই, জমি নেই, শুধু গতর আছে। গতর বেচে পর্যন্ত পয়সা হচ্ছে না। সারাদিন খাটুনির পর গৌর সরকারের সঙ্গে পয়সা নিয়ে বচসা হয়ে গেল। কুৎসিত গাল দিয়ে চলে এসেছে আবেদালি।

আবেদালির বিবি জালালি তখনও পেট মেঝেতে রেখে পড়ে আছে। সারাদিন কিছু পেটে পড়ে নি। জব্বর আসমানদির চরে গান শুনতে গেছে।

জালালি পেট মাটিতে রেখেই বলল, পাইলা নি ?

আবেদালি কোন উত্তর করল না। সে তার পাশ থেকে ছোট পুঁটলিটা ঢিল মেরে মেঝেতে ছুঁড়ে দিল। সামনে জোটনের ঘর। ঘরের ঝাঁপ বন্ধ। জালালি পুঁটলিটা দেখতে পেয়েই তাড়াতাড়ি উঠে বসল। এবং দাঁড়িয়ে খোলা কাপড়ের গিঁট ফের পেটে শক্ত করে বাঁধল। আবেদালি অন্যমনস্ক হবার জন্য হুঁকো নিয়ে বসল। আর জালালি ঝরাপাতা উঠোনে ঠেলে ঘোলা জলে পাতিল হাঁড়ি থলথল করে ধুতে গেল।

আবেদালি কতক্ষণ হুঁকো খাচ্ছিল টের পায় নি। সে দেখল উনানের ওপাশে বসে জালালি হাঁড়িতে চাল দিচ্ছে। ওর খাটো কাপড়। দু হাঁটুর ভিতর দিয়ে পেটের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে! শালি, মাগির বড় পেট ভাসাইয়া রাখনের অভ্যাস। শরীর দেয় না আর। তবু এই ভাসানো পেট আবেদালিকে কেমন লোভী করে তুলছে। আবেদালি বেশিক্ষণ বিবিকে এভাবে বসে থাকতে দেখলে কখনও কখনও কলাইর জমি অথবা একটা ফাঁকা মাঠ দেখতে পায়। সে ফের নিজেকে অন্যমনস্ক করার জন্য বলল, জব্বইরা গ্যাল কোনখানে ? কাইল থাইকা দ্যাখতাছি না।

জালালি আবেদালির দুষ্ট বুদ্ধি ধরতে পারছে যেন। সে বলল, জব্বইরা গুনাই বিবির গান শুনতে গ্যাছে। কাঠের হাতা দিয়ে ভাতের চালটা নেড়ে দেবার সময় জালালি বলল—গুনাই বিবির গান শুনতে আমার-অ ইসছা হয়।

এত অভাবের ভিতরও আবেদালির হাসি পাচ্ছে। এত দুঃখের ভিতরও আবেদালি বলল—পানিতে নদী-নালা ভাইসা যাউক, তখন তরে লইয়া পানিতে ভাইসা যামু।

জালালির এইসব কথাই যেন আবেদালির ছাড়পত্র। মাঠে নামার অথবা চাষ করার ছাড়পত্র।

আবেদালির দিদি জোটন এতক্ষণ দাওয়ায় বসে সব শুনছিল। এত সুখের কথা সে সহ্য করতে পারছিল না। সে সন্তর্পণে ঝাঁপটা আরও টেনে চুপচাপ বসে থাকল। কোন কর্ম নেই—শুধু আলস্য শরীরে। আর চুলের গোড়া থেকে চিমটি কেটে কেটে উকুন খুঁজছিল। আর জালালির এত সুখের কথা শুনেই যেন চুলের গোড়া থেকে একটা উকুনকে ধরে ফেলতে পারল। জোটনের মুখে এখন প্রতিশোধের স্পৃহা—মান্দার গাছের নিচে মনজুরের মুখ ভেসে উঠল। উকুনটাকে দু'নখের ভিতর রেখে ঝাঁপের ফাঁকে উঁকি দিতেই দেখল, উঠোনের অন্য পাশে আবেদালি। জালালিকে সে সাপ্টে যেন বাঘ ঘাড় কামড়ে অথবা থাবার ভিতর শিকার নিয়ে পালাচ্ছে। জালালি লতার মতো

দু'পায়ের ফাঁকে ঝুলে আছে। এখন চৈত্র মাস বলে কথায় কথায় ঘূর্ণি ঝড়। ধুলো উড়ে এসে ঝাপটা মারল—উঠোন অন্ধকার হয়ে ওঠায় ঘরের ভিতর আবেদালি কি করছে শিকার নিয়ে, দেখতে পেল না। সে রাগে দুঃখে এবার মাঠের ভিতর নেমে ধুলোর ঝড়ে ডুবে গেল।

চৈত্র মাস। সুতরাং রোদে খাঁ-খাঁ করছে মাঠ। পুকুরগুলোতে জল নেই। একমাত্র সোনালি বালির নদীর চরে পাতলা চাদরের মতো তখনও জল নেমে যাচ্ছে। মসজিদের কুয়োতে জল নেই। গ্রামের দুঃখী মানুষেরা অনেকদূর হেঁটে গিয়ে জল আনছে। সোনালি বালির নদীতে ঘড়া ডুবছে না। নমশূদ্রপাড়ার মেয়ে-বৌরা সার বেঁধে জল আনতে যাচ্ছে। ওরা খোঁড়া দিয়ে জল তুলছে কলসিতে। ট্যাবার পুকুরে, সরকারদের পুকুরে ঘোলা জল। গরু নেমে নেমে জল একেবারে সবুজ রঙ হয়ে গেছে। বড় দুঃসময় এখন। সে বের হবার মুখে কলসি নিয়ে বের হল। সোনালী বালির নদী থেকে এক ঘড়া জল এনে হাজি সাহেবের বাড়িতে উঠে যাবে। বুড়ো হাজি সাহেবের জন্য এত দুঃখ করে জল বয়ে আনলে কিছু তেলকড়ি মিলতে পারে—পয়সা না হোক, এক কড়ি ধান। সে নেমেই দেখল মাঠে কারা যেন ছুটে ছুটে যাচ্ছে। একদল লোক খাঁ-খাঁ রোদের ভিতর দিয়ে পালাচ্ছে। ওদের মাথায় বোধ হয় ওলাওঠার দেবী। বিশ্বাসপাড়াতে ওলাওঠা লেগেছে। সে এতদূর থেকে মানুষগুলোকে স্পষ্ট চিনতে পারছে না।

মাঠে পড়েই জোটনের মন হল—জালালি এখন উদোম গায়ে ঘরের ভিতর। উনানে ভাত সেদ্ধ হচ্ছে। পাতা, খেড় অথবা লতাপাতায় আগুন ধরে গেলে আগুন লাগতে কতক্ষণ! নদীর দিকে হেঁটে যাবার সময় জোটনের এমন সব দৃশ্য মনে পড়ছিল। চৈত্র মাসে আগুন যেন চালে বাঁশে লেগেই থাকে। জোটনের মন ভাল ছিল না, সে সেজন্য দ্রুত হাঁটছে। সকলেই জল নিয়ে ঘরে ফিরছে, তাকেও তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। গ্রামে গ্রামে ওলাওঠা মহামারীর মতো। যেসব লোকেরা রোদের ভিতর পালাচ্ছিল তারা ক্রমশ জোটনের নিকটবর্তী হচ্ছে। একেবারে সামনা-সামনি। জোটন তাড়াতাড়ি পাশে কলসি রেখে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। গাধার পিঠে ওলাওঠা দেবী যাচ্ছেন। মাথায় করে মানুষেরা ঢাকের বাদ্যি বাজাতে বাজাতে নিয়ে যাচ্ছে। জোটন ওদের পিছন পিছন বেশিদূর গেল না। সড়কের ধারে সব মান্দার গাছ। মান্দার গাছে লীগের ইস্তাহার ঝুলছে। জোটন সেই মান্দার গাছের ছায়ায় গ্রামের দিকে উঠে গেল।

পথে ফেলু শেখের সঙ্গে দেখা। ফেলু বলল, জুটি, পানি আনলি কার লাইগ্যা !

জোটন থুথু ফেলল মাটিতে। মানুষটার সঙ্গে কথা বললে গুনাহ। মানুষটা

এক কোপে আন্নুর মরদকে কেটে এখন আন্নুকে নিয়ে ঘর করছে। একদিন বসে বসে আবেদালিকে এইসব গল্প শুনিয়েছে—মানুষটার বুকের কি পাটা। ভয়ডর নাই। সামসুদ্দিনের সঙ্গে এখন লীগের পাণ্ডাগিরি করছে। জোটন কিছুতেই কথা বলছে না। আলের পাশে দাঁড়িয়ে ওর যাবার পথ খালি করে দিচ্ছে।

কিন্তু ফেলুর লক্ষণ ভাল না। সে দাঁড়িয়ে থাকল সামনে। কেমন মুচকি হাসছে। ওর একটা চোখ বসন্তে গেছে। মুখ কি ভয়ঙ্কর কুৎসিত। দাড়িতে অর্ধেকটা মুখ ঢেকে থাকে এখন। হাডুডু খেলার রস মরে গেছে। গতরে তেমন শক্তি নেই বুঝি। তবু চোখটা ভয়ঙ্করভাবে কেবল জ্বলছে। ফেলু মুচকি হেসে বলল, জুটি, তর ফকিরসাব তবে আর আইল না।

—কি করতে কন তবে! জোটন ফের থুথু ফেলল।

ফেলু এবার অন্য কথা বলল। কারণ জোটনের মুখ দেখে ধরতে পারছে এইসব ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর দাঁড়িয়ে থাকাটা সে পছন্দ করছে না। সে এবার খুব ভাল মানুষের মতো বলল, মানুষগুলাইন মাথায় কইরা কি লইয়া যাইতেছে।

—ওলাওঠা দেবীরে লইয়া যাইতাছে।

—মাথাটা ভাইঙা দিলে ক্যামন হয়?

জোটন এবারেও দাঁত শক্ত করে বলতে চাইল যেন, তর মাথাটা ভাঙমু নির্ব্বংশা। অথচ মুখে কোন শব্দ করল না। লোকটার জন্য সকলের ভয়ডর। কার মাথা কখন নেবে, হাসতে হাসতে হ্যাৎ করে মাথা কাটতে ফেলুর মতো ওস্তাদ আর নেই। মানুষটাকে কেউ ঘাঁটায় না। যেন ঘাঁটালেই সে রাতের অন্ধকারে বিশমিল্লা রহমানে রহিম বলে কোরবানির খাসির মতো গলা ছিঁড়ে দেবে। কোরবানির দিনে মানুষটা আরও ভয়ঙ্কর। সুতরাং জোটন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর থেকে বের হয়ে আসতে চাইল।

ফেলু দেখল চৈত্রের শেষ রোদ বাঁশগাছের মাথায়। সামসুদ্দিন তার দলবল নিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এখন সামনের মাঠ ফাঁকা। লতানে ঝোপ আর শ্যাওড়া গাছের জঙ্গল, আর জঙ্গলের ফাঁকে ওরা দু'জন। একটু ফষ্টিনষ্টি করার মতো মুখ করে সামনে ঝুঁকল, তারপর ফিসফিস করে বলল, দিমু নাকি একটা গুঁতা।

জোটন এবার মরিয়া হয়ে বলল, তর ওলাওঠা হইবরে নির্ব্বংশা। পথ ছাড়, না হইলে চিৎকার দিমু। বলা নেই কওয়া নেই, এমন একটা হঠাৎ ঘটনার জন্য জোটন প্রস্তুত ছিল না। ফেলু হাসতে হাসতে বলল, রাগ করস ক্যান! তর লগে মসকরা করলাম। তারপর চারিদিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলল, শীতলা ঠাইরেনের ডর আমারে দেখাইস না জোটন। কসত আইজ রাইতে মাথাটা লইয়া আইতে পারি।

সামসুদ্দিন দলবল নিয়ে সঙ্গে যাচ্ছে। লীগের সভা হবে। শহর থেকে মৌলবী সাব আসবেন। সুতরাং ফেলুকে নেতা গোছের মানুষের মতো লাগছে। পরনে খোপকাটা লুঙ্গি। গায়ে হাতকাটা কালো গেঞ্জি। আর গলাতে গামছা মাফলারের মতো বাঁধা। সে জোটনকে পথ ছেড়ে দিল। ওরা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। ওদের ধরতে হবে। সে আল ভেঙে হন্তদন্ত হয়ে ছুটছে। মাঠ থেকে ওলাওঠা দেবীও গ্রামের ভিতর অদৃশ্য। তখন ধোঁয়ার মতো এক কুণ্ডলী গাম মাঠ পার হয়ে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। সে যা ভাবছিল তাই। জল নেই নদী-নালাতে। মাঠ শুকনো, পাতা শুকনো। আর সারাদিন রোদে পাতার ছাউনি তেতে থাকে, পাটকাঠির বেড়া তেতে থাকে। জোটন কাঁখের কলসি নিয়ে দ্রুত ছুটছে। সে দেখল পাশের গ্রাম থেকেও মানুষেরা ছুটে আসছে। যারা সোনালী বালির নদীতে জল আনতে গিয়েছিল তারা পর্যন্ত দুঃসময়ে আগুনের উপর সব জল ঢেলে দিল।

কিন্তু এই আগুন, আগুনের মতো আগুন বাতাসের সঙ্গে মিলে-মিশে অশিক্ষিত এবং অপটু হাতের গড়া সব গৃহবাস ছাই করে দিতে থাকল। জোটনের ঘরটা পুড়ে যাচ্ছে। আবেদালির ঘরটা সকলের আগে পুড়েছে। আবেদালি জালালির অগোছালো শরীরটা সেই আগের মতো সাপ্টে ধরে রেখেছে। নতুবা ছুটে গিয়ে আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে। ওর কাঁথা, বালিশ মাদুর, কলাইকরা থালা, সানকি সব গেল। পুড়ে যাচ্ছে। ঠাস ঠাস করে বাঁশ ফাটছে, হাঁড়ি পাতিলের শব্দ হচ্ছে। আগুন গ্রামময় ছড়িয়ে পড়ছে। সুতরাং কাঁচা বাঁশ অথবা কলাগাছ এবং কাদা জল সবই প্রয়োজনীয়। চারদিকে বীভৎস সব দৃশ্য। যাদের কাঁথা-বালিশ আছে তারা কাঁথা বালিশ মাঠে এনে ফেলল। জালালি তখন আমগাছের নিচে বসে কপাল থাপড়াচ্ছে। পুবের বাড়ির নরেন দাস একটা দা নিয়ে এসেছে। যেসব ঘরে আগুন লাগেনি এবার লেগে যাবে—হল্‌কা বের হয়ে লম্বা হয়ে যাচ্ছে, চাল থেকে চালে আগুন লাফিয়ে পড়ছে, সেইসব চাল কেটে দিচ্ছে। ঘর আল্‌গা করে দিচ্ছে। যেন আগুন আর ছড়াতে না পারে। মানুষেরা সব হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, আগুন নেভানোর জন্য। কুয়োর জল ফুরিয়ে গেছে। হাজি সাহেবের পুকুরে যে তলানিটুকু ছিল তাও নিঃশেষ। মনজুরদের পুকুরে শুধু কাদামাটি। এখন লোকে কোদাল মেরে কাদামাটি চালে ছুঁড়ছে। তখন দূরে ওলাওঠা দেবীর সামনে ঢাক বাজছিল, ঢোল বাজছিল। বিশ্বাসপাড়াতে হরিপদ বিশ্বাস হিক্কা তুলে মারা গেল। সাইকেল চালিয়ে গোপাল ডাক্তার ছুটছে বাড়ি বাড়ি ডাকার জন্য, রুগী দেখার জন্য। সে যেতে যেতে আগুন দেখে এইসব অশিক্ষিত লোকদের গাল দিল। ফি বছর হামেশাই কোন না কোন দুঃখী গ্রামে এমন হচ্ছে। হাতুড়ে বদ্যি গোপাল ডাক্তারের এখন পোয়াবারো। রুগী কামিয়ে অর্থ,

গরীব লোকদের দুঃসময়ে অর্থ দিয়ে সুদ। আলের ওপর গোপাল ডাক্তার এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্রিং-ক্রিং বেল বাজাচ্ছে। যেন বলছে, কে আছ এস, টাকা নিয়ে যাও, ওষুধ নিয়ে যাও। অর্থ দিয়ে সুদ দেবে, ঋণশোধ করবে।

খড়ম পায়ে শচীন্দ্রনাথও ছুটে এসেছিল। জোটন, আবেদালি এবং গ্রামের অন্য সকলে সান্ত্বনার জন্য ওকে ঘিরে দাঁড়াল। শচীন্দ্রনাথ সকলের মুখ দেখল। সকলে এখন আবেদালি এবং জালালিকে দোষারোপ করছে। শচীন্দ্রনাথ বলল, কপাল।

সামসুদ্দিনের দলটা অনেক রাতে সভা শেষ করে ফিরে এল। ওরাও ঘুরে ঘুরে সকলকে সান্ত্বনা দিতে থাকল। আগুন নেভানোর চেষ্টায় বড় বড় বাঁশের লাঠি অথবা কাদামাটি নিক্ষেপ করে যখন বুঝল—কোন উপায় নেই, সব জ্বলে যাবে—তখন ওরা মসজিদের দিকে চলে গেল। মসজিদটা এখন দাউদাউ করে জ্বলছে।

চোখের ওপর গোটা গ্রামটা পুড়ে যাচ্ছে। বিশ্বাসপাড়াতে এখনও ওলাওঠা দেবীর অর্চনা হচ্ছে। মাঠে সব চাষের জমিতে পোড়া কাঁথা পেতে যে যার ভস্ম থেকে তুলে আনা ধন-সম্পত্তি আগলাচ্ছে। আগুনে ওদের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

যখন আগুন পড়ে এল এবং এক ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব—জোটন শোকে আকুল হতে থাকল। ঘন অন্ধকার চারিদিকে। থেকে থেকে ধোঁয়া উঠছে। সে অন্ধকারের ভিতর পোড়া ভস্ম ধন-সম্পত্তির আশায় চুপি চুপি হাজিসাহেবের গোলাবাড়িতে উঠে এল। সে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছিল। সে ঘুরেও গেল কতকটা পথ। পোড়া পোড়া গন্ধ। আশেপাশে সব দুঃখী মানুষদের হা-হুতাশের শব্দ ভেসে আসছে। অন্ধকারে জোটন পরিচিত কণ্ঠ পেয়ে বলল, ফুফা, আমার ঘরটা গ্যাল। ভালই হইছে। যামু গিয়া যেদিকে চোখ যায়। ঘরটার লাইগা বড় মায়া হইত। ফকিরসাব আর বুঝি আইল না, এও বলার ইচ্ছা। যখন এল না তখন আর কার আশায় সে এখানে বসে থাকবে! পরিচিত মানুষটা অন্ধকারে বসে টের পেল, জোটন অনেক কষ্টে এমন কথা বলছে।

পরিচিত মানুষটি বলল, আবেদালির আফুর হুফুর নাই!

জোটন এবার ফিরে দাঁড়াল। বলল, কারে কি কমু কন। পুরুষ মানুষ দিন নাই রাইত নাই থামু থামু করে, কিন্তু তুই মাইয়ামানুষ হইয়া আফুর হুফুর রাখলি না। ওদাম কইরা গায়ে গতরে পানি ঢাললি।

জোটন আর দাঁড়াল না। সে বকতে বকতে অন্ধকারে হাজিসাহেবের গোলাবাড়িতে ঢুকে গেল। বড় বড় গোলা সব ভস্ম হয়ে গেছে। ধান-পোড়া মুসুরি-পোড়া গন্ধ উঠছে। কোথাও থেকে এই দুঃসময়ে একটা ব্যাঙ রুপ রুপ করে উঠল। জোটন আগুনের ভিতর খোচা মারল একটা। না, কিছু বের হচ্ছে

না। অন্ধকারের ভিতর কিছু ছাইচাপা আগুন শুধু কতকটা ঝলসে উঠে ফের নিভে গেল। সেই আগুনে জোটনের মুখ পোয়াতির মুখের মতো—লোভী এবং পেট-সর্বস্ব চেহারা। সেই আগুনে জোটন অন্ধকারে পথ চিনে নিল। তখন ঢাকের বাজনা, ঢোলের বাজনা ওলাওঠা দেবীর সামনে। তখন হাজিসাহেব তার তিন বিবির কোলে ঠ্যাং রেখে কপাল চাপড়াচ্ছেন আর হাজিসাহেবের তিন বেটার তিন বিবি, মাঠের মধ্যে চষা জমির ওপর বিছানা পেতে ওৎ পাতার মতো অপেক্ষা করছে। যেন এটা ভালই হল। দিয়ে থুয়ে গড়াগড়ি খাবে।

জোটনের মনে হল এই অন্ধকারে সে একা নয়। অন্য অনেকে যেন হাতে কাঠি নিয়ে পা টিপে টিপে আগুনের ভিতর ঢুকে খোঁচা মারছে। দূর থেকে মনে হল ওর হাজিসাহেবের একটা ঘর তখনও জ্বলে নি। অথবা আর জ্বলবে না। সে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোল। সে ঘরের ভিতর গতকাল অনেকগুলো পাট দেখেছিল। জোটনের পরান এখন ভাদ্রমাসের পানির মতো টলটল করছে। আর তখন জোটনের পায়ের শব্দে অন্ধকার থেকে কে যেন বলল, কেডা?

—আমি...আমি...

জোটনের মনে হল অন্ধকারে আর একটা মানুষ যেন তন্ন তন্ন করে কি খুঁজছে।

জোটন বলল, তুমি কেডা?

জোটনের মনে হল ফেলু শেখ। সে অন্ধকারে সম্পত্তি চুরি করতে এসেছে। অথবা মাইজলা বিবির সনে পীরিত তার। হাজিসাহেবের মাইজলা বিবিও এই রাতের অন্ধকারে যখন কেউ কোথাও জেগে নেই, সকলে মাঠে নেমে গেছে, কিছু ফেলে গেছে এই নাম করে ফিরে এলে ফেলু শেখ চুপি-চুপি চিনে ফেলবে। কার টের পাবার কথা! ফেলু সেই এক জ্বালা নিবারণের জন্য, কি যে এক জ্বালা, উজানে যেতে হাজিসাহেব ভোলা অঞ্চলের পাশে কোন এক সাগরের কূল থেকে এই মাইজলা বিবিকে তুলে এনেছিল। তখন সঙ্গে ছিল ফেলু। ফেলু ফুসলে-ফাসলে টাকার লোভ দেখিয়ে হাজিসাহেবের নৌকায় এনে তুলেছিল মাইজলা বিবিকে। তখন হাজিসাহেব হাজি নন, তখন ফেলুর যৌবন কত বড়, ফেলুর কত নামডাক—জোয়ান মরদ ফেলু পীরিত করার অছিলা খুঁজছিল মাইজলা বিবির সনে। বোধ হয় এখনও সংগোপনে গানটা গায় মাইজলা বিবি। যখন কলিমুদ্দি সাহেব হজ করতে গেলেন এবং যখন হাজি হয়ে ফিরে এলেন তখন মাইজলা বিবির সেই গান গলায়। একা আতাবেড়ার পাশে বসে বসে গাইত। ঘাটে ফেলু বসে থাকত। সে ওদের তখন বড় নৌকার মাঝি—কায়-কারবারে তাকে হাটে-বাজারে যেতে হয়, সওদা করে আনতে হয়। তাই মাইজলা বিবির সনে পীরিত রঙ্গরস করার অছিলাতে ঘাটের মাঝি হয়ে সে বসে থাকত। কিন্তু কলিমুদ্দি হজ করে এসে সবই টের পেয়ে গেল। সে বলল, মিঞা, তোমার এই

আছিল মনে। তারপর হাজি সাহেবের ঘাট থেকে তাড়িয়ে দিল ফেলুকে। সে কবেকার কথা! সেই থেকে ফেলু আর হাজিসাহেবের বাড়ি যেতে পারে না। মাঝে মাঝে মাইজলা বিবির মুখ ওর পরানে দরিয়ার বান ডেকে আনে। তখন সে একা একা প্রায় পাগল ঠাকুরের সামিল। সে গোপাটে অথবা অন্ধকার রাতে চুপি-চুপি অশ্বত্থের নিচে নেমে আসে। ঝোপ-জঙ্গলে উবু হয়ে বসে থাকে। আতাবেড়ার পাশে কখন উঁকি দেবে মুখটা। বিবি আন্নু আজকাল হাজি সাহেবের বাড়িতে আসে-যায়। ছোট বিবির সঙ্গে আন্নুর খুব ভাব। সেই বিবি ওকে লুকিয়ে-চুরিয়ে তেল ছ্যায়, ডাল ছ্যায়, মাস কলাইর বড়ি ছ্যায়। আন্নু বলে ছোট বিবি ছ্যায়—কিন্তু জোটনের মন বলে সব মাইজলা বিবির কাজ। মাইজলা বিবির সনে পীরিত বড় ফেলুর।

জোটন বোঝে সব। আন্নু দেখায় ছোট বিবির সঙ্গে তার বড় ভাব—সখী সখী গলায় দড়ি ওলো সখী ভাব।

আর ফেলুর যখনই ভাবের কথা মনে হয় তখন আর এক মুহূর্ত দেরি করতে পারে না। সে এই অন্ধকারে আগুনের ভিতর মাইজলা বিবির মুখ মন শরীর দেখার বাসনাতে বসে আছে। চারিদিকে হল্লা—কে কোথায় ছুটছে—কে কোথায় আছে কে জানে। এই ত সময়। সুতরাং সে এখানে বসে বিবির উঠে আসার অপেক্ষায়—কি জাদু বিবির চোখে আর কি জাদু আছে এই মনের ভিতরে। এই মন কি যেন চায় সব সময়। ফেলু কি যেন চায় সব সময়। তার ঘরে যুবতী বিবি আন্নু, ফেলুর বয়স দুই কুড়ির ওপরে হয়ে গেছে—তবু মনটা কি যেন চায়! এত অভাব-অনটনের ভিতরও ভিতরটাতে কি পেতে কেবল ইসছা ইসছা করে। কিসে যে সুখ—এই আন্নুর জন্য সে কি কাণ্ড না করেছে! আলতাফ সাহেবের গলাটা সে হ্যাঁৎ করে কেটে ফেলেছে। পাট খেতের ভিতর আলতাফ সাহেব বাছ পাট কেমন হয়েছে দেখতে এসেছিল। বুড়ো আলতাফ সাহেবের শেষ পক্ষের বিবিকে সে ঈদের পার্বণে পীরের দরগায় দেখে প্রায় পাগলের মতো—কি করে, কি করে! কি করবে ফেলু ভেবে উঠতে পারল না। তখন ফেলুর যৌবনকাল যায়-যায়। সে তল্লাটের ফেলু। সুতরাং সে ঈদের আর এক পার্বণে মেমান সেজে চলে গেল আলতাফ সাহেবের বাড়ি। ওকে সে পাটের ব্যবসা করতে বলল—যান ফেলু কত বড় মহাজন। সে দাড়িতে আতর মাখত তখন, ভাল তফন কিনে আনত বাবুর হাট থেকে। মন খুশ থাকলেই ম্যাডেল ঝোলাত গলায়।

বুড়ো আলতাফ খেলার বড় উৎসাহদাতা ছিল। ফেলুর সঙ্গে কত জান পহচান, কত বড় খেলুড়ে ফেলু তার বাড়ি মেমান হয়ে এসেছে—বিবি, বেটারা দেখুক। খেলোয়াড় ফেলুকে সে অন্দর মহলে একদিন ঢুকিয়ে দিল। ফেলুর পীরিতের ছলাকলা সব যেন জানা। ফাঁক বুঝে ফুলের কুঁড়ির মতো

আলতাফের ছোট বিবিকে কাছিমের মতো বুকের ছাতি দেখাল একদিন। আন্নু দেখল সেই বুকের ছাতিতে মেডেলগুলি ঝকঝক করছে। আর আন্নুর তখন মনে পড়ছিল তার ছোট বয়সের কথা। বালিকা আন্নু খেলা দেখতে গেছে—হা-ডু-ডু খেলা। ফেলু এসেছে খেলতে পরাপরদির হাটে। সেদিন হাটবার ছিল না, তবু কি লোক, কি লোক! দু'দশ মাইলের ভিতর কোনো যুবা পুরুষ আর সেদিন ঘরে ছিল না। মেলার মতো প্রাঙ্গণে-প্রাঙ্গণে নিশান উড়ছিল—যান ঈদ-মুবারক। ফেলু সেই মেলার প্রাণ ছিল। খেলা শেষ হলে ফেলুর জয়-জয়কার। আন্নু, বালিকা আন্নু সেদিনই কেমন ফেলুর ভালবাসায় পড়ে গেল। সেই ফেলু এসেছে মেমান সেজে—আলতাফ সাহেবের বিবি নিজেকেই যেন শুধাল, এই আছিল তর মনে! তারপর সময় বুঝে হ্যাঁৎ করে গলাটা কেটে ফেলল ফেলু। পাটখেতের ভিতর হ্যাঁৎ করে কেটে ফেলল গলার নালিটা। যেমন সে কোরবানির দিন দশটা-পাঁচটা কোরবানিতে চাকু চালায়, বিশমিল্লা রহমানে রহিম বলে, তেমনি সে বিশমিল্লা রহমানে রহিম বলে হ্যাঁৎ করে নালিটা আলতাফ সাহেবের কেটে ফেলল। যেদিন সে বিবিকে বোরখা পরিয়ে নিয়ে আসে, সেদিন সে, হ্যাঁৎ করে গলা কেটে ফেলেছে কথাটা প্রথম জানাল বিবিকে। আন্নু শুনে বলল, এই আছিল তর মনে! বলে সেই বিস্তীর্ণ মাঠের ভিতর হা-হা করে হেসে উঠেছিল। আন্নুকে দেখলে মনেই হবে না ফেলুর জন্য সে এত বড় হত্যাকাণ্ড হজম করে গেছে।

অন্ধকারে ফেলু ও-পাশের একটা ছায়া-মূর্তি দেখছিল আর ভাবছিল। বুঝি চুপিচুপি মাইজলা বিবি এসে গেছে। কিন্তু এখন এ কি—কার গলা, জোটন মনে হয়। সে ধরা পড়ে যাবে, চুরি করতে এসেছে এই আগুনের ভস্ম ধন-সম্পত্তি থেকে—তার ভয় ধরে গেল।

জোটন তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলল, নাম কইতে পার না মিঞা? আমি কেডা!

—আমি মতিউর। ফেলু যেন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বলল।

—তোমাগ আর মানুষগুলান কই?

—আগুন দেইখ্যা পালাইছে।

—তুমি এখানে কি করতাছ?

—মানকিডা খুঁজতাছি।

—হাজিসাহেব জানে না, বৈঠকখানা ঘরডা পুইড়া যায় নাই!

—আগুনে বড় ডর হাজিসাহেবের। লোকটা দূর থেকেই কথা বলছে। অন্ধকারকে এখন ওদের সকলেরই ভয়। গলাটা স্পষ্ট নয়। গলাটা কখনও ফকির সাহেবের মত, কখনও মনে হচ্ছে ফেলুই মতিউরের গলায় কথা বলছে। তারপর মনে হল অন্ধকারে লোকটা কিছু কুড়িয়ে পেয়েছে। এবং পেয়েই এক দৌড়।

জোটন বলতে চাইল—ধর-ধর। কিন্তু বলতে পারল না। সে নিজেও একটা সানকি খুঁজতে এসেছে অথবা কিছু চাল, পোড়া ধান হলে মন্দ হয় না, পোড়া কাঁথা হলে মন্দ হয় না—সে এখন যা পেল তাই নিয়ে আম গাছের নিচে জড় করল। জালালি সব জোটনের হয়ে সংরক্ষণ করছে। সে অন্ধকার থেকে খুঁজে-পেতে আনছে আর জালালিকে দিয়ে আবার অন্ধকারে খুঁজতে চলে যাচ্ছে।

তখন কান্না ভেসে আসছিল বিশ্বাসপাড়া থেকে। তখন ওলাওঠা দেবীর সামনে আরতি হচ্ছিল। ওলাওঠাতে আবার হয়তো কেউ মারা গেল। জোটন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সানকি, ভাঙা পাতিল অথবা পেতলের বদনা খুঁজতে-খুঁজতে সেই কান্না শুনছে। রাত তখন অনেক। মাঠের ভিতর দিয়ে কারা যেন নদীর পাড়ের দিকে ছুটছে আর গাছের নিচে ইতস্তত যেসব লম্ফ জ্বলছিল—বাতাসে সব এক-দুই করে নিভে যাচ্ছে। মাঠে একটা মাত্র হ্যারিকেন জ্বলছে। হ্যারিকেনটা হাজিসাহেবের। মহামারী লাগলে যেমন এক অশরীরী বাতাসে ভেসে বেড়ায় তেমনি এই ধ্বংসের অন্ধকারে জোটন ভেসে বেড়াতে লাগল। জোটন অন্ধকারে পা টিপে-টিপে হাঁটছে। হাজিসাহেব মাঠে এখন কেবল সোভান আল্লা, সোভান আল্লা বলে চেঁচামেচি করছে। তিনি ঘুমোতে পারছেন না। মাঠের ভিতর তিনি তাঁর ছোট বিবিকে নিয়ে আছেন। কে কখন কি করে যাবে—ভয়ে ঘুম আসছিল না। যাদের ভাঙা ঘর শুধু গেছে, ছেঁড়া হোগলা বিছিয়ে ঘুম যাচ্ছে তারা। সকাল হলেই হিন্দু পাড়াতে রুজি-রোজগারের জন্য উঠে যেতে হবে এবং হিন্দু পাড়াতেই সব বাঁশ কাঠ। সব শণের জমি ওদের। ওদের থেকে চেয়ে আনলে ঘর এবং ঘর বানাতে-বানাতে ঘোর বর্ষা এসে যাবে। জোটন এ-সময় নিজের ঘরের কথা ভাবল, বর্ষার কথা ভাবল, ফেলু সময়-অসময় গুতা দিতে চায়, মনজুরের মতো চোখ-মুখ গরম ছিল না, চান্দের লাখান গড়বন্দি আছিল না—দিমু তরে একদিন একটা গুতা—এইসব ভেবে জোটন নিজের দুঃখকে জোড়াতালি দিয়ে পোড়া ভাঙা ঘরের ভিতর থেকে আর একটা বদনা টেনে বের করতেই এক দৌড়। সে জালালির পাশে এসে বসল, ছাখ, কি আনছি।

জালালি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বদনাটি দেখল। কুপির আলোতে এত বড় একটা আস্ত পেতলের বদনা—সে কিছুতেই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। আবেদালি ঘাড় কাত করে তাকিয়ে আছে। সে হাত দিয়ে প্রায় যেন ছুঁয়ে দেখল।

—এক বদনা পানি, পানি আন ঢক-ঢক কইরা খাই। বদনা দেখেই আবেদালির কেমন জলতেষ্টা পেয়ে গেল।

জালালি বলল, আমি যাই। যদি কিছু মিল্যা যায়!

জোটন জল আনতে গেছে। আশে-পাশে কেউ নেই। আবেদালি তাড়াতাড়ি বসে পড়ল। তারপর এক থাপ্পড় নিয়ে গেল গালের কাছে। বলল, তর এত সাহস! তুই যাবি চুরি করতে। পরে সে গামছা দিয়ে মুখ মুছল। ঘামে গরমে মুখ চুলকাচ্ছে। সে আমগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসতেই দেখল জোটন জলের জন্য উঠে যাচ্ছে। জলের বড় অভাব। সে অন্ধকারে এখন জল চুরি করতে যাচ্ছে।

জালালি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর কচ্ছপের মতো গলা লম্বা করে দিল। তারপর চিৎকার করে বলল, তর লাইগাই ত নির্বংশা আগুন লাগল রে!

আবেদালি চিৎকারে ভয় পেয়ে গেল।—আমার লাইগ্যা বুঝি!

এবার জালালি খল্‌খল্ করে উঠল, আমি সকলরে না কইছি ত কইলাম কি!

—কি কইবি?

—কমু তাইন আমারে ঘরে জোর কইরা ধইরা নিছে।

—ঘরে নিছি, ভাল করছি। তুই নাড়া দিয়া রানতে-রানতে প্যাট ভাসাইলি ক্যান?

—তার লাইগ্যা বুঝি সময়-অসময় নাই?

গোটা ঘটনাটাই আগুনের মতো। আবেদালি এবার আরও ঘন হয়ে বসল। আমার বুঝি ইচ্ছা হয় না ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করি।

ফকিরসাব নিমগাছটার নিচে বসলেন। গাছটাতে একটা কাক উড়ছে না। সুতরাং ফকিরসাব এ-গাঁয়ের ঘরগুলো দেখলেন। বৈশাখ মাস শেষ হচ্ছে। এখন গাছে-গাছে আমের ভাল ফলন। তিনি তাঁর মালা-তাবিজের ভিতর থেকে একটা বড় পুঁটলি বের করলেন। আর গোস্তের ওজন দেখবার সময় মনে হল এবার গ্রামে কোরবানির সংখ্যা কমে গেছে। তিনি হাত গুনে বলতে পারছেন যেন সংখ্যায় কত তারা, বকরি ঈদে এত কম কোরবানি এই প্রথম আর এই জন্যই কাকগুলি গোস্ত খুঁজে-খুঁজে হন্যে হচ্ছিল। কাকগুলি উড়ে-উড়ে হয়রান হয়ে গেছে অথচ কিছুই মিলছে না। ওরা উড়ে-উড়ে এদিক-ওদিক চলে গেল। সুতরাং তিনি কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত বোধ করছেন। কোথাও পুঁটলির ভিতর পান-সুপারি আছে অথবা চুনের কৌটা থেকে চুন নিয়ে ঠোঁটে লাগাবার সময়ই সুখী পায়রার মতো অনেক দিন আগের কসমের কথা মনে পড়ে গেল।

সামনে সড়ক। দূরে কোথাও আজ হিন্দুদের মেলা আছে। ফকিরসাব মনে করতে পারলেন, হয়তো এদিনেই নয়পাড়া পার হলে ঘোড়দৌড়ের মাঠে মরশুমের শেষ ঘোড়দৌড় হবে। একবার ঘোড়দৌড়ের মাঠ গেলে হয়। কিন্তু

অনেক দিন পর এদিকে আসায় কসমের কথা মনে পড়ে গেল। সড়কের পথে গলায় ঘণ্টা বাজিয়ে ঘোড়া যাচ্ছে। বিশ্বাসপাড়ার কালু বিশ্বাসের ঘোড়া—য্যান নয়নের মণি। ঘোড়াটার রঙ কালো কুচকুচে। কপাল সাদা আর সোনালী কড়ির মালা ঝুলছে ঘোড়ার গলাতে। ঘোড়াটা সড়ক ধরে দূরে চলে গেল। গ্রীষ্মের শেষ জল-ঝড়ে এ-অঞ্চলের কিছু বাড়ি-ঘর ফেলে দিয়েছে। মাঠে ছোট ছোট পাটের চারা বাতাসে দুলছে। ইতস্তত মাঠের ভিতর মাথলা মাথায় চাষীরা পাটের জমিতে নিড়ান দিচ্ছিল আর আল্লা ম্যাঘ দ্যা, পানি দ্যা—এই গান গাইছিল। চৈত্রের খরা রোদ এবং শুকনো ভাবটা কেটে গেছে। এখন শুধু সবুজ প্রান্তর এবং মানুষের মুখে সুখের ইচ্ছা অথবা যেন বছর শেষ, দুঃখ শেষ—এখন অভাব কম, গরীব মানুষেরা অন্তত শাকপাতা খেয়ে বাঁচবে। বিশেষ করে এই সব গ্রীষ্মের দিনে কচি পাট-পাতার শাক অথবা শুক্তোনি এক সানকি ভাতের সঙ্গে মন্দ নয় এবং যখন কোরবানির গোস্ত মুশকিলাসানের পাত্রটার নিচে যত্ন করে রাখা আছে, যখন মনে হচ্ছিল শেষ বয়সের সম্বল জোটন বিবিকে ধরে নিলে গোস্তের মতোই সস্তা হবে তখন সড়ক ধরে সামনের গ্রামটার দিকে হাঁটা যাক।

মুশকিলাসানের আধারে তেল নেই। দরগার ছইয়ের নিচে রসুন গোটা ভিজানো আছে। তার তেল বড় উজ্জ্বল আলো দেয়। আর এ-অঞ্চলে তিনি রাতে মুশকিলাসানের লম্ফ নিয়ে ঘুরতে পারবেন না। দরগায় গিয়ে লম্ফে আবার তেল ভরতে হবে। ফকির সাহেবের ইচ্ছা ছিল রসুন গোটার তেলে মুশকিলাসানের লম্ফ জ্বালাবেন এবং ছোটদের চোখে সুর্মা টেনে আস্তানা সাহেবের দরগাতে রসুলের কাছে দোয়া, জোটনের জন্য দোয়া ভিখ মেগে নিবেন। কিছুই হল না।

মসজিদের কুয়া থেকে প্রথম জল তুলে পা ধুলেন ফকিরসাব। তারপর শতচ্ছিন্ন এক জোড়া কাপড়ের জুতো, যার ফাঁকে কচ্ছপের গলার মতো বুড়ো আঙুলটা বের হয়ে আসে এবং জুতোর ভিতর পা গলাবার সময় একটা ইষ্টিকুটুম পাখি ডেকে উঠলে ফকিরসাব ভাবলেন, দিনটা ভালই যাবে। শেষে আবেদালির বাড়িতে ওঠার মুখেই ডাকতে থাকলেন, মুশকিলাসান সব আসান করেন এবং এইসব বলতে-বলতে উঠোনে উঠেই তিনি বুঝতে পারলেন পরবের দিনে জোটন বাড়ি নাই। তিনি যেন এই উঠোন এবং ঝোপ-জঙ্গলকে উদ্দেশ করে বললেন, ওনারে ডাইকা দিলে ভাল হয়। অনেক দূর থাইকা আইছি, আবার কবে আমু ঠিক নাই। তাই ভাবছি অরে নিয়া যামু। তারপর কারো উপর ভরসা না করে নিজেই ছেঁড়া লুঙ্গি ঘাসের উপর বিছিয়ে বসে পড়লেন। খুব সন্তর্পণে মালা-তাবিজ খুলে পোঁটলা-পুঁটলি পাশে রাখলেন। অন্য কোন দিকে তাকাচ্ছেন না। যেন সব ঠিকই করা আছে, উকিল বলা আছে, মৌলবী

সাবকে বলা আছে আর দু-চারটে দোয়া। ফকিরসাব এবার গলা খেকারি দিয়ে চোখ তুলতেই দেখলেন, জালালি ঝোপ-জঙ্গল ভেঙে জোটনকে খবর দিতে হাজিসাহেবের বাড়ির দিকে ছুটছে।

ফকিরসাব ছেঁড়া তফনের উপর বসে জামরুল গাছের ফাঁকে সেই অস্পষ্ট মুখ দেখতে পেলেন। জোটন আসছে। আগের শক্তিসামর্থ্য যেন গায়ে নেই। জোটন নিজের ঘরে ঢুকে গেল। ফকিরসাব জোটনকে আর দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি নানারকম শব্দে ধরতে পারছেন জোটন এখন আর্শিতে নিজের মুখ দেখছে। ভিজা শণের মতো চুল—কত কষ্টে খোঁপা বাঁধা! আর তিনি মুখ না তুলেও যেন ধরতে পারছিলেন, জোটন বেড়ার ফাঁকে ফকিরসাবের মুখ হাত-পা অথবা সব অবয়ব দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যাচ্ছে।

ফকিরসাব গাছ-গাছালিকে উদ্দেশ করে যেন বললেন, তাড়াতাড়ি করতে হয়।

ঘরের ভিতর জোটন সরমে মরে যাচ্ছিল। ঘরের ভিতর ফিসফিস শব্দ, আবেদালিরে আইতে দ্যান।

ফকিরসাব উঠোন থেকে বললেন, উকিল দ্যাখতে হয়।

জোটন এবার যেন গলায় শক্তি পাচ্ছে। ভাইবেন না। আবেদালি যাইয়া সব ঠিক কইরা দিব।

ফকিরসাব সঞ্চিত কোরবানির গোস্তের উপর হাত রেখে বললেন, ব্যালায় ব্যালায় রওনা হইতে হয়। না হইলে গোস্ত পইচা যাইব। বলে ফকিরসাব গোস্তের পুঁটলিটা নাকের কাছে এনে শুঁকে বললেন, গোস্তে মশলা নুন দিতে আপনের হাত কেমন?

এবার জোটন ঘরের ভিতর খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, ঘরে নেওয়ার আগে একবার পরখ কইরা দ্যাখতে সাধ যায় বুঝি!

—দ্যাখতে ইচ্ছা যায়, কিন্তু ব্যালা যে পইড়া আইতাছে।

জোটন দাঁত খুঁটছিল। মুখ কুলকুচা করে হাঁড়ির ভিতর থেকে পান-সুপারি বের করে মুখে পুরল। তারপর ঝোপের ফাঁকে যখন দেখল জালালি আসছে, যখন দেখল গোপাটের অশ্বত্থ গাছের মাথা থেকে রোদ নেমে যাচ্ছে এবং যখন কামলা ফিরছে মাঠ থেকে, মাথায় পাট গাছের আঁটি, ঘাসের বোঝা আর আবেদালি পরবের দিনেও ঠাকুরবাড়ির কাজে গেছে—ফেরার সময় এখন, হয়তো সে ফিরছে, তখন জোটন ঠোঁট রাঙা করে বাবুর হাটের ডুরে শাড়ি পরে দেখল বুকের মাংস একেবারে শুকিয়ে গেছে। সে একটু ঠোঁট থেকে থুতু এনে বুকে মেখে দিল। পাতলা থুতু দিয়ে শরীরের শুকনো ভাবটা কমনীয় করতে চাইছে অথবা মনে হল, ফকিরসাবের বুড়ো হাড় আঘ্রানী ধানের মতো—আশ্রয় দেবে, নিকা করবে এবং ফাঁকা মাঠের মতো উদোম গায়ে রঙ্গরস করবে।

দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা—আল্লার মাশুল তুলতে এই বয়সেও গতর কম কোশল করবে না।

বেলায় বেলায় আবেদালি এল। বেলায় বেলায় করণীয় কাজটুকু আবেদালি করে ফেলল। দু-চারজন গাঁয়ের লোক জমা হয়েছে উঠোনে। আবেদালি সকলকে পান-তামুক খাওয়াল। হাজিসাহেবের ছোট বিবি একটা ছেঁড়া বোরখা দিল জোটনকে। আগুনের ভস্ম থেকে যে পেতলের বদনাটা তুলে এনেছিল, ফকিরসাবের পাশে সেটা রেখে দিল জোটন।

দুটো মেটে কলসি এনেছিল জোটন লাঙ্গলবন্দের বান্নি থেকে—যাবার সময় জোটন জালালিকে ডেকে কলসি এবং ঘরের সামান্য জিনিসপত্র অর্থাৎ গ্রীষ্মের দিনে সংগ্রহ করা ঝরা পাতা, পাটকাঠি এবং দুটো সরা—সব দিয়ে দিল। আর ছেঁড়া তফনে জোটন তার ভাঙা আশি, ঠাকুরবাড়ির বৌদের পরিত্যক্ত ভাঙা কাঠের চিরুনী, একটা সানকি আর সম্বলের মধ্যে কিছু ভাতের শেউই বাঁধা পুঁটলি হাতে তুলে নেবার সময়ই অন্যান্যবারের মতো আবেদালির হাত ধরে কেঁদে ফেলল। এবার নিয়ে চারবার নিকা, এবং এবার নিয়ে চারবার জোটন এই উঠোন ছেড়ে বাপের ভিটা ছেড়ে মিঞা মানুষের সঙ্গে খোদার মাশুল তুলতে চলে গেছে। ফকিরসাব পোঁটলাপুঁটলি যত্ন নিয়ে বাঁধছে। পিতলের বদনাটা হাতে নিয়ে দু'বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বদনা থেকে পানি চুষে খেলেন। তারপর বাকি পানিটুকু ফেলে দিয়ে—বাঁ-হাতে পেতলের বদনা, কাঁধে ঝোলাঝুলি এবং ডান হাতে মুশকিলাসান, মুখে আল্লার নাম অথবা রসুলের নাম নিতে নিতে গোপাটে নেমে যাচ্ছেন। জোটন এক হাতে একটা পুঁটলি নিয়ে আবেদালির ঘরে ঢুকে বোরখাটা মাথার ওপর তুলে দিল। আবেদালিকে উদ্দেশ করে বলল, জালালিরে মাইর-অ ধইর-অ না ভাই। জালালিকে উদ্দেশ করে বলল, সময় মত দুইটা রাইন্দা খাইস।

এসব কথা বলার সময়ই জোটনের চোখ থেকে জল পড়ছিল। কত দীর্ঘদিন পরে ফের এই নিকা এবং এদিনে সে তার মোট তেরটি সন্তানের কথা মনে করতে পারল। যেন তাদের জন্যই চোখের জল। কোথাও তার দীর্ঘদিন ঠাঁই হয় না। জোটন চতুর্থবার স্বামীর ঘর করতে যাচ্ছে এবং আল্লার মাশুলের জন্য এই যাত্রা। যদি কোন কারণে আল্লার দরবার শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তবে সে ফের ফিরে আসবে এবং সোনালী বালির নদীতে অথবা বিলে শালুক তুলে, বাড়ি বাড়ি চিঁড়া কুটে, পরবে পরবে গেরস্থ মানুষের কাজ করে দুঃখে সুখে তার দিন কেটে যাবে।

বোরখা গায়ে জোটন চলে যাচ্ছিল। এই অঞ্চলের সকলে দেখল, আবেদালির দিদি জোটন ফের চলে যাচ্ছে। কবে আবার সন্তান-সন্ততি প্রসব

করে ফিরে আসবে, কবে আবেদালি ফের ওর দখিনদুয়ারি ঘরটা তুলে দিতে দিতে বচসা করবে জোটনের সঙ্গে, তা যেন সকলের জানা। হিন্দুপাড়ার মেয়েরা এই ঘটনায় খিলখিল করে হেসে একে অপরের গায়ে গড়িয়ে পড়ল। দীনবন্ধুর দ্বিতীয় পক্ষের বৌ খবর পেয়ে ড্যাফল গাছটার নিচে ছুটে এসেছে। মালতী ঝোপের ভিতর বেথুন ফল খুঁজছিল, সে জোটনকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে ডাকল, বৌদি, দেইখা যান কাণ্ড। জুটি একটা ফকিরের লগে কই যাইতাছে গিয়া। ঠাকুরবাড়ির বৌরা পর্যন্ত পুকুর পাড়ে এসে দাঁড়াল। হাতে মুশকিলাসান, বগলে কোরবানির গোস্ত এবং গলায় মালাতাবিজ—ফকিরসাব ওপরের দিকে চেয়ে চেয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। গায়ে শতচ্ছিন্ন আলখাল্লা এবং কাঁথার সেলাইর মতো সেলাই সেখানে। যেখানে যে কাপড়টুকু পাওয়া গেছে তাই জুড়ে দিয়েছেন ফকিরসাব। ঠিক এই আল্লার দুনিয়ার মতো—যেখানে যা পাওয়া গেছে এই দুনিয়ার জন্য তিনি হাজির করেছেন। এই মাঠ, গাছপালা, পাখি এবং নদীর তীর, তরমুজ খেত সবই যেন এক শতচ্ছিন্ন সেলাই করা জোব্বা। বিচিত্র দোঁয়াস মাটি এবং জলের রং-এ দুনিয়া রাঙিয়ে রেখেছেন। তিনি এবার চোখ তুলে দেখতে পেলেন পিছনে জোটন বিবি—বোরখা পরে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে তার, তবু এই চেনা পথটুকু বোরখা পরে পার না হলে সম্মান থাকে না। তিনি তাকে জোরে পা চালিয়ে হাঁটতে বললেন।

জোটন বোরখার ভিতর পেতলের বদনা রেখে জোরে জোরে হাঁটার চেষ্টা করছে। এই গ্রাম মাঠ ফেলে সে চলে যাচ্ছে, নরেন দাসের বিধবা বোন মালতীকে এখন কিছু বলার ইচ্ছা। মালতীর হাঁসগুলি প্যাক প্যাক করছিল মাঠে। পুরুষ হাঁসটার জন্য মালতীর বড় কষ্ট। মালতীর শরীর আর আল্লার মাশুল তুলবে না ভেবে জোটনেরও ভিতরে ভিতরে কষ্ট হচ্ছিল।

মাঠ ভেঙে কখনও নদী-নালা-অতিক্রম করে অথবা বাঁশের সাঁকোতে ওঠার সময় ফকিরসাব জোটনের হাত ধরে পার করে দিচ্ছিল। তিনি সওদা করে ফিরছেন। হাতে পানিফলের মতো মুশকিলাসানের লম্ফ, তিনদিকে তিনমুখ, কাজল জমানো গর্তে ছোট একটা কাঠি। চার ক্রোশের মতো পথ। জ্যৈষ্ঠ মাস বলে নদীতে জল বাড়তে শুরু করেছে। ফকিরসাব জোটনকে একটা পলাশ গাছের নিচে দাঁড় করিয়ে সামনের হাটে সওদা করতে গেলেন। নতুন মেমান ঘর আলো করে রাখবে। দূরবর্তী কোন দরগার পাশে ফকিরসাবের ছই দেয়া ছোট মাচানের ঘর। সাঁজ লাগলে দরগার কবরে কত মোমবাতির আলো, আলোতে খানিক সময় ঝোপ-জঙ্গল সাদা হয়ে থাকে। তখন তিনি কালো রঙের আলখাল্লা পরে মুশকিলাসানের লম্ফ জ্বেলে অন্ধকার মাঠ ভেঙে গেরস্থ বাড়ির উঠোনে উঠে যান। মোটা গলায় হেঁকে ওঠেন মাঠ থেকে। গভীর রাতে মানুষেরা ভয় পায়—মুশকিলাসান আসান করে, বলতে বলতে উঠে

আসেন। জবা ফুলের মতো চোখ লাল। রসুন গোটার তেল চোখে মেখে চোখ জবা ফুলের মতো করে না রাখলে—মানুষ রাতে ভয় পায় না, পয়সা দেয় না। তখন ফকিরসাবের মাচানে ফেরার স্পৃহা আর থাকে না। অন্ধকারের ভিতর, বিচিত্র সব ঘাসের ভিতর অথবা জমির আলে আলে এক ভয়ঙ্কর রহস্য জেগে থাকে। মনে হয় তাঁর এইসব অলৌকিক রহস্যের ভিতর আল্লা কোথাও না কোথাও অদৃশ্য হয়ে আছেন।

বাজার করে ফিরতে বেশিক্ষণ সময় নিলেন না ফকিরসাব। হাট পার হলে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রম। পলাশগাছের নিচে শুধোলেন, যাইবেন নাকি একবার বাবা লোকনাথের কাছে।

জোটন বোরখার ভিতর থেকে বলল, তবে চাইর পয়সার মিসরি কিনা লন।

কিন্তু ফকিরসাব যেন সহসা মনে করার মতো বললেন, কোরবানির গোস্ত নিয়া যামু কি কইরা বাবার কাছে। তার চাইতে বাবার উৎসবে আমুনে আপনেরে নিয়া। সুতরাং আর দেরি করা ভাল নয়। বেলাবেলিতে পৌঁছাতে পারলে হয়। আরও ক্রোশখানিক পথ। ওরা জোরে পা চালিয়ে হাঁটতে চেষ্টা করল।

ফকিরসাব বললেন, ক'দিন ভাবছি একবার আপনের কাছে চইলা যাই। কিন্তু ভরসা আছিল না।

—ক্যান এই কথা কন!

—আমার ছই ছোট। মেলা বন-জঙ্গল। কবরখানা। বড় বড় শিরিশ গাছ। রাতে ডর লাগতে পারে।

আপনে আমার নয়নের মণি। বলার ইচ্ছা ছিল জোটনের কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এমন ভালবাসাবাসির কথা বলতে পারল না।

এসময় বেলা পড়ে আসছিল। সূর্য মেঘনার অন্য পারে অস্ত যাচ্ছে। মাঠের পুকুরে অজু সেরে নামাজ পড়তে বসে গেলেন। জোটনও পাশাপাশি বসে—যখন কেউ নেই আশেপাশে—কেবল ফাঁকা মাঠ, সূর্য অস্ত যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, জোটন পা ভাঁজ করে ফকিরসাহেবের পাশে বসে পড়লে মনে হল তার সামনের গ্রামটাই বুঝি সেই প্রিয় সুলেমানপুর। তার প্রথম সাদি সমন্দের কথা মনে হল। গ্রামের সে বড় বিশ্বাসের ছোট বিবি ছিল। সেদিন সে যেন বেগম। তার সন্তানেরাই হয়তো দূরের মাঠে অবেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। জোটন নিজের প্রথম সাদি সমন্দের কথা ভেবে আকুল হতে থাকল।

আস্তানা সাবের দরগাতে পৌঁছাতে ওদের রাত হয়ে গেল। চারিদিকে [illegible]। চারিদিকে ঘন বন এবং মাঝে মাঝে শান বাঁধানো কবর, কেউ কেউ মোমের বাতি জ্বেলে দিয়ে গেছে। আজ কি বার, বুঝি কেউ কবর দিতে এসে সব কবরে মোমবাতি জ্বেলে দিয়ে গেছে। অন্ধকার রাতে লাঠি ঠুকে ঠুকে

নিজের আস্তানার ভিতর ঢুকে বললেন, ডর নাইগ বিবি। আপনে বোরখা খুইলা ইবারে হাওয়া খান। কবরের আলো থাইকা আসানের লম্ফটা জ্বালাইয়া আনতাছি।

ফকিরসাব লম্ফ জ্বালতে গেলে জোটন বোরখাটা খুলে রাখল। অন্ধকারে সে কিছুই টের করতে পারছে না। এমন ঘন অন্ধকার জোটন যেন জীবনেও দেখে নি। একটা কুকুর ডাকছে না, একটা মোরগ ডাকছে না। সে দূরবর্তী কোন গ্রামে আলো পর্যন্ত দেখল না। যেন সে যোজন দূরে চলে এসেছে। ওর ভয়ে আতঙ্কে কান্না পাচ্ছিল। জঙ্গলের ভিতর শুকনো পাতার শুধু খচখচ শব্দ। মৃত মানুষেরা ইতিমধ্যেই যেন যুদ্ধের মহড়া দেবার জন্য যোজন দূর থেকে জিনপরী হয়ে নেমে এসেছে।

তখন দূরে মুশকিলাসানের আলো এবং শেয়ালের চিৎকার। ঝোপ অথবা গাছগাছালির ফাঁক থেকে ফকিরসাবকে কোন রসুলের মতো মনে হচ্ছে যেন। সামনে অনেকগুলি অর্জুন গাছ ঊর্ধ্ববাহু হয়ে আছে। তার নিচে নতুন কবর খোঁড়া হচ্ছে। জোটন নতুন কফিনের গন্ধ পাচ্ছিল। অথবা কারা যেন বলাবলি করছে, সোলেমানপুরের বড় বিশ্বাসের ছোট বিবির পহেলা সন্তানের ইন্তেকাল হচ্ছে।

যারা কবরে কফিন নামাচ্ছিল জোটন তাদের দেখতে পাচ্ছে না। ফকির-সাব দরগার চারপাশটায় কেবল কি খুঁজে মরছেন লম্ফের আলোতে। কবর দিতে যারা এসেছে তারা সব এখন ফিরে যাচ্ছে। জোটন এই প্রথম এখানে মানুষের সাড়া পেল। ওদের হাতে হ্যারিকেন। ওরা নিচের পথ ধরে মাঠে নেমে যাচ্ছে। বড় বিশ্বাসের পেয়ারের ধন সকলের মুখে ছাই দিয়ে গেল। আল্লার বড় বিশ্বাসভাজন ছিলেন তিনি। বড় বিশ্বাসের নাম শুনতেই ছই-এর নিচে জোটনের মুখ শুকিয়ে গেল। সে ফকিরসাবের অপেক্ষায় বসে আছে, এলে খবরটা নেবে, কারণ লোকগুলি পথে যেতে যেতে সোলেমানপুরের বড় বিশ্বাসের কথা বলছিল। বাকি কথা অস্পষ্ট। বাকি কথা কানে আসে নি। মানুষগুলোকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। হ্যারিকেনটা মাঠে দুলতে দুলতে চলে যাচ্ছে।

ওখানে কার ইন্তেকাল হল, জিজ্ঞেস করতেই ফকিরসাহেব আসানের আলোটা জোটনের মুখে তুলে ধরলেন। কিছুক্ষণ মুখে কি দেখলেন। তারপর খুব ঘন হয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, আপনের মুখে এই কথা শোভা পায় না বিবি। আপনে ফকিরসাবের শেষ বিবি। বলে আরও কাছে মুখটা এনে তদগত চিত্তে দেখতে থাকলেন, তারপর একসময় আবেগে বলে ফেললেন, কথা দ্যান, আমারে ছাইড়া যাইবেন না।

—যামু না।

—ইবারে গোস্ত রাইন্দা ফ্যালান।

মাচানের নিচে নানা রকমের হাঁড়িপাতিল। ভাঙা এবং ভাল—সব রকমের। মাঠে জলাশয়। পিছনে নোনা-ধরা ইটের প্রাচীন মসজিদ। ফকিরসাব লম্ফটাকে বাঁশে ঝুলিয়ে দিলেন। সব জামা-কাপড়, মালাতাবিজ খুলে শুধু একটি নেংটি পরলেন। তারপর জলাশয় থেকে জল এনে দিলেন। ওরা রান্না হলে গোস্ত-ভাত খেয়ে তাড়াতাড়ি ছইয়ের ভেতরে ঢুকে মুখোমুখি বসে অন্ধকারে গল্প আরম্ভ করলেন।

আর যখন অন্ধকার এই শয়তানের রাজত্ব গিলে খাচ্ছে, যখন মনে হচ্ছিল এই ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর পরী অথবা জীনেরা হেঁটে বেড়াচ্ছে তখন একদল ধূর্ত শেয়াল নতুন কবরের দিকে সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে। নেমে আসার সময় ওরা পরস্পর মাংসের লোভে খ্যাকখ্যাক করছিল। জোটন বলল, আমার ক্যান জানি ডর লাগতাছে।

ফকিরসাব জানেন, সোলেমানপুরের বড় বিশ্বাসের ছোট বিবির বড় ছেলে কলেরায় মারা গেছে, জানেন শেয়ালেরা খাবার লোভে কবরে পা বাড়িয়ে গর্ত খুঁড়ছে। সুতরাং তিনি সান্ত্বনা দেবার মতো আদর করে বললেন, শিয়ালেরে এত ডরান! ডর নাই। অরা ক্ষুধায় এমন করতাছে। মনে আছে আপনের —পাঁচ বছর আগে আমার একবার ক্ষুধা পাইছিল। আপনে শুটকিমাছ দিয়া প্যাট ভ-ই-রা খাওয়াইছিলেন। প্যাট ভরলে অরা হুক্কাহুয়া করব না।

জোটনের স্মৃতিতে সব ভেসে উঠছে। সেদিন ফকিরসাব পরিপাটি করে ছেঁড়া মাদুরে খেতে বসেছিলেন। তিনি খেতে বসে দু'বার আল্লার নাম উচ্চারণ করে আকাশ দেখেছিলেন। আকাশ পরিষ্কার। বড় তকতকে সেই উঠোনে ঝকঝকে আকাশের নিচে বসে গব গব করে খেতে পারছিলেন না। যেমন পরিপাটি করে বসেছিলেন, তেমনি ধীরে-সুস্থে এক সানকি মোটা ভাত শুটকির বর্তা দিয়ে কিঞ্চিৎ মেখে বেশ তারিয়ে তারিয়ে খেয়েছিলেন। ঠিক যেন এই মাচানের মতো। কোন জবরদস্তি নাই। নিচে একটা দুটো ভাত পড়েছিল, তিনি আঙুলের ডগায় তুলে সন্তর্পণে মুখে পুরে···যেন এই মোটা ভাত ফুরিয়ে গেলে আর পাওয়া যাবে না···আল্লার বড় অমূল্য ধন। জোটনের এখন মনে হচ্ছে ফকিরসাবের খুঁটে খুঁটে খাওয়ার স্বভাব চিরদিনের। এখন এই মাচানে বসে অন্ধকারে শরীর খুঁটে খুঁটে খাওয়ার শখ। শরীরে শক্তি নেই। তবু ফোকলা দাঁতে মাংস খাওয়ার মতো হাতটা যত্রতত্র নাড়ছেন। এভাবে ধীরে ধীরে জোটন বিবি নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। এখন আর শেয়ালের চিৎকার কানে আসছে না। সোলেমানপুরের বড় বিশ্বাসের কথা মনে পড়ছে না। তেরটি সন্তানের জননী জোটন—এই অন্ধকারে চুপি দিলে কিছুতেই বিশ্বাস করা যাবে না। তার বড় বেটা কাফনের ভিতর হাত-পা শক্ত করে শুয়ে আছে,

অথচ জোটনের জননী হবার শখ মরছে না। সে ফকিরসাবের কোলে মাথা রেখে বলল, রাইতের ব্যালা চান্দের লাখান মুখখান একবার ছাখমু ফকিরসাব।

ধীর সুস্থির ফকিরসাব এই মুহূর্তে খুঁটে খুঁটে খেতে এত ব্যস্ত যে, চান্দের লাখান মুখখান, আপনে আমার নয়নের মণি অথবা পানির মতো গড়-বন্দী কইরা রাখতে ইচ্ছা যায়—এ ধরনের কোন কথাই গলা থেকে উঠে আসছে না। জননী জোটনও সে কথার উত্তর পেতে জবরদস্তি করল না। খুঁটে খুঁটে ভাত খেতে সেও বসে গেল।

ছোটকাকা লালটু পলটুকে পড়ার ঘরে ধমকাচ্ছেন। সোনার পড়া হয়ে গেছে, ওর এখন ছুটি। সুতরাং ওর একা-একা বাইরের ঘরে ভাল লাগছিল না। সে পাগল জ্যাঠামশাইকে মনে মনে খুঁজতে থাকল। মা এখন রান্নাঘরে, তিনি আতপ চাউলের ভাত রান্না করছেন। আতপের ভাত আর কৈ মাছ ভাজা আর সুগন্ধ ঘি। সোনা ক্ষুধার্ত ভাবল নিজেকে। সে জবা ফুলের কুঁড়ি ছিঁড়ে নিল একটা। ওদের পড়া শেষ হলে একসঙ্গে মা খেতে দেবেন। সে এখন বাড়ির চারিদিকে জ্যাঠামশাইকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে হেঁটে যাচ্ছে। বাগানে দোপাটি ফুল ফুটে আছে। বেলফুলের গন্ধ আসছে। ঝুমকোলতা গাছে গাছে দুলছিল। নানারকমের ফুল এই বাগানে। শ্বেত জবা, রক্ত জবা, চন্দনি জবা। কত রকমের জবা ফুল। সকালে সে বড় জেঠিমার সঙ্গে ফুল তোলার সময় সব ফুলের নাম মুখস্থ করে ফেলেছে। সে যেতে যেতে দেখল, দোপাটি ফুলগাছের নিচে যে সবুজ ঘাস রয়েছে, সেখানে জ্যাঠামশাই শুয়ে আছেন। সে চুপি চুপি ফুলের রাজ্যে ঢুকে জ্যাঠামশাইর পাশে বসল; জ্যাঠামশাই মাথার নিচে হাত রেখে সন্তর্পণে অন্য হাতটা প্রায় আয়নার মতো চোখের সামনে এনে ধরে রেখেছেন। যেন সেই হাতের ভিতর তাঁর বিশ্বদর্শনের পালা চলছে। সোনা এবার চুপি চুপি জ্যাঠামশাইর পেটের ওপর চেপে বসল। তারপর উঁকি দিল পাতার ফাঁক দিয়ে। সে দেখল কত সব বিচিত্র রঙের প্রজাপতি ফুলের মরা ডালে বসে আছে। সোনা বুঝল, জ্যাঠামশাই হাত দেখছেন না, গাছের সব প্রজাপতি দেখছেন। সোনা তখন পেটের ওপর বসে ডাকল, জ্যাঠামশয়।

মণীন্দ্রনাথ উত্তর করলেন না। শুধু হাসলেন।

সোনা বলল, তামুক খাইবেন? তামুক আইনা দিমু?

মণীন্দ্রনাথ বললেন, গ্যাৎচোরেৎশালা।

সোনা এবার বলল, আপনের ক্ষুধা লাগে না জ্যাঠামশয়?

মণীন্দ্রনাথ বললেন, গ্যাৎচোরেৎশালা।

সোনা এবার রেগে বলল, আমি-অ আপনেরে তবে গ্যাৎচোরেৎশালা কমু।

মণীন্দ্রনাথ এবারেও হাসলেন। তারপর হাত তুলে মরা সেই ডালে বিচিত্র রঙের সব প্রজাপতিদের দেখিয়ে নিজে দু-তিনটে ঘাস মুখে পুরে দিলেন। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে মুখটা হাঁ করে রাখলেন—যেন বলতে চাইছেন, আমার মুখ দ্যাখো, গহ্বর দ্যাখো, আমার আলজিভটা কত বড় দ্যাখো। তখন সামসুদ্দিন কি কাজে এ পাড়ায় নৌকা নিয়ে উঠে আসছে। ঈশম এই সকালে নাও নিয়ে আউশ ধান কাটতে চলে গেল। এটা ভাদ্র মাস।

মণীন্দ্রনাথ, দোপাটি ফুলের সব বড় বড় গাছ, গাছের ভিতর নিজেকে কেমন আড়াল করে রেখেছেন। কেউ দেখতে পাচ্ছে না। সেই গাছের ঝোপে ঢুকে গেলে সোনাকেও আর দেখা গেল না। কেবল মনে হয় সেখানে সব ফুলের গাছ আছে আর অজস্র দোপাটি ফুল, লাল নীল হলুদ অথবা লাল রঙের ফুল ফুটছে আর ঝরে পড়ছে। আর ঘাট পার হলে গোপাটের জল, জলে নৌকা যাচ্ছে। বাবুর হাটের শাড়ি যাচ্ছে নৌকায়, বাদাম তুলে সোনালী বালির নদীতে এখন গিয়ে এইসব নৌকা পড়বে। সামু ফতিমার হাত ধরে ছোটকর্তার কাছে যাচ্ছে।

সামু ছোটকর্তাকে দেখেই বলল, কর্তা আপনের ডে-লাইটটা নিতে আইলাম।

ছোটকর্তা বললেন, ডে-লাইট দিয়া কি হইব?

—ফুলুনের সাদি দিতাছি।

—কোন্‌খানে দিবি?

—আসমানদির চরে।

—বৈঠকখানায় গিয়া ব'! আমি দ্যাখতাছি লাইটের অবস্থাটা কি।

সামু ফুলের বাগান অতিক্রম করার সময় দেখল বড়কর্তা দোপাটি গাছের ভিতর শুয়ে আছেন। মাথার নিচে হাত এবং সোনা, বড়কর্তাকে জড়িয়ে দূর্বা-ঘাসের ওপর শুয়ে আছে। সন্তর্পণে ওরা উভয়ে গাছের ভিতর কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

ফতিমা সামুর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে সোনাবাবুকে দেখতে পেল। বলল, আমি যাই বা'জী।

—কই যাবি?

—বড় ঠাকুরের কাছে।

—যাও, কিন্তু বড়কর্তারে ছুঁইয় না। সোনাবাবুরে ছুঁইয় না।

এইসব ফুলের গাছ, পাতাবাহারের গাছ এবং লেবুর ঝোপ পার হলে গ্রামের পথ। ফতিমা ঘুরে গিয়ে সেই পথের ওপর বসল। ডাকল, অ সোনাবাবু!

সোনা পিটপিট করে তাকাচ্ছে ঝোপের ভিতর থেকে। সে বলল, তুই!

—বা'জীর লগে আইছি। ফিক করে হেসে দিল ফতিমা।

ফতিমার কোমরে একটা বাবুরহাটের ছোট শাড়ি জড়ানো। নাকে নথ, ছোট চোখ এবং সুর্মা-টানা চোখে। পায়ে মল। ফতিমা নড়লে অথবা হাঁটলে পায়ে ঝুমঝুম শব্দ হয়! গায়ের রঙ সবুজ এবং ঘন পাতার রঙ মুখে। সোনা বলল, ভিতরে আইবি?

—কি কইরা যামু?

—ক্যান, দোপাটি গাছগুলির ভিতর দিয়া আয়।

ফতিমা ফুলের ভিতর দিয়ে হামাগুড়ি দিল। সে লেবুর ঝোপে ঢুকে সোনার পাশে একটা পোষা পাখির মতো মুখ করে ফুলের মরা ডালে সেইসব প্রজাপতি দেখল। আর অবাক ফতিমা—সে লক্ষ্যই করেনি, ঠিক পায়ের কাছে, একটা গন্ধরাজ ফুলের গাছ, গাছটা ফুলে ফুলে সাদা হয়ে আছে, নিচে সেই আশ্বিনের কুকুর শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়ছে। ফতিমাকে সামান্য অপরিচিত মনে হচ্ছিল। কুকুরটা মুখ হাঁ করে ঘেউঘেউ করবে ভাবছিল—কিন্তু যা ভাব সোনাবাবুর সঙ্গে, কুকুরটা আর কোন কথা বলল না। মণীন্দ্রনাথ তেমনি শুয়ে আছেন। ডালপালা অতিক্রম করলে অফুরন্ত আকাশ, সেখানে মেঘের ভিতর অনেকদিন আগের সোনালী বালির চরে নৌকার পালের মতো একখানা মুখ ভাসতে দেখলেন। আর সেই অভ্যাস মতো একই কবিতার পাখিরা সারা মুখের ওপর উড়তে থাকল, তিনি যেন বলছেন, আই হ্যাভ একজামিনড্ অ্যাণ্ড ডু ফাইণ্ড অফ অল দ্যাট ফেভার মি, দেয়ার'স নান আই গ্রীভ টু লিভ বিহাইণ্ড, বাট ওনলি, ওনলি দি।

ফতিমা নথ পরে পোষা পাখির মতো ঝোপের ভিতর বসেছিল। সে পাগল ঠাকুরের কথা শুনে হাসছিল। কিছুই সে বুঝতে পারছে না। কিছু বুঝতে না পারলে ফতিমা হাসে। সোনা বলল, জ্যাঠামশাই ইংরাজি কইতাছে। আমি যখন জ্যাঠামশাইর মতো বড় হমু, ইংরাজিতে কথা কমু। আমি এ বি সি ডি পড়তে পারি।

ফতিমা পাল্টা গাইল,—বা'জী কইছে আমারে-অ ইস্কুলে ভর্তি কইরা দিব। আমি-অ পড়মু।

সোনা বলল, ভোরে কলাপাতায় খাগের কলমে এ বি সি ডি লেখলাম। তারপর সে বলতে পারত, নির্মল চরণে, রত্নে বিভূষিত কুণ্ডল করণে বললাম। কারণ পড়া শেষ হলে প্রতিদিনের মতো সোনা ঘাটে দাঁড়িয়ে খাজাপাতাগুলি কুচি কুচি করে ছিঁড়েছে। তারপর বর্ষার জলে ভাসিয়ে দেবার সময় সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করতে করতে বলেছে, আইছেন সরস্বতী যাইবেন কই—হাতে পায়ে ধরিয়া বিদ্যাখানি লই। কিন্তু সোনা কিছুই বলল না। কারণ, জ্যাঠামশায় বড় বড় চোখে তাকাচ্ছেন। কোনদিকে চলে যাবার আগে তিনি

এমন করেন। সোনা এবং ফতিমার কথা শুনে যেন তিনি বিরক্ত হচ্ছেন। ফতিমা এক কথা বললে, সোনা দু'কথা বলছে।

—বা'জী কইছে দন্দিরহাটে যাইয়া বই আইনা দিব। মসজিদের বারান্দায় বইসা আমি পড়মু।

পাগলঠাকুর তখন বললেন, গ্যাৎচোরেৎশালা।

সোনা বলল, আপনে গ্যাৎচোরেৎশালা।

এবার পাগল ঠাকুর সোনাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর সেই ঝোপ থেকে উঠে বাইরে এসে সোনাকে একটা প্রজাপতি ধরে দিতে সাহায্য করার সময় ফতিমা পাশে পাশে হাঁটতে থাকল। সোনা সেই প্রজাপতি নিয়ে কৌটার ভিতর ধরে রাখবার সময় বলল, এই, প্রজাপতি লাগব তর?

—ছান।

—নিবি কি কইরা?

ফতিমার গলাতে পাথরের মালা। ফতিমা কোমরের কাপড়টার প্যাঁচ খুলে ফেলল। একটা কচুর পাতা তুলে আনল। গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট মনে দু'জনে প্রজাপতিটা কচুপাতায় রেখে মুখটা বন্ধ করে দিল। তারপর ফতিমার আঁচলে বেঁধে দিয়ে আবার জ্যাঠামশাইর পিছনে ছুটতে থাকল। মণীন্দ্রনাথ ওদের নিয়ে অর্জুন গাছটা পর্যন্ত হেঁটে গেলেন। এখন বর্ষাকাল—সুতরাং নাও, নদী, মানুষ এই শুধু দৃশ্যমান জগৎ। এখন কত তালের নৌকা, আনারসের নৌকা, করলার নৌকা নদী ধরে নেমে যাচ্ছে। এই নদী আর নাও দেখলেই মনে হয় কোথাও পলিন শুয়ে আছে। পলিনের স্মৃতি, পলিনের চোখ গুণদেওয়া নৌকার মতো শুধু টানছে আর টানছে।

দক্ষিণের ঘরে লালটু পলটু এখনও পড়ছে। ওদের ছুটি হয় নি। ওরা সোনাকে পুকুর পাড়ে ঘুরতে দেখে চটে গেল। পুকুরের অন্য পাড়ে সোনা, পাগল জ্যাঠামশাই এবং টোডারবাগের সেই টরটরি মেয়েটা। যেন এক হরিণশিশু লাফায় আর নাচে, সোনাকে পেলে তো কথাই নেই—শুকনো দিন হলে মাঠে ছুটে গিয়ে যব গম খেতে হারিয়ে যেত। ওদের ছুটি হয় নি। সোনার ছুটি হয়ে গেছে। ওদের রাগ বাড়ছিল। সোনা মেয়েটার আঁচলে কি যেন বেঁধে দিচ্ছে। ওরা ক্ষেপে গেল। পলটু বলল, ছাখলি, সোনা ফতিমারে ছুঁইয়া দিল।

তখন অর্জুন গাছের নরম ত্বকের ওপর পিঠ রাখল মণীন্দ্রনাথ। সামনে বিলের জমি, জমিতে জল থৈথৈ করছে, দূরে কোথাও ধানখেতের ভিতর কোড়া পাখি ডাকছিল। নদীতে নৌকা, গ্রামোফোনে গান—নদী আমারে ভাসাইয়া লইয়া যাও। আর বর্ষার অবয়বে শুধু এই যেন প্রার্থনা—আমারে ভাসাইয়া লইয়া যাও। সুতরাং এখন এই দুই বালক-বালিকার সঙ্গে এই জলে ভেসে যেতে ইচ্ছা হল মণীন্দ্রনাথের।

ফতিমা ডাকল, সোনাবাবু।

সোনা বলল, কি!

—আমারে একটা লাল শাপলাফুল দিবেন?

—দিমুনে। তখন সামু ফিরছে। হাতে তার ডে-লাইট। সে কিছুতেই নরেন দাসের বাড়ির দিকে গেল না। সে সোজা পুকুর পাড়ে নেমে এল। এবং দূরে একবার চোখ তুলে গাছগাছালির ফাঁকে মালতীকে দেখার সময় মনে হল বাড়িটা বড় খালি খালি লাগছে। মালতী কি এখানে নেই? সে কি শ্বশুর-বাড়ি চলে গেছে! ওর কেন জানি একবার বেহায়ার মতো মালতীদের উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছা হল। অথচ পারছে না। কোথায় যেন ক্রমে সংশয় ওকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। সে তখন অন্যমনস্ক হবার জন্য ডাকল, ফতিমা, কই গ্যালি?

ফতিমা সোনাবাবুকে বলল, আমি যাই। সে ছুটে চলে গেল। সামসুদ্দিন নৌকায় উঠে লগি বাইতে থাকল। কি ভেবে ফতিমা বলল, বা'জী, সোনাবাবু কইছে আমারে একটা লাল শাপলাফুল দিব। সামু উত্তর না করে মেয়ের মুখ দেখল—মেয়ে তার বড় চঞ্চল। চোখ দুটোতে সব সময় দুষ্টুমির হাসি। মেয়ে এখনও অর্জুন গাছটার নিচে কি খুঁজছে। সামু দেখল, গাছটার নিচে কেউ নেই। ফতিমাকে বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

তখন সোনা ক্ষুধার জন্য এক লাফে রান্নাঘরে ঢুকে ধনবৌকে জড়িয়ে ধরল। বলল, মা, ভাত খাইতে ছাও। ক্ষুধা লাগছে।

ধনবৌ সোনার জন্য পিতলের মালসা থেকে সরু আতপ চালের ভাত বাড়ছিল। বলল, পিঁড়ি পাইতা বস।

লালটু খাচ্ছিল। সে পিটপিট করে তাকাচ্ছিল। সোনার জন্য মার এমন সোহাগ ভাল লাগছিল না। মা ওকে বড় কৈ মাছ ভাজা দিয়েছেন। সে কিছুতেই আর ক্ষোভ সামলাতে পারল না। বলল, মা, সোনা ফতিমার কাপড়ে কি বাইন্দা দিছে।

সোনা তাড়াতাড়ি ভয়ে মার গলা ছেড়ে বলল, না গ মা।

লালটু চিৎকার করে বলল, মিছা কথা কইস না। সে পলটুকে সাক্ষী রাখল।

পলটু বলল, তুই ফতিমারে প্রজাপতি ধইরা দিছস।

শশীবালা বাইরে বড় শিঙ মাছের গলা কাটছিলেন। তিনি এমন কথা শুনে হৈহৈ করে ছুটে এলেন। ধনবৌ ভীত হয়ে পড়ছে। কারণ, এখন এই ভোরে শাশুড়ীঠাকুরুণ জাতমান নিয়ে অনর্থ বাধাবেন। বাছ-বিচারের কথা

বলবেন। অশুচির কথা, অমঙ্গল ডেকে আনছে—আরও কত রকমের কথা হবে কে জানে। সুতরাং ধনবৌ ভাতের থালা রেখে বলল, সোনা, বাইরে যাও। তুমি সান কর আগে।

সোনা বলল, না আমি সান করমু না। আমার ক্ষুধা লাগছে। আমারে খাইতে ছাও।

ধনবৌর মাথা কেমন গরম হয়ে উঠছে। এই নিয়ে সারাদিন শশীবালা গজ্‌গজ করবে। সে কঠিন গলায় বলল, সোনা ঘরের বাইরে যাও কইতাছি।

সোনা বলল, আমার ক্ষুধা পাইছে। খামু। খাইতে ছাও আমারে। লালটু বলল, না, খাইতে পাইবি না, সান না করলে খাইতে পাইবি না। ধনবৌ ধমক দিল লালটুকে। পেতলের মালসাতে অবশিষ্ট যে ভাত ছিল—সবই ধনবৌ বাইরে বের করে দিল। মাছ ভাজা, ভাত সব আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিল। সোনার দুঃখ বাড়ছে তখন। জিদ বাড়ছে। মা তার খাবার আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছে। মা তাকে স্নান করতে বলছে। সোনা পিঁড়িতে বসে থাকল। সে উঠল না। সে রাগে, অভিমানে হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে থাকল।

ধনবৌ বলল, ভাল হইব না সোনা। তোমার পিঠে পড়ব কইতাছি। ভাল চাও ত উইঠা যাও।

বাইরে শাশুড়ীঠাকুরণের গজগজ করা ক্রমে বাড়ছে। সোনা কিছুতেই উঠছে না। এইসব হেনস্থার জন্য একমাত্র সোনাকে দায়ী ভেবে, সোনার পিঠে ধনবৌ অমানুষিকভাবে আঘাত করতে থাকল। সোনার দম বন্ধ হয়ে আসছে। সোনা কিছুতেই পিঁড়ি ছেড়ে উঠছে না। একান্নবর্তী পরিবার এবং সংসারের ভিন্ন ভিন্ন জ্বালা ধনবৌকে এই মুহূর্তে চরম কুৎসিত করে তুলল। সোনার চুল ধরে টেনে বাইরে নিয়ে এল। —খাড়ও চুপ কইরা। মুখে য্যান রা থাকে না। বলে ধনবৌ নিজে চান করে এল এবং এক কলসী জল ঢেলে দিল সোনার মাথায়।

আর কাফিলা গাছের নিচে তখন সেই আশ্বিনের কুকুর। পাশে মণীন্দ্রনাথ। মণীন্দ্রনাথ সোনার কষ্ট সহ্য করতে পারছেন না। দুঃখে নিজে নিজের হাত কামড়ে ধরেছেন। হাত থেকে রক্ত গড়াচ্ছিল।

ঘাটে ফতিমা নৌকা বাঁধলে বলছিল, বা'জী, সোনাবাবু আমারে প্রজাপতি ধইরা দিছে।

সামসুদ্দিন কেমন অন্যমনস্কভাবে বলল, জীবেরে কষ্ট দিতে নাই। ছাইড়া ছাও।

ফতিমা প্রজাপতিটাকে ছেড়ে দেবার জন্য আঁচল খুলে দেখল, প্রজাপতিটা উড়ছে না। প্রজাপতিটা মরে গেছে।

বাইরে ইতস্তত মুরগী চরে বেড়াচ্ছিল। জালালি ঘরের দাওয়ায় বসে। সামসুদ্দিন এবং তার মজলিস, অথবা ভেতর বাড়িতে অলিজানের রান্না গোস্ত (মেহমানদের ভোগের জন্য) সবই বিসদৃশ। জালালি কচুর ঝোপ অতিক্রম করে মাঠে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল। ধানখেতে কিছু হাঁস শব্দ করছে—প্যাক প্যাক। ওর পেট মোচড় দিয়ে উঠল। মকবুলের আতাবেড়াতে বাছ-পাট শুকাচ্ছে। তিন চার দিন ধরে বৃষ্টি হয় নি বলে মাটি শুকনো, ঘাস শুকনো। খামারবাড়িতে জামরুল গাছ; গাছে জামরুল ফল ঝুলছে। এবং রোদের জন্য ওদের পাখির মতো মনে হচ্ছিল। আর গ্রামময় রসুন পেঁয়াজের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। আর হাঁসগুলি তখনও গোপাটের ধানখেতে প্যাক প্যাক করে ডাকছে। সুতরাং জালালি বসে থাকতে পারছে না। মালতীর হাঁসগুলি আবার এই মাঠে। মিঞা মাতব্বরেরা মজলিস শেষ করে চলে যাচ্ছে। জালালি অলিজানের পাছ-দুয়ারে বসেছিল—চোখমুখ শুকনো এবং কাতর কণ্ঠ। অলিজান যেন তার এই প্রাচুর্যকে জালালির চোখের উপর ভাসিয়ে দিল। মেমানগণ বর্ষার জলে স্নান করতে গেল। ওরা ডুব দিল অথবা বর্ষার জলে সাঁতার কাটল, তারপর নামাজ শেষ করে শীতলপাটিতে খেতে বসে গেল গোল হয়ে। বেশ খাওয়া—মাছের ছালোন, মুরগীর গোস্ত, রসুন সম্বারে মুগের ডাল। ওরা খেয়ে সানকিতেই কুলকুচা করল। ওরা একই বদনার নলে মুখ রেখে পানি খেল। ওরা কোন উচ্ছিষ্ট খাবার রাখল না। জালালির বসে থেকে থেকে হাঁটু ধরে গেছিল। জালালি থুথু গিলে শেষ পর্যন্ত নিজের কুঁড়েঘরটাতে আশ্রয় নিয়ে সকলের প্রতি এবং আল্লার প্রতি ক্ষুব্ধ কথাবার্তা নিক্ষেপ করে শান্তি পাচ্ছিল। মালতীর হাঁসগুলি প্যাক প্যাক করছে গোপাটের ধানখেতে; সুতরাং সে গামছা পরে গোপাটের জলে শালুক তুলতে নেমে গেল।

মেমান সকল চলে গেল। সামসুদ্দিন ঘাটে সকলকে বিদায় জানাল। ওদের নৌকা গোপাট ধরে চলতে থাকল। কিছু পাটখেত অতিক্রম করলে নৌকাগুলো আর দেখা গেল না—মাঝে মাঝে লগির ডগাটাকে উঠতে নামতে দেখা গেল। ওরা পুবের বাড়ির পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। পুবের বাড়ির মালতী অথবা নরেন দাসের বিধবা বোন মালতীর কথা মনে হল সামসুদ্দিনের। হিজল গাছের ইস্তাহারটাকে কেন্দ্র করে যে বচসা এবং অপমানে উভয়ে ক্ষত-বিক্ষত ছিল—এ সময়ে সবই কেমন অর্থহীন লাগল। বার বার সেই এক ইস্তাহার ঝুলত। অর্থাৎ এই দেশ সামুর, এই দেশ সামুর জাতভাইদের। গাব গাছটার নিচে মালতীর সঙ্গে কতদিন দেখা—কিন্তু মালতী কথা বলত না। কৈশোর বয়সের কিছু স্মৃতি মনে করে কেমন কষ্ট বোধে পীড়িত হল সামু।

ফতিমা পাশ থেকে ডাকল, বা'জান।

সামু কেমন আঁতকে উঠল, কিছু কইলি ?

—বা'জান, মায় আপনেরে ডাকতাছে।

সামু ফতিমার মুখ দেখে, জলের নীল রঙ দেখে, এই ঘাস এবং মাটি দেখে, ক্রমশ সে কেমন ইসলাম প্রীতির জন্য এক গভীর অরণ্যের ভিতর ডুবে যেতে থাকল। সেই অরণ্যে সে দেখল কোনও এক ফকিরসাব ধর্মের নিশান হাতে নিয়ে মুশকিলাসানের আলোতে পথ ধরে শুধু সামনের দিকে হাঁটছেন। আলোর বৃত্তে বৃদ্ধের মুখ—অস্পষ্ট এক ইচ্ছার তাড়নাতে তিনি ক্লান্ত। সামু বার বার ডেকেও সেই শীর্ণ ক্লান্ত ফকিরকে ফেরাতে পারছে না। তিনি হেঁটে যাচ্ছেন এবং তিনি সামুকে শুধু অনুসরণ করতে বলছেন।

ফতিমা ঘুরে এসে সামনে দাঁড়াল। বলল, মায় আপনেরে ডাকতাছে।

সে ভিতর বাড়িতে ঢুকে গেল। তার বিবির খালি গা, নাকে নথ। বিবির চোখ ছোট, সুর্মা টানা। হাতে নীল কাচের চুড়ি। পরনে ডুরে শাড়ি। গায়ে সেমিজ নেই, কাপড়ের নিচে সায়া নেই। সাদাসিধে এক প্যাঁচে কাপড় পরনে, সুতরাং শরীরের সকল অবয়বই প্রায় স্পষ্ট। অলিজানের শরীরটা এখন গাভীন গরুর মতো। শুধু যেন শুয়ে থাকতে পারলে বাঁচে। অথচ চোখ সুর্মা টানা বলে ইচ্ছার চেয়ে চোখে আবেগ বেশী। সে বলল, বেলা বাড়ে না কমে ? তুমি খাইবা না ?

সামু তক্তপোশে খেতে বসল। ওর বিবি কাছে বসে খাওয়াল। সামুকে খুব চিন্তিত দেখে বিবি বলল, কি ভাবতাছ ?

সামু উত্তর দিল না। নিঃশব্দে খেয়ে যেতে থাকল।

—কি, কথা কও না ক্যান ?

সামু বিরক্ত হল। বলল, তর সব কথায় কাম কি ! তুইতা ভাত দিবি ত দ্যা। কথা বাড়াইস না।

অলিজান বলল, কি কথা বাড়াইলাম ?

সামু মুখ তুলে অলিজানের মুখ দেখল, চোখ দেখল। অলিজানের চোখে কি যেন একটা আছে—যা দেখলে সে সব রাগ দ্বেষ হিংসা ভুলে যায়। সে বলল, আমি ভোটে লীগের তরফে খারমু ঠিক করছি। ছোট ঠাকুরের বিরুদ্ধে খারমু।

—তোমার মাথায় যে কি ঢুইক্যা পড়ে না ! বুঝি না ! ক্যান, কি দায় পড়ছে এই কাইজ্যা ডাইকা আননের। ছোট ঠাকুর তোমার কি করছে ? তিনি ত খুব ভাল মানুষ।

সামসুদ্দিন বলল, আমি কইছি তাইন খারাপ মানুষ ! বলে সে উঠে পড়ল। হাত-মুখ ধুল এবং যখন দেখল বেলা পড়তে দেরি নেই—ধনু শেখ পাটের আঁটি

ঘরে তুলছে তখন নাও নিয়ে এবং ধনু শেখকে নিয়ে জলের ওপর ভেসে গেল। সে সব ঝোপজঙ্গল ভেঙে পুকুরের জল কেটে মাঠে গিয়ে পড়ল। এখন মসজিদের চালে মোরগ হেঁটে বেড়াচ্ছে। এখন গরুছাগল সব উঠোনের ওপর। বাড়ির সকল পুরুষরাই কামলা খাটতে গেছে। শুধু মনজুর নিজের জমি চাষ করে। হাজি সাহেবের কিছু জমি আছে। নয়া পাড়ার ইসমতালী বড় গেরস্থ। অলিজানকে সাদি করে সামু ভাবল, ইসমতালী-সাব এবার তার কথা বলবে। কিন্তু বড় হিন্দু ঘেঁষা লোক। সঙ্গে সঙ্গে সামুর মুখটা কঠিন দেখাল। আর এ-সময়ে পাশের শালুকের জমি অতিক্রম করে জঙ্গলের ভিতর হাঁসের শব্দ পেতেই সে চোখ তুলে তাকাল। মনে হল ঝোপের ভিতর কোনো মানুষের চিহ্ন যেন। সে বলল, ঝোপের ভিতর ক্যাডা ?

ঝোপের ভিতর থেকে কোন মুখ উঁকি দিল না। আশেপাশে বেত ঝোপ এবং শ্যাওড়া গাছ। কিছু সোনালী লতা শ্যাওড়া গাছটাকে ঢেকে রেখেছে। একদল হাঁস ভয়ে প্যাঁক প্যাঁক করতে করতে পুবের বাড়ির দিকে ছুটছে। আর তখন সে দেখল জলের নিচ থেকে কাদামাটি সব উপরে উঠে আসছে। যেন কোন গো-সাপ একটা বড় সাপকে ধরে জলের নিচে সামলাতে পারছে না, যেন জলের নিচে ঝোপের পাশে একটা প্রাগৈতিহাসিক জীব হেঁটে বেড়াচ্ছে।

সামু পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল। ধনু শেখ নৌকা থামিয়ে দিল। এবং নৌকাটাকে ঝোপের পাশে নিয়ে যেতেই দেখল জলের ওপর শাপলা-শালুকের পাতার ফাঁকে জালালি মুখ জাগিয়ে নিশ্বাস ফেলছে।

সামু বলল, আপনে এহানে কি করতাছেন ?

জালালি গলাটা কিঞ্চিৎ তুলে বলল, শালুক তুলতাছি রে বা'জী।

—এহনে কি শালুক হইছে ?

—হইছে। ইট্টু ইট্টু হইছে। বলে সে ডান হাতে একটা শালুক তুলে দেখাল সামুকে। বলল, বড় হয় নাই, কড়া। তারপর জালালি বিকালের রোদে মুখ রেখে বলল, তর চাচায় ফাওসার গয়না নৌকায় মাঝি হইয়া গ্যাল কবে ! না খত, না পয়সা। খাই কি, ক ! এয়ের লাইগ্যা শালুক তুইল্যা চিবাইতাছি।

জালালি গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে রেখেছে। এবং জালালির চোখ দুটোতে আতঙ্ক। জালালির শুকনো মুখ দেখে সামুর কষ্ট হতে থাকল। শাপলা-শালুকের জমি পার হলে ধানখেত। মালতীর হাঁসগুলো ধানখেতের ভিতর ভয়ে ভয়ে ডাকছে। সে আকাশে কোন বাজপাখি উড়তে দেখল না—কোন ঝোপজঙ্গলে শেয়ালের চোখ দেখল না—শুধু জালালির মুখটা লোভের জন্য পাপের জন্য ধীরে ধীরে বীভৎস হয়ে উঠছে, যেন মুখটা এখন যথার্থই শেয়ালের মতো।

জালালি ওর জায়গা থেকে এতটুকু নড়ল না। দু'হাতে হাঁসটার গলা

জলের নিচে টিপে ধরেছে। এতক্ষণ ধরে সংগ্রামের পর সে ক্লান্ত। সামুর চাকরটা এখন লগি বাইছে। হাঁড়িটা বাতাসে ভেসে দূরে সরে যাচ্ছে। সামু গোপাটের অশ্বত্থ গাছটার ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেলে গাল দিল জালালি, নির্ব্বংশা। এ-হানে কি করতাছেন? তর মাথা চিবাইতাছি। বলে সে একটা গিরগিটির মতো জলে সাঁতার কাটতে থাকল। হাঁসটা ওর ডান হাতে। এবং হাঁসটাকে সে জলের নিচে সব সময় লুকিয়ে রাখার জন্য এক হাতে সাঁতার কেটে হাঁড়িটাকে যখন আয়ত্তে আনল তখন সামু অনেক দূরে—তখন বিকালের রোদ সরে যাচ্ছিল এবং তখন আকাশে নানা রঙের মেঘ জমে ঈশান কোণটাকে কালো, গভীর করে তুলছে।

এবার সে বাড়ির দিকে উঠে যাবার জন্য হাঁসটাকে হাঁড়িতে ঢুকিয়ে দিল। পুরুষ্টু হাঁসের পেটটা এখনও নরম এবং উষ্ণ। সে পেটে হাত রেখে উত্তাপ নেবার সময় দেখল, অনেকগুলো ধানখেত পার হলে পুবের বাড়ির গাবগাছ, গাছের নিচে মালতী। মালতী ওর হাঁসগুলোকে খুঁজছে। জলের ওপর শরীরটাকে তুলে সে উঁকি দিল। এবং দূরে মানুষের শব্দ পেল জালালি। সে পরনের গামছাটা খুলে ভয়ে হাঁড়ির মুখটা ঢেকে দিল। দূর থেকে মালতীর গলাও ভেসে আসছে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে চারিদিকে। পাটখেতের ভেতর দিয়ে অন্য প্রান্তে কিছু দেখা যাচ্ছে না। জায়গাটা নির্জন। অশ্বত্থগাছ পার হলে মনজুরদের ঘর। ধনার মা বুড়ি ছাতিম গাছের নিচে বসে এখন প্রলাপ বকছে। সে ঘরের দিকে উঠে যাবার সময় যখন দেখল কোথাও কোন মানুষের চোখ উঁকি দিয়ে নেই, যখন অন্ধকার ধীরে ধীরে গাঢ় হচ্ছে তখন উষ্ণ পেটটাতে আর একবার হাত রাখল। সে গামছা তুলে ফের মৃত হাঁসটাকে উঁকি দিয়ে দেখল। এবং চাপ চাপ অন্ধকারের ভিতর মৃত হাঁসটার পেটে হাত রেখে ফের বড় রকমের একটা ঢোঁক গিলে মাংস খাবার লোভে মরিয়া হয়ে উঠল।

জলের ওপর দিয়ে মালতীর কণ্ঠ ভেসে আসছে—আয়, তৈ তৈ।

দূরে ধানখেতের ভিতর হাঁসগুলি তেমনি ভয়ে প্যাঁক প্যাঁক করছে। ঘন ধানগাছের ভিতর ওরা লুকিয়ে থাকল। মালতী জলে নেমে গেল। হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে ডাকল, আয়, তৈ তৈ। আয়······আয়।

চারিদিকে অন্ধকার। হাটুরেরা ঘরে ফিরছে। খালের ধারে লগির শব্দ। নৌকার শব্দ। সে অন্ধকারে কোন পরিচিত হাটুরের মুখ দেখতে পেল না। অমূল্য সুতা আনতে গেছে হাটে। শোভা, আবু ঘরে ঘরে আলো জ্বালছে এবং জল দিচ্ছে দরজাতে। নরেন দাসের বৌ বৃষ্টি আসবে ভেবে সব শুকনো পাটকাঠি ঘরে নিয়ে রাখছে। আর ঝড়বৃষ্টি এলে হাঁসগুলি ঘরে ফিরতে পারবে না, হাঁসগুলি পথ ভুল করে দূরে চলে যেতে পারে অথবা কত রকমের দুর্ঘটনা···মালতী প্রাণপণে ডাকতে থাকল, আয়, তৈ তৈ।

শোভা, আবু গাব গাছের নিচে পিসির গলা শুনতে পেল। সেই কখন থেকে পিসি হাঁসগুলোকে ডাকছে। ওরা কাফিলা গাছ অতিক্রম করে পিসির জন্য জলে নেমে গেল এবং পিসির সঙ্গে গলা মিলিয়ে ডাকতে থাকল। আর দূরে সামুর নৌকা ভেসে যাচ্ছে। বৃষ্টি আসবে জেনেও সামু ঘরে ফিরছে না। জালালি বৃষ্টির রঙ আকাশে দেখতে পেল। জলের পাশে কাঁটা গাছের সব ঝোপ। ঝোপ পার হলে মান্দার গাছের নিচে ওর পাটকাঠির বেড়া দেওয়া ঘর। ভিজে মাটির গন্ধ আসছে। জোটন ফকিরসাবের সঙ্গে দরগায় চলে গেছে। বাড়িটা একেবারে ফাঁকা। হাজি সাহেবের খামারবাড়ি পার হলে তবে অন্য ঘর। অন্ধকার এবং এই নির্জনতা সত্ত্বেও মৃত হাঁসটাকে সে গামছা দিয়ে সন্তর্পণে ঢেকে রেখেছে। বৃষ্টি নামবে। বর্ষাকাল বলে ঘরের আশেপাশে এবং সর্বত্র আগাছার জঙ্গল। এক সবুজ সবুজ গন্ধ। সুতরাং জালালি সব দেখে-শুনে নগ্ন শরীরটাকে ঘরের দিকে গোপনে তুলে নিয়ে গেল। ছোট গামছা দিয়ে যেহেতু সে হাঁড়ির মুখ ঢেকে রেখেছিল, সেহেতু নগ্ন। অন্ধকার বলে, বৃষ্টি আসবে বলে গাব গাছের নিচে মালতীর গলা শোনা যাচ্ছে না—আশেপাশে শুধু কীট-পতঙ্গের আওয়াজ।

মালতী দেখল ওর হাঁসি তিনটা ফিরে আসছে। হাঁসটা নেই। মালতীর বুকটা কেঁপে উঠল। কত কষ্টের এই হাঁস। প্রতিপালন করা কত বেদনা-সাপেক্ষ। ওর প্রিয় হাঁসাটাকে না দেখে মালতী চীৎকার করে উঠল, বৌদি গো, আমার হাঁসাটা কই। হাঁসি তিনটা আইতাছে, আমার হাঁসাটা কই গ্যাল!

নরেন দাসের বৌ পাঁজা করে সব শুকনো পাটকাঠি তুলছিল। পাটকাঠি-গুলিতে মড়মড় শব্দ হচ্ছে—সুতরাং সে মালতীর চিৎকার শুনতে পাচ্ছে অথচ স্পষ্ট বুঝতে পারছে না মালতী কি বলছে। সে পাটকাঠি ফেলে গাবগাছতলায় ছুটে গেল এবং জলের পাশে দাঁড়িয়ে বলল, কি হইছে তর?

—দ্যাখেন, কি হইছে! হাঁসি তিনটা আছে, হাঁসাটা নাই। কেমন কান্না কান্না গলায় মালতী বলল।

—দ্যাখ, কোনখানে পলাইয়া রইছে।

—আপনার যে কথা বৌদি! অর পরাণে বুঝি ডর নাই।

—ডর আছে ল, ডর আছে। অমূল্য আসুক, নৌকা লইয়া খুঁজতে বাইর হইবনে। তুই জল থাইক্যা উইঠ্যা আয়।

সুতরাং মালতী জল থেকে উঠে এল। ওর মনটা বিষণ্ণতায় ভরে আছে। কান্না কান্না এক আবেগ বুকের ভিতর জমা হচ্ছে ক্রমশ। ওর এই হাঁস বড় প্রিয়, বড় কষ্টে সে লালন করেছে এবং বিধবা যুবতীর একমাত্র অবলম্বন। ঝড়-জলে সেই ছোট ছোট চারটা পাখি যেদিন নরেন দাস ডুলাতে করে ঘরে নিয়ে

এসেছিল সেইদিন থেকে কত যত্নের সঙ্গে এদের সে ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছিল। ছোট ছিল বলে ওরা কচি ঘাস খেতে পারত না, ওরা ভাত খেতে পারত না, সুতরাং সে ছোট ডারকিনা মাছ ধরত পুকুর থেকে, ছোট ছোট জিড় তুলে যত্নের সঙ্গে খাইয়ে পুকুর ঘাটে ছেড়ে ওদের বড় হতে সাহায্য করত। মালতী জল থেকে উঠে আসার সময় প্রাণপণ ডাকল, আয়, তৈ তৈ।

অন্ধকার বলে, বৃষ্টি আসবে বলে ওরা আর গাবগাছের নিচে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারল না।

জালালি ঘরের ভিতর কুপি জ্বালল। ঘরে তার ছেঁড়া হোগলা এবং শিকাতে ঝোলানো নাঙলবন্দের বান্নি থেকে আনা হাঁড়ি পাতিল। একটা ভাঙা উনুন। কুপিটা জ্বলতে থাকল। সে ভিজা গামছাটা বিছিয়ে তার উপর মৃত হাঁসটাকে রেখেছে। ওর দরজার ঝাঁপ বন্ধ ছিল। কুপির আলোতে ওর তলপেট চকচক করছে। মুখে পেটুকের গন্ধ। সে হাঁসটার তলপেটে চাপ দিতেই বুঝল উষ্ণতা মরে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে হাঁসটার শরীরের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে ওর শরীরের সব পাখনা দ্রুত তুলতে থাকল। ওর শরীর থেকে এখনও ইতস্তত জল ঝরছে। এই জলের জন্য নিচের মাটি ভিজে উঠছে—কাদা-কাদা ভাব। সে যত্নের সঙ্গে হাঁসটাকে, গামছাটাকে শুকনো মাটিতে টেনে আনল, যত্নের সঙ্গে হাঁটু গেড়ে মাংস ভক্ষণের নিমিত্ত প্রাণপণে মৃত হাঁসটাকে আগুন জেলে সেঁকতে থাকল। বাইরে বৃষ্টি।

কতদিন থেকে যেন পেটে ভাত নেই, কতদিন থেকে যেন জাম-জামরুল খেয়ে, কখনও শালুক খেয়ে জালালি ক্ষুধা মিটিয়েছে। পুরুষ্টু খাদ্যের জন্য সারাদিন থেকে খোয়াব দেখছিল। বিকালের এই হাঁসটা সে-খোয়াবকে সার্থক করছে। সুতরাং সে তার আল্লার কাছে এই মেহেরবানিটুকুর জন্য খুশি। খুশির জন্যই হোক অথবা ক্ষুধার তাড়নাতেই হোক এবং লোভের জন্যও হতে পারে, সে কাপড় পরতে ভুলে গেছিল। ওর তলপেটের ফাটা সাদা সাদা দাগগুলোতে এখনও কিছু জলের রেখা চিকচিক করছে, অনেকটা মানচিত্রের নদী-নালার মতো। কি ভেবে জালালি তলপেটে হাত রাখল এবং ভাবল এই তলপেটে ফের চর্বি হবে, ফের আবেদালি গয়না নৌকার কাজ সেরে ঘরে ফিরবে।

জালালি হাঁসটার পেটের ভিতর থেকে নখ দিয়ে টেনে টেনে ময়লাগুলো বের করবার সময়েই ভাবল আবেদালির বড় দুঃখ। সে বলত, জব্বইরা হওয়নের পর তর প্যাট যে নাইমা গ্যাল আর উঠল না, আর তর পেটে চর্বি ধরল না।

জালালি মনে মনে বলল এ-সময়, তুমি আমারে হপ্তায় হপ্তায় হাঁসের গোস্ত খাইতে দ্যাও দ্যাখ ক'দিনে প্যাটে চর্বি লাগাইয়া দ্যাই। ওর এ-সময় মালতীর

কথাও মনে হল। মালতী বিধবা যুবতী। দিন দিন মালতীর রূপ খুইল্যা পড়তাছে। আল্লা, আমারে অর রূপটা দিলি না ক্যান? বাইরে বৃষ্টি এবং বৃষ্টি ঘন হয়ে নামছে তখন।

এবার হাঁসের শরীর থেকে চামড়াটা তুলে ফেলল জালালি। বাঁশের চোঙাতে সরষের তেল নেই। একটু তেল আনতে সে কোথাও যেতে পারছে না বৃষ্টির জন্য। সুতরাং সে অনেকক্ষণ ধরে হাঁসের শরীরটাকে সেঁকেছিল আর তার জন্য সেদ্ধপোড়া এক ধরনের গন্ধ উঠছিল। সে এই সেদ্ধ-পোড়া মাংস একটু নুন-লঙ্কাতে ভেজে দুটো সানকিতে রাখল। এক টুকরো মুখে দিল, তারপর ফুৎ করে হাড়টা মুখ থেকে বের করে চেখে চেখে মাংসটা খাবার সময় দেখল, হাঁসের পালকগুলো কখন সব বাতাসে ঘরময় হয়ে গেছে। গাছার ওপর কুপিটা দপদপ করে জ্বলছে। আলোটার দিকে চেয়ে, ঘরময় পালকগুলো দেখে এবং চুরি করে হাঁস ভক্ষণের নিমিত্ত মনে মনে অসহায় হয়ে পড়ল জালালি। আবেদালি জানতে পারলে মারধোর করবে। সেজন্য জালালি আর মাংসের হাড় না চিবিয়ে খুঁটে খুঁটে সব পালকগুলো তুলে বৃষ্টির ভিতর জলে নেমে গেল। জল ভেঙে অন্ধকারের ভেতর গোপাটের দিকে চলতে থাকল। তারপর অশ্বত্থের নিচে যে ঝোপ-জঙ্গল ছিল, সেখানে সব পালকগুলো ছড়িয়ে দিয়ে বলল, আল্লা আমার ক্ষুধা পাইছে। আমি যাই। এখন বৃষ্টির জলে জালালির সব দুঃখ ধুয়ে যাচ্ছে। সুখের জন্য জালালি ঘরের দিকে ফিরছে। সে বিদ্যুতের আলোয় দেখল, পাটখেত নুয়ে পড়েছে। সেই সব পাটখেত পার হলে জলের ওপর একটি আলোর বিন্দু ঘুরতে দেখল। এবং সন্তর্পণে কান পাতলে শুনতে পেল যেন তখনও মালতী ওর হাঁসটাকে ডাকছে—আয় তৈ তৈ। সে আর এতটুকু দেরি করল না। সে ঘরের ভিতর ঢুকে ঝাঁপ বন্ধ করে দিল। শরীর মুখ মুছল। এবার একটু সময় নিয়ে গামছাটা ভাল করে প্যাঁচ দিয়ে পরল। একটা কাঠের টুকরোর উপর বসে হাঁসের হাড় এবং গোস্ত চুষতে থাকল জালালি। মনে হল, মালতী যেভাবে ডাকছে—এখনই হয়তো হাঁসটা সানকির ওপর ডেকে উঠবে। সে গব গব করে এবার মাংস ছিঁড়ে খেতে থাকল। অথবা গিলতে থাকল। সে কিছুতেই হাঁসটাকে সানকির ওপর আর প্যাঁক প্যাঁক করে ডেকে উঠতে দিল না।

বৃষ্টি থামলে সামসুদ্দিন ঘরের দিকে ফিরল। ধনু শেখ নৌকা বাইছিল। দূরে ধানখেতের ভিতর অন্য একটি আলো দেখে, মালতীর কণ্ঠ শুনে বুঝল, মালতী এখনও হাঁসগুলো পায় নি। মালতী এবং অমূল্য প্রাণপণ ডাকছে—আয়, তৈ তৈ। এবং এই শব্দ গ্রাম মাঠ পার হয়ে বহু দূরে চলে যাচ্ছে—বড় দুঃখের এই ডাক, বড় কষ্টের। মালতীকে অনেকদিন পর সামু এই মাঠে দেখল—

কি যেন অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। অমূল্য নৌকা বাইছিল, ধানখেতের ভিতর, পাটখেতের ভিতর অথবা অন্য কোন ঝোপ-জঙ্গলে হাসটা ভয়ে লুকিয়ে আছে কি না দেখছে মালতী। এ-সময় মালতী দেখল, অন্য একটা নৌকা, পাটাতনে সামসুদ্দিন। সামসুদ্দিন যেন কিছু বলতে চাইছে। হ্যারিকেনের আলোতে সামসুদ্দিনের মুখ স্পষ্ট। মালতী এক বিজাতীয় ঘৃণাবোধে সামুর সঙ্গে প্রথমে কথা বলতে পারল না। সামু যেন হালে বসে বাইচ রক্ষীদের উৎসাহ দিচ্ছে। মালতীর কান্না পাচ্ছিল হাঁসটার জন্য। সে মাথা নিচু করে বসে থাকল। সামসুদ্দিনকে দেখে কোন কথা বলল না। সামু আজ অপমানিত বোধ করল না, কারণ মালতীর এই বসে থাকাটুকু সহায়-সম্বলহীনা নারীর মতো। সুতরাং সে বলল, তর হাঁসগুলি বাড়ি যায় নাই ?

—হাঁসিগুলি গ্যাছে। হাঁসাটা যায় নাই।

মালতী সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছিল। মালতী মাথা নিচু করে বসেছিল, চারদিকে ভিজা বাতাসের গন্ধ। চারদিকে আঁধার আরও ঘন হয়ে নামছে। সামু এবং অমূল্য দু'জন মিলেই এবার ডাকতে থাকল, আয়, তৈ তৈ। কোথাও কোন হাঁসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না শুধু অশ্বত্থ গাছটায় অনেক জোনাকি জ্বলছে। নিচে হাঁসের পালক উড়ছে। পালকগুলো জলে নৌকার মতো ভেসে যাচ্ছে।

সামু, অমূল্য এবং মালতী গলা মিলিয়ে ডাকল। ওরা লণ্ঠন তুলে ধান-গাছের ফাঁকে ফাঁকে অন্বেষণের সময় দেখল জলে ইতস্তত হাঁসের পালক ভেসে যাচ্ছে। গোপাটের অশ্বত্থ গাছটার নিচে এসে যথার্থই মালতী ভেঙে পড়ল। পালকের ধূসর রঙ, অশ্বত্থের ঘন জঙ্গল—সব মিলে সে হাঁসটার মৃত্যু সম্বন্ধে সচেতন হতেই ডুকরে কেঁদে উঠল।

এই কান্নার জন্যই হোক অথবা পালকের অবস্থানের জন্যই হোক, সামসুদ্দিন বিকালের কিছু কিছু ঘটনা প্রত্যক্ষ করতেই দেখল, জঙ্গলের ফাঁকে যেন জালালির মুখ। সুতরাং অযথা সে আর হাঁসটাকে খুঁজল না। সে জানত এই হাঁসগুলিকে মালতী পুত্রবৎ স্নেহে লালন করে আসছে। মালতী বিধবা—সুতরাং বিধবা যুবতীর একমাত্র সম্বল!···সামু রাগে দুঃখে প্রথমে কথা বলতে পারল না। জালালির মুখটা ওর চোখের ওপর কেবল ধূর্ত শেয়ালের মতো ভেসে উঠছে, এবং মালতীর বেদনাবোধ সামুকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তুলল।

সামু বলল, বাড়ি যা মালতী।

অমূল্য বলল, চলেন দিদি।

সামু বলল, কান্দিস না, মালতী।

মালতী এবার চোখ তুলল এবং সামুকে দেখে ভাবল, সেই সামু—যার চোখ ছোট এবং গোল গোল ছিল—সেই সামু যে শান্ত ছিল, এবং মালতীর দুঃখে কৈশোর বয়সে কাতর হত। সামু যেন আজ যথার্থই দাড়ি-গোঁফবিহীন পুরুষ—

সামু যেন এক হিন্দু যুবকের মতো আজ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং মালতীর দীর্ঘদিনের ঘৃণাবোধ সরে গেল। সে অনেকক্ষণ নির্বোধ বালিকার মতো সামুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। কিছু বলল না।

নৌকা দুটো পাশাপাশি ছিল।

হ্যারিকেনের আলোতে ওদের মুখ স্পষ্ট ছিল। গ্রামের ভিতর থেকে কুকুরের ডাক জলের ওপর দিয়ে ভেসে আসছে। বিশ্বাসপাড়াতে হ্যাজাকের আলো এবং আকাশে অস্পষ্ট মেঘের ছায়া। কিছু নক্ষত্র যেন মালতীর দুঃখবোধ গভীর করছে। এই দুঃখবোধ সামুর ভিতরেও সংক্রামিত হল। সামসুদ্দিন বালক বয়সে এই গ্রাম মাঠ পার হয়ে বাপের হাত ধরে ধরে কোথাও চলে যাচ্ছে······ যেন চারিদিকে ঢাক-ঢোল বাজছে—চারিদিকে পাইক-বরকন্দাজ···ওর বাপ দুগ্‌গা ঠাকুরের সামনে লাঠিখেলা দেখাচ্ছে—সামুর মনে হল, সেই সব কীর্তি-মান পুরুষেরা আজ অথর্ব এবং এক নতুন ভাবধারা, নতুন ধর্মবোধ মানুষকে সংকীর্ণ করে তুলছে। সে জালালির ওপর যথার্থ ই ক্ষেপে গেল। সে মনে মনে বলল, শালীর প্যাটে পাড়া দিয়া গোস্ত বাইর করমু।

সামুর নৌকা ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকল। ক্রমশ অদৃশ্য হতে থাকল। পিছনে অমূল্য, মালতী এবং হ্যারিকেনটা পড়ে থাকছে। হ্যারিকেনের আলো কিছুদূর পর্যন্ত অন্ধকারটাকেও ঠেলে রেখেছিল, সামু যত দূরে সরে যেতে থাকল তত মালতীর মুখ অস্পষ্ট হতে থাকল।······মালতী যেন এক রহস্যময়ী নারী। বৃষ্টির জল ধানগাছ থেকে টুপটাপ জলে এবং নৌকার পাটাতনে ঝরছে, ঠিক মালতীর চোখের জলের মতো। সামু দূর থেকে চিৎকার করে বলল, তুই বাড়ি যা, মালতী। অমূল্যকে উদ্দেশ করে বলল, অমূল্য, নৌকা ঘাটে লইয়া যাও। রাইতের ব্যালা এই মাঠ-ময়দানে ঘুইর না। নির্জনে মালতীর এই বসে-থাকা-টুকু সামুকে অসহায় করে তুলছিল, কারণ, কলজের ভিতর দুঃখের কাঁটাটা বড় বেশি আজ খচখচ করছে।

ধনু শেখকে নৌকাটা আবেদালির ঘাটে সন্তর্পণে ভিড়িয়ে দিতে বলল সামু। বলল, লগির য্যান শব্দ না হয়।

সামু সন্তর্পণে পা টিপে টিপে ওপরে উঠতে থাকল। ওকে হাঁটু পর্যন্ত কাদা ভাঙতে হল। এখনও ঝোপ-জঙ্গল থেকে বৃষ্টির জল গড়িয়ে নামছে। এখনও গাছ থেকে ছোট ছোট বৃষ্টির ফোঁটা বাতাসে ঝরে পড়ছে। ঘরের ভিতর স্তিমিত আলো। ভিতরে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। আবেদালি নেই, জব্বর গেছে বাবুর হাটে এবং জোটনও অনুপস্থিত। বড় ভুতুড়ে মনে হচ্ছিল। সে ছোট একটা বেতপাতা ঠেলে বেড়ার ফাঁকে চোখ ঠেলে দিল। দেখল, ছোট এক লম্ফ জ্বলছে। জালালি প্রায় নগ্ন হয়ে বসে আছে পিঁড়িতে। সে দুই

জানকির সব হাড় চুষছিল। হাড়ে কোন গোস্ত লেগে নেই। সে দাঁতের ফাঁকে হাড়গুলোকে মড়মড় করে ভেঙে দিচ্ছিল। জালালি জল খাচ্ছে। সামু দেখল, জলের ওপর যে ধূর্ত শেয়ালের মুখটা ভেসে ছিল জালালির—সারাদিন পর গোস্ত ভক্ষণে—সে মুখ সহজ এবং সুন্দর। সে মুখে আল্লার দোয়া। জল খেতে খেতে দু'বার সে তার আল্লার নাম স্মরণ করল। সামু গরীব এই মানুষগুলোর জন্য ফের অরণ্যের ভিতর হেঁটে যেতে চাইছে, সুতরাং মালতীর হাঁস চুরির কথা অথবা জালালির পেটে পাড়া দিয়ে গোস্ত বের করার কথা সব কেমন যেন মন থেকে নিঃশেষে মুছে গেল। কারণ জালালি একটা ছেঁড়া হোগলা পেতে এখন নামাজ পড়ছে। রসুলের মতো মুখ—সামনে দু'হাত প্রসারিত জালালির। সামসুদ্দিন কিছুই বলতে পারল না। দীর্ঘ এই সংসার যাত্রার আসরে সে যেন কালনেমির মতো এক অলীক লঙ্কাভাগে মত্ত। ওর পা সরছিল না। মাটির সঙ্গে পা গেঁথে যাচ্ছে।

শীতকাল এলেই মানুষটা কিছুদিন যেন ভাল থাকে। ঠাণ্ডার জন্য মণীন্দ্রনাথ গায়ে র‍্যাপার জড়িয়েছেন। আগের মতো খালি গায়ে থাকছেন না। এমন করে ভাল হতে হতে একদিন হয়তো যথার্থই ভাল হয়ে যাবেন। তখন কোথাও দু'জনে চলে যাবে এক সঙ্গে—কোন তীর্থে অথবা বড় শহরে। অথবা সেই যে বলে না, এক মাঠ আছে, মাঠের পাশে বড় দিঘি আছে, দিঘিতে বড় বড় পদ্মফুল ফুটে থাকে, বড়বৌ গ্রীক পুরাণের এই নায়ককে নিয়ে একদিন যথার্থই সেখানে চলে যাবে। মানুষটা ভাল হলেই জলদানের নিমিত্ত কোন জলছত্রের পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে। তখন হয়তো কোথাও দূরে গীর্জায় ঘণ্টা বাজবে, পুরোহিতেরা মন্ত্র উচ্চারণ করবে—পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ কোন আমলকি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সোনার হরিণের স্বপ্ন দেখবেন।

বড়বৌ মানুষটাকে এমন স্বাভাবিক দেখে এক বাটি গরম দুধ নিয়ে এল। সঙ্গে নতুন গুড়, মর্তমান কলা। কিছু গরম মুড়ি। বড় আসন পেতে সে মানুষটার জন্য অপেক্ষা করতে থাকল।

সেই আশ্বিনের কুকুরটা মণীন্দ্রনাথের পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছিল। সোনা দক্ষিণের বারান্দায় পড়ছে। কুকুরটা মাঝে মাঝে ঘেউঘেউ করছিল। লাল জবা গাছটার নিচে দুটো শীতের ব্যাঙ ক্লপ ক্লপ করছে। মণীন্দ্রনাথ গরম দুধ, মর্তমান কলা, নতুন গুড় মেখে খেলেন। কিছু তাঁর প্রিয় কুকুরকে দিলেন। তারপর উঠে আসার সময় মনে হল সোনা চুপি চুপি পড়া ফেলে এদিকে আসছে। বড়কর্তা খুব খুশি—তিনি, কুকুর এবং সোনাকে নিয়ে শীতের ভোরে মাঠে নেমে গেলেন।

ওরা সোনালী বালির নদীতে এসে নামল। এখন জলে তেমন স্রোত নেই। জল কমে গেছে। যেন ইচ্ছা করলে হেঁটে পার হওয়া যায়। পাড়ের পরিচিত মানুষেরা সোনা এবং মণীন্দ্রনাথকে আদাব দিল। আশেপাশে সব মুসলমান গ্রাম। ওদের দেখেই মাঝি এ-পাড়ে চলে এল। নৌকায় কুকুরটা সকলের আগে লাফিয়ে উঠেছে। সোনার অনেকদিনের ইচ্ছা—কোন ভোরে, পাগল জ্যাঠামশাইর সঙ্গে গ্রাম মাঠ দেখতে বের হবে। প্রতিদিন ক্রোশের পর ক্রোশ হেঁটে দুপুরে অথবা সন্ধ্যায় জ্যাঠামশাই ক্লান্ত সৈনিকের মতো বাড়ির উঠোনে উঠে আসেন, পায়ে পায়ে বিচিত্র নদী-নালার চিহ্ন থাকে, গরমে তরমুজ এবং শীতের শেষে আখের আঁটি সঙ্গে আনেন। সোনার কাছে মানুষটা বনবাসী রাজপুত্রের মতো। কতরকমের গল্প শোনার ইচ্ছা এই মানুষের কাছে— পাগল বলে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শোনাতেন। নির্জন নিঃসঙ্গ মাঠ পেলেই বলতে থাকেন। পাগল বলে গল্পের আরম্ভও নেই শেষও নেই।

জ্যাঠামশাই বলতেন, পদ্মপুকুরে যাবি ?

জ্যাঠামশাই বলতেন, ইলিশমাছের ঘর দেখবি ?

তারপর কোন উত্তর না পেলে বলতেন, রূপচাঁদ পক্ষী দেখবি ?

সোনা কোন উত্তর করত না। উত্তর করলেই বলবেন, গ্যাৎচোরেৎশালা। তবু একবার সে খুব সাহস সঞ্চয় করে বলেছিল, আমি পঙ্খীরাজ ঘোড়া ছাখমু। ছাখাইবেন ?

মণীন্দ্রনাথের যেন বলার ইচ্ছা, তোমার পদ্মপুকুর দেখতে ইচ্ছা হয় না! ইলিশমাছের ঘর দেখতে ইচ্ছা হয় না। রূপচাঁদ পক্ষী ছাখো না! ছাখো কেবল, পঙ্খীরাজ ঘোড়া। পঙ্খীরাজ ঘোড়া একটা আমারও লাগে। পাই কোথা! বলে সোনার দিকে একটা প্রশ্নবোধক মন নিয়ে তাকিয়েছিলেন।

আর আজ সোনার কিছুতেই পঙ্খীরাজ ঘোড়ার কথা মনে হল না। সে আজ পড়া ফেলে চলে এসেছে। মা, ছোট কাকা খুঁজছেন। সোনা কই গ্যাল, ছাখেন, পোলটা কই গ্যাল—সকলে খুঁজবে। সোনার ভারি মজা লাগল ব্যাপারটা। মা ওকে ফতিমাকে ছুঁয়ে দেবার জন্য মেরেছে। ঠাকুমা বলেছে ওঁর জাতধর্ম গেল। ওকে সকলে অযথা হেনস্থা করেছে কতদিন। লালটু পলটু ওঁকে একটু কিছু করলেই কান ধরে ওঠ বোস করিয়েছে—আজ ওরা সকলে ভাবুক। সে, জ্যাঠামশাইর সঙ্গে বাড়ি থেকে চুপি চুপি বের হয়ে পড়ল। পাগল বলে তিনি শুধু হেসেছিলেন। পাগল বলে তিনি তাকে এই যাত্রার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। যেন বলেছিলেন, কোথাও না কোথাও পঙ্খীরাজ ঘোড়া আকাশে উড়ে বেড়ায়, কোথাও না কোথাও শঙ্খের ভিতর শঙ্খকুমার পালিয়ে থাকে আর কোথাও না কোথাও ঝিনুকের ভিতর চম্পক-নগরের রাজকন্যা সাপের বিষে চলে আছে। তুমি আমি সেখানে চলে যাব সোনা। সবার জন্য বড় মাঠ থেকে সোনালী ধানের ছড়া নিয়ে আসব।

আহা, ওরা কত গ্রাম মাঠ ফেলে চলে যাচ্ছে। যত ওরা এগুচ্ছিল তত আকাশটা ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। সোনা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সে ক্ষুধায় অবসন্ন হয়ে পড়েছে। সে আকাশ ছুঁতে পারছে না কিছুতে। ওর কতদিনের ইচ্ছা, জ্যাঠামশাইর সঙ্গে বের হয়ে সে, যে আকাশটা নদীর ওপারে নেমে গেছে—সেটা ছুঁয়ে আসবে। কিন্তু কি করে জাদুবলে আকাশটা কেবল সরে যাচ্ছে।

কিছু পরিচিত লোক এই নাবালক শিশুকে পাগল মানুষের সঙ্গে দেখে বিস্ময়ে বলে উঠল, সোনাবাবু, আপনে! জ্যাঠামশয়র লগে কোনখানে যাইতাছেন। হাঁটতে কষ্ট হয় না!

সোনা খুব বড় মানুষের মত ঘাড় নাড়িয়ে বলল, না।

কিন্তু মণীন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন সোনা আর যথার্থই হাঁটতে পারছে না।

তিনি ওকে কাঁধে তুলে নিলেন। এখন সূর্যের উত্তাপ প্রখর। ঘাসের মাথায় আর শিশির পড়ে নেই। সূর্য মাথার ওপর উঠে গেছে। এ-সময় ওরা, কোথাও যেন ঘণ্টা বাজছে এমন শুনতে পেল।

সোনার মনে হল বুঝি সেই পঙ্খীরাজ ঘোড়া। সে হাততালি দিতে দিতে বলল, জ্যাঠামশয় পঙ্খীরাজ ঘোড়া।

আশ্বিনের কুকুরটা সহসা চলতে চলতে থেমে পড়ল। সে কান খাড়া করে শব্দটা শুনল। শব্দটা যেন এদিকে এগিয়ে আসছে।

মণীন্দ্রনাথের এখন বাড়ি ফেরার কথা মনে পড়ছে। সেই ঘণ্টাধ্বনি শুনেই বুঝি বাড়ি ফেরার কথা মনে পড়ে গেল। ডানদিকে এক দীর্ঘ বন। বনের ভিতর দিয়ে হাঁটলে ফের সেই সোনালী বালির নদী পাওয়া যাবে, নদীর পাড়ে তরমুজ খেত। এখন হয়তো তরমুজের লতা এক দুই করে বিছিয়ে যাচ্ছে ঈশম। আর তখন বনের ভিতর কত রকমের গাছ। সেই ঘণ্টার শব্দ ক্রমে নিকটবর্তী হচ্ছে। বনের ভিতর কত রকমের গাছ—সব চেনা নয়। তবু গন্ধ গোলাপ-জামের, লটকন ফলের। সব ফল এখন প্রায় নিঃশেষ। সোনা গাছে গাছে কি ফল আছে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করল। তারপর ফাঁকা মাঠে নামতেই দেখল, এক আজব জীব। অতিকায় জীব। ওর গলায় ঘণ্টা বাজছে। সোনা চিৎকার করে উঠল, ঐ ছাখেন জ্যাঠামশয়।

কুকুরটা ছুটতে চাইল এবং ঘেউঘেউ করে উঠল। জ্যাঠামশাই কুকুরটাকে ধরে রাখলেন। সোনাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে পাশাপাশি যেন তারা তিন মহাপ্রাণ সেই আজব জীবের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। কাছে এলেই ছুটতে থাকবে তারা, অন্য পথে চলে গেলে কোন ভয় থাকবে না।

সোনা বিস্ময়ে কথা বলতে পারছে না। আসলে এত বড় মাঠ এবং এক বিরাট জীব—এ-হাতির গল্প সে মেজ-জ্যাঠামশাইর কাছে শুনেছে। জমিদার বাড়ির হাতি। হাতিটা দুলে দুলে ওদের দিকে নেমে আসছে। কাছে এলে, ওর মতো বয়সের এক বালক হাতির মাথায় বসে অঙ্কুশ চালাচ্ছে দেখতে পেল। যে ভয়টুকু ছিল প্রাণে তা একেবারে উবে গেল। সে আনন্দে চিৎকার করে উঠল, জ্যাঠামশয়।

জ্যাঠামশাই কতদিন পর যেন কথা বললেন।—ওটা হাতি।

সোনা বলল, হাতি!

জ্যাঠামশাই বললেন, ওটা মুড়াপাড়ার হাতি।

কিন্তু এ-কি! হাতিটা যে ওদের দিকেই ধেয়ে আসছে। বড় বড় পা ফেলে উঠে আসছে। এত বড় একটা জীব দেখে আর এমনভাবে এগিয়ে আসছে দেখে সোনা ভয়ে গুটিয়ে গেল। একেবারে ওদের সামনে এসে পড়ছে। জ্যাঠামশাই নড়ছেন না। কুকুরটা ছুটাছুটি করছে। সোনা ভাবছিল পালাবে

কি না, ছুটবে কি না অথচ এত বড় বিস্তৃত মাঠ পিছনে—সামনে ঝোপ—সে কোন দিকে ছুটে যাবে স্থির করতে পারল না। ভয়ে সে শুধু জ্যাঠামশাইকে জড়িয়ে ধরল। বলল, জ্যাঠামশয় আমি বাড়ি যামু।

জ্যাঠামশাই কোন উত্তর করলেন না। তিনি এখন শুধু অপলক দৃষ্টিতে হাতিটাকে দেখছেন। যত নিকটবর্তী হচ্ছে তত তিনি কেমন মনে মনে অস্থির হয়ে উঠছেন।

সোনা জ্যাঠামশাইকে এবার হাত কামড়ে দিতে চাইল। মানুষটা ওর কথা শুনতে পাচ্ছে না। সে বলল, আমি মার কাছে যামু। বলে কাঁদতে থাকল।

কিন্তু কি আশ্চর্য, হাতিটা ওদের সামনে এসে চার পা মুড়ে বশংবদের মতো বসে পড়ল। মাহুত জ্যাঠামশাইকে সেলাম দিল। তারপর হাতিটাকে বলল সেলাম দিতে। হাতিটা শুঁড় তুলে সোনাকে সেলাম দিল।

জসীমের ছেলে ওসমান সামনে বসে। জসীম পিছনে। সে বলল, আসেন কর্তা, হাতির পিঠে চড়েন। আপনেগ বাড়ি দিয়া আসি।

ওরা এতদূর এসে গেছে যে জসীম পর্যন্ত বুঝতে পারছিল বেলাবেলিতে পাগল মানুষ এই নাবালককে নিয়ে ঘরে ফিরতে পারবে না। সে তাদের হাতির পিঠে তুলে নিল। সোনা হাতির পিঠে বসে মেজ-জ্যাঠামশাইর কথা মনে করতে পারছে। তিনি মুড়াপাড়া থেকে বাড়িতে এলেই এই হাতির বিচিত্র গল্প করতেন—হাতিতে চড়ে একবার ওঁরা শীতলক্ষা নদী পার হয়ে কালীগঞ্জে যেতে এক ভয়ঙ্কর ঝড় এবং ঝড়ে একটা গাছ উপড়ে এলে এই হাতি গাছ রুখে মেজ-জ্যাঠামশাইকে মৃত্যু থেকে রেহাই দিয়েছিল। সোনার এমন একটা বিরাট জীবের জন্য মায়া হতে থাকল। এখন মনে হচ্ছে তার, হাতির পিঠে চড়ে সামনের আকাশ অতিক্রম করে চলে যেতে পারবে। হাতিটা হাঁটছে। গলায় ঘণ্টা বাজছে। পিছনে আশ্বিনের কুকুর। সে পিছনে ছুটে ছুটে আসছে। কত গ্রাম কত মাঠ ভেঙে, ঝোপজঙ্গল ভেঙে ওরা হাতির পিঠে—যেন কোনো এক সওদাগর বাণিজ্য করতে যাচ্ছে—সপ্ত ডিঙায়, সাত শো মাঝির বহর··· সোনা যুদ্ধ জয়ের মতো ঘরে ফিরছে।

জসীম সোনাকে উদ্দেশ করে বলল, কখন আপনেরা বাইর হইছিলেন।

সোনা বলল, সেই ভোরবেলা।

—মুখ ত আপনের শুকাইয়া গ্যাছে।

—ক্ষুধা লাগছে, কিছু খাই নাই।

—খাইবেন? বলে জসীম পাকা পাকা প্রায় দুধের মতো সাদা গোলাপজাম কোঁচড় থেকে তুলে দিল।

মিষ্টি এবং সুস্বাদু গোলাপজাম। সোনা প্রায় খাচ্ছিল কি গিলে ফেলছিল বোঝা দায়।

তখন হাতিটাকে দেখে কিছু গাঁয়ের নেড়ীকুকুর চিৎকার করছিল। কিছু আবাদী মানুষ বাবুদের হাতি দেখছিল—মুড়াপাড়ার হাতি, হাতিটাকে নিয়ে জসীমউদ্দিন প্রতি বছর এ-অঞ্চলে ঠিক হেমন্তের শেষে, শীতের প্রথম দিকে চলে আসে। বাড়ি বাড়ি হাতি নিয়ে জসীম খেলা দেখায়।

জসীম সোনাকে উদ্দেশ করে বলল, কর্তা, পাগল জ্যাঠামশয়র লগে যে বাইর হইলেন—যদি আপনেরে ফালাইয়া তাইন অন্য কোনখানে চইলা যাইত?

—যায় না। জ্যাঠামশয় আমারে খুব ভালবাসে।

জসীম বলল, পাগল মাইনসের লগে বাইর হইতে ডর লাগে না?

সোনা বলল, না। লাগে না। জ্যাঠামশয় আমারে লইয়া কতখানে চইলা যায়। একবার হাসান পীরের দরগায় আমারে রাইখা আইছিল, না জ্যাঠামশয়! সোনা পাগল জ্যাঠামশাইকে সাক্ষী মানতে চাইল।

মণীন্দ্রনাথ ঘাড় ফিরিয়ে সোনাকে দেখলেন। যেন এখন কত অপরিচিত এই বালক। বালকের সঙ্গে কথা বলা অসম্মানজনক। তিনি তার চেয়ে বরং সামনের আকাশ দেখবেন। আকাশ অতিক্রম করে আরও দ্রুত চলে যাওয়া যায় কি না অথবা যদি তিনি আকাশ অতিক্রম করে চলে যেতে পারেন—সামনে এক বিরাট দুর্গ পাবেন, দুর্গের ভিতর পলিন—তিনি এইসব ভেবে হামাগুড়ি দিতে চাইলেন হাতির পিঠে এবং সেই ক্ষুদ্র বালক ওসমানকে তুলে অঙ্কুশ কেড়ে হাতিকে নিজের খুশিমতো চালিয়ে নিতে চাইলেন—হাতি আমাকে নিয়ে তুমি দ্রুত হেঁটে পলিনের দেশে চল—সেই কোমল মুখ আমি আর কোথাও দেখছি না।

জসীম চিৎকার করে উঠল, কর্তা, আপনে কি করতাছেন কর্তা! ওসমান পাগল মানুষটার দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেল। সে তার অঙ্কুশ কেড়ে নিতে আসছে। সোনা পিছন থেকে একটা পা চেপে ধরল।—জ্যাঠামশয় আপনে পইড়া যাইবেন। মণীন্দ্রনাথ আর পড়তে পারলেন না। তিনি করুণ এক মুখ নিয়ে সোনার দিকে তাকালেন। কারণ সোনার চোখে এমন এক জাদু আছে যা তিনি কিছুতেই ঠেলে ফেলতে পারেন না। মাঠ পার হলে শুধু তিনি দেখলেন, পুবের বাড়ির নরেন দাস মাথায় কাপড়ের গাঁট নিয়ে বাবুর হাটে যাচ্ছে। হাতির গলায় ঘণ্টা বাজছিল বলে গ্রামের সব বালকবালিকা ছুটে এসেছে। আর নরেন দাসের বিধবা বোন মালতী সেই শ্যাওড়া গাছটার পাশে দেখল বড় বড় সামিয়ানা টানানো হয়েছে। শতরঞ্চি পেতে দেওয়া হয়েছে। মিঞারা, মৌলবিরা এসে জড় হচ্ছে। আর এই গ্রামের সর্বত্র, অন্য গ্রামের গাছে গাছে, মাঠে মাঠে ইস্তাহার ঝুলিয়ে চলে গেছে সামসুদ্দিনের লোকেরা অথবা তার ডান হাত যাকে বলা যায়—সেই ফেলু শেখ। তাতে কিছু শব্দ লেখা ছিল। লেখা ছিল—পাকিস্তান জিন্দাবাদ। লেখা ছিল,

লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান আর লেখা ছিল নারায়ে তকদির। মালতী নারায়ে তকদির এই শব্দের অর্থ জানত না। একদিন সে ভেবেছিল, চুপি চুপি সামসুদ্দিনকে অর্থটা জিজ্ঞাসা করবে।

মালতী এবার নিজের দিকে তাকাল। শরীরের লাবণ্য ক্রমে বাড়ছে। স্বামীর মৃত্যুর পর ফের ঢাকায় গত মাসে দাঙ্গা হয়ে গেছে। ওর শ্বশুর এসে বলে গেল, ঢাকায় শাঁখারীরা, কুট্টিরা বড় বদলা নিছে। সেদিন থেকে মালতী খুশী। সামুরে, তুই গাছে গাছে ইস্তাহার ঝুলাইয়া কি করবি! সামুকে উদ্দেশ করে মনে মনে গাল দিল মালতী।

সামিয়ানার নিচে মুসলমান গ্রামের লোকেরা জড় হচ্ছে। সিন্নির জন্য বড় উনুন ধরানো হচ্ছে। বড় বড় তামার ডেকচিতে দুধে জলে চালের গুঁড়া সেদ্ধ হচ্ছে। গোপাট ধরে হাতির পিঠে রাজার মতো তখন পাগল মানুষ ঘরে ফিরে আসছেন।

মালতী দেখল হাতির পিঠে পাগল ঠাকুরবাড়িতে উঠে আসছে। ঘণ্টার আওয়াজে যে যেখানে ছিল ছুটে এসেছে। এই ঘণ্টার শব্দ কোন শুভ বার্তার মতো এই অঞ্চলের সকল মানুষের কানে বাজছে। ওরা মনে করতে পারল, সেই পয়মন্ত হাতি লক্ষ্মীর মতো রূপ নিয়ে, শুভ বার্তা নিয়ে তাদের দেশে চলে এসেছে। এই হাতির জন্য যারা গেরস্থ বৌ, যারা কোনকালে একা একা ঘরের বার হয় নি তারা পর্যন্ত বাড়ির সব ছোট বালকের পিছু পিছু ঠাকুরবাড়ির উদ্দেশে হাঁটতে থাকল।

অথবা হাতিটা যখন পরদিন উঠোনের ওপর এসে মা মা বলে ডাকবে তখন সব গেরস্থ বৌদের প্রাণে 'এই হাতি আপনার ধন' অথবা 'এই হাতি মা লক্ষ্মীর মতো'। এই হাতি বাড়ির উঠোনে উঠে এলে জমিতে সোনা ফলবে। ওরা হাতির মাথায় কপালে লেপে দেবার জন্য সিঁদুর গুলতে বসে গেল। হাতিটার কপালে সিঁদুর দিতে হবে, ধান দূর্বা সংগ্রহ করে রাখল সকলে। আর মালতী দেখল, হাতির পিঠে পাগল মানুষ হাততালি দিচ্ছে। হাতির পিঠে সোনা। ফতিমা, সোনাবাবুকে নিচ থেকে বলছে, আমারে পিঠে তুইলা নেন সোনাবাবু। ফতিমা হাতিটার পাশে পাশে হাতির পিঠে ওঠার জন্য ছুটছিল। আর তখন 'ফতিমার বা'জী সামসুদ্দিন সামিয়ানার নিচে বড় বড় অক্ষরে ইস্তাহার লিখছিল, ইসলাম বিপন্ন। বড় বড় হরফে লিখছিল—পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

মালতী এইসব দেখতে দেখতে ডেফল গাছটার নিচে বসে কেমন আবেগে কেঁদে ফেলল। সে চিৎকার করে বলতে চাইল, সামুরে, তুই দেশটার কপালে দুঃখ ডাইকা আনিস না।

হাতিটা পুকুর পাড় ধরে উঠে যাবার সময় আমের ডাল, অর্জুনের ডাল এবং

জামগাছের ডাল অর্থাৎ নিচে যা পেল সব মটমট করে ডালপালা ভেঙে শুঁড় দিয়ে মুখে পুরে দিতে থাকল। আর সেই স্থলপদ্ম গাছটা, যে গাছের নিচে বসে পাগল মানুষটা স্বচ্ছ আকাশ দেখতে ভালবাসতেন—সেই গাছটা পর্যন্ত মট-মট করে ভেঙে হাতিটা মুখে ফেলে কট করে একটা শব্দ, প্রায় কাটা নারকেল খেলে মানুষের মুখে যেমন শব্দ হয়, হাতির মুখে স্থলপদ্ম গাছের ডালপালা কাণ্ড তেমন শব্দ তুলছে। জসীম বার বার অঙ্কুশ চালিয়েও হাতিটাকে দমিয়ে দিতে পারল না। হাতিটা গাছটাকে চেটেপুটে খেয়ে ফেলল। রাগে দুঃখে পাগল জ্যাঠামশাই হাত কচলাতে থাকলেন। তার এই স্থলপদ্ম গাছ, তার সখের এবং নীরব আত্মীয়ের মতো এই স্থলপদ্ম গাছের মৃত্যুতে তিনি বললেন, গ্যাৎচোরেৎশালা।

মাঠের ভিতর সামিয়ানা টাঙানো। মোল্লা মৌলবিরা আসতে শুরু করেছে। ধানকাটা হয়ে গেছে বলে নেড়া নেড়া সব মাঠ। শস্য বলতে কিছু কলাই গাছ, মসুরি গাছ। ফেলু শেখ সব জুড়িদারদের নিয়ে বড় বড় গর্ত করছে। হাজি সাহেবের চাকর দুধ ফোটাচ্ছে। বড় বড় তামার ডেকচিতে দুধ এবং জল, জলে চালের গুঁড়ো, মিষ্টি, তেজপাতা, আখরোট, এলাচ, দারচিনি, জাফরান, লবঙ্গ। পুরনো তক্তপোশের ওপর ছিন্ন চাদর পাতা। আর হাজি সাহেবের তিন ছেলে উজান গিয়েছিল ধান কাটতে, তখন একটা খ্যাস এনেছিল উজান থেকে। সেই খ্যাস পেতে প্রধান মৌলবিসাবের জন্য একটা আসন করা হয়েছে। সব মুসলমান চাষাভুষা লোক ক্রমে সামিয়ানার নিচে জড় হচ্ছিল।

শচীন্দ্রনাথ জানত, এমন একটা ঘটনা ঘটবে। সামসুদ্দিন ভোটে এবারেও হেরে গেছে। লীগের নাম করে এবারেও সে মুসলমান চাষাভুষা লোকের সব ভোট নিতে পারে নি, শচীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাঁড়িয়ে এবারেও ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট হয়ে গেল। সুতরাং সে এমন একটা ঘটনা ঘটবে জানত। সামসুদ্দিন ঢাকা গেছিল। সাহাবুদ্দিন সাহেবের আসার কথা। এত বড় একটা মানুষ আসবে এদেশে, একবার ওরও ইচ্ছা ছিল সামিয়ানার নিচে গিয়ে দাঁড়াতে। কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই ধর্মীয় করে রেখেছে। বোধ হয় নিমন্ত্রণ করলেও সে যেতে পারত না।

হাতিটাকে পুকুর পাড় ধরে উঠে আসার সময় সে এসব ভাবছিল। জসীম হাতিটাকে এখন উঠোনে তুলে আনছে। হাতিটা কাছে এলে সে বলল, জসীম, ভাল আছ?

—আছি কর্তা। জসীম হাতিটাকে সেলাম দিতে বলল।

—মাইজাদা ভাল আছেন?

জসীম একটু নুয়ে বলল, হুজুর ভাল আছেন।

—অনেক দিন পর ইদিকে আইলা।

—আইলাম। আপনেগ দেখতে ইসছা হইল, চইলা আইলাম।

—বাবুরা বুঝি এখন বাড়ি নাই?

—না। বাবুরা ঢাকা গ্যাছে।

সোনাকে এবার ছোটকাকা বললেন, হারে সোনা, তর ক্ষুধা পায় না? অরে নামাইয়া দে জসীম। অর মায় ত গালে হাত দিয়া ভাবতেছে, পোলাটা গ্যাল কৈ?

হাতিটা পা মুড়ে বসে পড়ল। সোনা নেমে গেল। গ্রামে এখন এই হাতির জন্য উৎসবের মতো আনন্দ। জসীমের ছেলে ওসমান নেমে গেল। সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। জসীম পাগল মানুষকে উদ্দেশ করে বলল, কর্তা, নামেন।

পাগল মানুষ তিনি, তিনি এই কথায় শুধু হাসলেন। তিনি নেমে যাওয়ার এতটুকু চেষ্টা করলেন না। এই হাতি তাঁর প্রিয় স্থলপদ্ম গাছ খেয়ে ফেলেছে। যেন স্থলপদ্ম গাছটা কত দিনের কতকালের পলিনের স্মৃতি ধরে রেখেছে। এই গাছের নিচে বসলেই তিনি জাহাজের সেই অলৌকিক শব্দ শুনতে পেতেন। কাপ্তান মাস্তুলে উঠে নিশান ওড়াচ্ছে। জাহাজটা পলিনকে নিয়ে জলে ভেসে গেল। আর হাতিটা সেই স্মৃতিসহ সব চেটেপুটে খেয়ে এখন চোখ বুজে আছে।

শচীন্দ্রনাথও অনুরোধ করল হাতির পিঠ থেকে নামতে; কিন্তু পাগল মানুষ তিনি—হাতির পিঠে সন্ন্যাসীর মতো পদ্মাসন করে বসে থাকলেন। এতটুকু নড়লেন না। জোর করতে গেলে তিনি সকলের হাত কামড়ে দেবেন। অথবা হত্যা করবেন সকলকে, এমন এক ভঙ্গি নিয়ে স্থলপদ্ম গাছের শেষ চিহ্নটুকু দেখতে থাকলেন।

জসীম দেখল হাতির পিঠে বড়কর্তা বসে কেবল বিড়বিড় করে বকে যাচ্ছেন। তিনি কারও অনুরোধ রাখছেন না। শচীন্দ্রনাথ বার বার বলছে, দু' চারজন মাতব্বর মানুষ হাতিটা ঠাকুরবাড়ি উঠে আসতে দেখে জড় হয়েছিল—তারাও বলছে, বড়কর্তা নামেন। হাতিটা অনেকটা পথ হাঁইটা আইছে, অরে বিশ্রাম ছান। বড়কর্তা ভ্রূক্ষেপ করলেন না, তিনি বরং হাতিটার কানের নিচে পা রেখে বলতে চাইলেন, হেট্ হেট্।

তখন হাতিটা ইঙ্গিত পেয়ে উঠে দাঁড়াল। পাগল মানুষ বড়কর্তা হাতিটা নিয়ে বের হয়ে পড়ল। জসীম ডাকল, কর্তা এইটা আপনে কি করেন! কর্তা, অঃ কর্তা।

বাড়ির প্রায় সকলেই বিপদ বুঝতে পেরে পিছনে ছুটল। ততক্ষণে হাতিটা পুকুর পাড় ধরে নিচে নেমে যাচ্ছে। পূবের বাড়ির মালতী দেখল, পাগল ঠাকুর মুড়াপাড়ার হাতিটা নিয়ে মাঠে নেমে যাচ্ছে। মাঠে নরেন দাসের জমি পার হলেই সেই শ্যাওড়া গাছ, গাছে ইস্তাহার ঝুলছে, গাছে গাছে সামসুদ্দিন ইস্তাহার ঝুলিয়ে সেই এক বাক্য বলছে, পাকিস্তান জিন্দাবাদ। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। অথবা নারায়ে তকদির এবং এমন সব অনেক কথা লেখা আছে—যা মালতীর দু'চোখের বিষ। মালতীর চিৎকার করে বলার ইচ্ছা, সামুরে, তর ওলাওঠা হয় না ক্যান!

তখন হাতিটা নরেন দাসের জমি পার হয়ে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটছে। পিছনে ছোট ঠাকুর, জসীম, জসীমের পুত্র ওসমান ছুটছে। গ্রামের কিছু ছেলে-বুড়ো ছুটছে। ওরা সকলে হৈহৈ করছিল—কারণ একজন পাগল মানুষ এক অবলা হাতি নিয়ে মাঠে ঘোড়দৌড়ের বাজী জেতার মতো ছুটছে। কিছুদূর গেলে সামসুদ্দিনের সামিয়ানা টানানো মণ্ডপ। মণ্ডপের বাইরে খোলা আকাশের নিচে বড় বড় ডেকচি—ফেলু সিন্নি চড়িয়েছে। মৌলবিসাব আজান দিয়ে এইমাত্র মঞ্চে উঠে নামাজ পড়ছেন। যারা দূর গাঁ থেকে সভায় 'ইসলাম বিপন্ন' ভেবে সিন্নির স্বাদ নিতে এসেছে অথবা ইসলাম এক হও এবং এই যে কাফের জাতীয় মানুষ, যাদের পায়ের তলায় থেকে সংসারের হাল ধরে আছি—কি না দুঃখ বল, এই জাতি তোমাদের কি দিয়েছে, জমি তাদের, জমিদারী তাদের—উকিল বল, ডাক্তার বল সব তারা—কি আছে তোমাদের, নামাজ পড়ার পর এই ধরনের কিছু কিছু উক্তি—যা রক্তে উত্তেজনার জন্ম দেয়—মানুষগুলো কান খাড়া করে মৌলবিসাবের, বড় মিঞার এবং পরাপরদির বড় বিশ্বাসের ধর্মীয় বক্তৃতা শোনার সময় পেছনে ফেলু শেখের চিৎকারে একে অন্যের ওপর ছিটকে পড়ল। সেই ঠাকুরবাড়ির পাগল ঠাকুর এক মত্ত হাতি নিয়ে এদিকে ছুটে আসছে। সবাই হৈহৈ করতে থাকল। তিনি পাগল মানুষ, হাতি অবলা জীব—সারাদিনের পরিশ্রমের পর হাতিটা বুঝি ক্ষেপে গেছে। হাতিটা পাগলা হাতির মতো শুঁড় উঁচু করে চিৎকার করতে করতে সেই সামিয়ানার ভিতর ঢুকে সব লণ্ডভণ্ড করে দিল।

ফেলু শেখ তামার বড় ডেকচিগুলোর পাশে লুকিয়েছিল। ভিতরে দুধে জলে চালের গুঁড়োতে টগবগ ফুটছে। সেই মত্ত হাতি ভিতরে ঢুকে গেলে সকলে নানাভাবে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটছে। সকলে দৌড়ে দৌড়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করছে। সামসুদ্দিন আতঙ্কে ভাঙা তক্তপোশের নিচে লুকিয়ে পড়ল। ফেলু পালাচ্ছিল, পালাতে গিয়ে হাতিটার একেবারে সামনে পড়ে গেল। হাতিটা সহসা ওকে শুঁড়ে জড়িয়ে ধরল এবং ধরার জন্য একটা হাত ভেঙে গেল। সকলে চিৎকার করছে দূরে, কেউ কাছে আসতে সাহস পাচ্ছে না, হায় হায় করছে, একটা মানুষ হাতির পায়ের নিচে বুঝি চলে গেল। মণীন্দ্রনাথ হাতির পিঠে বসে গালে হাত দিয়ে হাতি কতটুকু কি করতে পারে যেন এমন কিছু দেখছিলেন। যেন তিনি ভাবে মগ্ন। হাতির পিঠে চড়ে বেশ তামাশা

দেখা যাচ্ছে যেন, যেন এমনি হওয়া উচিত ফেলুর। পাগল ঠাকুর এবারে ফের হাতির কানের নিচে পা দিয়ে খোঁচা মারতেই একান্ত বশংবদের মতো ফেলুকে মাটির ওপর পুতুলের মতো দাঁড় করিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাতিটাকে এই স্থান-কাল-পাত্র পরিত্যাগ করে চলে যেতে বললেন। আর হাতিটাও স্থান-কাল-পাত্র পরিত্যাগ করে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটতে থাকল।

তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। তখন নদীর চড়ে ঈশম তরমুজের লতা নিড়ান দিয়ে সাফ করে দিচ্ছিল। হেমন্তকাল শেষ হয়ে যাচ্ছে। সূর্য পশ্চিমে নামতে থাকলেই ঘাসে ঘাসে শিশির পড়তে থাকে। জসীম চিৎকার করছিল, আর হাতিটার পিছনে ছুটছিল। বাবুদের হাতি—সে এই অঞ্চলে হাতি নিয়ে ঘুরতে এসে কি এক বিপদে পড়ে গেল—সেই বিস্তীর্ণ মাঠের ভিতর থেকে পাগল মানুষকে হাতির পিঠে তুলে না নিলেই এখন মনে হচ্ছে ভাল হত। সেই যে তিনি হাতির পিঠে চড়ে বসলেন আর নামতে চাইলেন না। এখন কি হবে! হাতিটা ক্রমশ মাঠ ভেঙে গ্রামে, গ্রাম ভেঙে মাঠে পড়ছে। হাতির পিঠে মণীন্দ্রনাথ তালি বাজাচ্ছেন। গ্রামের ছোট বড় সকলে পিছনে ছুটে ছুটে যখন হাতিটার আর নাগাল পেল না, যখন হাতিটা নদীর চর পার হয়ে অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকল—তখন মণীন্দ্রনাথ চুপচাপ বসে থেকে বুঝলেন—আর ভয় নেই। হাতিটাকে কৌশলে তিনি যেন বলে দিলেন, অবলা জীব হাতি, তুমি এবার ধীরে ধীরে হাঁটো। তোমাকে আমাকে এখন আর কেউ খুঁজে পাবে না।

রাত হয়ে গেছে। এটা কোনো মাঠ হবে, বোধ হয় দামোদরদির মাঠ হবে। আর একটু গেলেই মেঘনা। নদীর পাড়ে বড় মঠ। অন্ধকারে এখন মঠ দেখা যাচ্ছে না। শুধু ত্রিশূলের মাথায় একটা আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে।

শচীন্দ্রনাথ তখন বাড়ির ভিতরে। আরও সব মানুষজন এসেছে। জসীম উঠোনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। এত বড় হাতি নিয়ে পাগল ঠাকুর কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। সে মাহুত হাতির—বাবুদের হাতি, লক্ষ্মীর মতো পয়মন্ত হাতি—এখন কি হবে, সে ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছিল না। উঠোনের ওপর গ্রামের লোকেরা কি করা যায় পরামর্শ করছে। গ্রামে গ্রামে এখন খবরটা পৌঁছে গেছে। ঈশম লণ্ঠন হাতে আবার বের হয়ে পড়েছে এবং প্রায় একদল মানুষ লণ্ঠন হাতে সোনালী বালির নদীর চরে নেমে যাচ্ছে। তারা জোরে জোরে ডাকছিল। জসীমও বেশীক্ষণ অপেক্ষা করে নি। সে ওসমানকে রেখে একা সেই দলটার সঙ্গে মেশার জন্য কাঁধে গামছা ফেলে দৌড়াতে থাকল।

সামসুদ্দিন লণ্ঠন হাতে মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। ফেলু খুব বেঁচে গেছে এ যাত্রা। ওকে ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একটা তছনছ

ভাব এবং পাগল ঠাকুর ইচ্ছা করে এমন একটা ঘটনা ঘটিয়েছেন যেন, যেন তিনি জানতেন সামসুদ্দিনের এই যে ইস্তাহার ঝুলিয়ে স্বার্থপর মানুষের মতো একই সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হবার বাসনা—এই বাসনা ভাল নয়। পাগল মানুষ তিনি। এইটুকু ভেবে গোটা উৎসবের মতো এক ছবিকে তছনছ করে চলে গেছেন। সামসুদ্দিনের আপ্রাণ চেষ্টার দরুন এই মাঠে এত বড় একটা জালসা হতে পারছে। এত বড় জালসাতে শহর থেকে মোল্লা মৌলবিরা এসেছিল। ওঁরা এখন হাজিসাহেবের বাড়িতে উঠে, তোবা তোবা, কি এক বেমাফিক কাজ হয়ে গেল! সামসুদ্দিনের ইচ্ছা হল এখন সে নিজের হাত কামড়ায়। আর মনে হল গোটা ব্যাপারটাই এক ষড়যন্ত্র। যেন ছোট ঠাকুর আবার ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হতে চায়। আবার কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ছোট ঠাকুর দাঁড়াবে এবং কবিরসাবকে ধরে এনে কংগ্রেসের পক্ষে বড় এক বক্তৃতা করাবে। সে ভাবছিল, এমন একটা হাতি পাওয়া যাবে না সেদিন! হাতির পিঠে ফেলু বসে থাকবে। অথবা ফেলুকে দিয়ে মণ্ডপে আগুন ধরিয়ে দিলে যেন সব আক্রোশের শোধ নেওয়া যাবে। লণ্ঠন হাতে সামসুদ্দিন জব্বরকে দিয়ে সব তৈজসপত্র, ভাঙা টুল টেবিল, ছেঁড়া সামিয়ানা এবং বড় শতরঞ্চ সব একসঙ্গে মাঠ থেকে বাড়িতে তুলে আনার সময় এসব ভাবল।

তখন বাড়ির বৃদ্ধ মানুষটি প্রশ্ন করেছিলেন—তিনি অতিশয় বৃদ্ধ বলেই ঘরের ভিতর বসে প্রদীপের মৃদু আলোতে সামান্য কাশছিলেন, এখন আর তিনি তেমন বেশী ঘর বার হন না—অধিকাংশ সময় ঘরের ভিতর খাটে একটা বড় তাকিয়ার ওপর ঠেস দিয়ে শুয়ে থাকেন—অতিশয় গৌরবর্ণ চেহারার এই মানুষ উঠোনে গোলযোগ শুনে বড়বৌকে প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে বড়বৌ? উঠানে এত গণ্ডগোল ক্যান?

বড়বৌ প্রদীপের আলো একটু উসকে দিল। টিন-কাঠের ঘর। জানালা দিয়ে শেষ হেমন্তের ঠাণ্ডা বাতাস ভেসে আসছে। বড়বৌ এই সংসারে বৃদ্ধ শ্বশুরের দেখাশুনা করার সময় প্রায়ই জানালায় দূরের সব মাঠ দেখতে পায় এবং সেই মাঠে সংসারের এক পাগল মানুষ ক্রমান্বয়ে হেঁটে হেঁটে কোথায় যেন কেবল চলে যেতে চাইছে। উঠোনের সেই গণ্ডগোল, মানুষটার এভাবে হাতিতে চড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া এ-সব বড়বৌকে বড় বিষণ্ণ করছে। মানুষটা আবার ক্ষেপে গেল। ভোরেও বড়বৌ এই মানুষকে খেতে দিয়েছে। ভালমানুষের মতো খেয়ে প্রতিদিনের মতো নিরুদ্দেশে চলে গেছিল। সংসারের ছোট এক বালক সোনা সঙ্গ দিয়েছে মাঠে মাঠে এবং গ্রামে গ্রামে। তারপর কোন এক দূর গ্রাম থেকে মাঠ ভেঙে সোনার হাত ধরে এই পাগল মানুষ গ্রামের উদ্দেশে ফিরছিল, তখন জসীম আসছে হাতিতে চড়ে। জসীমের ছেলে ওসমান হাতির সামনে। ওরা দেখল সেই বড় মাঠে ঠাকুরবাড়ির পাগল ঠাকুর ছোট এক

বালকের হাত ধরে কোথায় যেন চলে যাচ্ছে। এই মানুষটার জন্য তল্লাটের সকলের কষ্ট—কারণ এমন মানুষ হয় না, কথিত আছে তিনি দরগার পীরের মতো এক মহৎ পুরুষ। জসীম পাগল ঠাকুরকে হাতির পিঠে তুলে বলেছিল, চলেন বাড়ি দিয়া আসি কর্তা। জসীম, সোনা এবং পাগল মানুষকে বাড়ি পৌঁছে দিতে এই কাণ্ড। বড়বৌ খুব দুঃখের সঙ্গে বৃদ্ধের পায়ের কাছে বসে সব বলল। বৃদ্ধ, পুত্রের হাতিতে চড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার ঘটনা শুনে পাশ ফিরলেন শুধু। বৃদ্ধের মুখে এক অসামান্য কষ্ট ফুটে উঠেছে। বড়বৌর কাছে ধরা পড়ে যাবেন ভাবতেই মুখ ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে শুধু অন্ধকার দেখতে থাকলেন। এই শেষ সময়ে এক তাঁর পাগল ছেলে মাঠময় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং সব দুঃখের মূলে তিনি—তাঁর জেদ, এ সব ভেবে তাঁর দুঃখের যেন অন্ত ছিল না। তিনি বললেন, বৌমা, জানালাটা বন্ধ কইরা দ্যাও। আমার বড় শীত করতাছে।

—একটা কম্বল গায়ে দ্যান বাবা।

—না। জানালাটা বন্ধ কইরা দ্যাও।

বড়বৌ জানালা বন্ধ করার সময়ই দেখল কামরাঙা গাছের ওপারে যে বড় মাঠ, ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে—সেখানে অনেক লণ্ঠন। বড়বৌ বুঝল, এইসব মানুষ যাচ্ছে অন্ধকারের ভিতর পাগল মানুষ এবং হাতিটাকে খুঁজতে।

আর জসীম অন্ধকারে ডাকছিল হাতিটার নাম ধরে—লক্ষ্মী, অ লক্ষ্মী! সে সবার আগে ছুটে ছুটে যাচ্ছিল। যেন তার ঘরের বিবির মতো এক রমণী অন্ধকারে নিরুদ্দেশ হয়েছে অথবা সেরা মানুষ পাগল ঠাকুর—দশাসই চেহারা, গৌরবর্ণ—ঠিক পীরের মতো এক মানুষের সঙ্গে তার পোষা হাতি, তার ভালবাসার লক্ষ্মী চলে গেছে। সে প্রাণপণ ডাকছিল, লক্ষ্মী, অ লক্ষ্মী! আমি তর লাইগা চিড়ামুড়ি তুইলা রাখছি, লক্ষ্মী, অ লক্ষ্মী, তুই একবার অন্ধকারে ডাক দিহি, মাঠের কোন আনধাইরে তুই বইসা আছস একবার ডাইকা ক' দিহি। আমি পাগল ঠাকুরের মতো তরে লইয়া ঘরে ফিরমু।

ঈশম বলছিল, আরে মিঞা, এত উতালা হইলে চলব ক্যান। বড়কর্তা বড় মানুষ। হাতি অবলা জীব, ভালবাসার জীব। তিনি হাতির মতো পোষা জীব লইয়া পলিনেরে খুঁজতে বাইর হইছেন।

জসীম বলল, পলিন, কোন পলিনের কথা কন!

—আরে, আছে মিঞা!

জসীম বলল, হাঁটতে বড় কষ্ট। কিস্‌সা কইলে বেশী হাঁটতে পারি।

ঈশম বলল, বড় মানুষের কথা অধমের মুখে ভাল শুনাইব না। অথবা যেন ঈশমের বলার ইচ্ছা—মিঞা, তল্লাটের লোক কে না জানে এ-কথা। তুমি

এডা কি কও! তুমি জান না কর্তা ফাঁক পাইলে নৌকায়, না হয় হাঁটতে হাঁটতে নিরুদ্দেশে যান। তারপর ঈশম এক বর্ষার কথা বলল। এক বর্ষাকালে পাগল ঠাকুর নৌকা নিয়ে তিনদিন নিরুদ্দেশে ছিল, তার গল্প করল। সোনালী বালির নদীর জলে তখন স্রোত ছিল। তিনি একা স্রোতের মুখে নৌকা ছেড়ে বসেছিলেন। যেন সেই নাও তাঁকে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে অথবা গঙ্গার জেটির পাশে বড় এক জাহাজে পৌঁছে দেবে। পাগল মানুষ বলে তিনি মনে মনে বিলের ভিতর বড় এক কলকাতা শহর বানিয়ে বসেছিলেন এবং সারাদিন সারা মাস ধরে যেন তিনি সেই বিলের জলে পলিনকে খুঁজেছিলেন। বিলের জলে এক স্বপ্ন ভাসে, স্বপ্নে সেই বড় কলকাতা শহর—গাড়ি ঘোড়া হাতির মিছিল, আর ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ, দুর্গের পাশে মেমরিয়েল হল—কার্জন পার্ক। গড়ের মাঠে সাহেবরা উর্দি পরে কুচকাওয়াজ করছে। পাগল ঠাকুর হে হে করে হাসতে হাসতে শুধু বলছিলেন, গ্যাৎচোরেৎশালা। কারণ তাঁর প্রতিবিম্ব জলে দেখা যাচ্ছিল, আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। শহরটা নিমেষে কেমন জলের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল। পাগল মানুষের প্রতিবিম্ব তখন শুধু পরিহাস করছে, হায়, বেহুলা জলে ভাইস্যা যায় রে, জলে ভাইস্যা যায়।

সবই যেন জলে ভেসে যাচ্ছিল। এত বড় বিল, এই অন্ধকার চারিদিকে, জোনাকিরা জ্বলছে। উড়ে উড়ে জোনাকিরা পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথকে এবং হাতিটাকে ঘিরে ধরল। মণীন্দ্রনাথ হাতির পিঠে চড়ে বিলের পাড়ে পাড়ে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন। বিলের জলে শুধু অন্ধকার, অন্ধকার। হেমন্তকাল বলে ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আসছে। পাকা ধানের গন্ধ মাঠে মাঠে। এই অন্ধকারে হাতির পিঠে বসে পাকা ধানের গন্ধ পাচ্ছিলেন। আর আকাশে কত হাজার নক্ষত্র, পাগল মানুষ প্রতিদিনের মতো হাতির পিঠে বসে সেইসব নক্ষত্র দেখতে দেখতে, যেন সেইসব নক্ষত্রের কোন একটি তার প্রিয় পলিনের মুখ—তিনি হাতিতে চড়ে অথবা নৌকায় উঠে কিছুতেই আর সেই প্রিয় পলিনের কাছে অথবা হেমলক গাছের নিচে পৌঁছাতে পারলেন না। তিনি হাতিটাকে সম্বোধন করে বললেন, হ্যাঁ লক্ষ্মী, তুমি আমাকে নিয়ে পলিনের কাছে যেতে পার না! সেই সুন্দর মুখ—ঝরনার জলের উৎসে তুমি আমাকে পৌঁছে দিতে পার না!

সহসা এই পাগল মানুষের ভিতর পূর্বের স্মৃতি তোলপাড় করলে তিনি আর স্থির থাকতে পারেন না। মনে হয় আর কিছুদূর গেলেই সে তার প্রিয় হেমলক গাছটি খুঁজে পাবে এবং সেই হেমলক গাছের নিচে সোনার হরিণটি বাঁধা আছে। এইভাবে কতদিন কতভাবে একা একা মাঠ থেকে মাঠে, গ্রাম থেকে গ্রামে এবং এমন তল্লাট নেই এ-অঞ্চলে তিনি যেখানে একা-একা চলে যান না, তারপর একসময় ফের মনে হয় সেখানে আর তিনি এ-জীবনে পৌঁছাতে

পারবেন না। স্থতরাং সেই এক বড়বৌর মুখ এবং তার দুঃখের ছবি পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। তিনি ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকেন। তখন মনে হয় হাতিতে অথবা নৌকায় কখনও সেই হেমলক গাছের নিচে পৌছানো যাবে না। সোনার হরিণেরা বড় বেশি দ্রুত দৌড়ায়।

জসীম, ঈশম এবং নরেন দাসের দলটা সারারাত লণ্ঠন হাতে খুঁজে হাতিটা এবং মানুষটাকে বার করতে পারল না। ওরা সবাই ভোর রাতের দিকে ফিরে এসেছিল। আরও দুটো দলকে শচীন্দ্রনাথ পুবে এবং পশ্চিমে পাঠিয়েছিল। খবর এল, যারা উত্তরে দেখেছে, তারা আবার দক্ষিণেও দেখেছে। নানা মানুষ নানা রকমের খবর দিল। কেউ বলল, অশ্বথ গাছের নিচে গত রাতে পাগল মানুষ এবং হাতিটাকে দেখেছে। কেউ বলল, বারদির মাঠের উত্তরে একদিন দেখা গেছে মানুষটাকে। উত্তর থেকে খবর এল, পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ হাতিটাকে দিয়ে সব আখের খেত খাইয়ে দিচ্ছে। কেউ কিন্তু হাতিটার নাগাল পাচ্ছে না। সপ্তাহের শেষ দিকে আর কোন খবর এল না। সবাই তখন বলল, না আমরা পাগল মানুষ এবং হাতিটাকে দেখি নি।

বাড়িতে প্রায় সকলের মুখে একটা শোকের ছবি। কেউ জোরে কথা বলছে না। লালটু, পলটু, সোনা সারাদিন বাড়িতেই থাকছে। পুকুর পাড়ের অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে ওরা প্রতিদিনই হাতিতে চড়ে মানুষটা ফিরছে কিনা দেখত। বিকালের দিকে জ্যাঠামশাই মাঠের ওপর থেকে উঠে আসবে প্রতীক্ষায় অর্জুন গাছটার নিচে বসে থাকত। সঙ্গে থাকত সেই আশ্বিনের কুকুর। ওরা প্রিয় মানুষটির জন্য গাছের নিচে বসে সারা বিকেল, যতক্ষণ সন্ধ্যা না হত, যতক্ষণ গোপাট অতিক্রম করে মাঠের বড় অশ্বথ গাছটায় অন্ধকার না নামত, ততক্ষণ অপেক্ষা করত। আর এ ভাবেই একদিন কুকুরটা ঘেউঘেউ করে উঠল—কুকুরটা কেবল চিৎকার করছে—সূর্য তখনও অস্ত যায় নি। তখন ওরা দেখল কুকুরটা দৌড়ে দৌড়ে মাঠে নেমে যাচ্ছে। আবার সোনার কাছে উঠে আসছে। ওরা দেখল পুবের মাঠে আকাশের নিচে কালো একটা বিন্দুর মতো কি কাঁপছে। ক্রমে বিন্দুটা বড় হচ্ছে। হতে হতে ওরা দেখল এক বড় হাতি আসছে। সোনা চিৎকার করে বাড়ির দিকে দৌড়ে গেল, হাতিতে চইড়া জ্যাঠামশয় আইতাছে।

গ্রামের সকলে দেখল পাগল মানুষ ক্লান্ত। বিষণ্ণ। চোখেমুখে অনাহারের ছাপ। তিনি হাতির পিঠে প্রায় মিশে গেছেন।

হাতিটা হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল উঠোনে। যেন এই হাতি আর কোথাও যাবে না। এখানেই বসে থাকবে। জসীম বলল, কর্তা নামেন। লক্ষ্মীরে আর কত কষ্ট দিবেন।

গ্রামের সকলে অনুরোধ করল নামতে। কিন্তু তিনি নামলেন না।

শচীন্দ্রনাথ বললেন, তোমরা সকলে বাড়ি যাও বাছারা, আমি দেখি। বলে, সে হাতিটার কাছে গিয়ে ধীরে ধীরে বলল, বড়দা, বড়বৌদি কয়দিন ধইরা কিছুই খায় নাই। বৌদিরে কত আর কষ্ট দিবেন।

কিন্তু কোন লক্ষণ নেই নামার। শচীন্দ্রনাথ বলল, সোনা, তর বড় জ্যাঠিমারে ডাক।

বড়বৌ ঘোমটা টেনে স্থলপদ্ম গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল। শচীন্দ্রনাথ বলল, আপনে একবার চেষ্টা কইরা ছাখেন।

বড়বৌ কিছু বলল না। সেই সজল উদ্বিগ্ন এক চোখ নিয়ে হাতির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে মণীন্দ্রনাথ হাতি থেকে নেমে বড়বৌকে অনুসরণ করলেন—তিনি এখন এক সরল বালক যেন। তাঁর এখন বড়বৌর দুই বড় চোখ ব্যতিরেকে কিছুই মনে আসছে না। ঘরে ঢুকে দেখলেন, তাঁর প্রিয় জানালাটি খোলা। তিনি সেখানে দাঁড়ালেই তার প্রিয় মাঠ দেখতে পান। এবং তখন মনে হয় মাঠে বড় এক হেমলক গাছ আছে, নিচে পলিন দাঁড়িয়ে আছে। এতদিন অকারণ তিনি নদী বন মাঠের ওপারে পলিনকে খুঁজেছেন।

বড়বৌ পূজার ফুল তুলছিল। শীতকাল। বাগানের ভিতর শীতের সব ফুল ফুটে আছে। খুব ভোরে মালতী স্নান করতে এসেছিল ঘাটে। ঘাটে শীতের কুয়াশা ছিল তখন, ঘাটের সিঁড়িতে রোদ ছিল না। কিরণী আবু পাড়ে বসে ব্রতকথা বলছিল—ওঠ ওঠ স্থয্যিঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া···তখন মালতী ঘাটে নেমে গেল। ঘাটে এসে বড়বৌ দেখল, মালতী, শীতের ঠাণ্ডায় জলে ডুবে ডুবে স্নান করছে। যেন এই শীত, শীত নয়, মালতী জলের ওপর ভেসে যেতে থাকল।

মালতী এক সময় জল থেকে উঠে পড়ল। ভেজা কাপড়ে হিহি করে কাঁপছে। সে বড়বৌকে ভেজা কাপড়েই কিছু ফুল তুলে দেবার অছিলায় অতসী গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকল।

বড়বৌ বলল, তোর এই সাত সকালে স্নান?

মালতী কোন কথা বলল না। সে ফুলগাছ অথবা ঝোপ জঙ্গলের ভিতর উঁকি দিয়ে কি যেন অনুসন্ধান করছে। দেখলে মনে হবে, ওর কিছু হারিয়ে গেছে। স্থতরাং মালতীকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। মালতীর পরনে ডুরে শাড়ি—পাতলা। শাড়ি দেখে সেই স্বপ্নটার কথা মনে করতে পারছিল—সেই স্বপ্ন, স্বপ্নে সে মধুমালা সেজে বসেছিল। মালতী ডুরে শাড়ি পরে মধুমালা সেজে বসেছিল। মদনকুমার আসবে, সেই মদনকুমার, যার সখের সীমা ছিল না, যে হাটে বাজারে গেলেই ডুরে শাড়ি কিনতে ভালবাসত মালতীর জন্য। স্বপ্নে সেই মানুষ কতদিন পর রাতে ওর কাছে এসেছিল। পাশে বসেছিল। দাঙ্গার কথা বলার সময় মুখ বড় করুণ। তারপর সব ভুলে মানুষটা গল্প করতে করতে ওর মুখ চিবুক টেনে শেষে মালতীকে কোলে নিয়ে ধপাস করে মোটা গদিয়ালা বিছানাতে ফেলে দিয়েছিল। আর কি? আর কি করেছিল স্বপ্নে? স্বপ্নে স্বামীর সঙ্গে সহবাস। সে সহবাসের পর সোজা পুকুরঘাটে স্নান করতে চলে এসেছে। মালতী শরীরের উত্তাপ জলে ভাসিয়ে পাড়ে উঠতেই শুনতে পেল, দক্ষিণের ঘরে এখন কে যেন দুলে দুলে পড়ছে, পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির। শীতের সকাল। পুকুরের অন্য পাড়ে মাঘমণ্ডলের ব্রতকথা শেষ করে পালেদের দুই মেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছিল। ওরা কবিতার মতো আবৃত্তি করছিল, ওঠ ওঠ স্থয্যিঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া, না উঠিতে পারি আমি ইয়লের লাগিয়া।

সোনা পড়ছিল, পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।

লালটু পড়ছিল, অ্যাট লাস্ট দি সেল্‌ফিস্ জায়েন্ট কেম্।

পলটু পড়ছিল, এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার···

দক্ষিণের ঘরে তখন পড়ার প্রতিযোগিতা চলছে। ওরা তিনজনই চেঁচিয়ে পড়ছে। বাড়িতে দূরদেশ থেকে দীর্ঘদিন পর বুঝি সেই যুবক ফিরে এসেছে। বোধ হয় এখন উচ্চ স্বরে পড়ে এই বালকেরা কত বেশী পড়ছে এবং কত কঠিন পড়া পড়তে হয়, চেঁচিয়ে মানুষটাকে জানাচ্ছে। মালতী গত সন্ধ্যায় খবর পেয়েছে। কিন্তু সংকোচের জন্য আসতে পারে নি। মানুষটাকে দেখার বড় ইচ্ছা। প্রায় সারা রাত সে যেন মানুষটার জন্য জেগে ছিল।

লালটু একই লাইন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়ছে। এ্যাট লাস্ট দি সেল্‌ফিস্ জায়েন্ট কেম্। সেল্‌ফিস্ জায়েন্ট্। মনে মনে উচ্চারণ করল কথাটা। ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সেই কবেকার কথা। তখন বিলের জলে কুমীর ভেসে আসে নি, তখন মালতী ফ্রক পরত। একদিন সেই কৈশোর সেল্‌ফিস্ জায়েন্ট লুকোচুরি খেলতে গিয়ে মালতীকে সাপ্টে ধরেছিল। চুমু খেয়েছিল। মালতী রাগে দুঃখে, ঠিক রাগে দুঃখে বলা চলে না, কেমন যেন রঞ্জিত ওকে না বলে না কয়ে চুমু খেয়ে—কি একটা ফাজিল কাজ করে ফেলেছে। বলতে হয় কিছু, না বললে কুমারীর সম্মান থাকে না। বড়বৌকে বলে দেবে এমন ভয় দেখিয়েছিল রঞ্জিতকে।

পরদিন ভোরে বাপ-মা মরা সেল্‌ফিস্ জায়েন্ট কিছু না বলে কয়ে ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

ঠাকুরবাড়ির বড়বৌর পিতৃমাতৃহীন ছোট ভাই-এর খোঁজ-খবর কেউ আর দিতে পারে নি। তারপর কত জল সোনালী বালির নদীতে ভেসে গেল, কত শীত, কত বসন্ত চলে গেল। বিলের জলে যেবার কুমীর ধরা পড়ল—মালতীর সেবারেই বিয়ে। মালতী একদিন চুপি চুপি বলেছিল, বড়বৌদি, রঞ্জিত আপনেরে চিঠি ছ্যায় না?

—ছ্যায়।

—কি ল্যাখে।

—কিছু লেখে না। শুধু লেখে, ভাল আছি।

—ঠিকানা ছ্যায় না।

—ঠিকানা দিতে নেই।

—ক্যান?

—দেশের কাজ করে। ঠিকানা দিতে নেই।

শীতের সূর্য উঠতে চায় না। রোদ দিতে চায় না। গাছপালার ছায়ায় বাড়িগুলি ঢেকে থাকে। বুড়ো মানুষেরা রোদের জন্য প্রায় হাহাকার করছিল। ভোরের দিকে তখন খুব অন্ধকার নয়, আবার আলোও নয়—মালতী চুপি চুপি ঘাটে আসার সময় দেখেছিল অমূল্য, তাঁতঘরের পাশে বসে আগুন পোহাচ্ছে। খড়কুটো এনে—শীতের দিন বলে শুকনো পাতা সংগ্রহ করে রেখেছিল অমূল্য।

অমূল্য বসে বসে সেই খড়কুটোর ভিতর আগুন জেলে শীত থেকে রক্ষা পেতে চেয়েছিল। আর শোভা, আবু, নরেন দাসের বৌ আগুনের পাশে গোল হয়ে বসেছিল।

মালতী দরজা খুলে বের হবার মুখেই দেখল অমূল্য ওর দিকে তাকিয়ে আছে। মালতী সোজা উঠোনে নেমে এল না। চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। আগুনের ভিতর থেকে অমূল্যর মুখ ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। স্বপ্নে দেখা মৃত মানুষটার মুখ, চোখে আর ভাসছে না। শুধু অমূল্যর মুখ চোখে ভাসছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল এক অশুচি ভাব শরীরের সর্বত্র। শীতে কোথায় অমূল্যের পাশে বসে আগুন পোহাবে, কোথায় শীতের ভিতর উত্তাপ খুঁজবে—তা না করে মালতী ছুটে গেছে পুকুরে। স্বামীর মৃত মুখ মনে করে জলে অধিক সময় ডুব দিয়ে থেকেছে। অমূল্যর মুখ ভুলে থাকার জন্য, পাপ চিন্তা ভুলে থাকার জন্য মালতী শীতের জলে, ঠাণ্ডা হিমের মতো জলে বোধ হয় ডুব দিয়েছিল।

সুতরাং স্থলপদ্ম গাছটির পাশে দাঁড়িয়ে মালতী মনে করতে পারল না, সে কোন নির্দিষ্ট কারণে এসে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মালতী এখন ঠাকুরঘরে প্রণাম করছে এবং বিড়বিড় করে বকছে। নিজেকে গালাগালি দিচ্ছে। সে ঠাকুরঘরের দরজায় মাথা ঠুকছিল। যেন ভগবানের ইচ্ছা—বিধবা মানুষের যৌবন থাকতে নেই, সুখ থাকতে নেই, ভালবাসা থাকতে নেই। যৌবন থাকলে পাপ, ভালবাসা থাকলে পাপ এবং সুখ চাইলে পাপ। মালতী মাথা ঠুকে ঠুকে বলতে চাইলে যেন, ভগবান, তুমি আমার পোড়া যৌবন হরণ করে নাও। আমার পোড়া কপাল। ভালবাসার কপাল থাকলে আমার মানুষ ঘরে থাকত। রায়টে কাটা পড়ত না। স্বপ্নটার কথা কেবল মনে আসছিল মালতীর। কতদিন পর যেন যথার্থই তার কাছে জল চাইতে এসেছিল। কিন্তু সে যতবার জল নিয়ে ওর হাতে দিয়েছে তত বার মানুষটার মুখ বদলে গেছে। মুখটা যেন অমূল্যের। তাঁতঘরে অমূল্য যেমন হেসে হেসে কথা বলে, যেমন খুব সহজে নেকা নেকা কথা বলে—যেন কিছু জানে না অমূল্য, কিছু বোঝে না, দিদি, অ মালতী দিদি, আমার ঘরে জল পাঠাইয়া দ্যান। দিদি, আপনের জন্য বেথুন পাইড়া আনছি, দিদি, জলের তলে শালুক হয়, শালুকের ফল হয়—আপনের জন্য আমি কি না করছি। স্বপ্নে নিজের মানুষটাকে জল দিতে গিয়ে মালতী কেবল সেই অমূল্যকে বিছানার ওপর বসে থাকতে দেখল।

মালতী ঘরে ফিরে কাপড় ছাড়ল, সাদা থান পরল একটা। তাঁতের চাদর গায়ে দিল। ঘরের পাশে পেয়ারা গাছের নিচে মালতী আগুন জ্বালল। আজ ইচ্ছা করেই মালতী অমূল্যের পাশে গিয়ে আগুন পোহাতে বসল না। যেন ওর পাশে আগুন পোহাতে বসলেই শরীরের গ্লানিটা আবার ভেসে উঠবে।

সে আবুকে ডেকে আনল, শোভাকে কিছু শুকনো কাঁঠালের ডাল এনে দিতে বলল— শীতের জন্য হাত পা বড় বেশী সাদা সাদা দেখাচ্ছে। শীতের ভিতর আদর করে ঠাণ্ডা হাত আবুর গালে ঘষে দিল। হাত গরম করতে চাইল শোভার গালে হাত রেখে। মেয়েগুলো এই শীতেও কেমন গালগলা গরম করে রেখেছে।

শীতের রোদ তখন লম্বা হয়ে নামছে। বাড়ির নিচে সব জমি। বড় বড় তামাক গাছ সামনের মাঠে। পেছনে সব পেঁয়াজের জমি—পেঁয়াজ, রসুন, আলু, বাঁধাকপি। এবং নরেন দাস জমির জন্য, তাঁতের জন্য সারা মাস খেটে খেটে এই সংসারকে বড় করে তুলছে। নরেন দাস তার এই সংসারকে বড় ভালবেসে সারাক্ষণ মাঠে অথবা তাঁত-ঘরে কোন না কোন কাজের ভিতর ডুবে থাকে। নরেন দাস, পুবের বাড়ির নরেন দাস জমিতে এখন পেঁয়াজের গুঁড়িতে মাটি তুলে দিচ্ছে। মালতী দেখল, এই আগুনের ভিতর থেকে দেখল, নরেন দাস জমির মাটি সোনার মতো হাতে নিয়ে অপলক চেয়ে থাকছে। নরেন দাস মাটির ভিতর কি রস আছে, ফসলের মাটি কি রস দিয়ে গড়া, এই যে সোনার ফসল ঘরে ওঠে কিসের এত পুণ্য এই সংসারে—বোধ হয় নরেন দাস মাটির ভিতর তার রহস্য খুঁজছিল। মাটির সঙ্গে বিড়বিড় করে নরেন দাস তখন কথা বলতে আরম্ভ করে দিয়েছে অথবা গাছগুলির সঙ্গে হতে পারে, কারণ ওর চারিদিকে তামাক গাছ, চীনাবাদামের গাছ। কত যত্ন করে জল টেনে নরেন দাস মাটির ভিতর এইসব শস্যকণা পুঁতে দিয়েছিল। এইসব শস্যের জন্য নরেন দাসের বড় ভালবাসা। প্রতিদিন ভোর হলে নরেন দাস সে তার নিজের জমির ভিতর নেমে আসবে, কিছু না কিছু মাটি গাছের গুঁড়িতে দিতে দিতে গাছের সঙ্গে কথা বলবে, খেতে ভুলে যাবে। জীবনের অন্য সুখ-দুঃখের কথা ভুলে যাবে।

মালতী বড় একটা ঘটি নিল জলের, কিছু মুড়ি, তেল দিয়ে মেখে বড় বড় রুটো পেঁয়াজের টুকরো নিল হাতে, নুন এবং কাঁচা লঙ্কা নিয়ে জমির পাশে নেমে গেল নরেন দাসকে খেতে দিতে। আর আসার সময় দেখল, গ্রামের সব মানুষই এই শীতের সকালে জমি এবং ফসলের ভালবাসার জন্য মাঠে নেমে যাচ্ছে। ঠাকুরবাড়ির ছোট ঠাকুর নেমে গেল মাঠে, পিছনে ঈশম—ওরা নিশ্চয়ই সোনালী বালির চরে নেমে যাচ্ছে। ঈশম নিশ্চয়ই জমি থেকে জল নেমে যাচ্ছে না বলে চিন্তিত। নিশ্চয়ই ছোট ঠাকুরকে বিশ্বস্ত মানুষ ঈশম জমিতে নিয়ে গিয়ে এই জল নিয়ে কি করা যায়, কিভাবে জল নামিয়ে দেওয়া যায় চরের বুক থেকে, সেইসব সলাপরামর্শ করবে। তখন গোপাট ধরে বাজারে যাচ্ছিল মনজুর, জব্বর, এবং অন্য অনেকে। নয়াপাড়ার বিশ্বাসেরা, হাসিমের বাপ জয়নাল, আবেদালি কেউ যেন বাকি নেই। সকলে ষাঁড় গরু নিয়ে গরু-

বাছুর নিয়ে মাঠের রোদে নেমে আসছে। ফেলু শেখ হাজিসাহেবের খোদাই ষাঁড়টাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে মাঠে। এদের এখন শুধু ফসলের জন্য চাষাবাদ আর এই চাষাবাদই মানুষগুলির সব—আশা আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন অথবা ভালবাসা। আর কি চায় মানুষগুলি? মানুষগুলি তারপর ধর্ম করতে চায়। হিন্দু পাড়াতে তখন যাত্রা নাটক হবে, রাবণ বধের পালা-গান, রামায়ণ গান, রাম সেজে আসবে লোকনাথ পাল। মাঝিবাড়ির বড় সামিয়ানার নিচে ঢোলক বাজবে—গ্রামের বুড়োবুড়িরা তখন কেউ ঘরে থাকবে না। এই শীত এলে কবিগান হয় চন্দদের বাড়ি, বড় বড় ডে-লাইট জলবে, মনে হবে তখন গ্রামটা মেলার মতো। পরাপরদির হাট থেকে দোকানপাট তুলে শ্রীশচন্দ্র চলে আসবে। শীত এলেই কতরকমের মেলা বসবে, দূরে দূরে কত মানুষ চলে যাবে, ঘোড়-দৌড় হবে, বাজি জেতার জন্য বিশ্বাস পাড়াতে রোজ ঘোড়দৌড়ের মহড়া হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, অমূল্যও তাঁতঘরে মহড়া দিচ্ছে! অথচ এই অমূল্য আগে কত হাবাগোবা ছিল। এই অমূল্য সারাক্ষণ তাঁত বুনে ঘরের বার হলে চোখ তুলে তাকাত না পর্যন্ত। অমূল্য মালতীর বান্দা লোক ছিল। সেই অমূল্য কি করে গত বর্ষায়—ওরা সেই যে অষ্টমীর স্নানে এক সঙ্গে এক নৌকায় বড় নৌকা, প্রায় তেমাল্লা হবে, পাড়ার বড় পিসি, ধনবৌ, মাঝিবাড়ির কালা-পাহাড়ের মা, নরেন দাস—প্রায় গ্রামের গোটা লটবহর এক নৌকায় শুয়ে বসে একদিনের পথ নাঙ্গলবন্ধ, নাঙ্গলবন্ধের বাম্নিতে মালতী সকলের সঙ্গে স্নান করতে গিয়েছিল। অষ্টমীর স্নানে কত মানুষ, নদীর দু-পাড়ে কত দেব-দেবীর মূর্তি। মাটি দিয়ে গড়া ভৈরব ঠাকুরের বড় নীল রঙের পেটের দিকে তাকিয়ে অমূল্য রসিকতা করেছিল। বড় নদী, দু পাড় প্রায় দেখা যায় না নদীর। কত নৌকা এসেছে। কত মানুষ এসেছে স্টিমারে আর পাপ ঢেলে পুণ্য নিতে দু পাড়ে তিল ধারণের স্থান ছিল না। মালতীও সকলের সঙ্গে নদীর জলে স্নান করতে নেমেছিল। পাড়ে অমূল্য। পকেটে তামার পয়সা। মালতীর হয়ে ঠাকুরের দক্ষিণা, তিল-তুলসী সব সংগ্রহ করে দিচ্ছিল। গোটা মেলাতে সেই সারাক্ষণ মালতীকে দেখাশুনা করেছে। সে মালতীকে নিয়ে ঘুরেছে—একটা লক্ষ্মীর পট কিনে দিয়েছিল অমূল্য, মালতীর জন্য পয়সা খরচ করতে পেরে অমূল্য গুনগুন করে এক সময় গান ধরেছিল মুখে। পয়সা খরচ করার হকদার হতেই মালতী অমূল্যর জিম্মায় কি করে যেন চলে গেল। অমূল্য মালতীকে এক সময় বলেছিল, দিদি আসেন, সাঁতার দিয়া নদী পার হই।

—নদী পার হইতে তোমার বুঝি ইচ্ছা যায় অমূল্য!

—বড় ইচ্ছা যায়।

—নদীর জলে এক কুম্ভীর ভাইস্যা যায়, তোমার গানটা মনে পড়ে অমূল্য?

অমূল্য বলেছিল, পড়ে।

মালতী ভিড়ের ভিতরে অমূল্যর দিকে অপলক তাকিয়ে বলেছিল, বড় ডর ঐ কুম্ভীরকে।

—কোন ডর নেই মালতী দিদি। এবং ভয় নাই বলেই হয়তো অমূল্য সারাটা দিন মালতীকে নিয়ে ঘুরতে পেরেছিল। অষ্টমীর স্নানে মালতীকে আর কেউ এত আদর করে সোহাগ করে মেলা দেখায় নি। শোভা, আবু সঙ্গে ছিল না। নরেন দাস তাঁতের কাপড়ের দোকান খুলে বসেছিল আর সেই থেকে অমূল্য হাবাগোবা থাকল না। বান্দা লোক অমূল্যর খাই খাই সহসা বড় বেশী বেড়ে গেল।

সূর্য এবার গোপাটের ওপাশে উঠে এল। এখন হাতে পায়ে শীতটা জমে নেই। মালতী দেখল হাঁসগুলো গর্তের ভিতর প্যাকপ্যাক করছে। মালতী গর্তের মুখ থেকে টিনটা তুলে দিল। হাঁসগুলো গলা বের করে দিল প্রথম। বড় পুরুষ হাঁসটা সকলকে ঠেলে প্রথম বের হয়ে এল। অমূল্য বারদীর হাট থেকে পুরুষ হাঁসটা কিনে দিয়েছে মালতীকে। গত বর্ষায় কোথায় যে তার প্রিয় পুরুষ হাঁসটা হারিয়ে গেল, রাতের অন্ধকারে বিলেন মাঠে সে এবং অমূল্য পুরুষ হাঁসটাকে ঝোপে জঙ্গলে খুঁজে খুঁজে পেল না। অন্ধকার রাতে হাঁসটার অন্বেষণে নৌকায় মালতী এবং অমূল্য ধানখেতের ভিতর ঘোরাঘুরি করছিল। সামু নৌকায় গ্রামে ফেরার সময় ওদের দেখে অমূল্যকে বলছিল, অমূল্য, বাড়ি যাও। মালতীকে বলেছিল, আনধাইর রাইতে মাঠে ঘাটে একা ঘুরতে নাই মালতী। বাড়ি যা। হাঁসটা আমি ত্থাখতাছি কই গ্যাল। সামু শেষ পর্যন্ত হাঁসটার খোঁজ দিতে পারে নি। হাঁসটা নিখোঁজ হবার পর থেকেই মালতী বড় ম্রিয়মাণ ছিল। অমূল্যর পুরুষ হাঁসটা নীল, কালো এবং খয়েরী রঙের। কি করে, কত কষ্ট করে এবং সারা হাট ঘুরে মাত্র এই একটা তাজা হাঁস মালতীর জন্য অমূল্য সংগ্রহ করতে পেরেছে, প্রায়ই কথায় কথায় এই হাঁসের জন্য অমূল্যর কি কষ্ট গেছে, অমূল্য কত লোককে একটা ভাল পুরুষ হাঁস মালতী দিদির জন্য বলে রেখেছিল—সময়ে অসময়ে কথাটা শোনাবার চেষ্টা করত। আর এই হাঁস কিনে দেবার পর থেকে অমূল্যর আবদারটা আরও বেড়ে গেল।' অমূল্য, তুমি অমূল্য তাঁত বুনে খাও, বিধবার ধম্ম কি বুঝবে। যেন মালতীর বলার ইচ্ছা, বিধবার সম্মান বৈধব্যে, বিধবার শাক অন্নে। তুমি অমূল্য, তাঁতের খটখট শব্দ শুনে দু'কান ভোঁতা করে রেখেছ, নাকে তোমার গন্ধ থাকে না, চোখে তোমার স্বপ্ন ঝোলে—আমি বিধবা মালতী সারাদিন এই সংসার করে, ঘরদোর পরিষ্কার রেখে তোমার তাঁতের নলী ভরে শাক অন্নে আমার ভূরিভোজন। ঢেকুরে আঁশের গন্ধ থাকলে আমার সম্মান বাঁচে না। পুরুষ হাঁসটার মতো বনেবাদাড়ে, জলের ঘাটে অথবা রাতের আঁধারে ঘাড়

কামড়ে সুখ পেতে চাও, তাতে আমার সম্মান বাঁচে না। তুমি আমায় ভালবাসা দাও, শুধু আঁশের আশায় ঘুরলে আমিও একদিন গলা কামড়ে দেব। শুধু আঁশে আমার ভালবাসা কথা কয় না।

স্বপ্নটা দেখার পর থেকেই কেন জানি অমূল্যর প্রতি নৃশংস ভাবটা আরও বেড়ে গেল। অমূল্য আর জব্বর বড় বেশী ঘুরঘুর করছে। মালতী ভাবল, দাদাকে একদিন সে সব বলে দেবে। কারণ জব্বরও কম যায় না। জব্বরের কথা মনে আসতেই মালতীর মুখটা ঘৃণায় কুঁচকে গেল।

মালতী এখন হাঁস্ নিয়ে ঘাটে যাচ্ছে। মনে মনে ওর অমূল্য ভেতরে তাঁত বুনছে। একবার এদিক, একবার ওদিক। পুরুষ হাঁসটা অন্য হাঁসগুলোকে জলে নামতে দিচ্ছে না। তার আগেই ঠোঁট কামড়ে ঝগড়া করতে চাইছে। মালতী পুরুষ হাঁসটার কাণ্ড দেখে অন্যদিনের মতো আজও মুখে আঁচল চাপা দিল। ওর ভিতর থেকে এখন আবার সেই দুষ্ট হাসিটা মুখে খেলে গেল। তর সয় না! মালতী হাঁসগুলোকে জলের দিকে নিয়ে যাবার সময় কথাটা বলল। আর এইসব দেখলেই মনটা তাঁতের মাকুর মতো কেবল এদিকে ওদিক করতে থাকে। এই একটা ইচ্ছার ভাব থাকে ভিতরে, সাপ্টে ওকে কেউ খেয়ে ফেলুক। কিন্তু ফের কেন জানি মনে হয়, বিধবা মানুষের এই ইচ্ছা ভাল নয়। তখন শুধু স্নানের ইচ্ছা, ডুবে ডুবে শরীর থেকে সব পাপ চিন্তা মুছে দেবার ইচ্ছা। যেন স্নান না করলে জাত যাবে। তারপর আবার মনে হয় বিধবার আবার জাত, বিধবার আবার ছোট বড়—সরল যুবতী মালতী যার অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্য ঝরে পড়ে—যার মুখ পেঁয়াজের কোমল খোসার মতো নরম আর যার ইচ্ছার ঘরে অমূল্য শুধু একটা বাঁদর—সারাক্ষণ লেজ তুলে বসে আছে, সেই অমূল্যকে স্বপ্ন দেখে মুখ বড় বিস্বাদ লাগছিল।

হাঁসগুলি জলে নেমে গেলে মালতী একবার চারিদিকে তাকাল। হাঁসগুলি ডুবে ডুবে স্নান করছে। কেউ নেই কাছে। তামাক খেত পার হলে উঁচু জমি, জব্বর সেখানে হালচাষ করছে। নরেন দাস জমির নিচ থেকে রস তুলে পেঁয়াজ রসুন অথবা চিনাবাদামের শরীর পুষ্ট করার চেষ্টায় আছে। আর যেন কোথাও কোন দৃশ্য ঝুলে নেই। শুধু ঠাকুরবাড়ির সোনা পড়ছে—পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির। লালটু পড়ছে, অ্যাট লাস্ট দি সেলফিস্ জায়েণ্ট কেম। জব্বর হাল চাষ করছে। মালতীকে দেখতে পেলে জব্বর গাই গরু ফেলে এক্ষুনি ছুটে আসবে—মালতী দিদি, বদনাতে পানী থান। গলাটা শুকাইয়া গ্যাছে। মালতী ভাবল, জব্বর এলে সামসুদ্দিনের খবর নেবে। সামু এখন এখানে নেই। ঢাকা গেছে। পাগল ঠাকুর হাতি দিয়ে ওদের জালসা ভেঙে দিয়েছিল। ফেলু শেখের হাত ভেঙে দিয়েছে। তারপর থেকে সামু বুঝি হিন্দুপাড়া আসা ছেড়ে দিয়েছে। ছোট ঠাকুর শচীন্দ্রনাথ একদিন

গোপাটে দাঁড়িয়ে সামুর সঙ্গে কি সব কথা বলতে বলতে বচসা করেছিল। সেই থেকে সামু আর আসে না। সামুর মেয়েটা মাঝে মাঝে গোপাটে এসে ওদের ছাগল গরুগুলি নিয়ে যায়। বড় নথ নাকে দিয়েছে মেয়েটা। ঠাকুরবাড়ির অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়েছিল। কারো জন্য অপেক্ষা করছিল। মালতী চুপ চুপি হেঁটে গিয়ে বলেছিল, কিরে ফতিমা, তুই!

ফতিমার ছোট চোখ। বড় নথ নাকে। শিশু বয়সের মুখচোখ শুধু লাবণ্যে ভরা। বিনুনী বাঁধা চুল। ফতিমা কিছুক্ষণ মালতীর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, পিসি, সোনাবাবুরে দিয়েন। বলে, সে কোঁচড় থেকে দুটো লটকনের থোকা মালতীর হাতে দিয়েছিল।

অসময়ে লটকন ফল! সুতরাং মালতী বিস্মিত।

ফতিমা নিজেই বলল, আবেদালি চাচা উজান থাইকা আনছে।

মালতীর কেন জানি দু'হাতে মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরার ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানের মেয়ে, ছুঁয়ে দিলেই জাত যাবে। সে লটকনের ফল খুব আলগা করে হাতে নিল। সে ফতিমাকে ছুঁল না। শুধু হাসতে হাসতে বলল, সোনাবাবুর লাইগা বড় কষ্টরে তর। বড় হইলে বাবুর লগে বিয়া দিয়া দিমু।

ছোট্ট মেয়ে। অথচ সামান্য রসিকতা ফতিমাকে কেমন লজ্জিত করেছিল। ফতিমা আর দাঁড়ায় নি। সে গোপাট ধরে ছুটছিল। লজ্জায় হোক অথবা অন্য এক কারণ যেন, মেয়েটাকে গোপাট ধরে ছুটে যেতে সাহায্য করছে। অথবা এত যে গাছগাছালি যার ছায়া সারা গ্রামে এবং মাঠে জড়িয়ে আছে তার ভিতর নিরন্তর এক সুষমা আছে যেন। সেই সুষমা, ভালবাসার সুষমা মেয়েটার সারা অঙ্গে লেপ্টে আছে। হেমন্তের শেষ বিকেল ছিল সেটা। মেয়েটা ক্রমে এক সুষমার ভিতর হারিয়ে গেল।

সেই সুষমা মালতীকে দীর্ঘদিন অভিভূত করে রেখেছে। সোনা পড়ছে তখনও—পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির। হাঁসগুলি জলে ডুবছিল ভাসছিল। পাড়ে দাঁড়িয়ে মালতী। জলে ওর লম্বা ছায়া, মালতী জলে নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছে। এই পাড়ে দাঁড়িয়ে কত কথা মনে হয়, সামুর কথা মনে হয়। রসো এবং বুড়ির কথা মনে হয় আর সেই মানুষের কথা মনে হয়। যে মানুষ কৈশোরে ওকে সাপ্টে ধরে চুমু খেয়েছিল তারপর ভয়ে নিরুদ্দিষ্ট। সেই মানুষ গত রাতে এসেছে। এখন আর তেমন ছোট নেই। কথায় কথায় ঝগড়া করবে না। এখন মানুষটা বড় এবং মহৎ। মানুষটা দেশের কাজ করে বেড়াচ্ছে। জেলে ছিল কিছুদিন। সবই এখন কেন জানি গল্পকথার মতো মনে হয়। মালতী জলে আর হাঁস দেখতে পাচ্ছিল না, শুধু মানুষটার শরীর মুখ জলের ওপর ভেসে যেতে দেখছে। এই মানুষটাকে দেখার জন্য কেমন পাগলের মতো ঠাকুরবাড়ির ঘাটে সারাটা সকাল ডুবে ডুবে স্নান করল।

বড়বৌর জন্য পূজার ফুল তুলে দিল। এমন কি ঠাকুরঘরের পাশে মানুষটাকে দেখতে পাবে ভেবে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু কোথায়! ফের সেই অমূল্যের মুখ, অমূল্য এবং জব্বর উভয়ে মিলে কেবল যেন ওকে গিলতে আসছে। সে মানুষটার জন্য ঠাকুরঘরের দরজায় অধিক সময় অপেক্ষা করতে পারল না—কেউ দেখে ফেলে এই ভয়ে। এমন কি বড়বৌকে বলতে পারল না, বৌদি, রঞ্জিত নাকি কাইল রাইতে আইছে? কারণ, ভালবাসার সুষমা মালতীর চোখে। মালতী রঞ্জিতকে দেখার জন্য ঘাটের পাড়ে যেসব ঝোপ জঙ্গল ছিল সেখানে নিজেকে অদৃশ্য করার ইচ্ছাতে বসে পড়তেই পিছনে কে যেন বলে উঠল, মালতী, তুমি এখানে একা!

মালতীর বুকটা ধড়ফড় করে উঠল। সে পিছনের দিকে মুখ ফেরাতেই দেখল রঞ্জিত দাঁড়িয়ে আছে। হাত ধরে আছে সোনা। সব লুকোচুরি এবার বুঝি ফাঁস হয়ে গেল। মালতী প্রথম মাটি থেকে কিছুতেই মুখ তুলতে পারল না, পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির—এখন আর কেউ পড়ছে না। সব সহসা বড় চুপ মেরে গেছে। এমন কি কীটপতঙ্গের আওয়াজ টের পাওয়া যাচ্ছে না। মালতী ভয়ে ভয়ে বলল, জলে হাঁস ছাড়তে আইছি। এই বলে মুখ তুলে তাকাল রঞ্জিতের দিকে। মনে হল এখন কোথাও কিছু চুপ হয়ে নেই। সকল কিছু ডেকে বেড়াচ্ছে, হাঁস মুরগী, গরু বাছুর কাকপক্ষী সকলেই কলরব করছে। ঠিক তখন মালতী তাঁতঘরে অমূল্যর ঠকঠক তাঁতের শব্দ শুনতে পেল।

রঞ্জিতকে দেখে মালতীর দীর্ঘদিন পর সব ভয় কেটে গেছে। জব্বর অথবা অমূল্য কেউ বুঝি আর তাকে গিলে ফেলতে পারবে না।

কোথাও যেন তখনও একই স্বরে কে পড়ে যাচ্ছে—অ্যাট লাস্ট দি সেলফিস্ জায়েন্ট কেম। মালতী কান পেতে শোনার সময় রঞ্জিতের দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসল। রঞ্জিতও সামান্য না হেসে পারল না।

মালতীর দিনগুলি মন্দ কাটছিল না। রঞ্জিত আসার পর পরই মালতীর মনে হল ওর কি যেন হারিয়ে গিয়েছিল জীবন থেকে, কি যেন নেই, সংসারে কি না থাকলে ফাঁকা ফাঁকা মনে হয় এমন এক জিনিস রঞ্জিত ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে মালতীর জীবনে ফিরে এসেছে।

শীতকাল বলে বেলা তাড়াতাড়ি পড়ে যায়। শীতকাল বলে জলে বাঁশ পচা গন্ধটা তেমন তীক্ষ্ণ মনে হচ্ছে না। আর শীতকাল বলেই গ্রামের সকলে সকাল সকাল জল নিতে চলে আসে কুয়োতে।

চাকের কুয়ো লম্বা। গলা পর্যন্ত দাঁড়ালে দেখা যায়। কুয়োতলা পার হলে বাঁশঝাড়। ঈশম শক্ত বাঁশ খুঁজছে। রঞ্জিত একটা করে কোপ মেরে আলগা

করে দিচ্ছে আর ঈশম সেই বাঁশ টেনে বের করে কঞ্চিগুলি ছেটে দিচ্ছিল। যারা জল নিতে এসেছিল ওরা বেশীক্ষণ কুয়োতলায় অপেক্ষা করল না। বড়বৌর সেই নিরুদ্দিষ্ট ভাইটি ফিরে এসেছে। সরু গোঁফ, লম্বা চোখ আর বিদেশ বিভুঁয়ে থাকে বলেই হয়তো শরীরে এক ধরনের শ্যামল লাবণ্য। মালকোঁচা মেরে ধুতি পরেছে, চুল কোঁকড়ানো, মাথার মাঝখানে সিঁথি—লম্বা মানুষ রঞ্জিতকে এখন আর দেখলে চেনাই যায় না, বাপ মা মরা সেই বালক এত বড় হয়ে এখন মশাই হয়ে গেছে।

যারাই জল নিতে এসেছিল তারা সকলেই প্রায় বালতি ফেলছে কুয়োর ভিতর এবং জল তুলে আনার সময় রঞ্জিতকে দেখছে। সুদর্শন এই যুবকটিকে সকলেই একনজরে চিনতে পেরেছিল, কতদিন আগের কথা যেন, কেউ কেউ ডেকে ওর সঙ্গে কথা বলল, যাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, সে যাদের দিদি বলে ডাকত, পাড়াপড়শী যারা এক সময় ওকে স্নেহ-ভালবাসা দিয়েছিল, মা মরা ছেলে বলে যারা ওকে সামান্য ভালমন্দ হলে ডেকে খাওয়াতো, তারা জল তুলে নিচে নেমে গেল এবং ওর সঙ্গে কথা বলে ঘরে ফিরে গেল।

মালতী এল সকলের শেষে। ওর কাঁখে কলসী, পরনে তাঁতের শাড়ি। মালতী যে বিধবা, এ-শাড়ি পরলে মনে হয় না। মনে হয় কুমারী মালতী সখ করে এখন জল তুলতে এসেছে। মনে হয় মালতী এই মানুষের সামনে সাদা থান পরতে লজ্জা পায়। সে এসেই সোজা কুয়োতলায় কলসী রেখে যেখানে রঞ্জিত বাঁশ কাটছিল সেখানে গিয়ে দাঁড়াল।—কি এত বাঁশ! এত বাঁশ দিয়া কি হইব!

রঞ্জিত বলল, জলে ভিজিয়ে রাখব। লাঠি হবে, পাকা বাঁশের লাঠি।

সোনা আশেপাশে ছোটাছুটি করছে। সে এই নতুন মানুষটিকে কখনই ছাড়ছে না। মানুষটি তাকে কত দেশ-বিদেশের সব অদ্ভুত গল্প বলছে। অদ্ভুত সব ম্যাজিকের কথা বলছে।

সোনা বলল, পিসি, রঞ্জিত মামা রাইতের ব্যালা ম্যাজিক দ্যাখায়।

মালতী আর একটু নেমে গেল। যেখানে ঈশম বাঁশের গুঁড়িতে দা রেখে কাটা বাঁশ, ঝাড় থেকে টেনে নামাচ্ছে সেখান গিয়ে দাঁড়াল এবং বলল, তব মামার কথা আর কইস না!

রঞ্জিত মালতীর দিকে তাকাল না। সে বাঁশের কঞ্চি কেটে সাফ করছে। সে না তাকিয়েই হাসল। কারণ মালতীর কোন রহস্যজনক কথা শুনলেই শুধু সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে। সেদিন মালতী রাগে অথবা ক্ষোভে কিংবা হয়তো উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল। চোখ মুখ লাল, চোখ ভিজা ভিজা, যেন মালতীর সব সতীত্ব রঞ্জিত কেড়ে নিয়েছে। প্রায় মালতী কেঁদে ফেলেছিল। রঞ্জিতের সেই কথা মনে হয় আর মনে হয়—মালতী তোমার সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে না! মালতী তুমি দিদিকে আর কিছু বল নি তো!

রঞ্জিত এবার মালতীর দিকে সহজভাবে তাকাল। বলল, মামার কথা বলতে নেই কেন!

রঞ্জিত এমনভাবে তাকাল, যেন মালতীরও সেই দৃশ্যটা মনে পড়ুক এমন এক ইচ্ছা। সুতরাং মালতী আর দেরি করল না। সে জল ভরে চলে গেল। চলে গেলেই সব শেষ হয়ে যায় না। যেতে যেতে বড়বৌদির সঙ্গে গল্প করল। বড়বৌ এবং ধনবৌ ঢেঁকিতে ঠাকুর-ভোগের জন্য ধান ভানছে। ভানা ধান ঢেঁকির মাথার কাছে বসে শশীবালা ঝাড়ছিল। পাগল ঠাকুর আজ কোনদিকে বের হয়ে যায় নি। তিনি উঠোনে আপন মনে পায়চারি করছেন। মালতী উঠোনে এসেও বাঁশের কোপ শুনতে পেল। এই বাঁশ দিয়ে কি হবে, বাঁশ দিয়ে লাঠি হবে! তার তোড়জোড় হচ্ছে। মানুষটার শরীর হাত পা মুখ, সারাক্ষণ কেন জানি বুকের ভিতর নড়েচড়ে বেড়ায়। এমন মানুষটাকে দেখার জন্য ছলছুতো করে কেবল এ-বাড়িতে চলে আসা। কি আর কাজ মালতীর, নরেন দাস এখন আর বাড়িতে নেই। অমূল্য মাথায় ডুরে শাড়ি নিয়ে বাবুর হাটে গেছে নরেন দাসের সঙ্গে। এখন বাড়িতে শুধু শোভা, আবু আর মালতী। আভারানী আছে, কিন্তু এত নিরীহ যে মনেই হয় না একটা মানুষ বাড়িতে আছে। আভারানীকে রঞ্জিত বৌদি বলে ডাকে। রাতের বেলায়, যখন শীত বলে সকলে শুয়ে পড়ে, যখন বৈঠকখানায় শচীন্দ্রনাথ লালটু পলটুকে পড়াতে বসেন তখন রঞ্জিত নিজের ঘরে বসে সামান্য হ্যারিকেনের আলোতে কি সব বড় বড় বই পড়ে। কত পড়ে মানুষটা! মানুষটা এখন কম কথা বলে, বেশি কথা বললে মালতীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসে, যেন অজ্ঞ লোকের কথা শুনে হাসছে। তখন অভিমানে মুখটা লাল হয়ে ওঠে মালতীর। মানুষটা তখন অপরাধীর মতো চোখ করে তাকায়। তাকালেই কিছু দৃশ্য, ভয়ে মানুষটা নিরুদ্দেশে চলে গেল।

মালতী একদিন বলেছিল, এত ডর পুরুষ মাইনসের ভাল না।

—আমার আবার ডর কিসের?

—ডর না! মুখে কইলেই কি সব কওয়ন যায়।

—আমার কিন্তু মনে হয়েছিল তুমি দিদিকে সত্যি বলে দেবে।

—আর কিছু মনে হয় নাই ত! -

—আবার কি মনে হবে?

—ক্যান, মালতীর নামে কত কথা মনে হইতে পারে।

—আমার আর কিছু মনে হয় নি মালতী। আমি তারপর অনেক দূরে চলে গেছিলাম। আসাম চলে যাই। সেখান থেকে ফিরে আসি দু'বছর পর। কলকাতায় লাহিড়ীমশাইর সঙ্গে দেখা। তিনিই আমাকে প্রায় টেনে তুলেছেন। বলতে বলতে থেমে যেত রঞ্জিত। স্বপ্ন দেখতে শিখে গেলাম। এ-সব এখন

খুব তুচ্ছ মনে হয়। বোধ হয় বেশি বলা হয়ে গেল। তার গোপন জীবনের কথা বুঝি ফাঁস হয়ে গেল। সে সহসা থেমে তারপর আর কিছু বলতে চাইত না। নিজের কথা ভুলে গিয়ে বলত, বলো, তুমি কেমন আছ। তোমার সব খবরই আমি রাখতাম। তুমি যে এখানে চলে এসেছ তাও। কিন্তু তারপর?

—তারপর আবার কি। যেন বলার ইচ্ছা, তারপর যা আছে সে তো দেখতেই পাচ্ছ। এই নিয়ে আছি।

—সামুকে আর দেখি না কেন?

—সামু ঢাকা গ্যাছে। লীগ লীগ কইয়া ত্যাশটারে জ্বালাইয়া দিল।

—সামু তবে পার্টি করে!

—পার্টি না ছাই! মালতীকে খুব হিংস্র দেখাচ্ছিল। মালতী বলল, লাঠি ত বানাইতেছ মেলা। কিন্তু লাঠিতে মাথা ভাঙতে পার কয়টা?

—লাঠি তো মালতী মাথা ভাঙার জন্য নয়, মাথা রক্ষা করার জন্য। আমি ভেবেছি, এখানেই মূল আখড়া করব। তারপর আরও তিনটে ছোট ছোট আখড়া খুলব। একটা বামন্দিতে, একটা সম্মান্দিতে আর একটা বারদিতে। তারপর সেখান থেকে যারা শিখে ফেলবে তারা আবার তিনটে করে নতুন আখড়া খুলবে। গ্রামে গ্রামে আখড়া খুলে আমাদের প্রত্যেককে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা সব শিখে নিতে হবে। নিজের মাথা নিজে রক্ষা করার জন্য এসব করছি। অন্যের মাথা ভাঙার জন্য নয়।

মালতী কেমন লজ্জা পেল বলে। তারপর বলল, তুমি আমারে দুই চারটে কৌশল শিখাইয়া ত্যাও। আমারে লাঠি খেলা শিখাইলে তোমার আবার জাত যাইব না ত?

—জাত যাবে কেন।

—আমি মেয়েমানুষ। অবলা জীব।

—অবলা জীবদেরই বেশি শিখতে হবে। আরম্ভ হোক, সব গোছগাছ করে নি। খেলা জমে উঠুক।

—খেলা শিখাইবে কে?

—আমি।

—তুমি আবার এইসব শিখলা কবে।

—এক ফাঁকে শিখে ফেলেছি।

—তুমি কত না কিছু জান! কত না কিছু করতে পার!

—আমি কিছুই করতে পারি নি মালতী। কত কিছু করার আছে আমাদের। তুমি সব জানলে অবাক হয়ে যাবে।

—আমারে দলে লও না।

—দল পেলে কোনখানে?

—এই যে তুমি লাঠিখেলার দল করতাছ।

দল কথাটা বলতেই রঞ্জিত কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। দল বলা উচিত নয়। কারণ সে এখানে গোপনে কিছুদিন বসবাস করতে এসেছে। সে বলল, না, কোন দল করছি না মালতী। আমার দল করার কি আছে।

—ক্যান, বৌদি যে কইল তুমি স্বাশের কাজ কইরা বেড়াও।

—তা হলে দিদি তোমাকে সব বলেছে। বলে সামান্য সময় চুপ করে থাকল রঞ্জিত। সকালবেলার রোদ ওদের পিঠে পড়ছিল। ওরা দীনবন্ধুর বড় ঘরটার পিছনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। লালটু পলটু সোনা সকলেই ওকে ঘিরে আছে। ওরা মালতী পিসিকে দেখছে। মামা, মালতী পিসির মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে, মালতী পিসি মাটির দিকে তাকিয়ে কথা বলছে।

মালতী কিছু বলতে যাচ্ছিল। সে দেখল এইসব ছোট ছোট ছেলেদের সামনে বলা ঠিক না। মালতী আর কথা না বলে চলে গেল।

খুব গোপনে কাজ করছিল রঞ্জিত। সে লাঠি খেলা ভিতরে বাড়ির উঠোনে, জ্যোৎস্নায় অথবা মৃদু হ্যারিকেনের আলোতে শেখাবার চেষ্টা করছে। যেন কেউ না জানে। কেবল বড়বৌ, ধনবৌ, পাগল ঠাকুর সাক্ষী থাকত। সোনা, লালটু, পলটু ঘুমিয়ে পড়লে উঠোনে লাঠি খেলা আরম্ভ হত। কিন্তু একদিন রাতে সোনা পাশে খুঁজতে গিয়ে দেখল মা নেই। মা কোথায়! সে ঘুম থেকে উঠে বসল। দরজা খোলা। উঠোনে লাঠির ঠকঠক শব্দ পাচ্ছে। জ্যোৎস্না রাত। আবছা আলোতে সে বুঝতে পারল, মা এক কোণায় দাঁড়িয়ে আছেন। সে নেমে দরজা পার হয়ে মায়ের কাছে চলে গেল। আট দশজন গ্রামের জোয়ান লোক রঞ্জিত মামার কাছে লাঠি খেলা শিখছে। অন্য পাশে কারা যেন—বুঝি মালতী পিসি, বুঝি কিরণী দিদি এবং ননী, শোভা, আবু। ওরা কাঠের ছোরা নিয়ে খেলছিল, খেলা শিখছিল। মা এবং বড় জেঠিমা পাশে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছিল আর বোধহয় পাহারা দিচ্ছিল। এদিকে কেউ আসছে কিনা লক্ষ্য রাখছে। লাঠির ঠকাঠক শব্দ উঠছে। শির, বহেরা কাটি এমন সব শব্দ। ছোট মামা কেমন যন্ত্রের মতো তালে তালে বলে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে ছোট মামা লাঠি ঘুরাতে ঘুরাতে এত বেগে এদিকে ধেয়ে আসছেন যে টের পাওয়া যাচ্ছে না ছোট মামার হাতে লাঠি আছে। কেবল বনবন শব্দ। তিনি ঘুরে ঘুরে, কখনও ডান পা তুলে, কখনও বাঁ পা তুলে, যেন মানুষটা এই লাঠির ভিতর বেঁচে থাকার রহস্য খুঁজে পেয়েছে, মানুষটা লাঠিটাকে নিজের ডান হাত বাঁ হাত করে ফেলেছে, যেমন খুশি লাঠি চালাচ্ছে। সোনা মাঝে মাঝে লাঠির ভিতর ছোট মামার মুখটা হারিয়ে যাচ্ছে দেখতে পেল।

সোনাও খুব উত্তেজনা বোধ করছিল ভিতরে ভিতরে। সামান্য কাক-জ্যোৎস্না। কামরাঙা গাছের ওপাশে তেমনি বিস্তৃত মাঠ নিঃসঙ্গ জ্যোৎস্নায় শুয়ে আছে। পাগল জ্যাঠামশাই দাওয়ায় বসে হাত কচলাচ্ছেন আর মাঝে মাঝে ক্ষেপে গিয়ে সেই এক উচ্চারণ। সংসারে যেন এক আপদ লেগেই আছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ছোট মামা মাঝে মাঝে ছুটে যাচ্ছিলেন মালতী পিসির দিকে। মালতী পিসি কাঠের ছোরা নামাতে গিয়ে কোথায় ভুল করেছে শুধরে দিচ্ছেন। দাওয়ার পাশে সব বড় বড় লাঠি দাঁড় করানো। তেল মাখানো বলে লাঠিগুলি এই সামান্য জ্যোৎস্নায়ও চকচক করছে। কেউ লাঠি ঘুরাতে ঘুরাতে পরিশ্রান্ত হলে, লাঠিটা দাওয়ার পাশে রেখে উঠোনের ওপর দু'পা ছড়িয়ে বসে যাচ্ছে। ছোট মামা হাতকাটা গেঞ্জি গায়ে অনবরত দৃষ্টি রাখছেন সকলের ওপর। সোনা আর কাফিলা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। সে ছুটে মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

ধনবৌ বলল, তুমি সোনা!

—আমার ভয় করতাছে।

ঘরের অন্ধকারে সোনা একা থাকতে ভয় পাচ্ছিল। সে ফের বলল, মা এইটা কি হইতাছে!

—লাঠিখেলা।

রঞ্জিত দেখতে পেল সোনা ঘুম থেকে উঠে এসেছে। সে সোনাকে কাছে নিয়ে বলল, তুই খেলা শিখবি?

—শিখমু। খুব আগ্রহের সঙ্গে কথাটা বলল সোনা।

—কিন্তু অনেক সাধনা করতে হয়।

সোনা সাধনা কথাটার অর্থ জানে না। সে মাকে বলল, মা সাধনা মানে কি মা?

রঞ্জিত বলল, ধনদি কি বলবে। আমার কাছে আয়। সাধনা মানে হচ্ছে তুমি যা করবে, একাগ্রচিত্তে করবে। কেউ তোমার এই ইচ্ছার কথা জানবে না।

—আমি কমু না।

—হ্যাঁ বলতে নেই। যদি না বল, তবে তোমাকে শেখাতে পারি।

—ভাখবেন, আমি কমু না।

রঞ্জিত জানত এইসব কথার কোন অর্থ হয় না। এইসব বালকদের রঞ্জিত দলে নিয়ে নিল। বলে দিতে পারে, নাও পারে, তবু ওদের একাগ্রচিত্ত করার জন্য মাঝে মাঝে রঞ্জিত নানাভাবে বক্তৃতা করত। সুতরাং সোনা, লালটু, পলটু এই দলে এসে ক্রমে ভিড়ে গেল। ওরা খেলার চেয়ে ফাইফরমাস খাটায় বেশি উৎসাহ বোধ করত। রাত ঘন হলে কোনদিন সোনা ঘুমিয়ে পড়ত। ওর খেলার কথা মনে থাকত না। ভোর হলে মামাকে বলত, আমি তোমার লগে কথা কমু না।

—কেন কি হল ?

—তুমি কাইল আমারে খেলাতে লও নাই।

—তুমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলে।

সোনা মাঝে মাঝে মামার মতো অথবা বড় জেঠিমার মতো কথা বলতে চেষ্টা করত। মামা কেমন সুচতুর মানুষের মতো স্পষ্ট এবং ধীর গলায় কথা বলে। মালতীর ইচ্ছা হত রঞ্জিতের মতো কথা বলতে। বড়বৌদি এবং এই রঞ্জিতের কথা এত মিষ্টি যে, মনের ভিতর কেবল গুনগুন করে বাজে! ওদের কথা এতটুকু কর্কশ নয়। মালতীর মনে হত ওর কথা কর্কশ। সে সেজন্য যতটা পারে রঞ্জিতের সঙ্গে কম কথা বলে। রঞ্জিতও আজকাল কাজের কথা ব্যতিরেকে অন্য কথা বলতেই চায় না। সে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার সময় বলত, তোমার খুব একাগ্রতার অভাব মালতী। তুমি খুব যেন অন্যমনস্ক। খেলার সময় অন্যমনস্ক হলে মাথায় মুগে কোনদিন লেগে যাবে।

মালতী তখন উত্তর করত না। কি উত্তর করবে! এই খেলা যেন নিত্য তার সঙ্গলাভের জন্য। যেন এই মানুষ এসে গেছে তার, এখন আর ভয় কিসের। রঞ্জিতের সব কথা সেজন্য সে চুপচাপ শুনে যেত কেবল। কোন কোনদিন মালতীকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্য সে এই অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার করত। তখন আরও গা জ্বলে যেতো মালতীর। এইসব গ্রাম্য আঞ্চলিক ভাষা যেমন কর্কশ তেমন শ্রীহীন। রঞ্জিত এমন ভাষায় কথা বললে, তার কাছে আর কিছু চাইবার থাকে না। মালতী বিরক্ত হয়ে বলত, তোমার আর ঢং করতে হবে না রঞ্জিত। ইচ্ছা করলে আমিও তোমার মতো কথা বলতে পারি। তুমি যা ভালো করে বলতে পার না, তা বলো না। বড় খারাপ লাগে। তোমার সঙ্গে আমি ছেলেবয়স থেকে বড় হয়েছি।

রঞ্জিত কেমন অবাক হল ওর কথা শুনে।—তোমাকে মালতী আর গ্রাম্য বলে ধরাই যায় না।

মালতী বলল, তবু যার যা, তার তা। আমার মুখে তোমার ভাষা মানাইব কেন। তুমিও যা ভাল কইরা কইতে পার না, তা কইতে যাইয় না। বড় খারাপ লাগে শুনতে।

সোনা বলল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তুমি ডাকলা না ক্যান।

—ঠিক আছে, আজ রাতে তোমাকে ডেকে তুলব। কিন্তু শর্ত আছে।

—শর্ত! শর্ত কথাটাই শোনে নি সোনা। সে বলল, ছোটমামা শর্ত কি!

—তুমি সোনা শুধু মাঠ দেখেছ।

—মাঠ দেখেছি।

—ফুল দেখেছ।

—ফুল দেখেছি। সোনা মামার মতো কথা বলতে চেষ্টা করল।

—আর সোনালী বালির চর দেখেছ।

—চর দেখেছি। তরমুজ খেত দেখেছি।

—কিন্তু শর্ত ছাখো নি।

—না।

—শর্ত বড় এক দৈত্য। এই দৈত্য কাঁধে চাপলে মানুষ অমানুষ হয়ে যায়। আবার অমানুষ মানুষ হয়ে যায়।

—তোমার দৈত্যটা কি কয় ছোটমামা?

—আমার দৈত্যটা অমানুষকে মানুষ হতে কয়।

—দৈত্যটা আমারে আইনা ছাও না।

—বড় হও। বড় হলে এনে দেব। রঞ্জিত এই বলে সোনাকে কাঁধে তুলে ঘোরাতে থাকল। বড় উঠোনে লাঠি খেলা হয়, ছোরা খেলা হয়। চারধারে বড় বড় টিন-কাঠের ঘর। পালবাড়ির উঠোন থেকে কিছু দেখা যায় না ভিতরে। রাত হলেই উঠোনটা মানুষে মানুষে ভরে যাবে।

আতা বেড়ার ওপাশ থেকে একটা চোখ অপলকে দেখছে রঞ্জিতকে। রঞ্জিতের পেশীবহুল শরীর দেখে চোখটা তাজ্জব বনে যাচ্ছে। রঞ্জিতের খালি গা। রঞ্জিত সোনাকে কাঁধে নিয়ে ঘুরাচ্ছে। কখনও সোনাকে দুহাত ধরে ঘোরাচ্ছে। সোনা খুব আনন্দ পাচ্ছিল। ওর মাথা ঘুরছিল। কিছুক্ষণ ঘুরিয়েই সে সোনাকে মাটির ওপর ছেড়ে দিচ্ছে। সোনা টলছিল, দু'হাত বাড়িয়ে আবার আবার করছিল। শচীন্দ্রনাথ উঠোন পার হয়ে যাবার সময় দেখল, রঞ্জিত সোনাকে নিয়ে উঠোনে খেলা করছে। শচীন্দ্রনাথ কিছু বলল না। সকালবেলা পড়ার সময়। কিন্তু সোনার পরীক্ষা হয়ে গেছে। সে পরীক্ষায় খুব ভাল করেছে। সোনার স্মৃতিশক্তি প্রবল। এই সকালে উঠোনের ওপর মামা ভাগ্নেকে নিয়ে এমন মত্ত দেখে মনে মনে খুশি হল সে। শীতকালে ওদের মামাবাড়ি যাবার কথা। ধনবৌ ওদের পরীক্ষা হয়ে গেলেই বাপের বাড়ি যায়। শীতের সময় খুব কুয়াশা হয় মাঠে। কলাই গাছে কলাইর শুঁটি। আর মাঠে মাঠে সর্ষের ফুল হলুদগোলা রঙের মতো।

শীতের দিনেই যত খাবার, রকমারি খাবার। পিঠা-পায়েস তখন বাড়ি বাড়ি। তখন বড় বড় গেরস্থবাড়িতে বাস্তুপূজা। ভেড়া বলি, তিলা কদমা আর তিলের অম্বল। নানা রকমের খাবার। তখন বাজারে গেলেই বড় পাবদা মাছ—কি সোনালী রং, আর কি বড় বড়। কালিবাউশ, বড় বাগদা চিংড়ি আর দুধ। শীত এলেই অঞ্চলের গাভীরা তাদের সঞ্চিত দুধ সব ঢেলে দেয়। তখন অভাবটাও পল্লীতে পল্লীতে জাঁকিয়ে বসে থাকে না। তখন সংসারে সংসারে আনন্দ উৎসব। দুঃখী মানুষেরা তখন কাজ পায়

গেরস্থবাড়িতে। জিনিসপত্রের দাম সস্তা হয়ে যায় বড়। আর তখনই লাল্টু পলটু গ্রামের সব ছেলেদের সঙ্গে মাঠে নেমে গিয়ে গোল্লাছুট খেলে। শুধু মাঠ, ধান কেটে নেওয়া হয়েছে বলে নরম মাটির ওপর শুকনো নাড়া, পা পড়লেই খড়খড় শব্দ। তখন যত পারো ছোটো। ছুটে ছুটে পড়ে যাও মাটিতে—কিন্তু শরীরের কোথাও এতটুকু আঘাত লাগবে না।

শচীন্দ্রনাথ আতা বেড়ার পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখল, মালতী দাঁড়িয়ে আছে। কাফিলা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কি যেন করছে। শচীন্দ্রনাথ বলল, তুই এখানে?

—আঠা নিমু। বলে কাফিলা গাছ থেকে আঠা তুলে নেবার মতো অভিনয় করল। বস্তুত মালতী এই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে একজন মানুষকে ওপাশে বেড়ার ফাঁকে চুপি চুপি দেখছিল। কেউ এলেই খুঁটে খুঁটে যেন গাছ থেকে আঠা নিচ্ছে এমনভাব চোখেমুখে। সে এই করে প্রাণভরে রঞ্জিতকে দেখছিল। ভোরে উঠেই মালতীর হাতে যা কাজ ছিল, যেমন উঠোন ঝাঁট দেওয়া আর বাসন ঘাটে নিয়ে যাওয়া, তারপর হাঁসগুলো ছেড়ে দেওয়া—এইসব কাজ করে দেখল আর কিছু করণীয় নেই। আভারানী রান্নাঘরে চিঁড়ার ধান ভিজিয়ে রাখছে। চুপি চুপি সে ঠাকুরবাড়ি চলে এল। মালতী আতা বেড়ার পাশে একটু সময় অপেক্ষা করল। প্রথম উঁকি দিতে সাহস পায় নি। একটা কিছু অছিলা দরকার। বেড়ার সঙ্গে কাফিলা গাছ। গাছ থেকে একটু একটু আঠা ঝরছে। সে একটা পাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কেউ দেখতে পেলে বুঝবে মালতী আঠা নিচ্ছে গাছ থেকে। সে আতা বেড়ার ফাঁকে উঁকি দিল। মরিয়া হয়ে সে উঁকি দিয়ে রঞ্জিতকে দেখতে থাকল। অপমানকর ঘটনা ঘটে যেতে পারে এই নিয়ে, কলঙ্ক পর্যন্ত রটে যেতে পারে এই নিয়ে, সে তাও ভুলে গেল। নরেন দাস বাড়িতে নেই, অমূল্য বাবুর হাটে শাড়ি বিক্রি করতে গেছে, তাঁত এখন ক'দিনের জন্য বন্ধ। সুতরাং মালতীর প্রায় ছুটির দিন এগুলি। সে এইসব দিনে খেলে, বেড়িয়ে, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে, তেঁতুলের আচার মুখে স্বাদ নিতে নিতে বেশ কাটিয়ে দিতে পারবে। তারপরই পুরাপূজার মেলা। সে এবার রঞ্জিতকে নিয়ে পুরাপূজার মেলায় চলে যাবে। তারপর সেই মেলার প্রাঙ্গণে সারকাসের হাতি, সিংহ, বাঘ, মাঠে মাঠে ঘোড়দৌড় এবং মন্দিরের এক পাশে ডোমদের শুয়োর বলি এসব দেখে, জিলিপি রসগোল্লা মুখে পুরে সারা মাঠ ছুটে বেড়িয়ে—কি যে এক আনন্দ, কি যে এক সুখ বসন্ত করে মনের ভিতর—বুঝি সুখের জন্য এই মানুষ রঞ্জিত এখন তার জীবনের সব কিছু। সে মরিয়া হয়ে বেড়ার ফাঁকে একটা চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকল।

বিকালের দিকে যখন বেলা একেবারেই পড়ে এল, যখন বৈঠকখানার উঠোনে আলো মরে গেছে, সোনা, লালটু পলটু যখন একটা একটা করে

বাঁশের লাঠি তুলে নিয়ে পুবের ঘরে সাজিয়ে রেখে দিচ্ছিল—তখনই গলা পাওয়া গেল। পুকুর পাড় থেকে ডেকে ডেকে উঠে আসছে কে!

বৈঠকখানায় উঠোনে এসে ডাকল, রঞ্জিত নাকি আইছে?

শচীন্দ্রনাথ সামুকে দেখে সামান্য বিস্মিত হল। কিছুদিন আগে জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে শচীন্দ্রনাথ সামুকে গালমন্দ করেছিল। কথা কাটাকাটি হয়েছে। সেই সামু ফের এ বাড়িতে উঠে এসেছে বলেই বোধ হয় সংকুচিত না হয়ে পারছিল না। সে স্বাভাবিক হবার জন্য অন্য কথা টেনে আনল। বলল, তর মায় নাকি বিছানা থাইকা আর উঠতেই পারে না।

—পারে না কর্তা।

—তারিণী কবিরাজের কাছে একবার যা।

—গিয়া কি হইব কর্তা। বোধ হয় শীতটা পার করতে পারমু না।

—তবু একবার গিয়া ছাখ। যদি তাইন একবার তর মায়রে দেইখা যান। আমার চিঠি নিয়া যা।

সামু বলল, আন চিঠি। পাঠাই। ছাখি কি হয়।

—ছাখি কি হয় না! তুমি পাঠাইবা। পিসিরে অচিকিৎসায় মারবা সে হইতে দিমু না।

সামুর মুখে সামান্য প্রসন্ন হাসির রেখা ভেসে উঠল। ওর ছাঁটা গোঁফ এবং অতি সামান্য সুর—খুব লক্ষ্য করলে বোঝা যায় থুতনির নিচে সেই সুরটাকে যেন সামু গোপনে লালন করছে। এক সময় সামুর মুখে বড় বড় দাড়ি দেখে শচীন্দ্রনাথ বলেছিল—তরে দেখলে সামু, পিসার কথা মনে হয়। শচীন্দ্রনাথ সামুর বাবার কথা মনে করিয়ে দিয়ে সামুকে মহান করে তুলছিল যেন। তারপর কতদিন গেছে, মালতীকে ইচ্ছা করেই বড় দাড়ি দেখিয়ে যেন প্রতিশোধ তুলতে চেয়েছিল। তারপর একসময় মনে হয়েছে, প্রতিশোধ কোথাও কারো জন্য অপেক্ষা করে থাকে না, সময় এলে সব জলের মতো মনে হয়, হাস্যকর মনে হয়। নিজের ছেলেমানুষীর কথা ভেবে লজ্জায় মুখ ঢেকে দিতে ইচ্ছা যায়। সুতরাং এখন সামু আবার ভদ্রগোছের যেন। বিশেষ করে শিক্ষিত, মার্জিত রুচির পুরুষ যেন এখন সামু। ওর তফন, ডোরাকাটা। ধানগাছের মতো রং তফনের। আর গায়ে হাল্কা গেঞ্জি, পুরুহাতা শার্ট। সে এবার শচীন্দ্রনাথের দিকে না তাকিয়েই বলল, শোনলাম রঞ্জিত ফিরা আইছে?

—হ, আইছে। এতদিন কলিকাতায় আছিল, আবার ফিরা আইছে।

সামু আর শচীন্দ্রনাথের জন্য অপেক্ষা করল না। ডাকল, কৈ ঠাকুর, কৈ গ্যালা। একবার এদিকে বাইর হও। দেখি চেহারাটা। তুমি আমারে চিনতে পার কিনা দেখি।

রঞ্জিত বৈঠকখানার উঠোনে এসে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল।—তুই সামু না?

—তাইলে দেখছি ভুইলা যাও নাই।

—ভুলব কেন!

—কি জানি বাবা, তুমি কোনখানে চইলা গেলা। কোন চিঠিপত্র নাই। বড় বৌঠাইরেনের লগে ছাখা হইলে কইছি, রঞ্জিতের চিঠি পাইলেন নি! এক্কেবারে নিরুদ্দেশে গ্যালা। কোন চিঠিপত্র নাই।

রঞ্জিত বলল, ভিতরে এসে বোস।

—সাঁজ বেলাতে ঘরে বইসা থাকবা? চল না মাঠের দিকে যাই।

এটা মন্দ কথা নয়। মাঠের দিক বলতে—সেই সোনালী বালির নদীর চর। সেই নদী, এক আবহমান কালের নদী। কথায় কথায় রঞ্জিত সামুকে অনেক কথাই বলল, অনেক দিনের অনেক কথা। এক ফাঁকে মালতীর কথাও।

জ্যোৎস্না উঠে গেছে, পরিচ্ছন্ন আকাশ। ওরা আলের ওপর দিয়ে হাঁটছিল। এই সব যব গম খেত পার হলেই নদীর চর। সাপের মতো বিস্তৃতি নিয়ে এই চর, মাঠ এবং নদীর মাঝে শুয়ে আছে। তরমুজের লতা খুব ছোট বলে এবং বাতাস দিচ্ছিল বলে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় দূর থেকে একপাল খরগোশের মতো মনে হচ্ছে। ওরা যেন নিরন্তন সেই বালির চরে ছুটে বেড়াচ্ছিল। নদীর জল নেমে গেছে। কি আর জল—সেই এক রকমের, মনে হয় 'পার হয় গরু পার হয় গাড়ি'। ওরা নদীর জলে কাপড় হাঁটু পর্যন্ত তুলে নেমে গেল। স্ফটিক জল। নিচে নুড়িপাথর, মাথার ওপর আকাশ। সাদা জ্যোৎস্না, নদী পার হলে গ্রাম, কিছু ঘন বন এবং আরও পুবে হেঁটে গেলে এক বাঁশের সাঁকো পাওয়া যায়। সেই সাঁকোর ওপর মালতীকে নিয়ে একদিন সামু এবং রঞ্জিত চলে গিয়েছিল। নদীর জল ভেঙে মাঠ ভেঙে চুকৈর ফল, টক টক মিষ্টি মিষ্টি ফল, আনতে ওরা চলে গিয়েছিল। তারপর ওরা ফেরার পথে বড় মাঠ পার হতে গিয়ে পথ হারিয়ে সারাক্ষণ মাঠময়, গ্রামময় ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরলে নরেন দাস ধমক দিয়েছিল। ওদের দু'জনকে নরেন দাস লাঠি নিয়ে তেড়ে গিয়েছিল। ওরা বাড়িতে ঢুকলেই মালতীকে কাজ দিয়ে তাঁতঘরে পাঠিয়ে দিত।

তখন সামু বলেছিল, ঠাকুর একটা বুদ্ধি ছাও।

রঞ্জিত বলেছিল, নরেন দাস মাছ খেতে ভালবাসে।

—কি মাছ?

—ইচা মাছ।

সেবার ভাদ্র কি আশ্বিন মাস ছিল। ঠিক এখন মনে পড়ছে না ওদের। বর্ষার জল নেমে যেতে আরম্ভ করেছে। জলের নিচে সব জলজ ঘাস পচতে শুরু করেছে। দুর্গন্ধ জলে। জলের মাছ বড় বিল, নদী অথবা সমুদ্রে পালাতে পারলে যেন বাঁচে। খাল ধরে মাছগুলি নেমে যাবে। ঠিক জায়গা মতো

জলের নিচে চাই পেতে রাখতে পারলে মাছে চাই ভরে যাবে। চিংড়ি মাছে ভরে যাবে। বড় বড় গলদা চিংড়ি। কিন্তু বড় কষ্ট। বিশেষ করে সাপ-খোপের ভয়, জোঁক এবং জলজ কীটপতঙ্গের ভয়। ওরা সব তুচ্ছ করে গায়ে রসুন গোটার তেল মেখে মাছ ধরার জন্য সাঁতরাতে থাকল। পচা জল সাঁতরে খালের বড় বটগাছটার নিচে চাই পেতে সেই বটগাছের ডালে ওরা সারারাত পাহারা দিয়ে পরদিন প্রায় দুই ঝুড়ি গলদা চিংড়ি নরেন দাসের উঠোনে এনে ফেলতেই চকিতে যেন বলে উঠেছিল, আরে, তরা করছসটা কি! সেই যে উভয়ে চকিত চোখ দেখেছিল নরেন দাসের, সেই যে লোভে নরেন দাস, বিষয়ী মানুষ নরেন দাস, লোভে আকুপাকু করেছিল—আর কোনদিন কখনও ছোট মেয়ে মালতীকে ধরে রাখে নি। মালতী প্রায় সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে এই অঞ্চলের সর্বত্র ছুটে বেড়িয়েছে।

এই মালতীর জন্য ওরা নানারকমের দুঃসাহসিক কাজ করে বেড়াত। সেই মালতী এখন কত বড় হয়েছে। রঞ্জিত হাঁটছিল আর ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে এক সময় বলে ফেলল, মালতী বড় সুন্দর হয়েছে, কতদিন পর দেখা। মালতী এখন কি লম্বা হয়েছে।

সামু এবার মুখ তুলে তাকাল। বলল অরে নিয়া বড় ভয় আমার। একদিন রাইতে দেখি অমূল্যরে নিয়া আনধাইরে হাঁস খুঁজতে মাঠে বাইর হইছে।

রঞ্জিত বোধ হয় কিছুই শুনছিল না। মালতীকে সে প্রথম দিন দেখে চমকে গিয়েছিল। ওর মুখ থেকে যেন ফসকে বের হয়ে গেছিল—কি সুন্দর তুমি! কিন্তু বলতে পারে নি। কোথায় যেন ওর মনে এক অহঙ্কার আছে, আত্মত্যাগের অহঙ্কার। তবু মনের ভিতরে ভাল লাগার আবেগ সময়ে অসময়ে খেলা করে বেড়াচ্ছিল। সামুর সঙ্গে দেখা হতেই মনে হল, এই মানুষ, একমাত্র মানুষ যাকে তার ভাল লাগার কথাটুকু বললে কোন ক্ষতির কারণ হবে না। সে জলের কিনারে হেঁটে যাবার সময় মালতীর কথা বলছিল। নির্মল জলের মতো মালতী পবিত্র হয়ে আছে এমন সব বলার ইচ্ছা। জলে জ্যোৎস্না চিকচিক করছে। জলের শব্দে ছোট ছোট মাছেরা ছুটে আসছে পায়ের কাছে। দাঁড়িয়ে গেলে সেই সব কুঁচো মাছ পায়ে ঠোকর মারছিল। দু'জনই প্রায় সময় সময় একেবারে চুপ মেরে যাচ্ছে আবার কথা উঠলে নানারকমের কথা, কথায় কথায় রঞ্জিত বলল, তুই নাকি লীগের পাণ্ডা হয়েছিস!

সামু এ-কথার কোন জবাব দিল না। কারণ কথাটার ভিতর বোধ হয় রঞ্জিতের অবজ্ঞা আছে। সে যেন ঠিক এখন শচীন্দ্রনাথের মতো কথা বলছে। শচীন্দ্রনাথ অথবা অন্যান্য হিন্দু মাতব্বর ব্যক্তিরা ওর দল সম্পর্কে যেমন উন্নাসিকতা রক্ষা করে থাকে ঠিক তেমনি যেন রঞ্জিত ওর পার্টি সম্পর্কে অবজ্ঞা

দেখাতে চাইল। সুতরাং সামু অন্য কথায় চলে আসার জন্য বলল, চল উপরে উইঠা যাই। চরে বইসা হাওয়া খাই।

রঞ্জিত চরে উঠে এগিয়ে গেল। তারপর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে বলল, কি রে, জবাব পেলাম না যে!

—ও-কথা বাদ ছাও ঠাকুর।

—কেন বাদ দেব। আরও কি বলতে যাচ্ছিল। সহসা যেন সামু বলে ফেলল, ওটা আমার ধম্মের কথা। বলেই হাত ধরে রঞ্জিতকে টেনে বসাল। ছুঁইয়া দিলাম। সান করতে হইব না ত! রঞ্জিত এমন কথায় হা হা করে হেসে উঠল। কিন্তু হাসতে হাসতেই কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল রঞ্জিত। তারপর উদ্বিগ্ন চোখে পরস্পর পরস্পরের মুখ দেখল কিছুক্ষণ। সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সামু এবার ধীরে ধীরে বলল, কতদিন আছ ঠাকুর? বলে, দূরে নদীর জল দেখতে থাকল।

—ঠিক নেই। যতদিন পারি থাকব। বলার ইচ্ছা যেন, আত্মগোপন করে আছি। যদি ধরিয়ে না দিস তবে বোধ হয় এবার এখানে অনেকদিন পর্যন্ত থেকে যেতে পারব।

সামু এবার ওর দিকে মুখ ফেরাল। এখন সে আর এই বালিয়াড়ি দেখছে না। নদী দেখছে না। এবং এত যে রহস্যময় গ্রাম মাঠ ফসল পড়ে আছে, তাও দেখছে না! সে শুধু রঞ্জিতের মুখ দেখছে। সে রঞ্জিতের মুখে সেই ছায়া দেখছে—বোধ হয় আত্মত্যাগের অহঙ্কার এই মানুষের মুখে, অন্য মানুষের ধর্মে কর্মে একেবারেই বিশ্বাস নেই। সে মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলল, আমার মাইয়াটারে তোমারে আইনা ছাখামু ঠাকুর। মাইয়াটা এখন ঠিক মালতীর ছোট বয়সের মত হইছে। কেবল ছুটে ছুটে বেড়ায় গোপাটে। মাইয়াটারে ছাখলে, আমার, তোমার কথা মনে হয়। তুমি আমারে ঠাকুর অবিশ্বাস কইর না, অবহেলা কইর না। বলে কেমন দুঃখের সঙ্গে হাসল সামু।

—মালতী বলল, তুই ঢাকায় থাকিস, সেখানে পার্টি করছিস!

—মালতী বড় অবজ্ঞা করে ঠাকুর। মালতী আমার লগে আর প্রাণ খুইলা কথা কয় না।

—বুঝি অবিশ্বাস করছে।

—জানি না ঠাকুর। বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা জানি না।

ঠিক তখনই জ্যোৎস্নার ভিতর মনে হচ্ছিল এক মানুষ, পাগল মানুষ হেঁটে নদী পার হচ্ছে। ওপারে গ্রামের ভিতর লণ্ঠন জ্বলছিল, জলে সেই লণ্ঠনের আলো ভাসছে। পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ নদী পার হচ্ছিল বলে জলে সামান্য ঢেউ উঠছে। আলোর রেখাগুলি ছত্রখান হয়ে গেল।

ফেলু দাওয়ায় বসে গজরাচ্ছিল। বাঁ হাতে এখন আর একেবারেই শক্তি পাচ্ছে না। হাতটার দিকে তাকালেই ভয়ঙ্কর এক আক্রোশ বুক বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে—তুমি ঠাকুর, পাগল ঠাকুর, তোমার পাগলামি ভাইঙ্গা দিমু।

হাতটা ওর বাঁ হাত। কব্জিতে জোর নেই। কালো পোড়া বিশীর্ণ রঙ ধরে আছে কব্জির চামড়াতে। দু'পাশের মাংস ফুলে ফেঁপে আছে। যেন কব্জির দু পাশে মাংস বেড়ে একটা মোটা গিঁট হয়ে যাচ্ছে। কালো তার বাঁধা। কালো তারে মন্ত্র পড়া সাদা এক কড়ি ঝুলছে। কড়ির গলায় ফুটো করে হাতে বাঁধা সুতো নিয়ে ফেলু কেবল গজরাচ্ছিল। কিন্তু কাক উড়ছিল উঠোনে, কিছু শালিখ পড়ছিল মাচানে আর বিবি গেছে পশ্চিমপাড়াতে এক শিশি তেল ধার করতে। ফেলু আছে মাছ পাহারায়।

উঠোনের ওপর শীতের রোদ কাফিলা গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে নিচে এসে নামছে। এই সামান্য রোদেই ফেলু মাচানে মাছ ছড়িয়ে বসে আছে। তারপর আরও সামনে খানা-ডোবা এবং জমি, জমিতে কোন ফসল হয় না। ছোট্ট একখণ্ড জমি ফেলুর। বাড়ির উত্তরে এই জমি, বাঁশ গাছের ছায়া জমিটাকে বড় অনুর্বর করে রেখেছে।

ওর গলায় কালো তার বাঁধা। গলায় চৌকো রুপোর চাকতি। সব সময় পালোয়ানের মতো চেহারা করে রাখার সখ ফেলুর। ফেলুর যৌবন নেই, কিন্তু এখনও শক্ত ঘাড় গলা দেখলে, ঘাড় গলা হাত দেখলে, তাজ্জব বনে যেতে হয়। মানুষটার মুখ ফসলহীন মাঠের মতো। রুক্ষ, দাবদাহে যেন সব সময় পুড়ে যাচ্ছে। এক চোখে তাকালে বুকটা কেঁপে ওঠে। চোখের ভিতর মণি আছে, মণির ভিতর সব সময় নৃশংস এক ভাব। সুখী পায়রা আকাশে উড়তে দেখলেই ধরে ফেলার সখ, দুই পাখা ছিঁড়ে দেবার সখ। এবং ঠ্যাং খোঁড়া করে দিতে পারলে গাজীর গীদের বায়ানদারের মতো চান্দের লাখান মুখখান এমন সব বলতে থাকে।

ফেলু বড় হা-ডু-ডু খেলোয়াড় ছিল। তখন তার দুই হাতের ওপর শত্রুপক্ষের কি আক্রোশ! ঐ হাত যেভাবে পারো ভেঙে দাও। থাবা মারলে ফেলু, সকলে বাঘের ভয় পায়।

চত্বরে খেলা হচ্ছে। গোপালদি বাবুদের দল খেলছে—দশ টাকা আগাম, আরও দশ ফেলুর ঐ বাঘের মতো থাবা মচকে দিতে পারলে। কিন্তু হায়, কে কার থাবা মচকায়। ফেলু ছুটছে। একবার এ-মাথায় আবার ও-মাথায়। সে খুব দ্রুত ছুটতে ভালবাসে। দাগের ওপর পড়েই সে লাফ দেয়, যেন সে লাফ দিয়ে আসমান ছুঁতে চায়। ঐ ওর কায়দা। শক্ত হাত-পা পেশীতে

সূর্যের আলো ঝলমল করত। কালো খাটো প্যান্ট, কালো গেঞ্জি আর রুপোর তাগা গলায়, যেমন লম্বা ফেলু, তেমন কুৎসিত মুখ শরীর—মনে হয় তখন ফেলু জয় মা বলে অথবা আল্লা আল্লা বলে—হা মা ঈশ্বরী বলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। দুই পায়ে কাইচি চালাও—ফেলু যে ফেলু সে পর্যন্ত পাহাড়ের মতো মুখ থুবড়ে পড়বে। তখন ফেলুর কোমরে বসে উল্টোভাবে এমন এক মোচড় দিতে হবে যেন বাঘের থাবা বেড়ালের হয়ে যায়। বাবুদের বায়নার মুখে ছাই দিয়ে যে ফেলু সেই ফেলু। খেলার শেষে টেরটি পাওয়া যায় না, ফেলুর কোথাও শরীর জখম হয়েছে।

সেই ফেলু বসে বসে এখন হাত দেখছে। কাক তাড়াচ্ছিল এবং ভাঙা হাতের দিকে তাকিয়ে বড়ঠাকুরকে উদ্দেশ করে গাল পাড়ছিল—পাগলামির আর জায়গা পাও না ঠাকুর, তোমার পীরগিরি ভাইঙ্গা দিমু। তারপর সে হুস করল। একটা কাক ফের এসে ঘরের চালে বসেছে। কাকটা সেই থেকে জ্বালাতন করছে। কাক একটা নয়, অনেক। ধরে ফেলেছে সে ব্যারামি নাচারি মানুষ। সে ক্রমে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। গিঁটে গিঁটে ব্যাদনা। হাতির শুঁড় ওর সব শক্তি নিয়ে চলে গেছে। কিন্তু ফেলুর জ্বলন্ত দুই চোখ, বিশেষ করে পোকায় খাওয়া চোখটা এমন বড় বেশি ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। কাকটা বোধ হয় সেই চোখটা দেখতে পায় নি। সে চোখটা দেখাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। কাকটা উড়ে এসে উঠোনে বসল। চোখটা দেখতে পায় নি। সে এবার তেড়ে গেল—তুমি আমারে পাগল ঠাকুর পাইছ! বলেই সে ডান হাতটা উঁচু করতে গিয়ে দেখল, হাতটা পুরোপুরি নিরাময় হয় নি। বাঁ হাতটা পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। ডান হাতটা নিরাময় হচ্ছে না। বিবি গেছে এক শিশি তেল ধার করতে আর সে ঘরের মাগের মতো বসে আছে মাছ পাহারায়।

বিবির ওপর রাগটা বাড়ছিল। একটা পাটকাঠি দিয়ে পঙ্গু হাতে কত আর কাক-শালিখ তাড়ানো যায়! কাক-শালিখ, মাছের লোভে বাজপাখি পর্যন্ত উড়ে আসতে পারে। বাজপাখির কথা মনে আসতেই গৌর সরকারের কথা মনে এসে গেল। হাজিসাহেবের পাঁচনের খোঁচা, সময়ে অসময়ে সেই সন্দেহের পাখি কুরে কুরে খেলে, হাজিসাহেব পাঁচনের খোঁচা মারেন মাইজলা বিবিরে আর প্রতাপ চন্দের নাভিতে তেল মাখানোর অভ্যাস, অভ্যাসটার কথা মনে আসতেই ফেলু ভাবল—ওরা কাক চিল নয়, ওরা বাজপাখি নয়, ওরা লাল নদীর ঈগল। বড় মাছ বাদে ওরা খায় না।

সব জমি জিরাত ওদের। সুদিনে দুর্দিনে কামলা খাটলে পয়সা। ফেলুকে গৌর সরকার বড় ভয় পায়। সে ফেলুকে ভয় পায় গতর দেখে নয়, এমন গতরের কামলা ওর ঘরে কত বাঁধা আছে। ভয়, ফেলু নাকি যৌবনে অথবা

সেদিনও রাতে বিরাতে কোথায় চলে যেত। দরকার পড়লে সে দশটা টাকার বিনিময়ে দশটা মাথা এনে দিতে পারে—সেই ফেলু কি তাজ্জব, একটা কাক তাড়াতে পারছে না! ফেলু রাগে হতাশায় লুঙিটা ডান হাতে ঝাড়তে থাকল বার বার।

রোদে মাছ শুকানো হচ্ছে। ছোট একটা উঠোন নিয়ে ফেলুর ঘর। একটা পেয়ারা গাছ। নতুন বিবি ঘরে এসেছে। দু-তিন সাল হল সে বিবিকে ধরে এনেছে। বয়স আর কত বিবির, এক কুড়ি হবে, কি দু-এক বছর বেশি হতে পারে। কাঁচা যৌবনের ঢল বিবির বড় বেশি। পাড়াময় রসিকতা কত—বিবিটা আলতাফ সাহেবের। কি করে, কে কখন আলতাফ সাহেবের লাশ পাট খেতে আবিষ্কার করেছিল কেউ জানে না। তারপর বছর পার হয় নি, ফেলু আলতাফ সাহেবের খুবসুরত বিবিকে ঘরে এনে তুলেছে। কেউ রা-টি করে নি। ফেলু বড় দাঙ্গাবাজ মানুষ। ভয়ে বিস্ময়ে কেউ ওকে ঘাঁটাতে সাহস পায় না। সেই ফেলু এখন এক কাক, সামান্য কাকের সঙ্গে পেরে উঠছে না।

মাছ রোদে শুকাচ্ছে। এক ফাঁকে একটা কাক এসে মাছ নিয়ে উড়াল দিল। দুঃখে হতাশায় ফেলু কাকটাকে তেড়ে গেল। কোমর থেকে লুঙিটা খুলে গেছে, সে প্রায় উলঙ্গ হয়ে কাকটার পিছনে ছুটতে গিয়ে দেখল, প্রায় সব কাকগুলো ওর মাছের মাচানে বসে মাছ খাচ্ছে। রাগে দুঃখে সে ছেঁড়া তফনটা তুলে আর হাঁটতে পারল না। প্রায় হামাগুড়ি দেবার মতো হেঁটে গিয়ে দেখল, কাক যে সামান্য কাক, সেও বুঝে ফেলেছে ফেলুর আর শক্তি সামর্থ্য নেই। সে মরা মাছগুলোর দিকে নিজের পোকায় খাওয়া চোখটা খুলে দাঁড়িয়ে থাকল। সে নড়তে পারছে না। নড়লে বাকি কয়টা মাছও আর থাকবে না। ওর ডান হাত সম্বল, বিবির ওপর সংসার। মাছের এ-অবস্থা দেখলে বিবি তাকে কুপিয়ে কাটবে। সে মাচানের পাশে বসে মাছগুলোকে ফের ছড়িয়ে রাখল। পুঁটি মাছ, চেলা মাছ। ইতস্তত ছড়িয়ে রাখলে বিবি এসে ধরতে পারবে না। কাকে এসে মাছ নিয়ে গেছে। সামু ফের ঢাকা গেছে, ফিরছে না। সামুর মার কাছ থেকে এক কাঠা ধান এনেছে ধার করে, সেও কি দিয়ে শোধ হবে, কবে, কিভাবে কাজ করতে পারলে শোধ হবে সে বুঝে উঠতে পারছে না। একমাত্র যুবতী বিবি আন্নু সব দেখেশুনে করছে।

আন্নুর ওপর এ-সময় তার কেমন মায়া হতে থাকল। সে লুঙিটা তুলে এবার পরল। আন্নু বেগম, বড় মনোরম নাম। কিন্তু আন্নুটার শরীরে এত বেশি তেজ—প্রায় যেন সরকারদের তেজী ঘোড়া—লম্বা মাঠ পেলেই কেবল দৌড়াতে চায়। বড় মাঠে ফেলু এখন আর ঘোড়ায় চড়ে ছুটতে পারে না। কোমরে টান ধরে। সামনে ছুটতে গেলে বড় অবশ অবশ লাগে শরীরটা।

আন্নু ক্ষেপে গিয়ে বলে, মরদ আমার ! ঠেলে ফেলে দেয় পিঠ থেকে, মাটিতে থুবড়ে মুখ হাঁ করে রাখে ফেলু। তখনই একটা সন্দেহের কোড়া পাখি ফেলুকে কুরে কুরে খায়। সে অতি কষ্টে যেন নদীর চর পার হতে হতে ডাকছে আন্নু, আন্নু রে, পাগল ঠাকুর আমারে কানা কইরা দিছে।

ছোট্ট গ্রাম। কয়েক ঘর মুসলমান পরিবার। হাজিসাহেবের বাড়িতে চারটা চার-দুয়ারী নতুন টিনের ঘর উঠেছে। কিছু গাইগরু আছে, বড় দুটো মেলার গরু আছে। তারপর সামুদের কিছু জমি, নয়াপাড়ার মাঠে ওদের কিছু জমি আছে। সম্বৎসর সামুদের ঐ ফসলে চলে যায়। ভালো দু' কানি পাটের জমি থাকলে আর কি লাগে ! সামুর মিঞাজানেরা বড় গেরস্থ। সুতরাং অভাবে অনটনে ধান, খৈ, মুড়ি সবই চলে আসে। তারপর আর যারা আছে প্রায় সবাই আল্লার বান্দা। গতরের ওপর নির্ভর। আবেদালির জমি নেই। মনজুর অধিকাংশ জমি ভাগচাষ করে। ঈশম ত শালা ! বলে ফেলু একটা খিস্তি করল। পঙ্গু বিবি ঈশমের। সামুদের আতাবেড়া পার হলে হাজিসাহেবের গোলাবাড়ি এবং পরে একটা বেতঝোপ আর আতাফলের একটা বড় গাছ, গাছের নিচে ভাঙা কুঁড়েঘর—কোন আদ্যিকাল থেকে বিবিটা সেখানে পড়ে গোঙাচ্ছে। কি যেন এক ব্যাধি ! বিবিটাকে সে কোনদিন ভালবাসতে পারে নি। ওর একমাত্র সম্বল এক তরমুজ খেত। সেই খেতে বসে থাকে মানুষটা। এখন শীতের দিন, এইসব দিন পার হলে গ্রীষ্মের দিন আসবে। তখন যেন ঈশম সওদাগরের মতো। ঠাকুরবাড়ির বান্দা ঈশম তরমুজ বিক্রি করবে, আর সব টাকা তুলে দেবে ছোট ঠাকুরের হাতে। ওর গর্ব সে জমি থেকে ছোট ঠাকুরের হাতে কত টাকা তুলে দিতে পারল।

গ্রামের পর গ্রাম অথবা বিস্তীর্ণ মাঠ। মুসলমান গ্রামগুলিতে হাহাকার যেন। কোন কোন গ্রামে হাজিসাহেবের মতো ধনী আছেন, তাদের সুখ অন্য ধরনের। ওরা, ওদের ছেলেরা উজানে যায়, পাটের ব্যবসা করে কেউ। মসজিদে ইন্দারা দিয়ে ওরা সিন্নি চড়ায়। এইসব দেখে অজ্ঞ ফেলুর বড় ইসছা একবার বড় একটা নাও বানায়। সেই নাও নিয়ে পাটের ব্যবসা করার সখ। পাটের দালাল অথবা ফড়ে হতে পারলে বড় সুখের। যা করে হাজিসাহেব হজ্ব করে আসলেন পর্যন্ত।

আর হিন্দু-গ্রামগুলির দিকে তাকাও—পুবের বাড়ির নরেন দাস—তার জমি আছে, তাঁদের ব্যবসা আছে। দীনবন্ধুর দুই তাঁত, দুই বউ। সুখে আছে লোকটা। আর ঠাকুরবাড়ির মানুষেরা শোনা যায় তল্লাটের বিদ্বান বুদ্ধিমান মানুষ। বড় ঠাকুর পাগল মানুষ। মেজ ঠাকুর, সেজ ঠাকুর দু'দশ ক্রোশ হেঁটে গেলে মুড়াপাড়ার জমিদারদের কাছারিবাড়ির নায়েব গোমস্তা। জমিদারদের বড় বিশ্বাসভাজন লোক। ওদের সচ্ছল সংসার। তারপর পালবাড়ি

—জমি আছে ওদের, মিলের কাজ আছে। তারপর মাঝিরা—ওদের বড় বড় গরু। ইচ্ছা করলে ওরা প্রায় মেলায় জিতে আসতে পারে। কচিৎ দু' একবার নয়াপাড়ার মিঞাজানেরা বাজিতে জিতে ফেলে—সে যেন মাঝিদেরই বদান্যতা। বার বার কাপ মেডেল নিলে মাইনসে কয় কি ! ওরা মেলার গরু মাঠে নিয়ে যায় নি বলে মিঞাজানেরা দৌড়ে বাজি জিতে গেল।

শেষে পড়বে কবিরাজ বাড়ি। প্রতাপ মাঝি ধনী লোক, বিশ্বাসপাড়ার মাঠে ফাউসার মাঠে এবং সুলতানসাদির মাঠে সব সেরা জমিগুলি ওর। শেষে আর দ্যাখো গৌর সরকার—শালীর সনে পীরিত যার, যে ছন ছাইতে গেলে জলপান করতে দেয় না, যে মানুষ সুদে এবং লালসায় বড় হচ্ছে—অপরের সুখ দুঃখের বোধগম্যি কম—কেবল টাকা টাকা, টাকা পেলে সে তার নিজের কলিজা পর্যন্ত বিক্রি করতে পারে। ফেলু ভাবতে ভাবতে দাঁত শক্ত করে ফেলল—তোমা-গ মাশাইরা জবাই করতে পারলে শান্তি। সে চিৎকার করে উঠল, ঠাকুর, পাগল তুমি। তোমার পাগলামি—সে আর বলতে পারল না, কাকগুলি ওকে অন্যমনস্ক দেখে ফের উঠোনে নেমে এসেছে। সে হুস হুস করতে থাকল। কিন্তু দুঃখে দুর্দশায়···বিবিটা এখনও ফিরছে না, কি করছে এতক্ষণ ! হাজিসাহেবের ছোট ছেলে কি আন্নুর পেটে হাঁটু রাখতে চায়। সে চিৎকার করে উঠল, হালার কাওয়া আমারে ডরায় না। হালার বিবি আমারে ডরায় না ! সে বিবিকে খুন করবে ভেবে পাগলের মতো হেসে উঠল। সে হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে বলল, পোড়া হাত কি ভাল হইব আল্লা ! সে বাঁ-হাতটা কোনো রকমে ডান হাতে চোখের সামনে তুলে আনল। দেখল কব্জির চামড়া কুঁচকে গেছে। ফোলা কব্জি, কব্জিতে কানাকড়ি বাঁধা কালো তার ঝুলছে। মনে হয় এই ফেলু ঈশমের বিবির মতো পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। সে উঠোন থেকেই পাগলের মতো চিৎকার করতে থাকল, আন্নু রে, আন্নু !

তখন আবেদালির বিবি জালালি যাচ্ছে বাড়ি নিচ দিয়ে। বাঁশ ঝাড়ের নিচে শীর্ণ জালালিকে দেখে মনে হল বিলে নেমে যাচ্ছে জালালি। এখন গরীব-গরবাদের শালুক তুলবার সময়। আশ্বিন-কার্তিকে সামনের সব মাঠে আর অঘ্রান-পৌষে বিলেন জমিতে কট করে ধানের ছড়া শামুকের মুখে কেটে কোঁচড় ভরা যায়। এখন মাঠে কিছু নেই। ফাঁকা মাঠ। যব গমের ফলন হয় নি। এখন শুধু বিলে নেমে যাওয়া শালুকের জন্য। জালালি শালুক তুলতে ঝিলের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। সে জালালিকে দেখে বলল, ভাবি, আন্নুরে দ্যাখছেন নি ?

জালালি গামছাটা বগলে রেখেছে। মাথায় ওর একটা পাতিল ছিল। পাতিলটার জন্য মুখ দেখা যাচ্ছে না। পাতিলটা মাথায় ছিল বলেই হয়তো ফেলুর কথা ওর কানে যায় নি। অথবা গেলেও অস্পষ্ট। সুতরাং জালালি

পাতিলটা মুখ থেকে নামিয়ে এনে বলল, কি কও মিঞা! আমারে কিছু কও নাকি!

—আর কি কমু গ! বলে ফেলু যে ফেলু, সে পর্যন্ত গাইগরুর মতো মুখে নির্বোধের হাসি নিয়ে তাকাল।

—কিছু কইতে চাও?

—আন্নু গেছে এক শিশি ত্যাল আনতে। আইতাছে না।

জালালি বলল, আইব নে। বলে, জালালি দাঁড়াল না। সে ফের পাতিলটা মাথায় দিয়ে মাঠে নেমে গেল। বড় মাঠ সামনে। বাঁ পাশে সোনালী বালির নদী, নদীর চর। চর পার হয়ে সোজা উত্তরমুখো হাঁটলে সেই বিল। ফাওসার বিল। বিলে একবার ঈশমকে কানাওলায় ধরেছিল—এত বড় বিল এ-পরগনাতে কেন, এ-জেলাতে বুঝি আর নেই। একবার বিলের জলে কুমীর ভেসে এসেছিল, বড় এক অজগর সাপ ভেসে উঠেছিল। তারপর এই বিলের নানা রকমের কাছিমের গল্প, গজাড় মাছের গল্প এবং রাতে সপ্তডিঙা মধুকরের গল্প কিংবদন্তির মতো এ-অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। সেই বিলে জালালি যাচ্ছে শালুক তুলতে। শুধু জালালি নয়, অনেক, এমন প্রায় হাজার হবে। ওরা শালুক তুলে আনবে। ওরা ভোরে ভোরে বের হয়ে যাবে, সন্ধ্যায় ফিরে আসবে। দুঃখী মানুষেরা শীতের ভোরে শালুক তুলতে বের হয়ে যাচ্ছে। ফেলু উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল।

আবেদালি এ সময়ে দেশে চলে আসবে। বর্ষা, শরৎ, হেমন্তে সে গয়না নৌকার মাঝি, শীত, গ্রীষ্ম আর বসন্তে সে হিন্দু পাড়ায় কামলা খাটবে। এই তো গ্রাম—গ্রামে মাত্র সামু মাতব্বর মানুষের মতো চলাফেরা করতে পারছে। যত সামু মাতব্বর মানুষ হয়ে যাচ্ছে, যত হিন্দু যুবকেরা সামুকে সম্মান দিয়ে কথা বলছে, তত ফেলু সামুর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। সে যেন ফেলুর বান্দা হয়ে যাচ্ছে ক্রমে।

যেন এক মানুষ মিলে গেছে সমাজে, মাত্র এক মানুষ, যে এইসব ভদ্র হিন্দু পরিবারের মানুষদের চেয়ে কোন অংশে কম যায় না। সামু ঢাকা থেকে এলেই ফেলুর ঘুরঘুর করা বেড়ে যায়। সে ওর ভাঙা হাত সম্পর্কে নালিশ দেবার সময় ক্ষোভে-দুঃখে ভেঙে পড়ে। ভিতরে ভিতরে এইসব হিন্দু সুখী পরিবারের বিরুদ্ধে তার আক্রোশ ভয়ঙ্করভাবে পীড়ন করলে সামু যেন মোল্লা-মৌলবীর মতো কিছুটা আসানের কথা শোনাতে পারে। সামুর লীগ পার্টি—জিন্দাবাদ—আমাদের জন্য একটা দেশ চাই। এই দেশে আমাদের ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্য একটা জায়গা চাই। তারপর যে কথা শুনলে ফেলুর ঘুম চলে আসে—একদিন এ-দেশটা দুঃখী মানুষদের হয়ে যাবে। ফেলু দুঃখী মানুষ ভাবতে সে প্রায় তার গোটা স্বজাতিকে ভেবে ফেলেছিল। তার জন্য কত

রকমের জেহাদ—ধর্মযুদ্ধ চাই। তার জন্য কত রকমের বিপ্লব চাই, সামু বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়ত। আমাদের জন্য দেশ, এই দেশ মাটি ফসল সব আমাদের জন্য হবে। আমাদের সুখের জন্য হবে। অধিকাংশ মানুষ যখন আমরাই এই দেশে বসবাস করছি, তখন এই দেশ আমাদের।

সামু যখন বইয়ের ভাষায় টেনে টেনে কথা বলতে থাকে, তখন মনে হয়, ফেলুর সব ফেলে ঐ এক মানুষের পিছনে থেকে জাতির সেবা করলে কাজটা মোল্লা-মৌলবীর চেয়ে কম ধর্মীয় হবে না। কিন্তু হাত ভেঙে কি হয়ে গেল! কাকগুলি মাছের লোভে মাথার ওপর উড়ছে। সে হুস্ করল। বলল, হালার কাওয়া, আমার নাম ফেলু শেখ। সে মাথার ওপরে ডান হাতে পাটকাঠিটা ঘোরাতে থাকল।

আর তখনই বাছুরটা হাম্বা করে ডাকল। হাড় বের করা বাছুরটার মুখ দিয়ে ঠাণ্ডায় লাল পড়ছে। বাছুরটার ঠাণ্ডা লেগেছে, শীতে বাছুরটা ফুলে ঢাক হয়ে আছে। রোদে নিয়ে গেলে ফুলে থাকা ভাবটা গরমে কমে যাবে। তা'ছাড়া হাতে একটা কাজ পাওয়া গেল। এত বেলায়ও যখন আন্নু ফিরে এল না, বাছুরটা ক্ষুধায় হাম্বা করছে—ওকে নিয়ে তবে মাঠে নেমে যেতে হয়। খোঁটাতে বেঁধে দিলে কিছু ঘাসপাতা খেতে পাবে। ঘাসপাতা খেলে শক্ত হবে বাছুরটা।

আন্নু আসছে না! কি করা যায়? সে তাড়াতাড়ি ডান হাতে মাছগুলি তুলে ফেলল। ঘরের ভিতর মাছ রেখে ঝাঁপ বন্ধ করে দিল। সে বাছুর নিয়ে গোপাটে নেমে গেল। খোঁটা পুঁতে দিলে দেখল কাতারে কাতারে লোক বিলে শালুক তুলতে যাচ্ছে। সব মুসলমান বিবি, বেওয়া। ওরা এ-অঞ্চলের সব মুসলমান গ্রাম থেকে নেমে যাচ্ছে। আর এই তো সামনে বিশাল বিলেন মাঠ। হাইজাদির সরকাররা পুকুর পাড়ে বাস্তুপূজা করছে। ভেড়া বলি হচ্ছে। ঢাক বাজছে, ঢোল বাজছে।

বাস্তুপূজার জন্য ঠাকুরবাড়ির ছোট ঠাকুর বের হয়ে পড়েছে। সে হিন্দু গ্রামে উঠে সব হিন্দু গেরস্থ বাড়িতে বাস্তুপূজার তিল-তুলসী দেবে। বাস্তুপূজায় ঢাক বাজছে। পূজা-পার্বণে ঘুরে বেড়াবে, মন্ত্র পড়বে। ঈশম আজ যাবে না। সে কাল যাবে। চাল কলা এবং তৈজসপত্র সব বেঁধে আনবে।

সরকারদের বাস্তুপূজায় কত মেয়ে-বউ এসেছে নতুন শাড়ি পরে—কপালে সিঁদুরের টিপ, হাতে সোনার গহনা, পরনে গরদের শাড়ি আর ওদের কেমন মিষ্টি চেহারা—কি সুন্দর মুখ! একেবারে য্যান হেমন্তে সোনালী বালির নদীর চর। পূজা হচ্ছে পার্বণ হচ্ছে। কুটুমের মতো ঠাকুরবাড়ির বড়বৌ, ধনবৌ পুকুর পাড়ে নেমে এল। জমির বুকে ছোট এক কলাগাছ, নিচে ছোট ঘট, ঘটের ওপর নারকেল আর চারধারে সব নৈবেদ্য—যেন ভোজ্যদ্রব্যের অভাব নেই। তিলা কদমা শীতের যত খাদ্যদ্রব্য সব ওদের আয়ত্তে।

আর কি জ্বালা, জ্বালা নিবারণ হয় না জলে, জালালি জলের দিকে নেমে যাবার জন্যে মাঠের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আর কি জ্বালা, বাছুরটা কতকাল আর ঘাসে মুখ দিচ্ছে না। শীতের ঘাস—শিশিরে ভিজে আছে ঘাস। যতক্ষণ রোদ ভালভাবে না উঠবে, যতক্ষণ হিম ঘাস থেকে ভালভাবে না মরে যাবে ততক্ষণ বাছুরটা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে, ঘাসে মুখ দেবে না। সে রাগে দুঃখে বাছুরটা ঘাস খাচ্ছে না বলে পেটে লাথি বসিয়ে দিল। বাছুরটা দু'হাঁটু মুড়ে মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। কারণ ওর মনে হচ্ছিল কেবল তাড়াতাড়ি ঘাস ক'টা না খেয়ে ফেললে, এক ফাঁকে হাজিসাহেবের খোদাই ষাঁড়টা অথবা গৌর সরকারের দামড়া গরুটা এসে চেটেপুটে এই তাজা ঘাস খেয়ে ফেলবে। এই ঘাস সে যেন মাঠে নেমে আবিষ্কার করে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি বাছুরটা ঘাস খেয়ে ফেললে আর কেউ এসে ভাগ বসাতে পারবে না। কিন্তু বলিহারি যাই হালার মাগী আন্নু ভাগে এক বাছুর এনেছে! এমন এক মরা বাছুর যার কপালে সুখ নাই, গায়ে বল নাই, আছে কেবল ছড়ানো ছিটানো অথবা ধ্যাবড়ানো ঘরময়, পাড়াময়—আন্নুর কথা মনে হতেই সে সব ফেলে গাঁয়ের দিকে উঠে যাবে ভাবল। এক শিশি তেল ধার করতে এত দেরি!

দূরে ঢাক বাজছে, ঢোল বাজছে। ওর কানে বড় বেঢপ লাগছে শব্দটা। জালালিকে দেখা যাচ্ছে। অনাহারে জালালি কাতর। এখন ফাওসার বিলে নেমে যাবার জন্য প্রতাপ চন্দের ঘাট পার হচ্ছে। সে, সামনে যেসব জমি আছে, শাওড়া গাছের বন আছে তা অতিক্রম করে বেনেদের পুকুরপাড় ধরে হাঁটছে। সেই এক বিস্তীর্ণ মাঠ, মাঠের সব জমি প্রতাপ চন্দের। সেইসব জমি পার হলে ফাওসার খাল। খালের পাড়ে পাড়ে যত জমি পড়বে—পাটের, আখের, এমনকি করলার জমি, সব গৌর সরকারের। তারপর যত জমি, সব জমি হাজিসাহেবের। হাজিসাহেবের তিন বিবি, ছোট বিবির বয়স আর কত—এই এক কুড়ি চার-পাঁচ হবে। হাজিসাহেব ঈদের দিনে তিন বিবি মসজিদে নিয়ে যাবার সময় চারিদিকে নজর রাখেন। সতর্ক নজর। কেউ কিছু নজর দিয়ে গিলে ফেলল কিনা দেখেন। অন্তরালে কিছু দেখা যায় কিনা, হেই হেডা কি হইছে। নজরে লালসা ক্যান, বলে হয়তো একটা পাঁচনের খোঁচা মারেন মাইজলা বিবিরে। খোঁচা দিয়া কন, বিবিরে, অঃ সোনার বিবি, পথ দেইখা হাঁট। তখন কেবল কেন জানি মনে হয় ফেলুর, পাঁচনটা কেড়ে নিয়ে একবাড়ি হালা হালা, হাজির মাথায়। ভাবতে ভাবতে এসব, ফেলুর মাথায় খুন চড়ে যায়, ফেলু স্থির থাকতে পারে না—কেবল কি সব মনে হয়। ফেলু, যে ফেলু কোন মাতব্বর মানুষ নয়, জলে জঙ্গলে যে ফেলু মানুষ হয়েছে, যে ফেলুকে উজান থেকে হাজিসাহেব ধরে এনেছিল—উজানি নৌকাতে ধান

কাটা সারা হলে, ফেলু, হাজিসাহেবের পেটে পিঠে পায়ে রসুন গোটার তেল গরম করে মেখে দিত, সেই ফেলুর কেন জানি বড় সখ মাঝে মাঝে হাজিসাহেবের মাইজলা বিবিরে একবার বোরখায় অন্তরালে উঁকি দিয়া ছাখে।

সে গোপাটে দাঁড়িয়েছিল। বড় সেই অশ্বত্থ গাছটার নিচে বিচিত্র সব মটকিলা গাছের ঝোপ, পাতাবাহারের জঙ্গল। শীতকাল বলে জঙ্গলের ভিতরটা শুকনো খটখটে। ভিতরে ঢুকে গোসাপের মতো ঝোপের ভিতর সন্তর্পণে পড়ে থাকলে হয়তো মাইজলা বিবিরে দেখা যাবে—কারণ, ও-পাশটায় হাজিসাহেবের অন্দরে পুকুর। ঝোপের ভিতর থেকে উঁকি দেবার আগে চারপাশটা সে দেখে নিল। বাঁদিকে আবেদালির ঘর, কেউ এখন ঘরে নেই। আমগাছটার নিচে ভাঙা ঘর এখন খালি। দক্ষিণ-দুয়ারী ঘরে সেই কবে জোটন বাস করত, এখন জোটন নেই বলে বর্ষার বৃষ্টিতে ঝড়ে ঘরটা একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। কিছু ঝোপজঙ্গল, বেতগাছ আবেদালির বাড়িটাকে সব সময় অন্ধকার করে রাখে। কোন রকমেই শীতের সূর্য আবেদালির উঠোনে নামতে চায় না।

আর এইসব ঘর উঠোন এবং ঝোপজঙ্গল পার হলেই—হাজিসাহেবের আতাবেড়ার ওপাশে তিন বিবির গলা কাচের চুড়ির মতো জলতরঙ্গ বাজিয়ে চলছে। কি হাসে! হাসতে হাসতে মনে হয় হালার দুনিয়া গিলা ফ্যালবে। সিঁথিতে বড় লম্বা টান ধানখেতের সাদা আলের মতো। আর ডুরে শাড়ি হাঁটুর নিচে বেশিদূর নামতে চায় না। ঝোপের ভিতর থেকে ফেলু মরিয়া হয়ে এবার উঁকি দিল। হাত পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে, ডান হাতটা কোনরকমে কাজে লাগছে এখনও, কবে এই হাত পর্যন্ত পঙ্গু হয়ে যাবে—সে প্রায় একটা মরা সাপের মতো ঝোপের ভিতর পড়ে থাকল। ঝোপের পাশ দিয়ে ঘাটের পথ। হাজিসাহেবের অন্দরের পুকুরের পানি কি কালো। পানি দেখলেই বিবি-বৌদের পেটে জ্বালা ধরে। তলপেটটা শিরশির করতে থাকে। কালো পানির টানে চুপি চুপি সময়ে-অসময়ে মাইজলা বিবি ঘাটে নেমে আসে। এলেই খপ করে হাত ধরে ফেলবে, ধরে ঝোপের ভিতর টেনে—ফেলু আর অপেক্ষা করতে পারল না। সে কচ্ছপের মতো এবার গলাটা তুলে ধরল। সে মরা সাপের মতো বেশি সময় শিকারের আশায় ঝোপের ভিতর পড়ে থাকতে পারছে না।

যখন মন খুশিতে উজান বয় না তখন ডাকে আন্নু। আর যখন উজানে মন নদীর মতো মাতাল তখন ডাকে, আন্নু বেগম। পেট পুরে খেতে পারলে ডাকে বেগমসাহেবা। ফেলু বেগমসাহেবার জন্য পাগল, আর পাগল এই মাইজলা বিবির দুই সুরমাটানা চোখের জন্য। ঘাট থেকে তাড়িয়ে দেবার পর এই অশ্বত্থের ঝোপ ওর মতো মিরালম্ব মানুষের সামান্য আশ্রয়। সে ঝোপের ভিতর একটা মরা গো-সাপের মতো সেই থেকে পড়ে আছে—মাইজলা বিবি এ-পথে এখনও ঘাটে এসে নামছে না।

এখন শীতের দিন। জমি থেকে সব ফসল উঠে গেল বলে মাঠ ফাঁকা। কেবল নরেন দাস অথবা মাঝি-বাড়ির শ্রীশচন্দ্র, প্রতাপ চন্দ কামলা দিয়ে নিচু জমিতে তামাকের চাষ করছে। আর সব উর্বরা জমি থাকলে সেখানে পেঁয়াজ, রসুন এবং চিনাবাদামের গাছ দেখা যাচ্ছে। এই পথে কেউ বড় এখন আসবে না। এলেও ঝোপের ভিতর যে একটা মানুষ শিকারি বেড়ালের মতো ওৎ পেতে আছে টের পাবে না। জালালির শরীরটা এখন মাঠের শেষে অদৃশ্য হয়ে গেছে। পুবের বাড়ির মালতী গরু নিয়ে এসেছে গোপাটে। সে গোপাটে গরুর খোঁটা পুঁতে চলে যাচ্ছে।

সরকারদের ঘাট পাড়ে তেমনি ঢাক বাজছে, ঢোল বাজছে। মাঠে মাঠে বাস্তুপূজার নিশান উড়ছে। ঠাকুরবাড়ি, পালবাড়ি এবং বিশ্বাসপাড়া যেদিকে তাকানো যাচ্ছিল সব দিকে সেই ঢাক-ঢোলের বাজনা আর মেষ অথবা মোষের আর্তডাক। মোষ বলির সময় হলে সরকারদের পঞ্চাশজন ঢাকি একসঙ্গে ছররা ছোটাবে। সে এবার একটু কাত হয়ে গলাটা কচ্ছপের মতো যেন বাড়িয়ে দিল। মনে হল মাইজলা বিবির মুখ শরীর ঝোপের অন্য পাশে—ঠিক ঘাটের পথে নেমে আসতে ভেসে উঠেও উঠল না। মরীচিকার মতো ঝিলিমিলি করছে শুধু। আহা, ভেতরটা কেমন করছিল ফেলুর।

তখন হাইজাদির সরকারেরা করজোড়ে গামছা গলায় দাঁড়িয়ে আছে। মোষের চামড়া এবং মাংস নিতে যারা শীতলক্ষ্যার পার থেকে এসেছিল, তারা ঘাটের অন্য পাড়ে দাঁড়িয়ে। মাঠে মাঠে উৎসব আর ঝোপের ভিতর ফেলু। সে মাইজলা বিবির মরীচিকা দেখার জন্য ঝোপের ভিতর কচ্ছপের মতো গলা তুলে রাখল।

মালতী গোপাটে গরুর খোঁটা পুঁতে তাড়াতাড়ি শোভা আবুকে নিয়ে ঠাকুরবাড়ির ঘাটে স্নান করতে চলে গেল। বাস্তুপূজা বলে সকাল সকাল আভারাণী স্নান করেছে। মাঠে অমূল্য কলাগাছ পুঁতে এসেছে এবং দূর্বাঘাস চেঁচে চারিদিকটা পরিচ্ছন্ন করে শুকনো আমের ডাল বেলপাতা সব পেড়ে এনে বারকোষে রেখে দিয়েছে। গোটা তিনেক জমি পার হলে ঠাকুরবাড়ির ভিটা জমি। সেখানে বড়বৌ ধনবৌ সকাল সকাল স্নান করে চলে এসেছে। সোনা ঠাকুরঘর থেকে কাঁসি নিয়ে ছুটছে। সোনা কাঁসিটা জোরে জোরে বাজাচ্ছিল। পুকুরের জলে কচুরিপানা, কলমিলতা এবং শীতের সময় বলে গাছে কোন ফল নেই, ফুল বলতে কিছু শীতের ফুল ঝুমকো লতা, শ্বেত জবা, রাঙা জবা। বাস্তুপূজায় রাঙাজবা দিতে নেই। শ্বেতজবা কে ভোর না হতেই গাছ থেকে

চুরি করে নিয়ে গেছে। বড়-বৌ সাজিতে সামান্য ফুল সংগ্রহ করতে পেরেছেন। খুঁজে-পেতে কিছু শ্বেতজবা, কিছু অতসী ফুল আর ঝুমকো লতা। বেলফুল কিছু আছে। শীতের জন্য ফুলগুলি তেমন ফোটে না ভাল, ফুলগুলি কুঁকড়ে আছে—অসময়ের ফুল বড় হতে চায় না।

তখন জালালি সমস্ত গরীবদুঃখী মানুষের সঙ্গে সেই বড় বিলে, প্রকাণ্ড বিলে—এ-পাড়ে দাঁড়ালে যার ওপার দেখা যায় না, যে বিলে ভিন্ন ভিন্ন সব কিংবদন্তি রয়েছে, বিলের চারপাশে দলখাগড়ার বন, মাঝে মাঝে উঁচু ডাঙা, আবার দু'দশ একর নিয়ে গভীর জল, কালো জল বড় গভীর—সেখানে মানুষ যেতে নৌকা বাইতে ভয়, তেমন বিলে নেমে যাচ্ছে জালালি। জলের ভিতর কি এক দৈত্য থাকে বুঝি, কিংবদন্তির দৈত্য। ওর পেট পিঠ জ্যোৎস্না রাতে ময়ূরপঙ্খী নৌকার মতো। নৌকা যেন এক জলে ভাসে, জলে ভেসে নৌকা যায়, ময়ূরপঙ্খী ভেসে যায় তারপর মানুষের সাড়া পেলে টুপ করে জলের নিচে ডুবে যায়—হায়, মানুষের অগম্য বুদ্ধি। অজ্ঞ মানুষের বিশ্বাস, অলৌকিক ঘটনার মতো ঘটনা নেই। দুপুর রাতে চরাচরে যখন মানুষ জেগে থাকে না, যখন সারা বিলটা পাঁচ-দশ ক্রোশ জুড়ে জলের ভিতর ডুবে থাকে, যখন জ্যোৎস্নায় ফসলের মাঠ ভরে থাকে তখন জলে এক ময়ূরপঙ্খী নাও ভাসে—ভিতরে রাজকন্যা এক, চাঁদ বেনের পুত্রবধূ হবে হয়তো, বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের পাঁচালি মানুষের প্রাণে বিহ্বলতা জাগায়।

নৌকা বিলের জলে ভেসে উঠলে আলোতে আলোময়। যেন মাঝ বিলে আগুন ধরে গেছে। তেমন বিলে নেমে যাবার আগে জালালি জলটা প্রথম মাথায় দিল, পরে মুখে জল দিল, তারপর গোসাপের মতো জলে ভেসে গেল। শীত কন্‌কন্‌ করছে—কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, জ্বালা নিবারণ হয় না জলে। কবে আবেদালি গেছে, মাস পার হয়ে যাবে প্রায়, ঘুরে এল না এখনও। এলেও দু'চার হপ্তা পেট পুরে খাওয়া। তারপর ফের উপোস। জালালি জলে ভাসতে থাকল। ফুং করে জল মুখে নিয়ে হাওয়ার ভিতর জল ছুঁড়ে দিতে থাকল।

সব মানুষ সাঁতার কেটে যেখানে শাপলা-শালুকের পাতা ভেসে আছে সেদিকটায় চলে যেতে থাকল ক্রমশ। বড় শালুকের জন্য সকলের লোভ বেশি। এ-জলে কি আছে কি নেই, কেউ বড় জানে না। বরং কি নেই, কি থাকতে না পারে এই বিস্ময়। সেই এক সালে হাজার হাজার মানুষ পুরীপূজার মেলা থেকে ফিরে আসার সময় দেখেছিল—বিলের ঠিক মাঝখানে কালো রঙের এক মঠ ভেসে উঠেছে। ভেসে উঠতে উঠতে কিছু ওপরে উঠে থেমে গেল। তারপর ফের নিচে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রায় স্বপ্নের মতো ব্যাপারটা। যারা দেখেছে, তারা মন্ত্রের মতো বিশ্বাস করেছে, যারা দেখে নি তারা আজগুবি

গল্প মনে করেছে। আর যাদের অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস আছে তারা, খবরটাকে নিয়ে নতুন কিংবদন্তি সৃষ্টি করেছে। মনে হয় বুঝি ঈশা খাঁ সোনাই বিবিকে নিয়ে এ-বিলে লুকিয়ে রয়েছে। সেই জাহাজের মতো ময়ূরপঙ্খীর হালের দাঁড় কালো রঙের মঠের মতো জলের ওপর ভেসে ওঠে মাঝে মাঝে। শুধু একটু দেখিয়েই যেন ডুব দেয়। যেন বলে, ভাখো, ভাখো আমি এখনও বুড়ো বয়সে সোনাইরে নিয়ে বড় সুখে আছি বিলের ভিতর। তোমরা আমার অনিষ্ট করলে, আমিও তোমাদের অনিষ্ট করব। সেই ভয়ে ভরা ভাদরে সোজা বিলের মাঝে কেউ নৌকা ছাড়ে না। এ-বিলে বড় ভয়ঙ্কর। বিলের তল নেই, জলের নিচে মাটি নেই। শুধু যেন অন্ধকার আর প্রাচীন সব লতাগুল্ম নিয়ে চুপচাপ জলের ভিতর ডুবে আছে। ভয়ে এ বিলে কেউ নৌকায় বাদাম দেয় না। বড় নিভৃতে যেতে হয়, যেন ঈশা খাঁর কাল ঘুম ভেঙে না যায়।

অঞ্চলের মানুষেরা এ-বিলকে দানবের মতো ভয় পায়। ঈশম যে ঈশম, সে পর্যন্ত এ-বিলের পাড়ে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। কি এক জীনপরী পিছু লেগে ওকে রাতের বেলায় অজ্ঞান করে দিয়েছিল। সেই বিলে গরীবদুঃখী মানুষেরা পেটের জ্বালা নিবারণের জন্য জলে নেমে গেল।

পেটের জ্বালা বড় জালা, জ্বালা মরে না জলে। জলের ভিতর ভেসে ছিল জালালি, যেন নেমে গেলেই পেটের জ্বালা নিবারণ হবে। কিন্তু হায়, জলের ভিতর কাদার ভিতর কোথাও শালুকের গন্ধ নেই। রোজ রোজ তুলে নিয়ে গেলে কি আর থাকে! কিছু মরা শাপলা পাতা সামনের জলে উল্টে আছে। শীতের দিনে শাপলা ফুল আর ফোটে না। শাপলা ফুলে কালো কালো ফল হয়েছে। সে দুটো ফল সাঁতরাতে সাঁতরাতে সংগ্রহ করে ফেলল। এবং জলের ভিতরই জালালি ভাসতে ভাসতে খেতে থাকল। ভিতরে এক ধরনের কালো কালো বীচি, এক ধরনের সোঁদা সোঁদা গন্ধ, স্বাদ বলতে মরি মরি কিছু না, খেতে হয় বলে খাওয়া। পেটের ভেতর জ্বালা থাকলে কি খেতে না সখ যায়। লাল আলুর মতো সেদ্ধ করে খেতে হয় শালুকের ভিতরটা। একটু নুন দিয়ে, কোন কোন সময় তেঁতুলের অল্প গোলা ফেলে দিলে প্রায় অমৃতের মতো স্বাদ। লোভে সাঁতার দিতে থাকল জালালি। সামনে দুটো শালুক পাতা জলের ভিতর ডুবে আছে। লতা দুটো ধরার জন্য সে জলের ভিতর ডুব দিল। জলের নিচে নেমে গেল। অনেক নিচে, লতা ধরে ধরে আলগোছে তা ধরে ধরে—জোরে টান দিলে লতাটা ছিঁড়ে যাবে, লতা ছিঁড়ে গেলে সব গেল, জাদুর ঘরে নেমে যাবার সিঁড়িটা তুলে নেবার মতো হবে। সুতরাং খুব সন্তর্পণে জলে ডুবে যাবার জন্য, অন্ধকার মাটিতে হাতড়ে বেড়ানোর জন্য ডুবুরির মতো বুড়বুড়ি তুলে প্রায় হারিয়ে গেল। জলের নিচে বড় ভয়। ভয়ে চোখ খুলছে না জালালি। চোখ খুললেই মনে হয় কোন

জাদুকরের দেশে সে পৌঁছে গেছে। জলের নিচে জলজ ঘাসেরা তাকে নেচে নেচে ভয় দেখায়। নীল অথবা সবুজ মনে হতে হতে একটা কালো কুৎসিত অন্ধকার চারপাশে ঢেকে ফেলে। সে এক শ্বাসে জলের নিচে ডুবে নিমেষে জল কেটে ওপরে ভেসে উঠল। তারপর, কত দীর্ঘকাল পর যেন আকাশ মাটি এবং সূর্য দেখতে পেয়েছে এমন নিশ্চিন্তে শ্বাস নেবার সময় মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে—সোনার চেয়েও দামী একটা বড় শালুক ওর হাতে।

পাতিলটা ঢেউ খেয়ে একটু দূরে সরে গেছে। সে পাতিলটাকে টেনে এনে শালুকের শেঁকড়গুলি প্রথম কামড়ে ছিঁড়ে দেখল শালুকটা যত বড় ভেবেছিল—ঠিক তত বড় নয়। শালুকটা বোধ হয় রক্ত শাপলার। পেতি শাপলার শালুক বেশ মিষ্টি। সাদা শাপলার শালুকে কষ বেশি। রক্ত শাপলার শালুক অল্প তিতাভাব থাকে। তবু শালুকটাকে পরিচ্ছন্ন করে খুব যত্নের সঙ্গে পাতিলের ভিতর রেখে পাড়ের দিকে তাকাল কেউ আর পাড়ে দাঁড়িয়ে নেই। যে যার মতো শালুকের খোঁজে জলে ভেসে দূরে চলে যাচ্ছে। আবেদালি আসে না, কতকাল আসে না, সেই কবে গয়না নৌকায় মাঝি হয়ে চলে গেল—আর আসে না। জব্বর আসে না। সে বাবুর হাটে তাঁতের কাজ নিয়ে চলে গেছে। জোটন এসেছিল একটা মুরগী নিয়ে আবেদালিকে খাওয়াবে বলে, মুরগীটা উড়াল দিয়ে সেই যে হাজিসাহেবের বাড়িতে চলে গেল, আর এল না। হাজি সাহেবের ছোটবিবি কোতল করে ফেলল মুরগীর গলাটা।

বিলের জলে দুঃখী মানুষেরা শালুকের খোঁজে ভেসে বেড়াচ্ছিল। চার পাশের গ্রাম থেকে দুঃখী মানুষেরা হেঁটে এসে নেমে গেল জলে। বেলাবেলিতে সকলে জল ছেড়ে উঠে যাবে। এই শীতের শেষে আর যখন শালুক থাকবে না, যখন জলের ওপর আর কোন শালুক পাতা ভাসবে না অথবা এই বিলের জল শান্ত নিরিবিলি, তখন ঝোপেজঙ্গলে অথবা জলের ওপর বালিহাঁস ভাসবে। নানা রকমের পাখি, লাল-নীল পালকের পাখি, জলপিপি এবং ভিন্ন ভিন্ন সব বক ছোট বড় চকাচকিতে প্রায় বিলটা ছেয়ে যাবে। তখন মুড়াপাড়ার জমিদারবাবুর ছেলেরা হাতিতে চড়ে আসবেন, তাঁবু ফেলবেন বিলের ধারে এবং ভোরে অথবা জ্যোৎস্নায় পাখি শিকার করে তাঁবুতে পাখির মাংস, ওরা শীতের শেষে মাসাধিক কাল পাখির মাংসে বনমহোৎসব চালাবে।

গ্রীষ্মকালটাই জালালির বড় দুঃসময়। প্রায় মাটিতে পেট দিয়ে পড়ে থাকতে হয়। বর্ষা এলে ধানের জমিতে পাটের জমিতে আবেদালির কাজের অন্ত থাকে না। বর্ষা শেষ হলে জল কমতে থাকলে, শাপলা ফুল ফুটতে থাকলে মাটির নিচে অন্নের মতো প্রিয় এই শালুক, দুঃখী মানুষদের, নিরন্ন মানুষদের একমাত্র সম্বল এই শালুক, বর্ষা এলেই মাটির ভিতর জন্ম নিতে থাকে। এই জলা জমি আর মাটির অন্তরে শালুক আপনার প্রিয় ধন—যেন ফেলতে নেই,

অবজ্ঞা করতে নেই। বসে থাকলে পাপ; ভেসে বেড়ালে পুণ্য। জালালি পাতিলটার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে বেড়াতে থাকল। ডুব দিলে তখন অন্য কেউ হাত বাড়িয়ে পাতিল থেকে শালুক তুলে নিতে পারে।

সামনে শুধু জল, প্রায় অনন্ত জলরাশি। শালুকের লোভে সে খুব দূরে চলে এসেছে। বোধ হয় এর পর আর শালুক নেই। ডান দিকে পদ্মফুলের বন। বাঁ দিকে স্ফটিক জল। সামনের জলে কি যেন সব ভেসে বেড়াচ্ছে। কি হবে আর—বড় গজার মাছ হবে হয়তো। বড়-বড় মাছ, থামের মতো লম্বা গজার মাছ। কালো কুচকুচে, মাথায় মুখে লাল সিঁদুর গোলা রঙ, গায়ে অজগর সাপের মতো চক্র। ওর ভয় লাগছিল। তবু মনে হয়, ভয়ে হোক বিস্ময়ে হোক কেউ এতদূর আসে নি। কেউ আসে নি বলেই বোধ হয় কিছু ইতস্তত শালুক এখনও পড়ে আছে। সে ভয় থেকে রেহাই পাবার জন্য চোখ বুজে জলের নিচে ডুব দিল। কিন্তু জলের নিচে চোখ খুলতেই মনে হল—বড় একটা গজার মাছ ওর দিকে তাকিয়ে আছে। লেজ নাড়ছে। স্থির। গজার মাছটা জালালিকে দেখছে। জলের নিচে আজব একটা জীব, বোধ হয় মনুষ্যকুলের কেউ হবে—প্রায় ব্যাঙের মতো নিচে নেমে আসছে। প্রাচীন সব জলজ ঘাস এবং গুল্মলতা—লতার ভিতর মাছটা মুখ বার করে রেখেছে। জালালি চোখ খুললেই শুধু মাছটার মুখ দেখতে পাচ্ছে। কালো ভয়ঙ্কর মুখ একবার হাঁ করছে, আবার জল গিলে মুখ বন্ধ করছে। জালালিকে মাছটা এতটুকু ভয় পাচ্ছে না। বরং জালালিকেই ভয় পাইয়ে দিচ্ছে।

হায়, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, জ্বালা সহে না প্রাণে। ভয়ে বিস্ময়ে জালালি জলের নিচে এতটুকু হয়ে আছে। তবু লোভ সামলাতে পারল না জালালি। আর একটু নিচে গেলেই মাটিতে হাত লেগে যাবে এবং শালুকটা আয়ত্তে চলে আসবে। দমে আসছিল না। সে তাড়াতাড়ি শ্বাস নেবার জন্য জল কেটে ভেসে উঠল। দম নিল, একটু সময় ভেসে থেকে বিশ্রাম নিল। ফের ডুবে জলের নিচে চলে যেতে থাকলে দেখতে পেল, সবুজ এক দেশ, নীল জলের গালিচা পাতা। অন্ধকার, ক্রমে অন্ধকার আরও ঘন হয়ে আসছে। তারপরই লতার গোড়ায় ঠিক মাটিতে যেখানে শাপলা পাতার লতা এসে থেমে গেছে সেখানে হাতটা ঠেকে গেল। অন্ধকারেও টের পাচ্ছিল জালালি, মাছটা মুখ হাঁ করে এগিয়ে আসছে। অতিকায় মাছ। তবু একটা মাছ, সে যত অতিকায় হোক, বড় হোক, সে মাছ। একটা মাছ, সামান্য মাছ, তুমি মাছ যত বড়ই হও—আমি মনুষ্যকুলে জন্মে তোমাকে ভয় পাব! বোধ হয় সে এমন কিছু ভাবতে ভাবতে শালুকের গোড়া চেপে ধরল। তারপরও সে দেখল মাছটা সবুজ রঙের ঘাসের ভিতর মুখটা নাড়ছে। খুব সন্তর্পণে নাড়ছে আর জালালিকে দেখছে। জালালির শালুকটা হাতে পেয়ে সাহস বেড়ে গেল। সে ভ্রূক্ষেপ করল না।

সে আর একটু এগিয়ে গেল। মাছটা এবার পিছু হটে যাচ্ছে। সে এব আর দেরি করল না। যখন মাছটা ভয় পেয়ে যাচ্ছে তখন আর ডুবে থে কি হবে। সে ফোঁস করে জল কেটে শুশুকের মত পিঠ ভাসিয়ে দিল।

সেই কবে একবার জালালি জলের নিচে হাঁস চুরি করে গলা টিপে ধরেছি কবে একবার মালতীর পুরুষ হাঁসটাকে ঝড়ের রাতে পুড়িয়ে নরম মাংস এ ঠ্যাং চিবিয়ে আল্লার দুনিয়া বড় সুখের ভেবে বড় একটা ঢেকুর তুলেছিল- এখন শুধু তার কথা মনে আসছে। সেই মৃত হাঁসটার মতো মাছ, মাছট চোখ সারাক্ষণ জলের নিচে স্থির হয়ে ছিল। যেন এক বড় অজগর সাপ ও গিলতে আসছে এমন মনে হল। কিন্তু সাপ হলে সব জায়গাটা এতক্ষ প্লাবনের মতো তোলপাড় হতে আরম্ভ করত। এত স্থির থাকত না। সে এটা মনের ভয় ভাবল। জলের নিচে চোখ খুললেই মনে হয় সব বিচিত্র গাছগাছা যেন প্রাণ পেয়ে তার দিকে ধেয়ে আসছে। সে সহজে সেজন্যে চোখ খুলে চায় না।

সবুজ রঙের কদম ফুলের মতো ঘাসের অন্ধকারে জালালি বুঝতে পারে কি তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে বেশ সুখে একটার পর একটা ডুব দি গভীর জলের ভিতর চলে যেতে থাকল। ঠিক ডুবুরীর মতো জলের নি ডুবে যাচ্ছে, জলের ওপর ভেসে উঠছে। তেমন অসংখ্য মানুষ এখন পা দাঁড়ালে দেখা যাবে, জলের ভিতর তারা ডুবে যাচ্ছে, জলের ওপর ভে উঠছে। কখনও শালুক পাচ্ছে, কখনও পাচ্ছে না। আর ঠিক কখন পা কেউ বলতে পারছে না। সব শাপলালতার গোড়ায় শালুক থাকে না। ফ দলটা বিলের জলে ছড়িয়ে পড়ছিল। সূর্য ওপরে উঠে গেছে। দূরে চো মেলে তাকালে, শুধু গভীর জল—শান্ত এবং কালো। সেখানে এক শীত ঠাণ্ডা ঘর রয়েছে যেন। ওপার দেখা যাচ্ছে না। অনন্ত জলরাশি ক প্রাচীন কাল থেকে ভিন্ন-ভিন্ন কিংবদন্তি নিয়ে বিলের ভিতর ভেসে বেড়াচ্ছে। শীতের সময় জলের রঙটা আরও কালো হয়ে ওঠে। শীতের সময় চারপাশে নলখাগড়ার ঝোপ থেকে পাখিরা অন্যত্র উড়ে যায় এবং ঝোপের ভিত যেখানে জল থেকে জমি ভেসে উঠেছে সেখানে বিষাক্ত সাপেরা গর্তের ভিত মরার মতো শীতের ঠাণ্ডায় পড়ে থাকে। গ্রীষ্মের জন্য, বর্ষার জন্য ওদে প্রতীক্ষা। বর্ষা জলে পড়লেই অথবা বসন্তকালে যখন সূর্য মাথার ওপর কির দেয় তখন বিষাক্ত সাপ সব মাঠ থেকে জলে নেমে যায়। জলের ওপর ভেসে বেড়ায়। দূরের গজারী বন থেকে তখন কিছু ময়াল সাপ পর্যন্ত এই জলে নেমে আসে। জালালি জলের ভিতর দেখছিল লাল চোখ দুটো ওর দিকে সারাক্ষ তাকিয়ে থাকছে। কিছুই স্পষ্ট নয়। কারণ অন্ধকার বড় প্রকট জলে গভীরে। নীল অথবা সবুজ রঙের ঝোপের ভিতর যদি আরও দুটো শালুব

খুঁজে পাওয়া যায়—প্রলোভনে জালালি একটা পাতিহাঁস হয়ে গেল আর জলের ভিতর ডুবে-ডুবে লাল চোখ দুটোকে মরণ খেলা দেখাতে থাকল।

তখনও ফেলু ঝোপের ভিতর শুয়ে আছে। নেমে আসছে, আসছে না। এলেই খপ করে ধরে ঝোপের ভিতর টেবে নেবে। কামরাঙা গাছের ছায়ায় বিবির শরীর দেখা যাচ্ছে, যাচ্ছে না। এদিকে রোদ মাথার ওপর উঠে এল। অথচ বিবির মুখ দেখা গেল না, অঙ্গ দেখা গেল না। মাঠের ভিতর বাস্তুপূজার ঢাক-ঢোলের বাজনা কখন থেমে গেছে। পুকুরপাড়ে বড়বৌ। সোনা মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে কথা নেই বার্তা নেই কাঁসি বাজাচ্ছে—ট্যাং ট্যাং! পূজা পার্বণ শেষ। এখন সব তিল তুলসী, বারকোষ, নৈবেদ্য এবং তিলা কদমা আর অন্যান্য ভোজ্যদ্রব্য বাড়ি নিয়ে যাওয়া। বড় সাদা পাথরে পায়েস—ধনবৌ সাদা পাথরে পায়েস নিয়ে যাচ্ছে। ফল-ফুল, নতুন গামছা, ঘট আর নারকেল নিয়ে যাচ্ছে রঞ্জিত। মাঠের ভিতরই প্রসাদ বিতরণ হচ্ছে। গ্রামের যুবা পুরুষেরা, বৃদ্ধ, বৃদ্ধারা প্রসাদ নিয়ে চলে যাচ্ছে। তারপর হ্যাজাকের আলো জ্বলবে রাতে। সরকাররা পুকুরের পাড়ে চার পাঁচটা হ্যাজক জ্বালাবে। পথের ওপর ডে-লাইট জ্বলবে। তখন মাঠে-মাঠে আরও সব হ্যাজাকের আলো, আলোতে এই মাঠ এবং গ্রাম সকল এক সময়, মাত্র এক রাত্রির জন্য ডুবে থাকবে আর ভেড়ার মাংস এবং আতপ চাউলের সুগন্ধ মাঠময় কী যে গন্ধ ছাড়াবে! ফেলুর জিভে জল এসে গেল। রঞ্জিত এখন অন্য জমিতে মালতীকে দেখছে। মালতী বড় ব্যস্ত। সে কিছু লোককে বসিয়ে খিচুড়ি পায়েস খাওয়াচ্ছে। শীতের রোদে বেশ আমেজ আসছিল। উত্তুরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেশ শীত-শীত ভাব। সকলে পেট পুরে খেয়ে রোদের ভিতর ঘাসের ওপর যেন প্রায় গড়াগড়ি দিচ্ছে।

আর সোনা তখন কাঁসি ফেলে গোপাট ধরে ছুটছে। ফতিমা গোপাটে ছাগল দিতে এসে ইশারাতে সোনাকে ডাকল। যেন ফতিমা শীতের ঠাণ্ডায় একটা কচ্ছপ আবিষ্কার করে ফেলেছে। কচ্ছপটাকে ধরার জন্য সে সোনাকে ডাকছে। এখন শীতকাল। শীতের জন্য কচ্ছপেরা বেশিক্ষণ জলে থাকতে পারে না। পাড়ে উঠে রোদ পোহায়। অথবা জমির ভিতর কচ্ছপেরা লুকিয়ে থাকে। লাঙলের ফালে মাটির ভিতর থেকে কচ্ছপ উঠে আসতে পারে। কিন্তু ফতিমা সোনাকে সে-সবের কিছুই দেখাল না। অশ্বত্থ গাছটার নিচে সোনাকে টেনে নিয়ে গেল। ঝোপের ভিতর কি আছে ছাখেন। বলে ফতিমা চুপি দিল। বুঝি মানুষ হবে, পাগল ঠাকুর হবে। ফতিমা অন্তত তাই ভেবেছিল। সোনাবাবুর পাগল জ্যাঠামশাই যিনি রাত-বিরাতে, কোনদিন খুব ভোরবেলা উঠে মাঠ পার হয়ে, সোনালী বালির নদী পার হয়ে

নিরুদ্দেশে চলে যান, সেই মানুষই হয়তো আজ বেশি দূর না গিয়ে এই অশ্বত্থের নিচে মটকিলা ঝোপের ভিতর শুয়ে শুয়ে পাখির সঙ্গে গল্প করছেন। ছোট মেয়ে ফতিমা, সামুর একমাত্র মেয়ে ফতিমা জানে না—এই মানুষ পাগল মানুষ নয়, এ অন্য মানুষ ফেলু শেখ। ফেলু শেখ এখনও চুপচাপ সেই পরানের চেপে প্রিয়, মরণে যার স্মৃতি ভোলা দায়—সেই এক পরমাশ্চর্য যুবতীর খপ করে ঝোপের ভিতর টেনে নেবার জন্য আত্মগোপন করে আছে।

সোনা ঝোপের ভিতর উঁকি দিয়ে ডাকল, জ্যাঠামশায়। কারণ যখন সব দেখা যাচ্ছে তখন পাগল মানুষ ব্যতীত আর কে হবে! এই অঞ্চলে তিনিই তো একমাত্র মানুষ যাঁর কাছে এই মাঠ, গাছগাছালি এবং পরবের দিনে উৎসব সব সমান।

ফেলু এত নিবিষ্ট যে কতক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছে খেয়াল নেই। কার যেন গলা, কে যেন ঝোপে উঁকি দিয়ে পিছনে ডাকছে। হাত পিঠ মুখ ফেলুর দেখা যাচ্ছে না। ঘন ঝোপের বাইরে শুধু পা দুটো দৃশ্যমান, এই পা দেখে ধনকর্তার ছোট পোলা টের পেয়েছে মানুষ আছে ঝোপের ভিতর। ওরা এখন হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকছে। আগে সোনা পিছনে ফতিমা। সে তাড়াতাড়ি ধড়ফড় করে উঠে গেল। ঝোপ থেকে পাগলের মতো ছুটে বের হয়ে যাবে ভাবল, কিন্তু তাড়াতাড়ি করলে ধরা পড়ে যাবে, সে কি যেন হাতড়াতে থাকল ওর কি যেন হারিয়ে গেছে।

সোনা এবং ফতিমা বুঝতেই পারে নি, এমন একটা নীরস মানুষ ঝোপের ভিতর লুকিয়ে থাকতে পারে। সোনা বলল, আপনে!

ফেলুর কি হারিয়ে গেছে এমন চোখেমুখে। সে বলল, ঝোপের ভিতর শিকড়-বাকড় খুঁজতাছি।

—কি হইব?

—হাতটা জোড়া লাগব।

সোনা বলল, পাইলেন নি?

—না রে কর্তা, পাইলাম না। কৈ যে সব লুকাইয়া থাকে, বলে ফেলু ফতিমার দিকে কটমট করে তাকাল। ঝোপের ভিতর ফতিমা এবং সোনা। ফেলু সোনাবাবুকে কিছু বলল না। শুধু ফতিমার দিকে তাকিয়ে মনে-মনে গজরাতে থাকল, সামু মাইয়াটারে বড় আসকারা ত্যায়। মাইয়াটারে ইংরাজী শিখায়। এত অধর্ম ভাল নয় মনে হল ফেলুর। আর সঙ্গে সঙ্গে পাগল ঠাকুরের মুখ ভেসে ওঠে, মুখ ভেসে উঠলেই ভিতরের সেই অধর্মটা জেগে ওঠে। হাতের দিকে তাকালে দুঃখের সীমা থাকে না। ফেলুর প্রতিপত্তি কমে যাচ্ছে। সেই যে বিবি আন্নু, সে পর্যন্ত তেলের নাম করে হাজিসাহেবের ছোট বিবির কাছে চলে গেল। ছোট বিবির কাছে গেল কি ছোট সাহেবের কাছে গেল

কে জানে! এখনও সে ফিরছে না। ফেলু তাই ভাবল, একটু তাড়াতাড়ি করা যাক। বিবির কথা মনে হতেই সে পা চালিয়ে হাঁটল। তাড়াতাড়ি করতে গেলে বড় বাগের ভিতর দিয়ে সোজা উঠে যেতে হয়। পথ নেই, শুধু বাঁশের জঙ্গল। কিছু বেতগাছ এবং চারপাশটা অন্ধকার। দিনের বেলায় হেঁটে যেতে পর্যন্ত গা ছমছম করে। পাশেই গ্রামের কবরখানা। ফেলু হনহন করে হাঁটছিল। বাঁ হাতে একেবারেই শক্তি নেই। কব্জিতে মন্ত্রপড়া কড়ি ঝুলছে। যদি বিবি এখনও সং করে বেড়ায় সে বিবির পেটে এক লাথি মারবে। তার শরীর এবং দাঁত শক্ত হয়ে যাচ্ছে। আর তক্ষুনি দেখল বিবি তার বাগের অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসছে। কিন্তু হাতটা, হায় হাতটা—পঙ্গু হাত নিয়ে সে কিছু করতে পারল না। বাগের অন্ধকার থেকে বের হতেই সে মুখের উপরে ভয়ঙ্কর চিৎকার করে উঠল, তুই আন্নু।

আন্নু দাঁড়াল না। এমন মানুষটাকে সে আর ভয় পায় না। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় বলল, তুমি মানুষটা ক্যামনতর! কইলাম হুস্ করতে কাওয়া আর তুমি বাগের ভিতর ঘোরতাছ।

—তুই এহানে ঝোপেজঙ্গলে কি করতাছস?

—সঙের লাইগ্যা তোমারে খোঁজতাছি।

—অঃ। বিবিটাও ইতর কথা কইতে শিখা গ্যাছে। কারে লাথি মারে ফ্যালু। নিজের পেটে লাথি মারে! ফেলু রাগে দুঃখে নিজের পেটেই একটা লাথি মারতে চাইল। বিবিটা পর্যন্ত ধরে ফেলেছে ফেলু পঙ্গু হয়ে গেছে! সুতরাং কে কার পেটে এখন লাথি মারে। আন্নু পরম কুলীন এক যুবতী কন্যার মতো বাগের ভিতরে ডুব দিয়ে জল খাচ্ছে, একাদশীর বাপও টের পাচ্ছে না। ফেলু কেমন কাতর গলায় বলল, তুই মনে করস আমি কিছু বুঝি না! হালার কাওয়া।

—আর তুই মনে করস আমি-অ কিছু বুঝি না। ফেলুর মুখের ওপর ঝামটা মারল।

—তুই যুবতী মাইয়া, তর বোঝনের না আছে কি ক'। বলে ফেলু কথা আর বাড়াল না। একটু দূরে কাঁঠাল গাছে সোনা, ফতিমা নিচে। কাঁঠাল পাতা অথবা ডাল ভেঙে দিচ্ছে ফতিমার ছাগলটাকে। গোলমাল বাধালে অথবা চিৎকার চেঁচামেচি করলে এখানে ওরা ছুটে আসতে পারে। ছুটে এলেই এ-সব কথা ফাঁস হয়ে যাবে। সে অশ্বত্থের ঝোপে আত্মগোপন করেছিল, গাছে তখন কাক উড়ছিল না, মেলার গরু যাচ্ছে, গলায় ঘণ্টা বাজছিল আর ঘাসের ভিতর পড়ে থেকে মাইজলা বিবির সনে সঙ—সব টের পাবে যুবতী মেয়ে আন্নু। সে চুপচাপ আন্নুর শরীরে আঁশটে গন্ধটা এবারের মতো হজম করে গেল। সে পাগলের মতো চিৎকার করতে থাকল, গোসল কইরা বাড়ি ঢুকবি। না হয়,

তর একদিন কি আমার একদিন। আর এই হজম করায় যাবতীয় রাগ গিয়ে পড়ল পাগল ঠাকুরের ওপর, সে এক হাতিতে চড়ে ওর দুই হাত ভেঙে এখন মাঠে ময়দানে পাখি ওড়াচ্ছে, এবং বাতাসে ফুঁ দিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। সেই মানুষকে বাগে পেলে পীর না বানিয়ে ছাড়ছে না। রাগ এবং বিদ্বেষ ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে। বিবি আন্নু এই ঝোপজঙ্গলের ভিতর এতক্ষণ তেল আনার নাম করে, ওকে মাছ পাহারায় রেখে এসে কি করছিল সব যেন জানা।

কিন্তু অসহায় ফেলু দু'হাত ওপরে তুলতে গিয়ে দেখল, সে নাচারি, বেরামি মানুষ। এমন জবরদস্ত বিবির সঙ্গে সে বুঝি ইহজীবনে লড়তে পারবে না। লড়তে পারলে বোধ হয় এই অন্ধকার বাগের ভিতর এখন এক প্রলয়ঙ্কর খণ্ড-যুদ্ধ বেধে যেত। অগত্যা ভাল মানুষের মতো আন্নুর পিছনে পিছনে, যেন সে এবং আন্নু, মেমান বাড়ি থেকে বাগের ভিতর দিয়ে ফিরছে—কোন তঞ্চকতা নেই, পরস্পর তেমনভাবে হাঁটছে, মাঠে তখনও ঢাক বাজছে. ঢোল বাজছে। মালতী প্রসাদ বিতরণ করছে মাঠে। কাগজের লাল নীল পতাকা উড়ছে বাতাসে। মাঠের ভিতর সাদা ধবধবে গরদ পরে মালতী, নিষ্ঠাবতী, ধর্মাধর্ম যার একমাত্র সম্বল, যে সকলের মতো হাঁস পুষে বড় করছে, পুরুষ হাঁসটার জন্য যার মমতা আর বর্ষায় যে চুপচাপ নিঃশব্দে বৃষ্টি ভিজে সারারাত ধরে, সেই যুবতী মালতী, বিধবা মালতী এখন বাস্তুপূজার পায়েস খাওয়াচ্ছে সকল মানুষকে।

গাছের ডালে সোনাবাবু। ফতিমা দুষ্টু প্রজাপতির মতো চারা কাঁঠাল গাছটার চারপাশে ঘুরছে এবং লাফাচ্ছে। ছাগলটার জন্য সে ডালপাতা সংগ্রহ করছে। সোনা ছাগলটার জন্য ডাল ভেঙে দিচ্ছিল গাছের। কাঁঠাল পাতা খাবার জন্য ছাগলটা, ছোট্ট এক বাচ্চা ছাগল দু'পায়ে ভর করে লাফ দিচ্ছিল। সোনা ছাগলটার পাতা খাবার আনন্দে, গাছের সব কচিকাঁচা ডালপাতা ভেঙে ছাগলটার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে। ছাগলটার পাশে এখন পাতার ডাঁই। সোনা লাফ দিয়ে গাছ থেকে নেমে পড়ল। পড়তেই কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, যাইবেন সোনাবাবু?

—কোনখানে?

—বকুল ফল আনতে যাইবেন?

—কতদূর?

—বেশি দূর না। বলে, আঙুল তুলে দেখালো, ঐ যে দ্যাখছেন না হাসান পীরের দরগা, দরগার ডাইনে ট্যাবার পুস্কনি, আমরা যামু পুস্কনির পাড়ে।

—ছোটকাকা বকব।

—যামু আর আমু। এক দৌড়ে যামু, এক দৌড়ে আমু।

সোনা চারিদিকে তাকাল। পূজা-পার্বণের দিনে কারো কোনো লক্ষ্য নেই। লালটু পলটু ছোটকাকার সঙ্গে চরু রান্নার জন্য গেছে। ছোটমামা গেছে সরকারদের বাস্তুপূজাতে। শোভা, আবু, কিরণী বাস্তুপূজার প্রসাদ খেয়ে বেড়াচ্ছে। পূজাপার্বণের দিনে কে কোথায় যায়—কে কার খবর রাখে! পাগল জ্যাঠামশাই ভোরে কোনদিকে বের হয়ে গেলেন, কেউ টের করতে পারে নি। সোনা মনে মনে ভাবল, বেশি দেরি হলে সকলে ভাববে, সোনা গেছে জ্যাঠামশায়ের লগে। সুতরাং সোনা বোঁ বোঁ শব্দ করতে থাকল মুখে। তারপর ওরা মাঠের ওপর দিয়ে ছুটতে থাকল। বড় মাঠ, উত্তরে গেলে হাসান পীরের দরগা। দরগার পাশ দিয়ে সাইকেলে গোপাল ডাক্তার নেমে আসছে। গোপাল ডাক্তার ওদের দেখে ফেলবে ভয়ে ওরা দালানবাড়ির খালের ভিতর নেমে গেল। দু'জনে চুপচাপ মাথা গুঁজে উবু হয়ে বসে থাকল। এত বড় মাঠের ভিতর সোনা, এবং ফতিমাকে একা একা ঘুরতে দেখলে আশঙ্কার কথা। তুমি সোনা, সেদিনের সোনা, একা একা এত বড় বিশাল বিলেন মাঠে নেমে এসেছ—কি সাহস তোমাদের! চল চল বাড়ি চল। অথবা কিছু তিরস্কার। কিংবা বাড়িতে খবরটা পৌঁছে দিলে ছুটবে ঈশম, তার প্রিয় তরমুজ খেত ফেলে ছুটবে। আর মাঠের ভিতর দাঁড়িয়ে অথবা বিলেন মাঠে নেমে গিয়ে ডাকবে, সোনাবাবু কৈ গ্যালেন! অঃ সোনাবাবু!

কবে একবার সোনা একা একা তরমুজ খেতে নেমে গিয়েছিল—কবে, সেই কতকাল আগে, সোনা প্রথম গ্রামের বাইরে বের হয়ে দক্ষিণের মাঠে—সোনালী বালির নদীর চরে তরমুজ খেতের ভিতর হারিয়ে গিয়েছিল সঠিক মনে নেই, কিন্তু সেই তরমুজ খেত, মালিনী মাছ, এবং বড় মিঞার দুই বিবি—দুর্গাঠাকুরের মতো মুখ, নাকে নথ দুলছিল, কি এক রোমাঞ্চ যেন জীবনে, সোনা এখন সেই এক রোমাঞ্চের লোভে ছুটছে। ফতিমা কাপড়টা গামছার মতো করে প্যাঁচ দিয়ে পরেছে। শরীরে ফতিমার জামা নেই। কোন ফ্রক নেই। খালি গা। নাকে নথ দুলছে ফতিমার। কানে পেতলের মাকড়ি। নাকের বাঁশিতে সোনার নাকছাবি। ছাবির মুখটা চ্যাপ্টা চাঁদের মতো। কথা নেই বার্তা নেই সোনা ফতিমার নাকটা চ্যাপ্টা করে ধরে নাকের ভিতর সেই চ্যাপ্টা চাঁদ কি করে বাঁশিতে আটকে আছে দেখল। ফতিমার খুব লাগছিল নাকে। কিন্তু সোনাবাবু, ছোট্ট সোনাবাবু—শরীরে যার চন্দনের গন্ধ লেগে থাকে আর মাথায় কি সুমধুর গন্ধ! সোনাবাবু তার নাক উল্টে বাঁশিতে এখন চ্যাপ্টা চাঁদের মুখ উঁকি দিয়ে দেখছে।

ফতিমার শরীর শিরশির করে আনন্দে কাঁপছিল। সে বলল, সোনাবাবু চলেন। গোপাল ডাক্তার গ্যাছে গিয়া। দূরে মাঠের আলে গোপাল ডাক্তারের ঘণ্টি বাজছে। আর প্রান্তরে যখন শব্দ নেই, যখন মাঠ ফাঁকা, শুধু মাঝে মাঝে

নিরুদ্দেশে চলে যান, সেই মানুষই হয়তো আজ বেশি দূর না গিয়ে এই অশ্বত্থের নিচে মটকিলা ঝোপের ভিতর শুয়ে শুয়ে পাখির সঙ্গে গল্প করছেন। ছোট মেয়ে ফতিমা, সামুর একমাত্র মেয়ে ফতিমা জানে না—এই মানুষ পাগল মানুষ নয়, এ অন্য মানুষ ফেলু শেখ। ফেলু শেখ এখনও চুপচাপ সেই পরানের চেপে প্রিয়, মরণে যার স্মৃতি ভোলা দায়—সেই এক পরমাশ্চর্য যুবতীর খপ করে ঝোপের ভিতর টেনে নেবার জন্য আত্মগোপন করে আছে।

সোনা ঝোপের ভিতর উঁকি দিয়ে ডাকল, জ্যাঠামশায়। কারণ যখন সব দেখা যাচ্ছে তখন পাগল মানুষ ব্যতীত আর কে হবে! এই অঞ্চলে তিনিই তো একমাত্র মানুষ যাঁর কাছে এই মাঠ, গাছগাছালি এবং পরবের দিনে উৎসব সব সমান।

ফেলু এত নিবিষ্ট যে কতক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছে খেয়াল নেই। কার যেন গলা, কে যেন ঝোপে উঁকি দিয়ে পিছনে ডাকছে। হাত পিঠ মুখ ফেলুর দেখা যাচ্ছে না। ঘন ঝোপের বাইরে শুধু পা দুটো দৃশ্যমান, এই পা দেখে ধনকর্তার ছোট পোলা টের পেয়েছে মানুষ আছে ঝোপের ভিতর। ওরা এখন হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকছে। আগে সোনা পিছনে ফতিমা। সে তাড়াতাড়ি ধড়ফড় করে উঠে গেল। ঝোপ থেকে পাগলের মতো ছুটে বের হয়ে যাবে ভাবল, কিন্তু তাড়াতাড়ি করলে ধরা পড়ে যাবে, সে কি যেন হাতড়াতে থাকল ওর কি যেন হারিয়ে গেছে।

সোনা এবং ফতিমা বুঝতেই পারে নি, এমন একটা নীরস মানুষ ঝোপের ভিতর লুকিয়ে থাকতে পারে। সোনা বলল, আপনে!

ফেলুর কি হারিয়ে গেছে এমন চোখেমুখে। সে বলল, ঝোপের ভিতর শিকড়-বাকড় খুঁজতাছি।

—কি হইব?

—হাতটা জোড়া লাগব।

সোনা বলল, পাইলেন নি?

—না রে কর্তা, পাইলাম না। কৈ যে সব লুকাইয়া থাকে, বলে ফেলু ফতিমার দিকে কটমট করে তাকাল। ঝোপের ভিতর ফতিমা এবং সোনা। ফেলু সোনাবাবুকে কিছু বলল না। শুধু ফতিমার দিকে তাকিয়ে মনে-মনে গজরাতে থাকল, সামু মাইয়াটারে বড় আসকারা দ্যায়। মাইয়াটারে ইংরাজী শিখায়। এত অধর্ম ভাল নয় মনে হল ফেলুর। আর সঙ্গে সঙ্গে পাগল ঠাকুরের মুখ ভেসে ওঠে, মুখ ভেসে উঠলেই ভিতরের সেই অধর্মটা জেগে ওঠে। হাতের দিকে তাকালে দুঃখের সীমা থাকে না। ফেলুর প্রতিপত্তি কমে যাচ্ছে। সেই যে বিবি আন্নু, সে পর্যন্ত তেলের নাম করে হাজিসাহেবের ছোট বিবির কাছে চলে গেল। ছোট বিবির কাছে গেল কি ছোট সাহেবের কাছে গেল

জায়গাটা বড় নির্জন, পুকুরটা প্রাচীন। মজা দিঘির মতো দাম এবং কচুরি পানায় ঠাসা। পাড়ে পাড়ে কত বিচিত্র গাছগাছালি গভীর বনের সৃষ্টি করেছে। ছোট বড় লতার ঝোপ—পায়ে হাঁটা সামান্য পথ। পথে শুকনো ঘাসপাতা। মাটিতে মরা ডাল, পাখির পালক। বোধ হয় মাথার ওপরে প্রচীন এক অর্জুনের ডালে পাখিদের রাতের আস্তানা। তার নিচে কত যুগ ধরে, মাছের এবং মানুষের হাড়, গরু-বাছুরের হাড়। পাশেই এক জরদ্গবের মতো কড়ুই গাছ। গাছটার ভিতর কত বিচিত্র খোঁদল, ডালপালা নিয়ে প্রায় যেন আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একপাশে সব মৃত গাছের ডাল, ডালে ডালে হাজার হবে সব শকুন সার সার বসে রয়েছে। ওরা গাছটার নিচে যেতে সাহস পেল না। কিন্তু এইটুকু পথ পার না হতে পারলে ওরা অকালের ফল বকুল ফল খুঁজে পাবে না। বকুল গাছটা বড় নয়, ছোট। ঝোপজঙ্গলে গাছটাকে খুঁজে বের করা কঠিন। গাছটার খোঁজখবর ফতিমাকে জোটন দিয়ে গেছে। আবেদালির দিদি জোটন আবেদালির জন্য একটা মুরগি এনেছিল, মুরগিটা উড়াল দিয়ে চলে গেল হাজিসাহেবের আতা বেড়াতে। আতা বেড়ার পাশে ছোটবিবির সঙ্গে দেখা, জোটনকে ছোটবিবি বলল, মুরগিটা মাঠের দিকে নেমে গেছে। মাঠে নামলেই মনে হল জোটনের দূরে কি একটা কেবল ছুটছে। বুঝি কুকুর হবে। বেড়াল হতে পারে। মাঠের ওপর দিয়ে অকারণে ছুটে পালাচ্ছে। মাঠে নামতেই হাজিসাহেবের ছোট বেটার সঙ্গে জোটনের দেখা।—ঐ যায়, যায়। দেখা যায়। সব সলাপরামর্শ যেন ঠিক ছিল। ছোট বেটা জোটনকে অকারণ সেই মাঠের দিকে হাত তুলে মুরগির খোঁজে যেতে বলে দিল।

জোটন মুরগিটা চুরি করে এনেছিল আবেদালিকে খাওয়াবে বলে। জোটনের ধারণা এখন সেই মুরগি ফাঁক বুঝে তার গ্রামের দিকে পালাচ্ছে। পোষা মুরগি, বড় সোহাগের মুরগি মৌলবীসাহেবের। আদরের মুরগি মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। সে কি ভেবে তাড়াতাড়ি মুরগি ধরার জন্য ছুটতে থাকল। যদি এ মুরগি চলে যায় আর যদি টের পায় মৌলবীসাব, মুরগি যাবার পথে জোটন চুরি করে নিয়ে গেছে তবে আর রক্ষে থাকবে না। সেই মুরগি যখন দূর থেকে অস্পষ্ট, মনে হচ্ছে কি একটা ট্যাবার পুকুর পাড়ে বনের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে, তখন জোটনও না ছুটে পারল না। এত সখ করে, এত কুরশিস করে মুরগিটা ধরে এনেছিল আবেদালিকে খাওয়াবে বলে, এখন হায়, সেই মুরগির চৈতন্য উদয়। কি হবে! কি হবে! সুতরাং ছোটা ভাল। মুরগি ধরার জন্য জোটন কাপড় হাঁটুর ওপর তুলে ছুটতে থাকল। ছুটতে ছুটতে

ট্যাবার পুকুরের পাড়ে, ভিতরের জঙ্গলে। কিন্তু শেষে আর পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। মুরগিটা যদি গাছের ডালে চুপচাপ বসে থাকে, উঁকি দিয়ে দেখতে থাকল।

তখন মুরগির গলা টিপে ধরেছে ছোটবিবি। হাজিসাহেবের ছোটবিবি মুরগির গলা কেটে হাতের ভিতর শক্ত করে ধরে রেখেছে। ছেড়ে দিলেই ক্যাঁ-ক্যাঁ করে ডেকে উঠবে। তখন বনে বনে জোটন খুঁজছিল, হায়, মুরগি তুই কোথায় গেলি! ঝোপে জঙ্গলে জোটন মুরগি খুঁজতে এসে কপাল থাবড়াতে থাকল। তখন মনে হল খুঁটিতে লাল রঙ মুরগির, ঝোপের ভিতর লাল রঙের কি যেন দেখা যায়। সে লোভে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে বনের ভিতর ঢুকে পড়ল। কিন্তু হায়, ঢুকে দেখল গাছের ডালে লাল বকুল ফল। অকালে বকুল ধরেছে গাছটাতে। পাকা ফল দু'চারটে নিচে পড়ে আছে। একটা বিড়াল কি নেড়িকুকুর এই বাগের ভিতর ঢুকে গেল। আবছা অস্পষ্ট শীতের রোদে দূর থেকে বিড়াল কুকুর না অন্য কোন জীব ধরা যাচ্ছিল না। জোটন ভেবেছিল, ওর মুরগি পালাচ্ছে। নাকের বদলে নরুন পাবার মতো জোটন মুরগির বদলে বকুল ফল তুলে নিল। সেই ফল এনে সে ফতিমার হাতে দিয়েছে, আর বলেছে সেই আশ্চর্য বকুল ফলের গাছটা বনের ভিতর লুকিয়ে আছে।

গাছটার অনুসন্ধানে এসে সোনার ভয় ধরে গেল। সে বলল, আমার ডর করতাছে ফতিমা।

—ডর কিয়ের। আইয়েন আপনে। বলে ফতিমা সোনার হাত ধরে কড়ুই গাছটার দিকে তাকাল। বড় বড় শকুন, ওরা নিবিষ্ট মনে বসে আছে। কড়ুই গাছটার দিকে তাকালেই সোনার ভয়টা বাড়ছে। ওরা শকুনের রাজা পৃথিবীকে দেখতে পেল, মগ ডালে বসে রাজার মতো তাবৎ পৃথিবীর কোথায় কোন মৃত জীব পড়ে আছে বাতাস শুঁকে টের পাবার চেষ্টা করছে। অন্য শকুনগুলি ঠোঁট গুঁজে বোধ হয় ঘুমোচ্ছে। কেউ কেউ হয়তো ঘাড় নিচু করে ওদের একবার দেখে নিল—ছোট ছোট কাঠের পুতুলের মতো মনুষ্যকুলের দুই জীব নিচে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু শকুনের রাজা সবসময় জেগে। সে ক্ষুধার জন্য শিকারের খবর দেবে। সেই একমাত্র উঁচু মুখে আকাশের অন্য প্রান্তে কি উড়ে যাচ্ছে, কারা উড়ে যাচ্ছে, কত হবে……আর যদি মৃত জীবের গন্ধ ভেসে আসে, সে প্রথম দু'পাখা বাতাসে ছড়িয়ে দেবে, তারপর উড়তে থাকবে আকাশে—প্রায় তখন মনে হয় নির্বাণ লাভের মতো এইসব বড় বড় পাখি কোন এক অদৃশ্য জগতের সন্ধানে উড়ে যাচ্ছে।

কিন্তু রাজা শকুনটা ওড়ার বদলে কেবল উঁকি দিয়ে ওদের দেখছে। ফতিমা, যে ফতিমা, একা গোপাটে ছাগল নিয়ে আসে, সে মাথায় করে সানকিতে নাস্তা নিয়ে যায় জমিতে, যার ভয়ডর একেবারে কম—পাটখেত বড় হলে অথবা নির্জন মাঠের ভিতরে যখন বড় বড় পাটগাছগুলি ফতিমার মাথা পার হয়ে

অনেক উঁচুতে উঠে যায়, যখন সামনের আলপথ সিঁথির মতো, দু'ধারে পাটগাছ ঘন বনের সৃষ্টি করে রাখে, তেমন পথে কতবার ফতিমা একা একা চলে এসেছে ছাগলটার দড়ি ধরে—সেই ফতিমা পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। রাজা শকুনটা নিচের দিকে উঁকি দিলে সে লাফ দিয়ে ছুটতে চাইল সোনাবাবুর হাত ধরে।

যেন এই গাছটা গল্পের সেই সদর দেউড়ি—গাছটা রাক্ষস খোক্কসের মতো সদর দেউড়িতে পাহারা দিচ্ছে। সদর দেউড়ি পার হতে পারলেই ফুল-ফল রাজকন্যা মিলে যাবে। ফতিমা সাহসে ভর করে ফুল-ফলের জন্য এবং সেই অত্যাশ্চর্য জগতের জন্য সোনাবাবুকে ঠেলে-ঠুলে পাখির পালক, মাছের হাড়, মানুষের হাড়, পাখিদের মলমূত্র অতিক্রম করে বনের ভিতর ঢুকে গেল। ভিতরে বিচিত্র বর্ণের ছোট ছোট পাখি উড়ে বেড়াচ্ছিল। পাখিরা ডাকছিল। প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। একটা গিরগিটি ঝুপ ঝুপ শব্দ করে ডাল থেকে পাতায় উঠে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল। জায়গাটা বড় নির্জন, নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে সোনার। কোথাও কোন মানুষের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। দূরে কে যেন কেবল কাঠ কেটে চলেছে—তার শব্দ ভেসে আসছিল। কান পাতলে ঢাক-ঢোলের শব্দ শোনা যায়। ওরা এমন একটা জায়গায় চলে এসে এই প্রথম পরস্পর অসহায় চোখ তুলে তাকাল।

ফতিমা বলল, সোনাবাবু, আপনেরে ছুঁইয়া দিছি। বাড়ি গেলে সান করতে হইব।

সোনা মা'র ভয়ে বলল, তুই ছুঁইলি ক্যান আমারে।

—আমি ছুঁইলাম, না আপনে ছুঁইলেন! বাঁশিতে নাকচাবিটা আপনে ভাখলেন না!

—মায় শুনলে আমারে মারব। সোনার চোখের ওপর সেই দৃশ্যটা এতক্ষণে ভেসে উঠল। সেই বর্ষার মতো। সে ফতিমার আঁচলে প্রজাপতি বেঁধে দিয়েছিল বলে—মা।ওকে খুব মেরেছিল। ফতিমার কথায় সোনার যথার্থই ভয় ধরে গেল। বলল, তুই কইস না। আমি তরে ছুঁইয়া দিছি মায়রে কইস না।

—আমি কইতে যামু ক্যান!

—কইলে ঠিক মায় আমারে মারব।

—কোনদিন কমু না।

—তিন সত্য!

—তিন সত্য।

সোনা যেন এবার একটু নিশ্চিন্ত হল। ফতিমা না বললে, এ-কথা কেউ আর জানতে পারবে না।

চারিদিকে বড় বড় গাছ। অপরিচিত গাছ। ঝোপ-জঙ্গলে লতায়-পাতায় প্রায় কোথাও কোথাও নিবিড় অরণ্য সৃষ্টি করে ফেলেছে। ওরা সেই অরণ্যের

ভিতর বকুল গাছটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যেন ওরা বলতে চাইছে, বৃক্ষ, তুমি এতদিন কার ছিলে?

বৃক্ষ উত্তর দিল, রাক্ষসের।

—এখন কার?

—এখন তোমাদের।

—তবে তুমি আমাদের ফল দাও। বকুল ফল।

ওরা পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। দ্রুত এগুতে পারছে না। চার পাশটায় যেন জঙ্গলের শেষ নেই। কতদূর হেঁটে যাওয়া যেন এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে! শুকনো ঘাসপাতা পায়ের নিচে। কত দীর্ঘদিনের মানুষ-বিবর্জিত জায়গা! ওরা হামাগুড়ি দিয়ে অথবা সন্তর্পণে কাঁটাগাছ পার হবার জন্য ছোট ছোট লাফ দিচ্ছিল। আর মনে মনে সেই গল্পের মতো বলা, বৃক্ষ তুমি কার ছিলে?

—রাজার ছিলাম।

—এখন কার?

—এখন তোমার।

—তবে ফল দাও। বকুল ফল।

বৃক্ষ কখনও রাজার, কখনও রাক্ষসের। বৃক্ষ, অঃ বৃক্ষ! ওরা বৃক্ষ বৃক্ষ বলে চেঁচাতে থাকল। কোথায় গেলে তুমি বৃক্ষ। ওরা বনের ভিতর হেঁকে ডেকে বেড়াতে থাকল। ওরা কেবল গাছটার অন্বেষণে আছে। মগডালে বসে শকুনেরা চিৎকার করছিল, বনের বিচিত্র সব শব্দ উঠছে ঘস ঘস—ডালে ডালে পাখিদের কলরব ছিল আর ছিল দুই বালক-বালিকা। ওরা ভয়ে ভয়ে বকুল গাছটার উদ্দেশে হাঁটছে।

আর ঠিক তখন মনে হল বনের ভিতর কে বা কারা হুঁম্ হুঁম্ শব্দ করে ক্রমশ ওদের দিকে এগিয়ে আসছে, ঠাকুমার কাছে শোনা গল্পের সেই ভূত-প্রেত অথবা ডাকিনী যোগিনীর মতো। ফতিমা ফিসফিস করে বলল, সোনাবাবু, ঐ শোনেন।

সোনা একটা মরা গাছের গুঁড়িতে বসেছিল। ও আর হাঁটতে পারছিল না। পায়ে লাগছিল। পায়ে কাঁটা ফুটছে। ওর মনে হল এখন এইসব ফেলে খোলা মাঠের ভিতর নেমে যেতে পারলে বেশ হত। কিন্তু মনে মনে বড় শখ অকালের সেই বকুল ফলের। নিতে পারলে বড়দা মেজদা ট্যারা হয়ে যাবে। আমারে একটা দে, সোনা বড় ভাল পোলা, দে দে, একটা দে, বলে বড়দা মেজদা ওর চারপাশে ঘুর-ঘুর করবে। ফতিমাও বড় শখ করে এই বনের ভিতর পালিয়ে এসেছে ফল নেবে বলে কিন্তু বনের ভিতর সেই হুম্ হুম্ শব্দটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে।

বনের ভিতর ওরা চুপচাপ বসেছিল। ওদের ভিতরে আতঙ্ক—এবারে কিছু

একটা হয়ে যাবে। ওরা পালাতে গিয়ে ঘন গাছপালার ভিতর ক্রমে আরও হারিয়ে যাচ্ছিল। বনটা যে ভিতরে ভিতরে এত বড় ওদের জানা ছিল না। বনের ভিতর ঢুকে গেলেই গাছটা সদর দেউড়ির সেপাইর মতো সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে, এবং ওদের অঞ্জলিতে বকুল ফল ভরে দেবে এমন একটা ধারণা ছিল। কিন্তু হায়, এখন ওরা এত ভিতরে ঢুকে গেছে যে, কোনদিকে গেলে মাঠ এবং পরিচিত পথ মিলে যাবে বুঝতে পারছে না। ফতিমার মুখ-চোখ শুকনো দেখাচ্ছে। বনময় সেই শব্দ কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে এইসব জঙ্গলের ভিতর কে বা কারা সহসা সহসা অট্টহাস্য করছিল। ঠাকুমার গল্পের মতো যেন কে বা কারা বলছে হাঁউ-মাঁউ কাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ। ওরা ভয়ে, মৃত্যুভয়ে চোখ-মুখ বন্ধ করে সামনের ঘাস, শুকনো পাতা, জঙ্গল যা কিছু সামনে পড়ছে সব সরিয়ে ছুটছে। অথচ বাইরে খোলা মাঠ এখনও দেখা যাচ্ছে না। ওরা শুকনো ডাল, পাখির পালক, মাছ এবং মানুষের হাড় অতিক্রম করে কেবল ছুটতে থাকল। কিন্তু সামনে আর পথ নেই, ফের পেছনের দিকে ছোটা। অথচ সেই এক অট্টহাসি পেছনে ছুটে আসছে তো আসছেই। ডালপালা ঝোপ-জঙ্গল ভেঙে ওদের ধরার জন্য ছুটে আসছে। সূর্যের অমিত তেজের মতো বনের ভিতর সেই এক অট্টহাসি গাছপালা ভেঙে দুম-দাম শব্দ করে তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে।

তখন মাঠের ভিতর হুম্-হুম্ শব্দ। রাজ-রাজেশ্বর কি জয়! জয় যজ্ঞেশ্বর কি জয়—কারা যেন মাঠ ভেঙে এমন বলতে বলতে চলে যাচ্ছে। সোনা ভয়ে গাছ-পাতার ভিতর লুকিয়ে পড়ল। ফতিমাও জঙ্গলের ভিতর মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ল। আর মুখ তুলতেই দেখল, ঝোপের ভিতর থেকে খোলা মাঠ দেখা যাচ্ছে। প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশজনের একটা দল খোলা মাঠের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। ষোলজন লোক বাঁশের ভিতর কাটা মোষটা ঝুলিয়ে নিয়েছে। চার পা বাঁধা কাটা মোষটা মরা গরু-বাছুরের মতো ঝুলছে। ঠিক পেটের মাঝখানে বসানো কাটা মোষের মাথাটা। দড়ি দিয়ে মাথাটাকে পেটের ওপর বেঁধে রাখা হয়েছে। মাথাটা চোখ খুলে রেখেছে, কান ঝুলিয়ে রেখেছে। এবং শস্যবিহীন মাঠ দেখতে দেখতে চলে যাচ্ছে। লোকগুলি জয় যজ্ঞেশ্বর কি জয়, রাজ-রাজেশ্বর কি জয় বলতে বলতে নেমে যাচ্ছে। ওরা ঝোপের ভিতর প্রায় যেন শ্বাস বন্ধ করে পড়ে আছে। ভয়ঙ্কর দৃশ্য এখন শুধু চোখের ওপর ভাসছে। গলা এত শুকনো যে, ওরা ডাকতে পর্যন্ত পারল না। বলতে পারল না। আমরা ঝোপের ভিতর আটকা পড়েছি। কোনদিকে রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না। আর কিছুক্ষণ এভাবে থাকলে আমরা মরে যাব।

লোকগুলো কাটা মোষ নিয়ে চলে যাচ্ছে। পিছনে যারা আসছে, তাদের মাথায় চাল ডাল। একটা মোষের মাংস খাবার মতো মানুষের জন্য চাল ডাল

তেল। ওরা শীতলক্ষার পাড় থেকে এসেছে। পূজার প্রসাদ মোষের মাংস ফেলতে নেই। তাই এইসব মানুষ এসেছে শীতলক্ষার পাড় থেকে এই কাটা মোষ নিয়ে যেতে। ওরা মোষটা নিয়ে যেন পাল্কি কাঁধে বেহারা যায়—হুঁ-হোম-না, যেন বরের সঙ্গে বধূ যায়—হুঁ-হোম-না, যেন মোষের পেটে কাটা মাথা যায়—হুঁ-হোম-না! বড় কুৎসিত এই দৃশ্য। মুণ্ডবিহীন মোষ পেটে মাথা নিয়ে দুলতে দুলতে যাচ্ছে। বনের ভিতর তখন ডালপালা ভেঙে বেড়াচ্ছে কে? অট্টহাস্য, অট্টহাস্য! মগডালে শকুনের আর্তনাদ, ঝিঁঝিঁপোকার ডাক এবং সেই দ্রুত ডালপালা ভাঙার শব্দ—ওরা ভয়ে এবার চোখ বুজে ফেলল। কারণ বনের ভিতর পথ করে সেই অট্টহাস্য ওদের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। ওদের দু'জনকে শক্ত দুই বাহুতে জড়িয়ে ধরেছে। মাটি থেকে টেনে ওপরে তুলে নিচ্ছে। যেন দুই পুতুল। সোনা রুপোর পুতুল। দৈত্যটা দুই কাঁধে দুই সোনা-রুপোর পুতুল ফেলে বনের বাইরে বের হয়ে এল। তখন দুই পুতুল প্রাণ পেয়ে ঝলমল করে উঠছে। দৈত্যটা বুঝি এত আনন্দ আর দু'হাতে সামলাতে পারছিল না। চিৎকার করে উঠল, গ্যাৎচোরেৎশালা।

তখনও মাঠে ঢাক বাজছে, ঢোল বাজছে। বাস্তুপূজা শেষ হলেই পুরি-পূজার মেলা। মেলায় দোকানপত্র যাচ্ছে গোপাট ধরে। বাঁশ কাঁধে মানুষ যাচ্ছে। ত্রিপল মাথায় মানুষ যাচ্ছে। সোনালী বালির নদীর জলে এখন কত সওদাগর নৌকো ভাসাল। বাদাম তুলে থাঁড়ি ধরে ব্রহ্মপুত্রে পড়বে। তারপর ফের বাঁক নিলে সেই প্রকাণ্ড বিল—পাঁচ ক্রোশের মতো বিল রয়েছে। খালের জল বিলে পড়েছে। বিল পার হলেই মেলার প্রাঙ্গণ। বড় কাঠের পুল পার হলে যজ্ঞেশ্বরের মন্দির। মন্দিরের পাশে সারকাসের তাঁবু পড়েছে।

সেই বিলের কথা মনে পড়ছিল পাগল ঠাকুরের। তিনি সোনা এবং ফতিমাকে মাঠে এনে ছেড়ে দিলেন। সোনার সব ভয় উবে গেছে। ফতিমা পর্যন্ত এখন হি-হি করে হাসছে। ওরা বাড়ি ফেরার জন্য দৌড়াতে লাগল। বেলা পড়ে আসছে, শীতের বেলা। সামসুদ্দিন ঢাকা গেছে। আজ ঢাকা থেকে ফেরার কথা। ফতিমা দ্রুত ছুটতে থাকল। ঢাকা থেকে বা'জান কাচের চুড়ি কিনে আনবে। ফিরে ফতিমাকে বাড়ি না দেখলে খুব রাগ করবে বা'জান। কানের দুল আনবে। মা'র জন্য ডুরে শাড়ি আনবে। বা'জান সময় অসময় নেই শহরে চলে যায়। দু'চার দিন পর ফের ফিরে আসে। সেই ঢাকা শহরে বড় হলে ফতিমা যাবে। যেতে যেতে তেমন গল্পও করল ফতিমা।

সোনা বলল, আমি-অ যামু। বাবায় কইছে বড় হইলে আমারে লইয়া যাইব।

—বা'জী কইছে আমারে সদর ঘাটের কামান দেখাইব।

—বাবায় কইছে আমারে সদর ঘাটের কামান দেখাইব। রমনার মাঠ দেখাইব। বুড়িগঙ্গার জলে সান করাইব।

—বা'জী কইছে লিখা-পড়া শিখলে মোটরে চড়াইব।

—বাবায় কইছে ফাস্ট হইলে রেলগাড়ি কইরা ঢাকায় নিয়ে যাইব।

—রেলগাড়ি ছোট। ছোট গাড়িতে সোনাবাবু যাইব!

—মোটরগাড়ি রেলগাড়ির ছোট।

—হ কইছে? ফতিমা সোনার মুখের সামনে গিয়ে মুখ বাঁকাল।

—কিছু জানস না ছেরি, দিমু এক থাপ্পর।

—দ্যান ত দ্যাখি। থাপ্পর দিবেন। আপনের মায়রে কইয়া মাইর খাওয়ামু না তবে। কমু, সোনাবাবু আমারে ছুইয়া দিছে।

—আমি যে তরে ছুইয়া দিছি, তুই কইয়া দিবি!

—তবে মোটরগাড়ি ছোট এডা কন ক্যান!

—আর কমু না।

ফতিমা আর দেরি করল না। এই বাবুটির ওপর বিজয়িনী হয়ে উল্লাসে ছুটছে। মাথার চুল উড়ছে। কোমর থেকে ডুরে শাড়ি খুলে পড়ছে। ছুটতে ছুটতে কোনরকমে প্যাঁচ দিচ্ছে কোমরে। কোনরকমে কাপড় সামলে মল বাজিয়ে ছুটছিল। পায়ে মল, রুপোর মলের ভিতর ছোট লোহার দানা। ফতিমা ছুটছিল আর পায়ের মল বাজছিল ঝম-ঝম। ছুটতে ছুটতে দু'বার ফিরে তাকাল পিছনে। এতটুকু নড়ছে না, সেই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ক্ষোভে দুঃখে ভেঙে পড়ছে সোনাবাবু। ফতিমা বিজয়িনীর মতো ঘুরে ফিরে লাফ দিল, হাঁটল, দু'পা এগিয়ে ফের লাফ দিল। ফের ঘুরে ফিরে চরকিবাজির মতো মাঠের ওপর ঘুরছে। যেন এক চঞ্চল খরগোশ কচি ঘাস থেকে এক কামড় খাচ্ছে, দু'কামড় নষ্ট করছে। ফতিমা মাঠের ওপর দিয়ে চঞ্চল খরগোশের মতো ছুটছিল। কিন্তু মনে মনে সোনা, যে সোনার শরীরে সব সময় চন্দনের গন্ধ লেগে থাকে, যে সোনাবাবুর মুখ ঘাসের মতো নরম, কচি কলাপাতার মতো যে লাজুক, তেমন মানুষকে মাঠে একা ফেলে যেতে কেমন কষ্ট হচ্ছিল ফতিমার। ফতিমা এবার দাঁড়াল। পিছন ফিরে ডাকল, আইয়েন, আমি খাড়ইছি।

সোনা রাগে এবং ক্ষোভে চিৎকার করে উঠল, না, আমি যামু না।

ফতিমাও গলা ছেড়ে বলল, আপনে না আইলে, আমি-অ যামু না।

দু'জন দু'জমির শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকল। সোনা কিছুতেই নড়ছে না। ফতিমা ছুটে সোনার নাগালে চলে গেল। চলেন।

—না, আমি যামু না।

—চলেন। না-হয় আপনের রেলগাড়িটাই বড়। তারপর ফতিমা আরও কি যেন বলতে চেয়েছিল। বলতে পারল না। অথবা মনের ভিতর হয়তো এমন কথা উঁকি মারতে পারে—মেলায় গেলে আমরা রেলগাড়িতে যাব। বড় গাড়ি না হলে আমরা দু'জনে যাব কি করে। অথচ ফতিমা কথাটা

প্রকাশের ভাষা ঠিক খুঁজে পেল না। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল কিছু সময়। তারপর সোনার হাত ধরে বলল, আমারে একটা কারতিক পূজার ছিরাঘট দিবেন!

—দিমু।

—আইয়েন, ইবারে মাঠের ওপর দিয়া ছুটি। ওরা হাত ধরে শীতের রোদে কিছুক্ষণ ছুটে দেখল, পুকুরপাড়ে মালতী। ওরা তাড়াতাড়ি হাত ছেড়ে দিল। হাত ছেড়ে দিয়ে দু'জন দু'দিকে ছুটতে থাকল।

সেই যে ঢাক বাজছিল, ঢোল বাজছিল আর থামছে না। পঞ্চাশটা ঢাকী অনবরত ঘাড় কাৎ করে বাজাচ্ছে তো, বাজাচ্ছেই। সরকারদের বাস্তুপূজা অঞ্চলে বিখ্যাত। লোকজনের সীমা সংখ্যা নেই। আত্মীয় কুটুম, গ্রামের নিবাসিগণ, কিছু গরীব প্রজা আর সব মাতব্বর ব্যক্তি লাঠি হাতে ঘোরা ফেরা করছিল। পুকুর পাড়ে হাজার মানুষ হবে, দূর দূর গ্রাম থেকে ওরা এসেছে। ধোপা নাপিত নমশূদ্র। ওরা পাত পেতে খিচুড়ি খাচ্ছে। আর মাঠের ওপর দিয়ে মোষ যাচ্ছে, সেই যেন পাল্কি কাঁধে বেহারা যায়। ওরা মুসলমান গ্রাম-গুলির পাশ দিয়ে যাবার সময় শিব ঠাকুর কি জয়, রাজ রাজেশ্বর যজ্ঞেশ্বর কি জয়, এইসব বলছিল। পেটে মাথা নিয়ে মোষ চলেছে। মাঠের ওপর, ঘাসের ওপর বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়ছে—ধর্ম আমাদের সনাতন, এত কচি মোষ তল্লাটে বলি হয় না। এত বড় খাঁড়া তল্লাটে আর কার আছে। আর এই ধর্মের মতো পূতপবিত্র কি আছে—জয় রাজ রাজেশ্বর, যজ্ঞেশ্বর কি জয়। বিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মানুষগুলি কাটা মোষ বাঁশে ঝুলিয়ে জয়ধ্বনি করছিল। বিলের গরীব দুঃখী মানুষগুলি যারা শালুক তুলতে এসে জলের ভিতর সাদা হয়ে যাচ্ছে—হাত পা ঠাণ্ডা—এবং শীতে শিথিল হয়ে যাচ্ছে, যারা মাঝে মাঝে পাড়ে বসে রোদ পোহাচ্ছিল, তারা পাড়ের ওপর দেখল বিন্দু বিন্দু এক ঝাঁক পাখির মতো মানুষগুলি কাঁধে মোষ নিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার কাটা মোষের পেটে মাথা, মাথাটা হড়কে নিচে পড়ে গেল। এত খাড়া ছিল বিলের পাড় যে পড়বি তো পড়বি একেবারে সেই গরীব দুঃখীদের পায়ের কাছে। সহসা এমন কাণ্ড! ধড়বিহীন মুণ্ড ওদের পায়ের কাছে পড়ে আছে।

মোষের কাটা মুণ্ড দেখে ওরা তোবা তোবা বলে উঠল। এক কোপে কাটা মুণ্ড দেখে ওরা কেমন গুনাহ করে ফেলল। এত বড় বিলে ওরা দুঃখী মানুষ সব শালুক তুলতে এসে এমন কুৎসিত দৃশ্য দেখে ফেলে চোখে কানে কেমন আঙুল দিল অথবা বুঝি ভয়, এই যে বিল দেখছ, বড় বিল, বিলে কত না কিংবদন্তি, কত না সাপখোপ অজগর আর কত না জলজ ঘাস জলের ভিতর। লতাপাতা, কীটপতঙ্গ, বড় বড় জোঁক নাকে কানে ঢুকে গেলে কে কাকে রক্ষা করে! সুতরাং ওরা মুণ্ডটার দিকে আর তাকাল না। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, এবারে ঘরে ফিরতে হয়।

শীতকাল বলে উত্তরের হাওয়া ক্রমশ প্রবল হচ্ছে। আকাশ বড় পরিচ্ছন্ন। মনে হয় এবার পৃথিবী উজাড় করে সব ঠাণ্ডা এই মাটির ওপর, এই বিলের ওপর নেমে আসবে। এতক্ষণ বিলের জলে সহস্র পাতিল ভেসেছিল, এখন একটিমাত্র পাতিল জলে ভাসছে। জলে একা এক পাতিল ভাসলে বড় ভয়। সেই পাতিলের মানুষটা কোথায় গেল! দ্যাখো দ্যাখো পাতিলের মানুষটা কোথায় গেল!

সূর্য তেমনি অস্ত যাচ্ছিল। শালুক ফুল ফোটে না আর। দূরে সব পদ্মপাতা, পদ্মপাতার পাশে ছোট এক পাতিল একা একা জলে ভেসে বেড়াচ্ছে। মানুষটা কোথায় গেল! পাতিলের মানুষটা! জলের মানুষ সব পাড়ে উঠে এসেছে। যে যার শালুকের পাতিল মাথায় পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখছে--একটা পাতিল বিলের জলের উত্তরের হাওয়ায় ভেসে ভেসে গভীর জলে যাচ্ছে।

কে তখন হাঁকল, দ্যাখো, বিলের জলে পাতিল ভাইস্যা যায়।

কে তখন ফের হাঁকল, দ্যাখো, পানির তলে মানুষ ডুইবা যায়।

কিন্তু এক ত্রিকালজ্ঞ বৃদ্ধা, মুখে জরার চিহ্ন, ক্লিষ্ট চেহারা, সে জোর গলায় হাঁকরাতে থাকল, বিল আবার একটা মানুষ কাইড়া নিল। সেই বৃদ্ধা নিয়তির মতো দাঁড়িয়ে যেন বলতে চাইল, এটা হবেই। সালের পর সাল বিল ক্ষুধা নিয়ে জেগে থাকে। ফাঁক পেলেই গিলে খায়। কিন্তু মানুষটা কে? কে ডুবে গেল জলে!

জালালি লাল চোখ দুটোর সঙ্গে জলের ভিতর তামাশা করছিল। সেই চোখ দুটো এগোচ্ছে পিছুচ্ছে। জলের নিচে ডুব দিলে ঘন নীল অথবা সবুজ রঙ চারিদিকে স্রোতের মতো ভেসে বেড়ায়। নিচে সূর্যের আলো যতটুকু পৌঁছায় ততটুকু আবছা দেখা যায়। কিন্তু গভীর জলের ভিতর জালালি আদৌ বুঝতে পারে নি, বড় রাক্ষুসে গজার মাছটা ওকে মরণ কামড় দেবার তালে আছে। ফাঁক পেলেই এসে খুবলে মাংস তুলে নেবে। কারণ মাছটা তার আস্তানায় জালালির উপদ্রব আদৌ সহ্য করতে পারছে না।

জালালি জলের ভিতর ডুবে দেখল, মাটি খুব মসৃণ। কোন মাছের আস্তানা হলেই—বড় মাছ হতে হয়, রুই কাতলা অথবা কালিবাউস, বড় প্রকাণ্ড হতে হবে, হলেই নিচে, গভীর জলের নিচে বৃত্তাকার সমতল আবাস। চারপাশের ঘন ঝোপজঙ্গলের ভিতর মাছের এই নিঃসঙ্গ নিবাস। নিবাসের আশেপাশে যত জালালি শালুকের জন্য ঘুর ঘুর করছিল তত মাছটা ক্ষেপে যাচ্ছিল। তত মাছটার লেজ কাঁপছে জলের নিচে। তত এগুচ্ছে, পিছোচ্ছে। ভয় পাচ্ছে মানুষ দেখে, অথবা ভয় পাচ্ছে না মতো ঘোড়ার কদমে পাখনা নাচাচ্ছে। মাছটার শরীরে বড় বড় চক্র। অজগর সাপের গা যেন। বড় একটা কালো রঙের থাম যেন। শরীরে তার মানুষের চেয়ে কত অধিক শক্তি, সেই শক্তি নিয়ে দুর্বল জালালির বুক থেকে খুবলে মাংস তুলে নেবার জন্য জোরে এসে ধাক্কা মারল। জালালির মাথাটা নিচের দিকে ছিল তখন। জলের নিচে শালুক, মাটিতে শালুক—জালালি দু ঠ্যাঙ ফাঁক করে প্রায় ব্যাঙের মতো ক্রমে নিচে নেমে যাচ্ছিল। ঠিক নিচে নেমে যাবার মুখে মাছটা এসে বুকে ধাক্কা মারল।

জালালির এবার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। জলের ভিতর মাছটা অতিকায় পশুর মতো দাপাচ্ছে। ফলে জলে ঘূর্ণি উঠছিল। আর জলের ভিতর ঘাস-লতাপাতাগুলো উল্টে পাল্টে ক্ষীণকায় জালালিকে সাপটে ধরল। শেষবারের মতো সে ঘাস-লতাপাতা ফুঁড়ে ওপরে ভেসে ওঠার দু'বার চেষ্টা করতে গিয়ে একটা ঢেকুর তুলল। একটা বড় শ্বাস নিতে গিয়ে জল গিলে ফেলল অনেকটা। ফের উঠতে গিয়ে যখন আর পারছিল না, তখন জলের ভিতরই শ্বাস নেবার চেষ্টা করতে গিয়ে মনে হল রাজ্যের সব জল পেটে ঢুকে যাচ্ছে। যত অন্ধকারের ভিতর শালুকের লতা এবং সেইসব পদ্মপাতার শক্ত লতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাইছিল এবং প্রাণের যাতনায় ছটফট করছে তত লাল চোখ দুটো বড় হতে হতে এক সময় আগুনের গোলা হয়ে গেল। তারপর ফস করে নিভে যাওয়ার মতো, জলের সঙ্গে জল মিশে গেলে যেমন হয় ঠিক তেমনি আগুনের

গোলা দুটো জলের সঙ্গে মিশে একটা কুসুমের মতো রঙ নিয়ে খানিকক্ষণ জেগে থাকল। তারপর জালালির প্রাণটুকু ফুটকরি তুলে জলের ওপর ভেসে উঠলে কুসুমের রংটাও আর থাকল না। ঘোলা জলটা ক্রমে থিতিয়ে আসতে থাকল। জলজ জঙ্গল, লতাপাতা ঝোপ ঘাস সব জলের নিচে চুপ হয়ে আছে। আর নড়ছে না। লতাপাতার ভিতর একটা মানুষ আটকা পড়ল। আজব জীব মনে হচ্ছে এখন জালালিকে। ঘাড়ে গলায় লতাপতা পেঁচিয়ে আছে পায়ের নিচে এবং বুকের চারপাশে অজস্র কদম ফুলের মতো জলজ দাম লেপ্টে আছে। জালালি উপুড় হয়ে আছে। পা দুটো উপরের দিকে, মাথাটা নিচের দিকে হেলানো। একটা ছোট মাছ রূপালী ঝিলিক তুলে জালালির নাকে মুখে এবং স্তনে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

গজার মাছটা নড়ছিল না। সে দূরে লেজ খাড়া করে একদৃষ্টে ঘটনাটা দেখছে। যখন দেখল আজব জীবটা লতাপাতায় আটকে গিয়ে আর নড়তে পারছে না তখন নিজের আস্তানার চারপাশে বিজয়ীর মতো পাক খেল। তারপর দ্রুত পাখনা ভাসিয়ে তীরের মতো দক্ষিণের দিকে ছুটতে থাকল। সকলকে যেন খবরটা দিতে হয়—দ্যাখো এসে আমার আস্তানায় একটা আজব জীবকে আমি ধরে ফেলেছি।

মাছটা এত বড় আর কপালে মনে হয় সিঁদুর দেওয়া—মাছটা কত প্রাচীনকালের কে জানে! মাছটার গায়ে কত মানুষের আজন্মকাল থেকে কোচ অথবা একহলার শিকারচিহ্ন। মাছটার ডান ঠোঁটে দুটো বোয়ালের বঁড়শি নোলকের মতো দুলছে। মাছটার গায়ে কোচের ছোট ছোট ফালি। খুঁজলে, একটা দুটো নয়, অনেক কটা যেন মাংসের ভিতর থেকে বের করা যাবে। সেই মাছটা এবার আনন্দে এবং উত্তেজনায়, বিলের ভিতর জল ফুঁড়ে আকাশের দিকে লাফিয়ে উঠল। তারপর সেই পাড়ের লোক, যারা পাতিল একা ভেসে যায় বলে হায় হায় করছিল, তারা দেখল বিলের জলে এমন একটা মাছ নয়, যেন হাজার লক্ষ মাছ সেই প্রাচীন বিলের জল ফুঁড়ে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে, নেমে আসছে। ভয়ে এবং বিস্ময়ে মানুষগুলি দেখল অনন্ত জলরাশির ভিতর বড় বড় রাক্ষুসে সব গজার মাছ কুমিরের মতো জলের ওপর ভেসে উঠছে। ওরা যেন সন্তর্পণে সকলকে সাবধান করে দিল—বাপুরা দ্যাখো, দ্যাখো, আমাদের তামাশা দ্যাখো। আমরা জলের জীব, তাবৎ সুখ আমাদের জলে।

সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। বিলের জলে সূর্যের লাল রঙ। আকাশে তাম্র রঙ। মানুষগুলির মুখে আগুনের মতো উজ্জ্বল এক রঙ। গরীব দুঃখী মানুষেরা অসহায় মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শীত। উত্তুরে হাওয়ায় সব শীত এসে এই বিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। জলে ডুবে ডুবে ওদের হাত-

পা সাদা হয়ে গেছে। ওরা একসঙ্গে সেই হাজার রাক্ষুসে গজার মাছের ডুব দেওয়া এবং কখনও কখনও জল ফুঁড়ে বাতাসের দিকে উঠে যাওয়া দেখছে। এমন হয়। সেই প্রাচীন বৃদ্ধা, যার শরীরে প্রায় কোন বাস ছিল না, যে আগুন জ্বালবার জন্য ঘাসপাতা সংগ্রহ করছে এবং যে আগুন জ্বালাতে না পারলে, গামছার মতো জ্যালজ্যালে শাড়িটা শুকিয়ে নিতে না পারলে প্রচণ্ড শীতে এই বিলের পাড়েই মরে পড়ে থাকবে; সে ঘাসপাতায় আগুন জ্বেলে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলছে—কি বলছে বোঝা যাচ্ছে না, শুধু চোখমুখ দেখলে ধরা যাচ্ছে—যেন বলার ইচ্ছা, হে তোমরা বাপুরা মনুষ্যজাতিগণ দ্যাখো', মাছেদের খেলা দ্যাখো। আনন্দের দিনে একসঙ্গে ওরা কেমন ঘোরাফেরা করছে দ্যাখো। তোমরা খবর রাখনা মনুষ্যগণ, নোয়া নামক এক মহাপুরুষ জলে নৌকা ভাসিয়েছিলেন। সেই মহাপ্লাবনের দিন স্মরণ কর। এমন সব কথাই বুঝি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে চাইছিল বৃদ্ধা। কিন্তু এসব বলবার অর্থ কি! জালালি, যার স্বামী আবেদালি, যে গয়না নৌকার মাঝি, যার বিবি এখন জলের নিচে দুই ফেরাস্তার আলোর জন্য প্রতীক্ষা করছে, তার আর, মহাপ্লাবনের খবর নিয়ে কি হবে! সুতরাং বৃদ্ধার দিকে কেউ আর তাকাল না। সকলে শীতের ভিতর শুধু আগুনটুকুর জন্য লোভী হয়ে উঠল। সকলে জালালি জলে ডুবে যাওয়ার ঘটনটা পর্যন্ত ভুলে গেল সহসা। ওরা নিজেদের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বিলের পাড় থেকে ঘাসপাতা এনে, শুকনো সব ঘাসপাতা, খড়কুটো এবং ঝোপজঙ্গল থেকে ডালপালা এই অগ্নিকুণ্ডে সকলে নিক্ষেপ করতে থাকল। বিলের ভিতর ক্রমে সূর্য ডুবে যাচ্ছে। এ-পাড়ে আগুন মাথার ওপর উঠে গিয়ে প্রায় আকাশ ছুঁয়ে দিতে চাইছে। কি লেলিহান জিহ্বা! সেই আগুনের প্রচণ্ড উত্তাপ পেয়ে মনে হল সেই সহস্র মাছ বিলের দিকে চলে যাচ্ছে।

পাড়ে দাঁড়িয়ে তখন বিশাল মানুষ পাগলঠাকুর। তিনি আগুন দেখে শীত নিবারণের জন্য ছুটে গেলেন না। তিনি হাত কচলে শুধু বললেন, গ্যাৎচোরেৎশালা। কারণ বিলে মানুষ ডুবে গেল। দুই পদ্মকলির নিচে মানুষ ডুবে গেল। জলে ডুবে শালুক তুলতে গিয়ে মানুষটা আর উঠল না।

শীতের জন্য পাড়ের মানুষেরা আগুনের চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিলের সেই পাতিলটা নড়ছে না। বাতাস পড়ে গেছে। দূরে পদ্মপাতার ভিতর পাতিলটা ভাসতে ভাসতে আটকে গেল। বিলের জলে সূর্য ডুবে যাচ্ছিল বলে ক্রমে জলটা রক্তবর্ণ, ফিকে রক্তিম আভা, তারপর ক্রমশ ফিকে হতে হতে একেবারে নীল হয়ে গেল। নীল থেকে সবুজ এবং পরে কালো জল। এখন এই অনন্ত জলরাশি মনে হচ্ছে স্থির। জলে কোন ফুটকরি ভাসছে না। শীতের ভয়ে মাছগুলি পর্যন্ত নড়তে সাহস পাচ্ছে না। পাগলঠাকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে ফের উচ্চারণ করলেন, গ্যাৎচোরেৎশালা।

মোষের কাটা মুণ্ড তেমনি বিলে পড়ে থাকল। মানুষগুলি যারা কাটা মোষ নিয়ে শীতলক্ষার পাড়ে যাবে তাদের কাছে বুঝি মাথাটা আদৌ লোভনীয় নয়। মাথাটা এখানে ওখানে ফেলে দিতেই হয়। মোষের সব মাংস খাওয়া যায় না। তবু নিতে হয়। প্রসাদ ফেলতে নেই। মাথা নিলে চালডালের পরিমাণটা বাড়ে। সুতরাং এই বিলের ভিতর কাটা মুণ্ড মোষের, আগুনের উত্তাপে কান দুটো খাড়া করে দিল। আহা, সেই কখন শীতের ভোরে অবলা কচি মোষটাকে স্নান করানো হয়েছিল, তেল সিঁদুর মাথায় দিয়ে কচি ঘাস খেতে দিয়েছিল। গলায় করবী ফুলের মালা। পায়ে রক্তজবার মালা ঠিক নূপুরের মতো। যেন ধর্মক্ষেত্রে কচি মোষের বাচ্চাটা এবার মরণ নাচন নাচবে।

অবলা মোষের এই বাচ্চা শীতের সকালে স্নান করে হাড়িকাঠের পাশে শুয়েছিল। শীতে নড়তে পারছিল না। রাজার মতো তার আপ্যায়ন। ছোট কচিকাচা ছেলেরা নূতন জামা-কাপড় পরে, কি সুন্দর ফুটফুটে মেয়েরা নূতন ফ্রক পরে কচি ঘাস রেখে গেছে সামনে। সারা সকালটা ওর কত সোহাগ ছিল। বুড়ো বামুনঠাকুরের মাথায় বড় টিকি, টিকিতে রক্তজবা বেঁধে সেই যে এক সের খি নিয়ে বসে গেল, আর কিছুতেই ওঠে না। ঘাড়ে গলায় ঘি মেখে মোষের, চবর চবর সে পান চিবুচ্ছিল। ঘাড়ে গলায় ঘি মেখে মাংসের ভিতরটা নরম করে দিচ্ছিল। যেন খাঁড়া আটকে না যায়। কি প্রাণান্তকর চেষ্টা সফল বলির জন্য। কিন্তু হলে কি হয়, মোষের প্রাণবায়ু গলায় আটকে আছে। সব খেতে বিস্বাদ। ঢাকঢোলের বাজনায়, ধূপধুনোর গন্ধে, চন্দনের গন্ধে, ফুল বেলপাতার গন্ধে এবং ভয়ঙ্কর শীতে মোষটা বড় নির্জীব ছিল সারাদিন। এখন একটু আগুনের তাপ এসে গায়ে লাগতেই কাটা মুণ্ড কান খাড়া করে দিল। পাগলঠাকুর এইসব দেখে, না হেসে এবং না বলে পারলেন না—গ্যাৎচোরেৎশালা।

তখন গ্রামে গ্রামে খবর রটে গেল—এ সালেও বিলের জলে মানুষ ডুবেছে। এমন কোন সাল নেই, বছর যায় না, মানুষ ডুবে না মরে এই জলে। কিংবদন্তির পাঁচালিকে রক্ষা করে আসছে যেন। সুতরাং সর্বত্র খবর—ফাঁওসার বিলে, যে বিল বিশাল, যে বিলের তল খুঁজে পাওয়া যায় না, মানুষ যে বিলে পড়লে পথ হারিয়ে ফেলে, তেমন বিলে এ সালে আবেদালির বিবি জালালি ডুবে মরল। টোডারবাগের আবেদালি গয়না নৌকা চালাতে সেই যে বর্ষার দিনে নেমে গেছে আর উঠে আসে নি। জব্বর বাবুরহাটে গেছে। সুতরাং মানুষজন পাঠাতে হয়, না হলে বিল থেকে লাশ তোলা যাবে না। কোথায় কোন জলে ডুবে আছে অথবা কিংবদন্তির রাক্ষসটা জালালিকে নিয়ে কোথায় ডুব দিয়েছে কে জানে!

বিলের মানুষগুলি আগুন নিভে গেলে যে যার গাঁয়ের দিকে রওনা হল। এখন জ্যোৎস্না নামবে বিলের ওপর। সমস্ত বিলটা জ্যোৎস্নায় সারা রাত ডুবে থাকবে। পাতিলটা ভেসে যেতে যেতে এক সময় অদৃশ্য হয়ে যাবে। হাওয়া উঠলে সেই পাহাড়ের মতো কালো বস্তুটা বিলের ভিতর থেকে ফের ভেসে উঠতে পারে। কি বস্তু, কোন জীব, কোথায় এর নিবাস—দৈত্যদানো অথবা অন্য কিছু বোঝা ভার। কেউ কেউ জীবটাকে দেখেছে, এমন একটা প্রচলিত ধারণা আছে অঞ্চলের মানুষদের। বিলের পাড় ধরে হাঁটলেই কথাটা মনে হয়। এত বড় বিল এবং কালো জল দেখে অবিশ্বাস করা যায় না যেন। প্রাচীন বিল—কথিত আছে, নবাব ঈশা খাঁ এই বিলে সোনাই বিবিকে নিয়ে ময়ূরপঙ্খী নৌকায় কত রাতের পর রাত কলাগাছিয়ার দুর্গের দিকে মুখ করে বসে থাকতেন। চাঁদ রায়, কেদার রায় কলাগাছিয়ার দুর্গ তছনছ করে দিয়েছে। সোনাইকে উদ্ধারের জন্য জলে জলে সপ্তডিঙা যায়—সোনাইকে উদ্ধারের জন্য সাতশো মকরমুখী জাহাজ পাল তুলে দিয়েছে। জলে বৃদ্ধ ঈশা খাঁর মুখে লম্বা সাদা দাড়ি ফকির দরবেশের মতো। মাথায় তার সোনার ঝালর, কোমরে অসি আর পিছনে কালো রঙের বোরখার ভিতর প্রতিমার মতো সোনাই, সোনাই বিবি—স্থির অপলক দৃষ্টি সামনে। ওরা বিলের ভিতর আত্মগোপন করে ছিল। এই আত্মগোপনের ছবি কিংবদন্তির পাঁচালির মতো বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। ফলে তামাক খেতে খেতে ফেলু ভাবল, জালালি এখন কিংবদন্তির দেশে যেফৎ খেতে চলে গেছে। নবাব ইশা খাঁ, সোনাই বিবি, সেই পাহাড়ের মতো দানোটা এবং বিলের হাজার হাজার রাক্ষুসে গজার মাছ ফেরাস্তার অলৌকিক আলোতে জলের নিচে পথ দেখিয়ে নবাববাড়ির অন্দরে নিয়ে যাচ্ছে জালালিকে।

কেবল পাগল ঠাকুরই পাড়ে এখন একা দাঁড়িয়ে। প্রথমে পাতিলটা যে জায়গায় ছিল আর যে জায়গায় জালালি ডুব দিয়েছিল, সেই জায়গাটার দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন। ডান দিকের বাঁশবন পার হয়ে কিছুটা জলের ভিতর নেমে যেতে হয়। দুটো বড় পদ্মের কলি জল ফুঁড়ে উঠে পড়েছে এবং ঠিক তার পাশেই জালালি শেষবারের মতো ডুব দিয়ে আর উঠতে পারে নি। পাতিলটা ভেসে ভেসে দূরে সরে গেল বলে আর দেখা গেল না। জ্যোৎস্নায় অদৃশ্য সব। ঠিক পায়ের নিচে শুধু সেই কাটা মুণ্ড। কাটা মুণ্ড পাগল ঠাকুরের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। কিছু বলতে চায় যেন। রক্তবীজের বংশ। যেখানে এক ফোঁটা রক্ত সেখানে সেই রক্তবীজ দৈত—হাজার হাজার, লাখে লাখে। রক্তবীজ অসুরের মতো এই মোষের মুণ্ডটা প্রাণ পেয়ে যাচ্ছে। পাগল ঠাকুর বিস্ময়ে দেখছিলেন, দেখতে দেখতে মনে হল মোষের মুণ্ডটা প্রশ্ন করছে, ঠাকুর তুমি কি দেখছ?

পাগল ঠাকুর বললেন, আমি বিলের জ্যোৎস্না দেখছি।

—ঠাকুর তুমি জ্যোৎস্না ছাড়া আর কি দেখতে পাচ্ছ?

—তোমাকে দেখতে পাচ্ছি।

—আমি কে?

—তুমি এক অবলা জীব মোষ।

—মোষের বুঝি ঠাকুর প্রাণ থাকে না!

—থাকে।

—তবে তোমরা আমাকে অযথা হত্যা করলে কেন!

—তোমাকে হত্যা করা হয় নি, দেবতার নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।

—দেবতা সে কে?

—দেবতা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। আলো দিচ্ছেন ফুল ফোটাচ্ছেন। সংসারের যাবতীয় পাপ মুছে পুণ্য ঘরে তুলে আনছেন।

—আর কিছু করছেন না?

—আরও অনেক কিছু করছেন। জীবের পালন, সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সব তাঁরই হাতে।

—তবে আমি নিমিত্ত মাত্র! ভোগের নিমিত্ত!

—নিমিত্ত মাত্র। ভোগের নিমিত্ত।

মোষটা এবার হেসে উঠল।

পাগল ঠাকুর বললেন, তুমি হাসছ কেন?

—ঠাকুর তোমার কথা শুনে।

পাগল ঠাকুরকে এবার খুব বিমর্ষ দেখাল। তিনি মোষটার দিকে তাকাতে পারছেন না। তাকালেই ফের হেসে উঠবে। তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলেন। দুই পদ্মকলির নিচে জালালি ডুবে আছে দেখতে থাকলেন। সামনে শুধু জলরাশি। হাওয়ার জন্য এখন জলে ঢেউ উঠছে। জলের শব্দ ভেসে আসছিল তীরে। দূর থেকে ঢাক-ঢোলের শব্দ তেমনি ভেসে আসছে। কেমন গুমগুম শব্দের মতো মনে হচ্ছে। যেন ঝড় আসছে। অথবা মনে হয় হাজার বছর ধরে সেই রাক্ষস ছুটে আসছে। রাজপুত্রের হাতে পাখি। পাখির ডানা ছিঁড়ে ফেলেছে রাজপুত্র। পড়ি-মরি করে সেই হাজার লক্ষ রাক্ষসের দলটা রাজপুরীর দিকে ছুটে আসছে। কান পাতলে মনে হয় সেই রাক্ষসেরা অনন্ত কালের গর্ভে পাখির রক্তপানের লোভে ছুটছে। পাখি রাজপুত্রের হাতে। খুশিমতো ডানা পা এবং মুণ্ড ছিঁড়ে দিলেই শেষ। কিন্তু হায়, রাজপুত্র পাথরের, পাখি পাথরের। সুখী রাজপুত্র রাতের বেলায় পাখি হাতে স্বপ্ন দেখতে দেখতে পাথর হয়ে গেছে।

মোষটা বলল, কি ঠাকুর, তাকাচ্ছো না কেন?

পাগল ঠাকুর জবাব দিলেন না।

—ঠাকুর তুমি সামান্য কাটা মুণ্ডের হাসি সহ্য করতে পার না, আর আমি কি করে খাঁড়ার ঘা সহ্য করেছি বল!

পাগল ঠাকুর বললেন, ভাখো তোমাকে বাপু আমি কিছু বলছি না। তুমি আমার পিছনে লাগবে না।

—ঠিক আছে। তবে আমি উড়াল দিলাম। বলে মুণ্ডটা দু'পাশে পলকে দুটো ডানা গজিয়ে নিল, তারপর বিলের ওপর উড়তে থাকল।

—আরে কর কি, কর কি! পাগল ঠাকুর কাটা মুণ্ড ধরতে গেলেন।

—কেন, আমাকে তোমার ভগবানের চেয়ে খারাপ দেখাচ্ছে এখন! বাদুড়ের মতো দেখাচ্ছে না। অতিকায় বাদুড়ের মতো। বলে, মোষের মাথাটা পাগল ঠাকুরের সামনে পেণ্ডুলামের মতো দুলতে দুলতে বলল, কেমন লাগে দেখতে। বাদুড়ের মতো লাগছে না! লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর বুকে এমন সব বাদুড় ছিল। এখন আর তারা নেই। একদল আরও বড় সরীসৃপ এসে ওদের খেয়ে ফেলল। কিন্তু তারা তোমাদের মতো আর যাই করুক, ধর্মের নামে ভণ্ডামি করে নি। ঈশ্বরের নামে সব অপকর্ম চালায় নি।

কাটা মুণ্ডটার কাণ্ডকারখানা দেখে পাগল ঠাকুর বড় বেশি বিরক্ত হলেন। বড্ড জ্বালাতন করছে মুণ্ডটা, ভালো মানুষ পেলে যা হয়। তিনি পাড় ধরে হাঁটতে থাকলেন—কিন্তু আশ্চর্য, সব সময় সেই মোষের মুণ্ডটা দুটো বড় পাখা নিয়ে ওঁর চোখের সামনে ঠিক পেণ্ডুলামের মতো ঝুলছে তো ঝুলছেই। কেউ যেন অদৃশ্য এক সুতো দিয়ে মোষের মুণ্ডটাকে আকাশ থেকে ছেড়ে দিয়েছে। পাগল ঠাকুর হাঁটছেন সামনে, মোষের মুণ্ডটা ক্রমশ পিছনে সরে যাচ্ছে। পাগল ঠাকুর পিছনে হাঁটছেন, মোষের মুণ্ডটা এবার এগুচ্ছে। এ তো বিষম জ্বালাতন হল। তিনি এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য থেকে মুক্ত হবার জন্য ছুটতে থাকলেন। একবার সামনে, একবার পিছনে। যেন একা একা মাঠে গোল্লাছুট খেলছেন। একবার উত্তরে, একবার দক্ষিণে। পশ্চিমে পুবে যেদিকে গেছেন, মোষের মুণ্ডটা ওঁর চোখের ওপর একটা অতিকায় বাদুড় হয়ে ঝুলছে। কখনও মুণ্ডটা হাসছে, কখনও কাঁদছে। কখনও বলছে, শালা মনুষ্যজাতির মতো ইতর জাতি দেখি নি বাপু। খুশিমতো ঈশ্বরের নামে আমাকে দু'টুকরো করে বিলের পাশে ফেলে চলে গেল।

পাগল ঠাকুর যে পাগল ঠাকুর, তার পর্যন্ত ভয় ধরে গেল। তিনি সব ভুলে মাঠময় ছুটে বেড়াতে থাকলেন। এবং সেই এক চিৎকার অতিকায় বাদুড়কে উদ্দেশ্য করে, গ্যাৎচোরেৎশালা!

সামসুদ্দিন ঢাকা থেকে ফিরেই শুনল, জালালি ডুবে গেছে জলে। গ্রামের

কেউ একবার খোঁজ করতে যায় নি পর্যন্ত। সে তাড়াতাড়ি দলবল নিয়ে মাঠে বের হয়ে পড়ল। দু'জন লোককে দু'জায়গায় পাঠিয়ে দিল। একজন আবেদালি এবং অন্যজন জব্বরকে খবর দিতে চলে গেল। সে তার দলবল নিয়ে বিলের পাড়ে পৌঁছতে বেশ রাত করে ফেলল। ওরা পাড়ে পৌঁছেই দেখল, জ্যোৎস্নার ভিতর মাঠময় কে যেন ছুটে বেড়াচ্ছে। দেখলে মনে হবে ঘটনাটা আধিভৌতিক। মনে হবে কোন জিনপরী, ঈশ্বরের ভয়ে পাগলের মতো ছুটে পালাচ্ছে। সামসুদ্দিন পর্যন্ত হকচকিয়ে গেল। দলের লোকেরা বলল, ভাই সামু, চলি রে। কার কপালে কি আছে কওয়ন যায় না।

সামু এবার চিৎকার করে উঠল, মাঠের ভিতর কে জাগে কও!

উত্তরে এক পরিচিত শব্দ, গ্যাৎচোরেৎশালা। মাঠের ভিতর মনুষ্য জাগে। সকলের প্রাণে এবার জল এসে গেল। পাগল ঠাকুর সাদা জ্যোৎস্নায় এই মাঠের ভিতর ছুটোছুটি করছে। ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানোর ভয় ওদের আর থাকল না। সামু চিৎকার করে প্রতিধ্বনি তুলল, বড়কর্তা, আমি সামু। আবেদালির বিবি জালালি জলে ডুইবা গ্যাছে। তারে আমরা তুলতে আইছি।

সুতরাং কিংবদন্তির ভয়টা ওদের মুহূর্তে উবে গেল। ওরা এবার অলস অথবা মন্থর পায়ে জলের কাছে নেমে গেল। যারা বিলে শালুক তুলতে এসেছিল তা[illegible]একজন সঙ্গে আছে। সামসুদ্দিন তাদের একজনকে নিয়ে বিলের ধারে [illegible]ত থাকল। কোথায় শেষবার ওরা জালালিকে দেখেছে এবং তখন বেলা ক'টা তার একটা আন্দাজ করতে চাইল সামু। হাসিমদের বড় নৌকাটা জলের নিচ থেকে তুলে আনার জন্য কয়েকজন লোক চলে গেছে। নৌকা এলেই জলের ভিতর অন্বেষণে নেমে যাবে। জালালির কাপড় জলে ভেসে থাকতে পারে, ফুলে ফেঁপে জালালি জলের ওপর ভেসে উঠতে পারে।

কিন্তু নৌকা ভাসিয়ে মনজুর যখন এল, যখন জয়নাল গলুইতে লগি বাইছে এবং নৌকার ওপর প্রায় পঁচিশ-ত্রিশজন লোক, জ্যোৎস্না রাতে বিলের জলে ঢেউ উঠছে—পদ্মপাতার ওপর কোন গাঙফড়িঙের শব্দ, রাত নিশুতি হচ্ছে অথচ জালালির কোন হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না, তখন মনে হল দূরে কি ভেসে যায়! ওরা বিলের ভিতর ঢুকে দেখল সেই পাতিল, পাতিলে কিছু শালুক, শালুকের ওপর চাঁদের আলো মায়াময়। গোটা আট-দশ শালুক সারাদিনে ডুবে ডুবে জালালি সংগ্রহ করেছিল। শালুকের ভিতর একটা বড় ঝিনুক। ঝিনুক দেখলেই, বড় ঝিনুক জলের তলায় মিলে গেলে স্বপ্ন দেখা—ঝিনুকে যদি মুক্তা থাকে, বোধ হয় জালালি জলের নিচে স্বপ্ন দেখেছিল, বেগম হবার স্বপ্ন। সামসুদ্দিন নুয়ে পাতিলটা পাটাতনে তোলার সময় কাতর গলায় হাঁকল, চাচি, তর রাজ্যে এখন কারা জাগে!

জল থেকে কোন উত্তর উঠে এল না। সে এবার চারিদিকে তাকাল। বিলের পাড়ে পাড়ে একের পর এক ছোট ছোট গ্রাম। গরীব-দুঃখীদের নিবাস। গ্রামে যারা মোল্লা-মৌলবী মানুষ, হাটে তাদের সুতোর অথবা পাটের কারবার আছে। আর আছে হিন্দু মহাজন। এবং হক সাহেবের ঋণসালিশী বোর্ড। মানুষগুলি আত্মরক্ষার কৌশল ধীরে ধীরে জেনে ফেলছে। সে অন্যান্য সকলকে লক্ষ্য করে বলল, তবে দ্যাখছি পাওয়া গ্যাল না।

কেউ কোন শব্দ করল না। করলেই সামু ওদের জলের নিচে ডুব দিতে বলবে। এই শীতে জলে নামলে হিমে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ওরা কেমন ইতস্তত করতে থাকলে সামু বলল, ঠিক আছে, আপনারা নৌকায় থাকেন, জলে ডুব দিয়া আমিই খুঁজি। বলে, সেই দলের মানুষটা যেখানে শেষবার জালালিকে দেখেছে বলেছে, সামু গামছাটা পরে সেখানে ডুব দিল।

বিলে এত মানুষজন দেখেই বুঝি মোষের মুণ্ডটা চোখের ওপর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। পাগল ঠাকুর সামান্য সময় পেলেন ভাববার। তিনি ভাবলেন, এমন কেন হল! সামান্য এক অবলা জীবের এত রোষ! তিনি তাড়াতাড়ি সেই রোষ থেকে রক্ষা পাবার জন্য সামুদের নৌকার দিকে হাঁটতে থাকলেন। নৌকাটা জলের ওপর এক জায়গায় থেমে আছে। এবং একজন মানুষ একা জলে সাঁতার কাটছে। জলে ডুব দিচ্ছে। ভয়-ভীতির তোয়াক্কা[illegible] না। এতগুলো মানুষ নৌকার ওপর দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে। আর [illegible]টা মানুষ দামের ভিতর শীতের রাতে আটকা পড়বে। কে এমন অবিবেচক মানুষ! পাগল ঠাকুর প্রায় জলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। জালালি যেখানে ডুবেছে তার চেয়ে অনেক দূরে ওরা খোঁজাখুঁজি করছে। সামুর এই অনর্থক পরিশ্রমের জন্য পাগল ঠাকুর রুষ্ট হচ্ছিল। তা'ছাড়া একা একা মাঠে হাঁটলে ফের মোষের কবলে পড়ে যাবেন ভেবে পাড়ে দাঁড়িয়ে তালি বাজালেন। যেন তোমরা আমায় নৌকায় তুলে নাও এমন বলার ইচ্ছা।

মনজুর পাটাতনে দাঁড়িয়ে হাঁকল, তালি বাজায় কোন্ মাইনষে?

উত্তর নেই। কেবল কে অনবরত বিলের পাড়ে তালি বাজাচ্ছে। ওর বুঝতে এবার আদৌ কষ্ট হল না, ঠাকুরবাড়ির পাগল ঠাকুর তালি বাজাচ্ছে। নৌকায় ওঠার জন্য তালি বাজাচ্ছে। মনজুর এবার চিৎকার করে বলল, আইতাছি কর্তা, খাড়ন।

নৌকা পাড়ের কাছে গেলে কোথায় পাগল ঠাকুর নৌকায় উঠে আসবেন—তা না, জলে ঝাঁপ দিয়ে সেই দুই পদ্মকলির দিকে ছুটে যেতে থাকলেন। পাগল মানুষের শীত গ্রীষ্ম সব সমান। মানুষটা বুঝি পুরোপুরি ক্ষেপে গেছে। তিনি সকলকে পিছনে ফেলে দুই পদ্মকলির উদ্দেশে একটা বড় সাদা রাজহাঁসের বেগে চলে যেতে থাকলেন। দশাসই মানুষ, তল্লাটে এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার।

যেমন লম্বা তেমনি অসীম শক্তির ধারক মানুষটি। সকল কিংবদন্তির দৈত্য-দানোকে কলা দেখিয়ে দুই পদ্মকলির ভিতরে ডুবে গেলেন। দাম, লতাপাতা, পদ্মের লতা ছিঁড়ে ফুঁড়ে জালালির জীর্ণ লাশটাকে টেনে বের করে ফেললেন। তারপর চুল ধরে জলের ওপরে ভেসে সাঁতরাতে থাকলেন। তীরের বেগে সাঁতার কাটছেন। মানুষগুলো ভয়ে বিস্ময়ে রা করতে পারছে না। ঠিক এক পীর, দরগার পীর এই পাগল মানুষ যেন। সকলকে বিস্মিত করে জালালির শরীরটা কাঁধে ফেলে জল ভেঙে ওপরে উঠে গেলেন তিনি। কোনদিকে তাকালেন না। কাঁধে মৃতদেহ, সামনে ফসলবিহীন মাঠ, আকাশে কিছু নক্ষত্র জ্বলছিল, আর দূরে তেমনি ঢাকের বাদ্যি বাজছে। পাগল ঠাকুরের সহসা মনে হল তিনি জালালিকে নিয়ে হাঁটছেন না। যেন সেই ফোর্ট উইলিয়ামের দুর্গ, দুর্গের মাথায় কবুতর উড়ছে এবং রেমপার্টে ব্যাণ্ড বাজছিল। এখন ঢাকের বাদ্যি শুনে সেসব মনে করতে পারছেন। কাঁধে তার জালালি নয়, যুবতী পলিন। পলিনকে নিয়ে হাঁটছেন। এটা ফসলবিহীন মাঠ নয়, এটা যেন সেই রেমপার্ট। পাশে দুর্গ। একদল ইংরেজ সৈন্যের কুচকাওয়াজের শব্দ, ওরা পিছন থেকে পলিনকে কেড়ে নেবার জন্য ছুটে আসছে। পাগল ঠাকুর এই ভেবে ছুটতে থাকলেন।

ওরা দেখল মাঠের ওপর দিয়ে তিনি ছুটে যাচ্ছেন। পাগল মানুষ তিনি, কোনদিকে চলে যাবেন জালালিকে নিয়ে কে জানে! তা ছাড়া তিনি বিধর্মী মানুষ। সেই মানুষের কাঁধে মৃত জালালি। ওরা ছুটতে থাকল। মৃত জালালিকে নিয়ে অন্য কোন মাঠে অথবা নদীর ওপারে চলে গেলে ইসলামের গুনাহগার হতে তবে আর বাকি থাকবে না। এখন জালালিকে ধর্মমতে আবেদালি পর্যন্ত দেখতে পাবে না। আর কিনা এই পাগল মানুষ বিধর্মী মানুষ সব পিছনে ফেলে মাঠ ধরে ছুটছেন! ওরা তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে মাঠের মাঝখানে পাগল ঠাকুরকে ঘিরে ফেলল। ধীরে ধীরে ওরা পাগল ঠাকুরের নিকটবর্তী হতে থাকল। ওরা বুঝতে দিচ্ছে না জালালিকে কাঁধ থেকে তুলে নেবার জন্য ওরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। ওদের এই কৌশল ধরে ফেলতে পারলে তিনি ফের ছুটবেন। যেমন এক হেমন্তের বিকেলে মুড়াপাড়ার হাতি নিয়ে মাঠে ঘাটে বের হয়ে পড়েছিলেন।

ওরা ওঁকে ঘিরে ফেলে চারিদিকে সতর্ক নজর রাখল। সামু কাছে গিয়ে বলল, চাচিরে দ্যান।

অদ্ভুত ব্যাপার! একেবারে ভালমানুষ তিনি। খুব ধীরে ধীরে, যেন রুগ্ন অসুস্থ মানুষকে কাঁধ থেকে নামাচ্ছেন। ধীরে ধীরে তিনি জালালিকে শুইয়ে দিলেন। শুইয়ে দেবার সময় গলগল করে ভিতর থেকে জল উগলে দিল জালালি। শরীরটা সাদা ফ্যাকাসে। চোখের মণি দুটো স্থির। অপলক তাকিয়ে

সকলকে দেখছে। ডুবে শাড়িটা আলগা হয়ে গেছে। সামু কাপড়টা খুলে জলটা চিপে ফেলে দিল। তারপর শাড়িটা দিয়ে লাশটা ঢেকে দিল। তারপর জালালির সঙ্গে কার কি সম্পর্ক, কে এই লাশ বহন করে নেবার অধিকারী—যারা পুত্রবৎ অথবা পিতৃবৎ তারাই শুধু লাশ বহন করে নিয়ে যেতে পারবে। এইসব ভেবে সে চার পাঁচজন মানুষকে লাশটা বেঁধে ফেলতে বলল। একটা বাঁশের সঙ্গে বেঁধে যেমন কাটা মোষ নিয়ে মানুষেরা গিয়েছিল, জয় যজ্ঞেশ্বর কি জয়, বলে জয়ধ্বনি করছিল, তেমনি ওরা আল্লা রহমানে রহিম বলে চলে যাচ্ছিল মাঠ ধরে।

আবেদালির বিবি শালুক তুলতে এসে জলে ডুবে মরে গেল। কিংবদন্তির দেশে জালালি শহীদ হয়ে গেল। এই নিয়ে ফের একটা সাল উত্তেজনা থাকবে—যেমন রসো এবং বুড়ি সেই কোন এক সালে জলে ডুবে মরেছিল, কেউ টের পায় নি, হেমন্তের কোন অপরাহ্নে কঙ্কাল আবিষ্কার করে বিস্মিত হয়েছে অঞ্চলের মানুষেরা। তারপর সব গালগল্প। অশিক্ষিত অথবা অর্ধশিক্ষিত মানুষেরা, যখন রাত হয়, যখন কেউ জেগে থাকে না, তখন অঞ্চলের এইসব খালবিল, শ্মশানের অথবা কবরখানার অলৌকিক ঘটনা নিয়ে তারা ডুবে থাকে। এমন একটা বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকতে ভালবাসে।

ওরা যত এগুচ্ছিল ততই ঢাক এবং ঢোলের শব্দ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সারারাত ঢাক ঢোল বাজবে। হ্যাজাকের আলো এখন মাঠময় আর মাঝে মাঝে বাজি পুড়ছে। হাউই উড়ছে আকাশে। মালতীর চোখে ঘুম আসছিল না। পার্বণের খাওয়া চালকলা, তিলাকদমা ফুলেফলে ভরা। তারপর খিচুড়ি পায়েস। বড়বৌ ভিন্ন ডেকে আবার পায়েস খেতে দিয়েছিল মালতীকে।

মালতী লেপ-কাঁথার ভিতর শুয়ে জানালা দিয়ে মাঠের জ্যোৎস্না দেখছিল। বাস্তুপূজার দিনে জ্যোৎস্না বড় রহস্যময়। ঠিক যেন কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা। বাজি, আতসবাজি আর নাড়ু মোয়া। খেতে খেতে আকণ্ঠ। এই জ্যোৎস্নায় বিলের জলে জালালি ডুবে আছে। কথাটা ভাবতেই মালতীর কেমন দম বন্ধ ভাব হচ্ছে। সে উঠে বসল। ওরা এখনও আসে নি। এলে গোপাটে ওদের কথাবার্তা থেকে টের পাওয়া যেত জালালিকে খুঁজে পাওয়া গেছে কিনা!

মালতী অনেক চেষ্টা করেও ঘুমাতে পারল না। লেপ-কাঁথা গায়ে জড়িয়ে কেমন চুপচাপ উদাস ভঙ্গিতে জানালার কাছে বসে থাকল। সারাদিন শরীরে খুব ধকল গেছে। নৈবেদ্য সাজাবার জন্য পেতলের হাঁড়ি মেজে সাফসোফ করেছে। নরেন দাসের নানারকম বাতিক। এই বাস্তুপূজা জমির জন্য, ফসলের জন্য। প্রাণের চেয়ে মূল্যবান এই ফসল। সুতরাং কোথাও ত্রুটি থাকলে রক্ষা নেই। বিষয়ী মানুষ নরেন দাস অমূল্যকে পর্যন্ত ছুটি দিয়েছে এই দিনে।

মালতী সেই কোন ভোর থেকে দুধের বাসন, পেতলের হাঁড়ি মেজে সাফসোফ করেছে। তারপর সারাদিন মাঠ আর বাড়ি। বাস্তুপূজা মাঠে হয়। মাঠে সব টেনে নিয়ে যেতে হয়েছে। আবার মাঠ থেকে সব টেনে বাড়িতে তুলতে হয়েছে। প্রায় এক হাতে সব কাজ, শোভা আবু সামান্য সাহায্য করেছে। অমূল্য দুপুর পর্যন্ত ছিল, তারপর সে বাড়ি চলে গেছে। ফলে মালতী সন্ধ্যা পর্যন্ত শ্বাস ফেলার সময় পায় নি। তাড়াতাড়ি সেজন্য হাত পা ধুয়ে শুয়ে পড়েছে ঘুমোবে বলে। কিন্তু হায় কপাল, ঘুম আসে না চোখে। কিসের আশায় কি যেন কেবল বুকে বাজে। মনে হয় এই জ্যোৎস্না রাতে চুপচাপ মাঠে একা দাঁড়িয়ে থাকতে। পাশে এক ভালোবাসার মানুষ থাকবে শুধু। ওর প্রিয় সেই স্বার্থপর দৈত্যটির কথা মনে হল।

দৈত্যটি তার সারাদিন মাঠে মাঠে প্রসাদ খেয়ে বেড়িয়েছে—একবার মালতীর পূজা দেখতে এল না। সে, সরকারদের বাস্তুপূজা দেখতে ওর মাঠের পাশ দিয়ে চলে গেল অথচ ওর এমন নিয়মনিষ্ঠার পূজা দেখে গেল না। ভিতরে ভিতরে ক্ষোভে মরে যাচ্ছিল। যেন মানুষটার ওপর রাগ করেই সে সারাদিন ক্রমান্বয় কাজ করেছে। এই ক্ষোভের জ্বালা ভয়ঙ্কর। সে ভিতরে বড় কষ্ট পাচ্ছিল। মানুষটার বড় বেশি গরিমা মনে মনে। দেশের কাজ করে বেড়ায় বলে অহঙ্কারে পা পড়ে না।

জ্যোৎস্নায় মাঠ এখন ভেসে যাচ্ছে। গাছগাছালি সব সাদা হয়ে গেছে। একটুকু অন্ধকার নেই কোথাও। এমন জ্যোৎস্না যেন কতকাল ওঠে নি। এমন জ্যোৎস্নায় ঘুম আসে না চোখে।

মালতীর প্রথম মনে হয়েছিল বেশি খাওয়ার জন্য ভিতরটা হাঁসফাঁস করছে এবং ঘুম আসছে না চোখে। ক্ষোভে অভিমানে ঘুম আসছে না, অথবা মানুষটাকে খুব কাছে পেতে ইচ্ছা হচ্ছে। ফলে জ্বালা ভিতরে, বুকের ভিতর কি এক ভীষণ জ্বালা। মাঝে মাঝে বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠছে। বুঝি সে এল। চুপিচুপি ওর জানালার পাশে এসে দাঁড়াল। কিন্তু না, কেউ এল না। কেউ আসবে না। শুধু একা জেগে বসে থাকা। মালতী ফের শুয়ে পড়ল। জ্যোৎস্নায় মাঠ আদিগন্ত ভেসে যাচ্ছে। ওর মুখে জ্যোৎস্নার লাবণ্য ছড়িয়ে পড়ছে। সে নিজের ঘাড় গলা ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখল। কি মসৃণ ত্বক, কি মনোরম এই শরীর! সে ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে পড়ছে। সে রঞ্জিতকে ভুলে থাকার জন্য স্বামীর স্মৃতি মনে করার চেষ্টা করল। স্বামীর সঙ্গে সহবাসের দৃশ্য ভাববার চেষ্টা করল—যদি মনের ভিতর তার অস্থির অস্থির ভাবটা কাটে। কিন্তু সেই পুরোনো দৃশ্য, একঘেয়ে দৃশ্য নিয়ে বেঁচে থাকা যায় না। পুরোনো সহবাসের দৃশ্য কোন আর উত্তেজনার জন্ম দেয় না। সে মনে মনে ভাবল, না কোথাও আর জ্যোৎস্না নেই। সে লেপটা গোটা মাথায়

মুখে ছড়িয়ে দিয়ে ভিতরটা অন্ধকার করে দিল। এখন শুধু মালতীর চারপাশে অন্ধকার। সব স্বপ্ন শহরের দাঙ্গা শেষ করে দিয়েছে। নূতন করে স্বপ্ন দেখলে পাপ। মালতী এই পাপের ভয়ে লেপের নিচে মুখ লুকিয়ে ফেলল, অন্ধকারে নিজে নিজে পাপ করে বেড়ালে কে আর টের পাবে। স্বামীর মুখ যখন কিছুতেই মনে আসছে না, পুরোনো সহবাসের ছবি যখন চোখের ওপর ক্যালেণ্ডারের পাতার মতো নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে গেছে তখন অন্ধকারে সরু সুন্দর আঙুলের স্পর্শ শরীরে রোমাঞ্চ এনে দিচ্ছে। আঙুলগুলি শরীরের ভিতর নানারকম পাপ কাজ করে বেড়াচ্ছে, শরীরে আবেশ এনে দিচ্ছিল। সতী সাবিত্রীর মতো পুণ্যবতী না হয়ে মনে মনে অন্ধকারের ভিতর রঞ্জিত নামক এক যুবকের স্মৃতিভারে আপন শরীরের ভিতর পাপকে অন্বেষণ করে বেড়ান —গোপনে এই পাপকার্য বড় ভালো লাগে। প্রাণের চেয়েও আপন মনে হয়। আহত সাপ মরে যাবার আগে শরীর যেমন গুটিয়ে আনে আবার সবটা ছেড়ে দেয় এবং এক সময় সোজা লম্বা হয়ে পড়ে থাকে, তেমনি মালতী শরীর ক্রমে গুটিয়ে আনছে এবং সহসা শরীর ছেড়ে দিচ্ছিল। তুলে দিচ্ছিল। তার এখন অসহায় আর্তনাদ এই শরীরের ভিতর। কি যেন নেই পৃথিবীতে, কি যেন তার হারিয়ে গেছে। সারা শরীরে এখন তার ভালোবাসার অনুসন্ধান চলছে শুধু। কত আপন আর কত প্রিয় এই অনুসন্ধান। হায়, মানুষের অন্তরে এই ভালোবাসার ইচ্ছা কি করে হয়, কোন অন্ধকার থেকে সে উঁকি মারে, কখন সে সব পাপ-পুণ্য বিসর্জন দিয়ে মরমিয়া সন্ন্যাসীর মতো পাগলপারা হয় কেউ বলতে পারে না। মালতী ঘন ঘন শ্বাস ফেলছিল। বুঝি সেই এক বাউল শরীরে নৃত্য-গীত বাজায়, আমারে বাজাও তুমি রসের আঙ্গুলি দিয়া। তারপর কোড়াপাখির ডাকের মতো শব্দ—ডুব্ ডুব্। মালতী একেবারে নিস্তেজ হয়ে গেল। কিন্তু এ-কি! গোপাটে কারা এখন ছুটোছুটি করছে! কে যে এমন আকাশফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ছে! মালতীর গলা চিনতে কষ্ট হল না। জব্বর কাঁদছে। ওর মা শালুক তুলতে গিয়ে ডুবে মরেছে। জব্বর এমনভাবে কবে কাঁদতে শিখল! ঠিক শিশুর মতো আকাশ বিদীর্ণ করে কেঁদে উঠছে—মা মা! মালতী ছুটে সাদা জ্যোৎস্নায় নেমে গেল। বাঁশে ঝুলিয়ে লাশটা নিয়ে সামু গোপাট ধরে এবার বুঝি উঠে আসবে।

গোপাটের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা প্রায় সকলেই জেগে গেল। তা ছাড়া সন্ধ্যার পর থেকে পাড়ার বৌ-ঝিরা কুয়োতলায় অথবা পুকুর পাড়ে, কখনও আতা বেড়ার ফাঁকে উকিঝুঁকি মেরেছে—এই বুঝি এল! সামসুদ্দিন যখন তার দলবল নিয়ে গেছে তখন লাশ তুলে আনতে কতক্ষণ! কিন্তু যারা বয়সে প্রাচীন, যারা বিলের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস রাখে, তাদের কাছে এটা সাবুর পণ্ডশ্রম। ওরা বৈঠকখানায় অথবা উঠোনে এবং গোয়ালের পাশে বসে তামাক খাচ্ছিল আর বিলের সব অলৌকিক গল্পের ফোয়ারা ছোটাচ্ছিল। প্রতিবেশীদের ছোট ছোট শিশুরা, নাবালকেরা সেইসব প্রাচীন পুরুষদের পাশে বসে দলে দলে গল্প শুনছিল।

ঈশম সোনাকে সেই কিংবদন্তির গল্প শোনাচ্ছিল।

হেমন্তের এক বিকালে সোনাবাবু জন্মালেন। ঈশম তরমুজ খেতে তরমুজের লতা পাহারা দিচ্ছিল। তখন সোনালী বালির নদীর চরে ফুল ফুটে থাকার কথা। ধান কাটা হয়ে গেছে তখন। সোনাবাবু ম্যাঁউ ম্যাঁউ করে বেড়ালের মতো অন্থজ ঘরে কাঁদছেন। সোনা ঈশমের কাছে সেই ম্যাঁউ ম্যাঁউ কান্নার কথা শুনে বলল, যান! আপনে মিছা কথা কন।

—না গ কর্তা, মিছা কথা কই না। যেন তার বলার ইচ্ছা, সংসারে এমনটা হয় কত। মাথায় পাগড়ি বাইন্দা রওনা দিলাম, ধনকর্তারে খবর দিতে। তারপর বোঝলেন নি কর্তা, রাইত, কি ঘুটঘুইটা আনধাইর। মনে হইল বামুন্দির মাঠের বড় শিমুল গাছটা, মাথায় একটা চেরাগ জ্বালাইয়া আমার দিকে হাঁইটা আইতাছে। কি ডর, কি ডর! বিলের পানিতে মনে হইল কে য্যান আমারে ডুবাইয়া মারতে চায়।

—মারতে চায়! সোনা প্রায় চোখ কপালে তুলে কথাটা বলল।

—হ। কি কমু কর্তা! বিলের লক্ষ্মীরে ত আমরা দেখি নাই কোনদিন। রূপবতী কন্যা—সোনার নাও পবনের বৈঠাতে পানি থ্যাইক্যা ফুস কইরা ভাইসা ওঠে। আনধাইর রাইতে ভাসে না, রাইত ফর্সা হইলে ভাসে। চান্দের আলো থাকলে ভাসে। পূর্ণিমার দিনে সেই নাও দেখলে তাজ্জব। কি সাদা কি সাদা! সেই জলে ডুইবা গ্যালে আর ভাসে না জলে, বলে গান ধরে দিল ঈশম।

সোনার এই গল্প কেন জানি ভাল লাগছিল না। বিলের অলৌকিক গল্প শুনে ওর ভয় ধরে যাচ্ছে। সেই জলে ডুইবা গ্যালে আর ভাসে না জলে। এখন কেন জানি বার বার মার কথা মনে আসছিল সোনার। মা বিকেলে

বকাবকি করেছেন, তুমি কোনখানে যাও সোনা, কোনখানে থাক ঠিক থাকে না। কোনদিন তুমি জলে ডুইবা মরবা।

সোনার মনে হল মা ঠিকই বলেছেন। বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ানোর শখ বড় বেশি ওর। কবে থেকে এমন অভ্যাস গড়ে উঠেছে, সোনা নিজেও জানে না। ছোট মানুষের যা হয় সোনার তাই হল। ভয় ধরে গেল প্রাণে। কোনদিন সে না বলে না কয়ে মাঠে নেমে যাবে—তারপর সেই বিল, প্রকাণ্ড বিলে নেমে যাবার নেশা, কোনদিন সে জলে ডুবে মরে থাকবে কেউ টের পাবে না। সেজন্য সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, না আর না। আর কোনদিন সে বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াবে না। সে একা অথবা পাগল জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে কোথাও চলে যাবে না। গেলে সেই যে গল্প অথবা কিংবদন্তির পাঁচালি—জলে ডুইবা গ্যালে আর ভাসে না জলে—সেই জলে অথবা ডাঙ্গায় যেখানেই হোক সে আর যাবে না। মা সারাদিন চিন্তা করেন। মার চোখে ভয়ের চিহ্ন দেখে এখন সে কেমন অতি কর্তব্যপরায়ণ অথবা যেন সদা সত্য কথা বলিবে, যেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গল্প—মায়ের জন্য ঝড় জলের ভিতর অবলীলাক্রমে দামোদর নদী পার হয়ে যাচ্ছেন—সোনা এবার ভাবল, সে মায়ের অবাধ্য কোনদিন হবে না। সেও মায়ের জন্য সব করবে। কেন জানি তার মার কথা মনে হলেই ঈশ্বরচন্দ্রের জননীর কথা মনে হয়। সে কেমন যেন মনে মনে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো আদর্শবাদী সত্যবাদী হতে চাইল। ঈশ্বরচন্দ্রের মতো সেও মায়ের জন্য সব করবে। মার যা অপছন্দ তা করবে না, যা পছন্দ তা করবে। ঈশম গান করছে তেমনি ডুইবা গ্যালে আর ভাসে না জলে।

এখন বড় ঘরে ঠাকুর্দা কাশছেন। ওরা এই উঠোনের পাশে বসে সব শুনতে পেল।

ঈশম এক সময় গান থামিয়ে বলল, বোঝলেন নি কর্তা, সাঁজ লাগলেই রাজকন্যা বিলের পানিতে সূর্য হাতে ডুব দ্যায়।

—আর ভাসে না জলে?

ভাসে। সারা রাইত পানির তলে দুই হাতে সূর্যেরে লইয়া সাঁতার কাটে। কাটতে কাটতে নদী ধরিয়া সাগরে যায়। সাগরে সাগরে মহাসাগর। ভোর হইতে না হইতে পুবের আকাশে ভাইসা ওঠে। আসমানে সূর্যটারে টানাইয়া দ্যান রাজকন্যা। তারপর পলকে তিনি অন্তর্ধান করেন।

—কোনখানে তিনি অন্তর্ধান করেন?

—বিলের পানিতে।

—আপনে দ্যাখছেন!

—আমি দ্যাখমু কি গ কর্তা। আপনের মায়রে জিগাইয়েন। পাগল কর্তারে জিগাইতে পারেন।

সোনা ভাবল, হয়তো হবে। এত বড় যখন বিল আর সোনার নাও পবনের বৈঠা যখন রাজকন্যার জিম্মায়, তখন তার নদী ধরে সাগরে পড়তে কতক্ষণ! সাগরে সাগরে কতদূর চলে যায় রাজকন্যা। এখন রাজকন্যা তবে কোন সাগরে আছে—দক্ষিণের না উত্তরের? ওর প্রশ্ন করার ইচ্ছা, কোন সাগরের নিচে এখন রাজকন্যা সাঁতার কাটছে? সূর্য হাতে রাজকন্যা নীল জলের ভিতর সোনালী মাছের মতো মুখে রূপোলী সূর্য নিয়ে কোন জলের নিচে সাঁতার কাটছে? এসবও জানার ইচ্ছা। ঈশম তখন বলছিল, সকাল হইলে রাজকন্যা পূব সাগরে ভাইস্যা ওঠে। সূর্যটারে আসমানে টানাইয়া দ্যায়। তারপর রাজকন্যা টুপ করিয়া পানির নিচে ডুইবা যায়। সোনা যেন এবার কতদিন পর এই সূর্য ঠাকুরের চালাকিটা ধরে ফেলেছে।

ওর বার বার এক প্রশ্ন ছিল, সূর্য তুমি যাও কোথা? বাবা বলেছেন, সে বড় হলে এই রহস্য জানতে পারবে। এখন কিন্তু তার কাছে সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। সূর্য যায় মামার বাড়ি। বিলের নিচে মামা-মামীদের ঘরে যায়।

সোনা চুপচাপ বসেছিল। ঈশম গোয়ালে কি কাজের জন্য উঠে গেল। ঈশম চলে গেলে উঠোনের ওপর একা ওর ভয় করতে থাকল। সে তাড়াতাড়ি ছুটে বড় ঘরে উঠে গেল। ঘরে ঠাকুমা আছেন, ঠাকুরদা তক্তপোশের ওপর কাঁথা-বালিশ চারিদিকে রেখে বসে আছেন। বড় বড় বালিশ দিয়ে ঠাকুরদাকে ঘিরে রাখা হয়েছে। বালিশগুলি ওঁর অবলম্বনের মতো কাজ করছিল। মাথার কাছে পিলসুজে বাতি জ্বলছে। রেড়ির তেলের প্রদীপ। নীলচে রঙ এই আলোর। মুখে-চোখে বিদ্যুতের মতো আলোটা লম্বা হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুমা সন্ধ্যাহ্নিকের জন্য ঠাকুরঘরে চলে যাবেন এবার। যতক্ষণ ঠাকুমা ঘরে ছিল, সোনা পায়ে পায়ে ঘুর ঘুর করেছে। ঘুর ঘুর করার সময়ই ঈশ্বরচন্দ্রের কথা ফের মনে হল। দামোদর নদীর কথা মনে হল। সে আবার ভাবল, মায়ের জন্য সে সব করবে। আর ঘুরেফিরে সেই কথা মনে হল—বিলে রাজকন্যা, মাঠে ফতিমা। ফতিমা ওকে ছুঁয়ে দিয়েছে। সে স্নান করে নি। এসব শুনলে মা রাগ করবেন। মার কঠিন মুখের কথা ভাবতেই ওর প্রায় কান্না পেতে থাকল। মা আজ গরদের শাড়ি পরেছেন, পূজা-পার্বণের দিনে মা সারাদিন গরদ পরে থাকেন। মাকে তখন ভাল মানুষের ঝি মনে হয়। মাকে জলের মতো নির্মল মনে হয়, সাদা শাপলা ফুলের মতো পবিত্র মনে হয়! সুতরাং সেই পবিত্র এবং নির্মল জলের পাশে অশুচি শরীর নিয়ে থাকলে পাপ। সোনা এখন কি করবে ভাবতে পারছিল না। বলবে, মা, ফতিমা আমাকে ছুঁয়ে দিয়েছে! না কিছুই বলবে না—চুপচাপ থেকে যাবে, সে কিছুই স্থির করতে পারছে না। ওর ভিতর থেকে ভয়ে কেমন শীত উঠে আসছিল, সে দাঁড়াল না। এক দৌড়ে পশ্চিমের ঘরে ঢুকে গেল। কি শীত কি শীত! কি ঠাণ্ডা

এই ঠাণ্ডায় স্নান করা বড় কষ্ট। সোনা গায়ের চাদরটা আরও ভালভাবে জড়িয়ে নিল। তারপর মায়ের পাশে বসে পড়ল। ওর স্নান করবার কথা মনে থাকল না। এখন কেবল বিলের সেই রাজকন্যার কথা মনে আসছে। রাজকন্যার মুখে রুপোলী সূর্য। সূর্য মুখে রাজকন্যা একটা মাছের মতো জলের নিচে সাঁতার কাটছে।

উৎসবের দিনে এই ছুটোছুটি সোনাকে খুব ক্লান্ত করেছিল। সে রাতে খেল না পর্যন্ত। তক্তপোশে উঠে সকলের অলক্ষ্যে শুয়ে পড়ল। ওর আজ পড়া নেই। উৎসবের জন্য ছুটি। আজ উঠোনে লাঠিখেলা ছোরা খেলা বন্ধ। লালটু পলটু সেই যে ছোটকাকার সঙ্গে পূজার চরু রান্না করতে গেছে, এখনও ফেরে নি। সারা বিকেল সে প্রায় একা ছিল। বড় জ্যেঠিমা এখনও রান্নাঘরে, রাত্রে আজ কোন রান্নাবান্নার কাজ নেই। ঠাকুরদা সামান্য ফল সেদ্ধ খাবেন। ঠাকুরমা গরম দুধ খাবেন। তাদের সেই কাজটুকু করতে পারলে মা-জেঠিমার ছুটি। মা এখন ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। সে এখন একা এই ঘরে। হ্যারিকেনের আলোটা নিবু নিবু। টিনের চাল, চালে কুয়াশা জমেছে। ফোঁটা ফোঁটা জল জমে নিচে পড়ছে। টপ্-টপ্ শব্দ হচ্ছিল। কান পেতে রয়েছে সোনা। যেন কে বা কারা ওপরের কাঠের পাটাতনে হেঁটে বেড়াচ্ছে। সোনা মাকে ডাকতে পারত। তার ভয়ের কথা বলতে পারত। অন্যদিন কোন ভয় থাকে না, আজ ভয়ের কথা বললে মা বিরক্ত হবেন। সে মাকে ডাকতে সাহস পেল না

একটা মানুষ জলে ডুবে মরে গেছে আর কাটা মুণ্ড পেটে নিয়ে মোষ যায় মাঠে, দৃশ্যটা মনে পড়তেই সে লেপ দিয়ে মুখ মাথা ঢেকে দিল। মনে হল তার শরীরটা অশুচি। সে ফতিমাকে ছুঁয়ে স্নান করে নি। শরীর অশুচি থাকলে অপদেবতা ঘাড়ে চাপতে সময় নেয় না। সে নিজেকে অশরীরী আত্মাদের কাছ থেকে রক্ষা করার জন্য লেপ দিয়ে শরীর মুখ ঢেকে দিল। ছোট মানুষের মনে কত রকমের ভয়, ওর বার-বারই মনে হচ্ছিল ফাঁক পেলেই সেই বিলের অপদেবতা ওর লেপের ভিতর ঢুকে যাবে। ওকে সুড়সুড়ি দেবে। ওকে হাসিয়ে মেরে ফেলবে অথবা ওর নাকে-মুখে কল্পিত এক ঘ্রাণ দেবে মেখে। মেখে দিলেই সে দাসানুদাস—সেই অপদেবতা তাকে বিলের জলে হেঁটে যেতে বলবে। অপদেবতার পিছনে-পিছনে সে জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে গেলেই ডুবে যাবে। ওর ভিতরে-ভিতরে বড় কষ্ট হচ্ছিল। মা-বাবার জন্য কষ্ট হচ্ছে। সে ক্রমে লেপের নিচে গুটিয়ে আসছে। তারা যেন এখন ঘরটার চারপাশে ফিসফিস করে কথা বলছে। সোনা মনে-মনে দেবতাদের নাম স্মরণ করছে। তখন ঘরের আলোটা ক'বার দপদপ করে নিভে গেল। ঘর অন্ধকার। সোনা এবার লেপ থেকে মুখ বার করতেই দেখল জানালায় সাদা জ্যোৎস্না এবং

সেখানে যেন কার মুখ! বুঝি জালালি উঁকি দিয়ে সোনাকে দেখছে। সোনা এবার ভয়ে চিৎকার করে উঠল। কাটা মোষের গলা নিয়ে জালালি ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

চিৎকার শুনে রান্নাঘর থেকে ধনবৌ ছুটে এসেছে। সোনা বসে থরথর করে কাঁপছিল। জানালায় আঙুল তুলে কি যেন দেখাতে চাইছে। ধনবৌ দেখল, জানালায় এখন শুধু সাদা জ্যোৎস্না খেলা করে বেড়াচ্ছে।

ধনবৌ বলল, চিৎকার দিলি ক্যান!

সে বলল, মানুষ।

—মানুষ কই থাইকা আইব। শুইয়া পড়।

সোনা এবার ভয়ে কেঁদে ফেলল—মা, আমারে ফতিমা ছুঁইয়া দিছে।

—আবার সেই মাইয়াটার লগে তুমি গেছ!

সোনা নিজের দোষ ঢেকে বলল, মা, আমি অরে ছুঁই নাই।

ধনবৌ সোনাকে কিছু আর বলল না। সে ঠাকুরঘরের দিকে হাঁটতে থাকল। পরনে গরদের শাড়ি, ফুল-বেলপাতার গন্ধ, চন্দনের গন্ধ শরীরে। মাকে পবিত্র ফুলকুমারী মনে হচ্ছে সোনার। সে মায়ের পিছনে আল্‌গা হয়ে হাঁটছে। অন্ধকার ছিল না। জ্যোৎস্নায় মাঠ-ঘাট ভেসে যাচ্ছে। ঈশম বোধ হয় এতক্ষণে তরমুজ খেতে পৌঁছে গেছে। রঞ্জিতও বৈঠকখানা ঘরে বসে কি লিখছিল মনোযোগ দিয়ে—সে ক্রমাগত লিখে যাচ্ছে। আর ধনবৌ উঠোন পার হয়ে যাচ্ছে। সোনা প্রথম ভেবেছিল মার যা রাগ—তিনি নিশ্চয়ই ওকে পুকুরে নিয়ে যাচ্ছেন। সেখানে হিমের মতো জল, জলে ডুব দিতে বলবেন। সে ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিল।

মা ঠিক শেফালি গাছটার নিচে এসে বললেন, সোনা, তুমি দাঁড়াও।

সোনা দাঁড়াল।

মা পুকুরের দিকে নেমে গেলেন না। ঠাকুরঘরের দরজা খুলে তামার পাত্র থেকে তুলসীপাতা নিলেন, সামান্য চরণামৃত নিলেন। জলটা সোনার শরীরে এবং নিজের মাথায় ছড়িয়ে দিয়ে হাঁ করতে বললেন, সোনাকে। হাঁ করলে তুলসীপাতাটা সোনার মুখে আল্‌গা করে ছেড়ে দিয়ে বললেন, খাও। এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে হল সোনার, শরীর থেকে তার সমস্ত ভয় মন্ত্রের মতো উবে গেছে। সে মাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, মা আমি আর একা মাঠে যামু না।

ধনবৌ সোনার কথার জবাব দিল না। তামার পাত্র থেকে গণ্ডূষ করে জল নিল এবং দ্রুত ছুটে গেল ঘরে। ঘরের ভিতর, বিছানায় তক্তপোশে জলটা ছিটিয়ে দেবার সময়ই শুনল, গোপাটে হৈ-চৈ। জব্বর কাঁদছে।

বড়বৌ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে এল। রঞ্জিতও সব ফেলে নেমে এল উঠোনে। ধনবৌ দরজায় শেকল তুলে দিল। এক সঙ্গে ওরা পুকুর

পাড়ের দিকে হেঁটে গেল সোনা পিছনে। সেও সন্তর্পণে ওদের পিছু-পিছু পুকুর পাড়ে নেমে গেল।

দীনবন্ধু আর ওর দুই বৌ সুখী দুঃখী এসে দাঁড়াল বকুল তলায়। প্রতাপ চন্দ এসে দাঁড়াল চিলাকোঠার পাশে। ওর তিন স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি অনেক। ওরা ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে জালালিকে দেখার জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকল। শ্রীশ চন্দ, নাপিতবাড়ির কবিরাজ এবং গৌর সরকারের ছেলে-মেয়ে বাঁশঝাড়ের নিচে দাঁড়িয়েছিল—দলটা আসছে। কেমন ভৌতিক মনে হচ্ছে সব। জলে ডোবা মানুষ উঠে আসছে। জ্যোৎস্না পর্যন্ত কেমন মরা-মরা, সাদা ফ্যাকাশে। এমন কি এখন একটা কলাপাতা নাড়লে পর্যন্ত টের পাওয়া যায়। চুপচাপ। নিঃশব্দ। আকাশে এতটুকু মেঘ নেই। সাদা মেঘ থাকলে, হাওয়া থাকলে এবং ঝোপ-জঙ্গলে কোন কীট-পতঙ্গ শব্দ করলে বোধ হয় ব্যাপারটা এত বেশি ভৌতিক মনে হত না। এমন কি ঢাকঢোলের বাজনা থেমে গেছে। ভয়ঙ্কর সাদা জ্যোৎস্নায় ওরা দেখল গোপাট ধরে মানুষগুলি উঠে আসছে। সোনা এবার মাকে জড়িয়ে ধরল, কারণ সেই মুখটা, কাটা মোষের মুণ্ড পেটে নিয়ে যেন ফের উঁকি দেবে।

ধনবৌ সোনাকে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিল।

লাশটা বাঁশে বাঁধা। লাশটা ঝুলে-ঝুলে উঠে আসছে। রঞ্জিতও ভাবল একবার ডেকে সামসুদ্দিনের সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু মাঠের দিকে তাকাতেই মনে হল এখনও উৎসবের ছবি জেগে আছে। একটু পরেই অর্থাৎ শেষ রাতের দিকে সরকারদের পুকুর পাড়ে বাজি পোড়ানো হবে। রঞ্জিত ডাকতে সঙ্কোচ বোধ করল।

আর সোনার মনে হল দুপুরের ছবি যায়। কাটা মোষ পেটে মাথা নিয়ে যায়। সব স্পষ্ট নয়, তবু মনে হয় জালালির মাথাটা নিচের দিকে ঝুলে আছে। চুলগুলি শণের মতো খাড়া হয়ে আছে। সোনা ভয়ে এবার মাকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু মার কোন সাড়া-শব্দ পাচ্ছে না। তিনি এই দৃশ্য দেখে কেমন শক্ত হয়ে গেছেন।

সাধারণত এমনি হয় মানুষের। দুঃখের ছবি দেখলে কষ্ট নামক একটা বোধ সংক্রামিত হতে থাকে ভিতরে। মনে হয় একদিন না একদিন সকলকে সব কিছু ছেড়ে যেতে হবে। ভুবনময় সাদা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে। বড়বৌ অর্জুন গাছটার নিচে। জালালির লাশ নিয়ে ওরা মাঠ পার হয়ে চলে গেল। তারপরই ওরা সকলে দেখল, সেই মানুষ, কিংবদন্তীর মানুষ গোপাট ধরে রাজার মতো উঠে আসছে।

সাদা জ্যোৎস্নায় পাগল ঠাকুরকে সন্ন্যাসীর মতো দেখাচ্ছে।

সোনা দেখল, জ্যাঠামশাই এখন কোন দিকে তাকাচ্ছেন না। সোজা

গোপাট ধরে হেঁটে আসছেন। সামনে এসে পড়তেই বড় জ্যেঠিমা ছুটে গোপাটে নেমে গেলেন। রঞ্জিতও নেমে গেল। জ্যাঠামশাইকে দেখে সোনার সব ভয় উবে গেল। সে ছুটে গিয়ে গোপাটে নেমে ডাকল, জ্যাঠামশাই!

বড়বৌ পথ আগলে আর মানুষটাকে বেশি দূরে যেতে দিল না। সে পাগল মানুষের হাতে হাত রাখল। হাত রাখলে এই মানুষ একেবারে সরল বালক বনে যান। তাঁর খালি পা, হাত-পা ঠাণ্ডা, শীতে মানুষটা আরও সাদা হয়ে গেছে। কাপড় ভিজা। মানুষটার সর্দিকাশি পর্যন্ত হয় না। আর বড়বৌ পারছে না। মানুষটার দিন-দুপুর নেই, কখন কোথায় চলে যান, কখন আসেন ঠিক থাকে না। এত বড় উৎসবের দিনে মানুষটাকে সে আহার করাতে পারে নি। আলাদা করে সব রেখে দিয়েছে—যদি মানুষটা রাতে আসে, যদি মানুষটা ভোরের দিকে ফিরে আসে—সেই আশায় বড়বৌ শ্বেতপাথরের বাটিতে সব কিছু ভাগে ভাগে আলাদা করে রেখেছে।

পাগল ঠাকুর বেশীক্ষণ শক্ত হয়ে থাকতে পারলেন না। বড়বৌর চোখে সেই এক বিষণ্ণতা। সাদা জ্যোৎস্নায় সেই বিষণ্ণতা যেন আরও তির্যক্। মানুষটা এবার চুপচাপ বড়বৌর হাত ধরে ঘরের দিকে উঠে যেতে থাকলেন। চারিদিকে একবার চোখ মেলে তাকালেন, কেন যে বের হয়েছিলেন মনে করতে পারছেন না। কিসের উদ্দেশ্যে এই বের হওয়া। কার স্মৃতির জন্য এমন উদ্বিগ্ন হওয়া। কারা ওর জীবনের সোনার হরিণটি বেঁধে রেখেছে! কোথায় এমন হেমলক গাছ আছে—যার নিচে এক সোনার হরিণ বাঁধা—কল্পিত সেই সোনার হরিণটি কোন মাঠে—পাগল ঠাকুর ভাবতে-ভাবতে বিচলিত বোধ করলেন। কে সে? যুবতী পলিন কি চাঁদের বুড়ির মতো? অপলক কি তার চোখ! সে কি কোন ঝর্ণার পাশে খরগোশের ঘরে বাস করছে! অথবা প্রতিদিন ঝর্ণার জলে স্নান, যুবতী পলিন হায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে···দুর্গের মাথায় জালালি কবুতর এবং সামনে কত জাহাজ। জাহাজে করে যুবতী এসেছিল এ-দেশে বাপের কাছে। সে জাহাজঘাটায় বাপের সঙ্গে তাকে রিসিভ করতে গেছিল। কিছু কিছু স্মৃতি ফের মনে পড়ছে। স্পষ্ট নয়, ভাসা-ভাসা। যুবতীর মুখে কি অপরূপ লাবণ্য, নীল চোখ। আর ভালবাসার মানুষটিকে নিয়ে প্রতিদিন দুর্গের রেমপার্টে বসত। এসব মনে এলেই উদ্বিগ্ন হওয়া, তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা মাথার ভিতর। আবার স্মৃতিভ্রষ্ট। যুবতীর চোখ-মুখ এবং শরীরের লাবণ্য কেবল পাগল-প্রায় মাঠে-মাঠে ঘুরিয়ে মারছে তাঁকে। তিনি কিছুতেই সেই নীল চোখ, লাবণ্যভরা মুখ স্মরণ করতে পারলেন না। প্রিয়জনের মুখ এবং স্মৃতি স্মরণ করতে না পারলে যা হয়—রাগে দুঃখে বেদনায় এবং হতাশায় ক্রমশ অস্থির হয়ে ওঠেন। ফলে সেই আক্রোশের চিৎকার, গ্যাৎচোরেৎশালা।

রঞ্জিতও দেখল মাঠে সে একা। দূরে-দূরে ইতস্তত এখনও মাঠের

ভেতর হ্যাজাকের আলো জ্বলছে। মাঠ, বিশাল বিলেন মাঠ, মাঠে আলো—বিশ্বাসপাড়াতে হ্যাজাকের আলো, সরকারদের পুকুর পাড়ে হ্যাজাকের আলো এবং দু-একজন মানুষ এখনও প্রসাদ পাবার লোভে মাঠ পার হয়ে চলে যাচ্ছে। রঞ্জিত একা-একা কিছুক্ষণ ঠাণ্ডার ভিতর পায়চারি করল। ওকে খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। বোধ হয় মনের ভিতর আখড়ার কাজকর্মগুলো সম্পর্কে সে সমস্যা-পীড়িত। সে সকলের অলক্ষ্যে, প্রায় গোপনে কাজটা চালাচ্ছে—সমিতির এই নির্দেশ। কিন্তু কেন জানি মনে হচ্ছে ওর লাঠিখেলা, ছোরাখেলার আখড়া সম্পর্কে সামসুদ্দিন এবং তার দলবল ভালভাবেই জেনে গেছে। ওরা অর্থাৎ এই সব হিন্দুরা নিজেদের সাহসী এবং শক্তিশালী করে তুলছে। আত্মরক্ষার নিমিত্ত এই সব হচ্ছে। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস। হিন্দুরা জনসংখ্যায় কম। ওরা কম-বেশী সব মধ্যবিত্ত! এবং নিচু জাতি যারা, যেমন নমশূদ্র সম্প্রদায়—তাদের ভিতরও এই লাঠিখেলা, ছোরাখেলার হুজুগ এসে গেছে। এইসব কারণে পরস্পর নির্ভরতা ক্রমশ কমে আসছিল। ভিন্ন দুই জাতি, ফলে ক্রমশ দুই দিকে ধাবিত হচ্ছে। বোধ হয় সমিতির কাছে দীর্ঘ এক চিঠিতে এইসব ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিল রঞ্জিত। এবং এই মৃত্যু, জালালির জলে ডুবে মরা প্রায় জীবন-সংগ্রামের জন্য বলা যায়। শালুক তুলতে গিয়ে জালালি পদ্ম-লতায় আটকে মরে গেল। বোধ হয় রঞ্জিতকে মানুষে-মানুষে এই প্রকট আর্থিক বৈষম্যও পীড়িত করছিল। সে সমিতিকে এইসব লিখেও জানাবে ভাবল।

ঠিক তখনই মনে হল নরেন দাসের জমিতে সাদা কাপড়ে কে এক মানুষ দাঁড়িয়ে তাকে দূর থেকে দেখছে। রঞ্জিত বুঝল মালতী মাঠে নেমে এসেছে। সে সবার সঙ্গে ফিরে যায় নি। সে ক্রমে সন্তর্পণে এদিকে এগিয়ে আসছে। নিঃসঙ্গ এই মালতীর জন্য ভেতরটা তোলপাড় করে উঠল। সে নিজেকে অর্জুন গাছটার পাশে অদৃশ্য করে রাখল। কিন্তু হায়, কে কাকে লুকায়, কে কাকে অদৃশ্য করে। মালতীর চোখ বড় প্রখর এবং বুকের ভিতর যে সুখ-পাখিটা ডাকছিল, দূরে জ্যোৎস্নায় রঞ্জিতকে দেখে সেই সুখপাখি ফের কলরব করতে থাকল। ধিকিধিকি করে বুকের ভিতরটা জ্বলছে। এমন দিনে কার না ইচ্ছা হয় সামনের দিগন্ত প্রসারিত মাঠে অদৃশ্য হতে। যখন জ্যোৎস্নায় সমস্ত জগৎ-সংসার ডুবে আছে, কার না ইচ্ছা করে অগাধ সলিলে ডুবে মরতে।

আর কার না ইচ্ছা করে এমন সুপুরুষ দেখলে ভালবাসতে। বড়বৌ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। টেবিলের ওপর হ্যারিকেন জ্বলছে। পাগল মানুষ এখন প্রায় নগ্ন। বড়বৌ ভিজা কাপড় শরীর থেকে খুলে ফেলল। শ্বেতপাথরের মতো শক্ত অবয়ব। বুকের পেশি এত প্রবল যে মনে হয় একটা বড় হাতি অনায়াসে বুকের ওপর তুলে নাচাতে পারেন। পেটে চর্বি নেই।

পাতলা মাংসের ওপর সাদা চামড়া—ঠিক যেন নদীরেখার মতো কোমল লোমশ বুকের পেশি থেকে একটা রেখা নাভি বরাবর নিচে নেমে এক আদিম অরণ্য সৃষ্টি করেছে। বড়বৌ সাদা তোয়ালে দিয়ে শরীরের সব বিন্দু-বিন্দু জলকণা খুব যত্নের সঙ্গে শুষে নিল। পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ ঠিক যেন একটা বড় কাঠের পুতুল। কল লাগানো কাঠের পুতুল। এতটুকু নড়ছে না, এতটুকু অন্যমনস্ক হচ্ছে না—কেবল বড়বৌর সেই বড় বড় চোখ, ভালবাসার চোখ অপলক দেখছেন। হাত তুলে দিতে বললে হাত তুলে দিচ্ছেন। বসতে বললে বসে পড়ছেন।

উৎসবের দিন। বড়বৌ সব খাদ্যবস্তু ভিন্ন ভিন্ন থালাতে সাজিয়ে রেখেছে। তিনি কিছু খাবেন, কিছু খাবেন না। আবার হয়তো সবটাই খেয়ে ফেলতে পারেন। তারপর আরও খাবার জন্য বড়বৌর হাতটা কামড়ে ধরতে পারেন। দিতে না পারলে সাপ্টে তুলে নেবেন পাঁজাকোলে। এবং ছুটতে থাকবেন মাঠ-ময়দানে। অথবা এই খাটের ওপর নিরন্তর মানুষটা বড়বৌকে ফেলে রেখে, কখনও উলঙ্গ করে দেয়, কখনও এক সুন্দর যুবতীর মুখে ঘ্রাণ নেবার মতো মুখে মুখ দিয়ে পড়ে থাকেন—কখন যে কি করবেন কেউ বলতে পারে না। সবই প্রায় তার অত্যাচারের সামিল এবং এই অত্যাচারের আশায় বড়বৌ সারা দিনমান অপেক্ষা করে। দিনের শেষে তিনি ফিরে না এলে জানালায় বড়বৌ দূরের মাঠ দেখে। সেই মাঠ দেখতে দেখতে কত রাত শেষ হয়ে যায় তবু পাগল ঠাকুর ফিরে আসেন না। হয়তো তিনি কোন গাছের নিচে শুয়ে নীল আকাশের গায়ে নক্ষত্র গুণছেন। তখন তাঁর মুখে কত সব কবিতা উচ্চারণ। ভালবাসার কবিতা শুয়ে শুয়ে নক্ষত্র দেখতে দেখতে উচ্চারণ করেন। কবিতার সেই পঙক্তি সব বড়বৌকে এক নীল চোখ এবং সোনালী চুলের কথা বার বার মনে করিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুর ঠাকুরের উদ্দেশে আবেগে বলার ইচ্ছা, আপনি কেন মানুষটাকে পাগল করে দিলেন বাবা। আপনার ধর্মাধর্ম মানুষটার চেয়ে বড় কেন ভাবলেন। চোখে জল এসে গেল বড়বৌর। কাপড় পরাবার সময় চোখের জলটা আচ্ছন্ন করে দিল সব কিছু। মণীন্দ্রনাথকে বড় ঝাপসা দেখাচ্ছে এখন। পাট-ভাঙা কাপড় পরাবার সময় বড়বৌ কিছুক্ষণ বুকের ভিতর মুখ লুকিয়ে রাখল। কাঠের পুতুলটা এতটুকু নড়ছে না। যদি তাঁর সামান্য অত্যাচার আরম্ভ হয়, যদি তিনি দু'হাতে জোরজার করে বড়বৌকে উলঙ্গ করে দেন—কিন্তু পাগল ঠাকুর আজ এতটুকু উত্তেজিত হলেন না। তিনি যেন এখন সন্ন্যাসীর মতো ফলদানের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করছেন। হাতে বুঝি দণ্ডি দিলে তাই হতো।

উৎসবের দিন বলে তসরের জামা গায়ে দেওয়া হল। কোঁকড়ানো চুলে

চিরুনী দেওয়া হল। ঠিক যেন বরের সাজে পাগল মানুষ এখন দাঁড়িয়ে আছেন। এমন দৃশ্য বড়বৌ দেখে আবেগে গলে পড়ল।—এমন সুপুরুষ হয় না গো, বলতে বলতে সে প্রায় কেঁদে ফেলল। হাত ধরে এনে বড়বৌ পাগল মানুষটাকে আসনে বসাল। তারপর এক-এক করে উৎসবের ফুল-ফল-বাতাসা, তিলা কদমা-পায়েস এবং খিচুড়ি—কত রকমারি খাবার থালার পাশে ; বড়বৌ মাঝে-মাঝে এটা-ওটা এগিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু আজ পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথের কোন খাবার স্পৃহা দেখা গেল না। তিনি সব নেড়েচেড়ে উঠে পড়লেন। তারপর নরম বিছানাতে সুন্দর এক রাজপুত্র যেমন শুয়ে থাকে, রুপোর কাঠি সোনার কাঠি যেমন মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকে, ঠিক তেমনি শুয়ে থাকলেন মণীন্দ্রনাথ। এতটুকু পাট ভাঙে নি কাপড়ের। গোড়ালি পর্যন্ত টানা কাপড়, কোঁচা সোজা পায়ের কাছে নেমে এসেছে। দু'হাত আড়াআড়ি করে বুকের ওপর রাখা। তিনি বুকের ওপর হাত রেখে ঘরের কড়িকাঠ গুনছেন। স্থির অপলক দৃষ্টি। পাশে বড়বৌ। বসে আছে তো আছেই। চোখে ঘুম আসছে না। বারবার দু'গালে চুমু খাচ্ছে। জামার নিচে বুকের ভিতর নরম হাতের আঙুল কিলবিল করে বেড়াচ্ছিল—যদি মানুষটা সোনা রুপোর কাঠির স্পর্শে মুহূর্তের জন্য জেগে ওঠে। না মানুষটা আজ কিছুতেই জাগছে না। এমন উৎসবের দিন বিফলে গেল। সে মানুষটার লোমশ বুক থেকে হাত তুলে নিল এবার। কোন উত্তেজনা নেই দেখে লেপ গায়ে দিয়ে কাঠের পুতুল বুকে নিয়ে শুয়ে থাকল সারা রাত। কাঠের পুতুলটা ঘুমায় না।—কিন্তু কি কালঘুম বড়বৌর—কখন দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে, কখন মণীন্দ্রনাথ ধীরে-ধীরে রাজপুত্রের এই খোলশ ছেড়ে হাঁটু কাপড়ে বের হয়ে যান, বড়বৌ টের পায় না। কালঘুম বড়বৌর সব কিছু হরণ করে নিয়েছে।

তাবুদের ভিতর ততক্ষণে জালালিকে রাখা হয়ে গেছে। মালতী সেই অর্জুন গাছটার উদ্দেশে পা টিপে টিপে হাঁটছে। আর তখন ফেলু পাড়ে দাঁড়িয়ে জালালির কবর ঠিক মতো খোঁড়া হল কিনা দেখছে।

বিলে তখন গজার মাছটা আপন আস্তানায় ফিরে এসেছে এবং সন্তর্পণে পদ্মলতার ভিতর আজব জীবটাকে দেখতে না পেয়ে বিস্ময়ে লেজ নাড়ছে। কে চুরি করে নিয়ে গেল—কোথায় কোন জলে আজব জীবটা ভেসে বেড়াচ্ছে! অনুসন্ধানের জন্য গজার মাছটা জলের ওপর পাখনা ভাসিয়ে সাঁতার কাটতে থাকল।

তাবুদের ভিতর জালালির মুখ সাদা কাপড়ে ঢাকা। নূতন কাপড়ের কফিন দিয়েছে হাজিসাহেব। হাজিসাহেবের তিন বিবি উষ্ণ জলে গোসল করিয়েছে। সব কাজ-কর্ম ওরাই দেখে-শুনে করছে। চুলে বেণী বেঁধে দিয়েছে, আতর

দিয়েছে, চন্দনের গন্ধ দিয়েছে—এখন আর কে বলবে জালালি সারাটা জীবন হা অন্ন করে গেছে, কে বলবে সামান্য গয়না নৌকার মাঝি আবেদালির বিবি জালালি!

তাবুদে জালালি, মসজিদে ইমাম। আল্লার কাছে জালালির জন্য দোয়া চাইছে সবে। তিন সারিতে গ্রামের সব পুরুষ মসজিদের ভিতর দাঁড়িয়ে কান স্পর্শ করে—হে আল্লা, এমন বিরাট বিশ্বময় তোমার অপার মহিমা—আমরা সামান্য মানুষ, আমাদের আর কি করণীয় আছে, বিশ্বময় সৌরজগতের অপার লীলা তুমি ছড়িয়ে দিয়েছ, হে আল্লা, এই যে ঘাস মাঠ ফসল এবং পাখিদের সব কলরব শুনছি, তোমার করুণার কথা কে না জানে—তুমি সকলকে আশ্রয় দাও, তুমি আমাদের এই দুঃখী জালালিকে তোমার অপার মহিমার আশ্রয়ে তুলে নাও—ওরা বোধ হয় ওদের দোয়া ভিক্ষার ভিতর এমন কিছুই বলতে চাইছিল।

জ্যোৎস্না রাত, ঢাক-ঢোল বাজছে, ইতস্তত হ্যাজাকের আলো মাঠে ঘাটে এবং তাবুদের ভিতর জালালি মুখ ফিরে শুয়ে আছে। সামসুদ্দিন ইমামের কাজ করছিল। মসজিদের পাশে আতাফলের গাছ, গাছে রাজ্যের সব পাখির নিবাস, অসময়ে এত লোক দেখে ওরা সকলেই জেগে গেল, কলরব করতে থাকল এবং কিছু আতাফলের পাতা প্রায় ফুলের মতো তাবুদের ওপর ঝরে পড়তে থাকল।

তারপর সকলে মিলে লা ইলাহা ইল্‌লাল্‌লা মোহম্মদর রসুলাল্লা—তাবুদ কাঁধে নিয়ে মানুষগুলি মাঠে যাবার সময় আল্লা এক, মহম্মদ তার রসুল, এইসব বলছে। তখনও সরকারদের পুকুরপাড়ে ঢাক বাজছে ঢোল বাজছে। তখনও মাঠময় জ্যোৎস্না। ওরা লণ্ঠন হাতে, কেউ কুপি হাতে, বোরখা পরে বিবিরা—যাদের নামার কথা নয় কবরে তারা পর্যন্ত দুঃখী মানুষ জালালির জন্য মাঠে নেমে এসেছে। ওরা কবরটার চারপাশে দাঁড়াল। হাজিসাহেব অসুস্থ, তিনি আসতে পারেন নি। অন্যান্য প্রায় সকলে কবরের চারপাশটায় দাঁড়িয়ে আছে। তাবুদ থেকে জালালিকে বের করা হল। একপাশে সামু, জব্বর অন্য পাশে। ওরা নিচে নেমে গেল। ফেলু সেই দুপুরে যার জন্য গলা বাড়িয়েছিল কচ্ছপের মতো, সেই বিবি বোরখার ভিতর থেকে ফেলুকে দেখছে। ফেলুর বুক আঁকুপাঁকু করছিল, ধুকপুক করছিল। সে ডান হাত দিয়ে কাটা বাঁশগুলি সামু কবর থেকে উঠে এলেই সাজিয়ে দেবে। উত্তরের দিকে মাথা এবং দক্ষিণে পা রেখে জালালিকে শুইয়ে দেওয়া হল। মুখটা ঘুরিয়ে দিল পশ্চিমে—মক্কা মদিনা দেখুক জালালি—এই করে ওরা ওপরে উঠে এলে ফেলু এক হাতে কাটা বাঁশগুলি কবরের ওপরে বিছিয়ে দিল, কিছু ইস্তাহার বিছিয়ে দিল—তাতে লেখা আছে, মুস্লিম লীগ—জিন্দাবাদ। যেন কবরে সাক্ষ্য হিসাবে ওরা ওদের শপথপত্র রেখে দিল। এই শপথপত্র কবরে মাটি ঝুরঝুর করে পড়ে না যাবার জন্য এবং গরীব মুসলমানদের

বেঁচে থাকবার উত্তরাধিকারের দৌলতকে কেউ যেন অস্বীকার করতে না পারে; অথবা যেন সামুর বলার ইচ্ছা—চাচি, আমরা এই ফসল এবং মাঠ আমাদের উত্তরাধিকারীকে দিয়ে যাব, আমরা এমন সব সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছি। ধর্ম আমাদের সকলের ওপরে—রসুল আমাদের মহম্মদ, আল্লা এক—তার কোন শরিক নেই।

সকলেই একটু একটু করে কবরে মাটি দিল। তারপর সব মাটি কবরের ওপর তুলে দেওয়া হল। চেপে মাটি দিল, মাটির ওপর গোসলের বাকি জল ঢেলে দিল জব্বর। তিনটা জীয়ল গাছ পুঁতে, ওরা পেছনের দিকে তাকাল না, ওরা গ্রামের দিকে উঠে যেতে থাকল। ঠিক ওরা সকলে আড়াই পা গিয়েছে, তক্ষুণি এক অলৌকিক আলো কবরের ভিতরে ঢুকে গেল। ফতিমা বাপের পাশে হাঁটছিল। বাপ তাকে ফেরাস্তার গল্প বলছে। সেই যেন এক কিংবদন্তীর গল্প—বেহেস্তের এক সিঁড়ি পড়ে গেল, আলোর সিঁড়ি। কবরের ভিতর অলৌকিক আলোর প্রভায় জালালি জেগে গেল।

দুই ফেরাস্তা প্রশ্ন করল, তুমি কে?

জালালি বলল, আমি জামিলা খাতুন।

—তোমার ধর্ম কি?

—ধর্ম ইসলাম।

—আল্লা কে?

—আল্লা এক, তার কোন শরিক নেই।

—রসুলের নাম?

—হজরত মহম্মদ।

—এঁকে চেন? বলেই দুই ফেরাস্তা আলো ফেলল মুখে।—কে তিনি?

—হজরত মহম্মদ। জালালি ফের ঘুমের ভিতর যেন ঢলে পড়ল।

জালালিকে দুই ফেরাস্তা কোলে তুলে নিলেন। অলৌকিক আলোয় জালালির শরীর লীন হয়ে গেল। ঠিক যেন এক কিংবদন্তীর সূর্য—যায় যায়, বিলের জলে ডুবে যায়। বিল থেকে নদীতে, নদী থেকে সাগরে, মহাসাগরে—শেষে এক সময় রাজকন্যা টুপ করে জলে ভেসে উঠে দুই ডানা মেলে দেয় আকাশে, পুবের আকাশে সূর্য লটকে দিয়ে আবার সাগরের জলে ডুবে অদৃশ্য হয়ে যায়।

তখন সোনা মায়ের পাশে শুয়ে একটা ঘোড়ার স্বপ্ন দেখল। একটা ঘোড়ার দুটো মুখ। ঘোড়াটা অন্ধ। সারকাসের তাঁবু থেকে ঘোড়াটাকে একটা ক্লাউন টেনে বের করে এনেছে। তারপর ফাঁকা মাঠে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিল। অন্ধ ঘোড়া এখন একবার পুবে আবার পশ্চিমে ছুটছে। ঘোড়ার পিঠে এক হতভাগ্য মানুষ—সে একবার পুবে আবার পশ্চিমে ডিগবাজি খাচ্ছে। প্রায় সারকাসের

খেলার মতো। দর্শক মাত্র দু'জন। সোনা এবং ফতিমা। সোনা এবং ফতিমা এমন মজার খেলা দেখে হাততালি দিতে থাকল। পিছনে পাগল জ্যাঠামশাই দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ওদের মাঠে সারকাসের খেলা যেন দেখাতে এনেছেন।

জ্যোৎস্না মরে আসছে, ভোর হতে দেরি নেই। গ্রামের সবাই জালালিকে কবর দিয়ে উঠে যাচ্ছে। বাগের পথে ফেলু দাঁড়াল। সারা মাঠময় কুয়াশার জন্য দৃষ্টি এগুচ্ছে না। ক্রমশ কুয়াশা এত ঘন হয়ে জমছিল যে ফেলু প্রায় নিজেকেই দেখতে পাচ্ছিল না। ভোর রাতের ঠাণ্ডা—হাত-পা সব বরফ হয়ে যাচ্ছে। আন্নু সবার আগে উঠে গেছে, ঘুমের বাতিক বড় বেশি বিবির! মনজুর উঠে গেল, হাজি সাহেবের বড় বিবি উঠে গেল। জব্বরকে সামু ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সামুর বিবি পেছনে পেছনে উঠে আসছে। বোরখা দেখে চেনা যাচ্ছিল সব—কার বিবি, বিবির কিরকম ফের, শুধু সেই বোরখাটার চোখে সাদা গুটি সুতার কাজ। জ্যোৎস্নায় সহসা দেখে ফেললে প্রায় ভূত বলে বিভ্রম হতে পারে। সেই বোরখার নিচে যুবতী মাইজলা বিবি। তোর সনে পীরিত আমার ওলো সই ললিতে, ফেলু মনে মনে মরিয়া হয়ে উঠল। আবার সেই বুকের ভিতর আঁকু-পাঁকু শব্দটা হচ্ছে। কাজটা খুব নিমেষে করে ফেলতে হবে। যেন অন্য মানুষ টের না পায়। কুয়াশা এত ঘন যে এক হাত সামনের মানুষটাকে স্পষ্ট দেখা যায় না। অস্পষ্ট কুয়াশার ভিতর সেই বোরখাটা চিনে ঠিক মতো ধরতে না পারলে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে যাবে। সে শীতে হি হি করে কাঁপছিল। মাত্র একটা হাত তার সম্বল। জবরদস্ত বিবিকে কাবু করতে কতক্ষণ সময় নেবে! ভাববার সময়ই মনে হল কুয়াশায় পর্দার ওপর মাইজলা বিবি ভেসে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে খপ করে সাপটে ধরল এক হাতে। ওর ভিতরে প্রায় যেন এখন অদ্ভুত হস্তির বল। সে মুখে ডান হাতটা চেপে ঠেলতে ঠেলতে ঝোপের ভিতর ফেলে বাঘের মতো হুঙ্কার দিল, রা করবি না বিবি। আমি তর পরানের ফেলু।

সবার শেষে ঈশমও গ্রামে উঠে যাচ্ছে। উঠে যাবার পথে মনে হল, ঝোপের ভিতর এক প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড। প্রায় সাপে সাপে খেলা হচ্ছে যেন অথবা সাপে বাঘে। ঝোপের ভিতর খুব একটা ধস্তাধস্তি হচ্ছে। বোধ হয় মরার গন্ধ পেয়ে হাসান পীরের দরগা থেকে শেয়াল উঠে এসেছে। গোসাপও হতে পারে। প্রায় কুমীরের মতো বড় বড় গোসাপ নদীর চরে সে কতদিন ঘুরতে দেখেছে। এখন এই ঝোপের ভিতর কামড়াকামড়ি করছে। ঈশম ভয়ে দ্রুত গ্রামের দিকে ছুটে গেল।

ভোরের স্বপ্ন, যেমন তাজা তেমনি মিষ্টি। আর বোধ হয় প্রথম স্বপ্ন দেখতে শিখল সোনা। স্বপ্ন দেখার পরই ঘুম ভেঙে গেল। সে শুনতে পেল বড় ঘরে ঠাকুরদা ঈশ্বরের স্তোত্র পাঠ করছেন। বড় জ্যেঠিমা, ছোটি কাকা এই শীতের ভোরে ঠাকুরদাকে উঠোনের ওপর এনে দাঁড় করিয়েছেন।

বৃদ্ধ দীর্ঘদিন পর বায়না ধরেছেন—তিনি আজ সূর্যোদয় দেখবেন। তিনি সেই কবে অন্ধ হয়ে গেছেন—দীর্ঘদিন ঘরের বার হন নি, তিনি ঘরে বসেই প্রতিদিন ভোর রাতের দিকে ঈশ্বরের স্তোত্র পাঠ করেন—হে ঈশ্বর, তোমার করুণা ফুলে ফলে, ফসলের মাঠে, তুমি করুণাময়।

বৃদ্ধের কথা না রাখলে অনর্থ ঘটবে। সুতরাং ওরা বৃদ্ধের হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। ঠিক কামরাঙা গাছটার নিচে দাঁড়ালে পুবের আকাশ স্পষ্ট। সূর্য উঠবে। পুবের আকাশ ফর্সা হয়ে গেছে। পাখিরা উড়ে যাচ্ছিল। মসজিদে আজান দিচ্ছে সামসুদ্দিন। মোরগেরা ডাকছে। বড়বৌ পূজার ফুল তুলতে চলে গেছে। বৃদ্ধ মানুষটি সূর্যোদয় দেখার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। কতকাল, যেন কত দীর্ঘকাল সূর্যোদয় দেখেন নি, কতকাল তিনি যেন এমন পাখির কলরব শুনতে পান নি! কামরাঙা গাছটার নিচে তিনি সোনা, লালটু, পলটুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। সূর্য উঠলেই বলতে হবে—সূর্যোদয় হচ্ছে। তিনি এই যে সূর্য, আলোর দেবতা, ঈশ্বরের অংশ, ঈশ্বর জনে জনে ফুলে ফুলে বিরাজ-মান—সর্বত্র তিনি, তিনি এক এবং বহু, তিনি সীমাসংখ্যার অতীত, মহাবিশ্বের তিনিই সব—তাঁর সেই আলোর দূতকে স্বাগত জানাবেন।

কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার সূর্যোদয়ের কথা তাঁকে আর বলতে হল না। তিনি নিজেই যেন টের পাচ্ছেন সূর্য আকাশে উঠে আসছে। কুয়াশার জল কামরাঙা গাছ থেকে টুপটাপ ঝরছিল। লাল নীল পাখির পালক উড়ছিল। ফ্লানেলের জামা গায়ে খড়ম পায়ে বৃদ্ধ মানুষটি সূর্য উঠতেই দু'হাত তুলে প্রণাম করলেন।

মহাবিশ্বে আমরা সামান্য মানুষ। তুমি মানুষের জরাজীর্ণ জীবনকে আলোকিত কর। রোগ শোক সব হরণ করে নাও।

সূর্যোদয়ে এত রহস্য আছে সোনার জানা ছিল না। সেও ঠাকুরদার দেখাদেখি সূর্যকে প্রণাম করল এবং ঠাকুরদার সঙ্গে গলা মিলিয়ে সূর্যস্তব পাঠ করল।

শচীন্দ্রনাথের অন্য কিছু কাজ ছিল। মাঠে ঈশমকে নিয়ে নেমে যেতে হবে। গৌর সরকার সীমানা ভেঙে দিচ্ছে জমির। এসব দেখার জন্য, আর বোধ হয় ঘটনাটা মামলাবাজ গৌর সরকারকে একটু সমঝে দেবার জন্য সে দ্রুত মাঠে নেমে যাবে বলে স্থির করেছিল। উত্তেজনায় রাতে শচীন্দ্রনাথের ঘুম হয় নি, কারণ মাটির মতো ভালবাসার সামগ্রী আর কি আছে।

সূর্য আকাশে উঠে গেছে। মনে হল বৃদ্ধের এখন আর কোন অবলম্বনের প্রয়োজন নেই। সূর্যের উত্তাপে শরীরের ভিতর প্রাণের আবেগ—সেই যৌবনের মতো অথবা শৈশবের মতো মনে হয়, তিনি এখন একা একা, কেউ কিছু বলে না দিলেও কোথায় কোনদিকে গেলে গোপাট পড়বে, কোনদিকে গেলে পুকুর পাড়ে প্রিয় অর্জুন গাছটা পড়বে এবং নদী আর কতদূর, কতটা মাঠ এগুতে পারলে সোনালী বালির নদীর চর, চরে এখন তরমুজ লতা কত বড়, কত সবুজ সব লতাপাতা তিনি চোখ বুজে বলে দিতে পারেন। তিনি যেন বলতে চাইলেন, শচি, তুমি মাঠে নাইমা যাইতে চাও—যাও, আমার জন্য তোমার কোন চিন্তার কারণ নাই। আমি একলা মানুষ। সংসারে এই তো হয়—স্ত্রী-পুত্র এত, তবু নিজেকে কেবল একা মনে হয়। তিনি শচীন্দ্রনাথকে শুধু বলেছিলেন, সে যেন মাঠে নেমে যাবার আগে তাঁর চাঁদির বাঁধানো লাঠিটা দিয়ে যায়। কতকাল আগে, তখন প্রৌঢ় মহেন্দ্রনাথের কি দাপট! তিনি এই চাঁদির বাঁধানো লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে গ্রাম মাঠ পার হয়ে চলে গেছেন। সেই মানুষ কতকাল ঘরের বার হন নি। প্রায় অথর্ব এখন তিনি। কিন্তু কথা আছে এ-সালে তিনি দেহরক্ষা করবেন। কুষ্ঠি-ঠিকুজি এবং রাশিফল এমনই সব বলছে। শীতকালে বুড়ো মানুষের মৃত্যুভয় অসীম। কাতিকের টান, বড় টান। কাতিকের টান বানের জলের মতো। গ্রাম মাঠ সাফ করে বুড়ো মানুষদের নিয়ে যায়। ঠিক সেই সময়ে একদিন তাঁর সন্তান ভূপেন্দ্রনাথ বলেছিল, বাবা, এবারে চন্দ্রায়ণটা কইরা ফেলি।

তিনি পুত্রের ইচ্ছার কথা ধরতে পেরেছিলেন। বয়স হয়েছে। কাতিকের টানে বড় কষ্ট পাচ্ছিলেন। দ্বাদশ ব্রাহ্মণ ভোজন এবং চন্দ্রায়ণ করালে পাপ খণ্ডন হবে। পাপ খণ্ডন হলেই এই সংসার থেকে মুক্তি। তখন বায়ুতে পঞ্চভূত হয়ে আত্মাটা মিশে যাবে। তিনি ভূপেন্দ্রনাথের কথায় রুষ্ট হয়েছিলেন।—আমার ত যাওয়নের সময় হয় নাই! হইলে টের পামু। তোমা গ ঘণ্টা বাজাইতে হইব না।

আর শীতের মাঝামাঝিতে মনে হল মহেন্দ্রনাথ আবার তাজা হয়ে যাচ্ছেন। এবং কানে যেন ভাল শুনতে পাচ্ছেন। শরীরের জড়তা ক্রমশ উবে যাচ্ছে। এখন তিনি বিছানাতে ওঠা-বসা করতে পারেন। হাঁটা চলা করতে পারেন। আর মনে হল তিনি ফের শতবর্ষ বাঁচার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

তিনি এবার তাঁর তিন নাতিকে উদ্দেশ করে—বড় কচিকাচা বয়স ওদের, তাঁর সন্তানেরা সবই শেষ বয়সের, প্রথম দিকে কোন সন্তানাদি হবে না বলেই ঠিক ছিল, তিন নাতিকে উদ্দেশ করে কিছু বলতে গিয়ে এমন সব ছবি মনে পড়ে গেল তাঁর। তিনি বললেন, আমার মাঠে নাইমা যাইতে ইচ্ছা হয়। তোমরা আমারে মাঠে নিয়া যাইবা?

এই কথায় তিন নাতিকে বড় উৎফুল্ল দেখাল। ওরা ঠাকুরদার এমন একটা অভিপ্রায় জেনে আনন্দে উৎফুল্ল। এখনও সূর্য ওপরে উঠে আসে নি।

পলটুর হাত ধরে মহেন্দ্রনাথ গোপাটে নেমে যাচ্ছেন। লালটু আগে আগে হাঁটছে। সোনা পিছনে পিছনে হাঁটছে। ঠাকুরদার হাতে চাঁদি বাঁধানো লাঠি। লাঠির মুখটা সোনাব্যাঙের মাথা যেন। চোখ বুজে, কান খাড়া করে, কোন-কোন সময় মনে হয় সজারুর মুখের মতো লাঠির মাথাটা হাঁ করে আছে। মহেন্দ্রনাথ লাঠিটা ডান হাতে ভাল করে ধরলেন। তিনি যেন এখন সব কিছু দেখতে পাচ্ছেন, সেই প্রৌঢ় বয়সের মতো। কোথাও একটা শ্বেত জবা ফুটে আছে। তিনি বললেন, দ্যাখ ত পলটু, মনে হয় গাছে একটা জবা ফুল ফুটে আছে।

লালটু বলল, আছে।

লালটু পলটু সোনা অবাক। হ্যাঁ, গাছে মাত্র একটা শ্বেত জবা ফুটে আছে।

সোনা বলল, ঠাকুরদা, স্থলপদ্ম গাছটায় ফুল হইছে।

—অসময়ে ফুল! বলে তিনি পুকুর পাড় ধরে নেমে যাবার সময় বললেন, তরা আমারে তেঁতুল গাছটার নিচে নিয়া আইলি!

ওরা ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। অন্ধ মানুষকে যেমন সবাই ধরাধরি করে পথ পার করে দেয় তেমনি এই তিন নাবালক মহেন্দ্রনাথকে মাঠের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। পুকুর পাড় ধরে হাঁটার সময় তিনি প্রায় এক-এক করে সব গাছের নাম বলে যাচ্ছিলেন। কখন কদবেল গাছ অথবা কখন জামরুল গাছের নিচ দিয়ে যাচ্ছেন, বলে দিতে পারছেন। যেতে যেতে সহসা তিনি থেমে পড়লেন। বললেন, জলে একটা বোয়াল মাছ ভাইসা আছে।

ওরা দেখল, হ্যাঁ, পুকুরের জলে বড় একটা বোয়াল মাছ ভেসে ভেসে দাম খাচ্ছে। সোনা বলল, দ্যাখি, আপনের চোখ দুইটা। বাবায় আইলে কইয়া দিমু, আপনে মিছা কথা কন। চক্ষে দ্যাখতে পান ঠিক। মহেন্দ্রনাথ সোনার কথা শুনে হাসলেন। তিনি পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে মাছের গন্ধ পাচ্ছিলেন, এবার

লাঠি ঠুকে ঠুকে জায়গাটাকে চেনার জন্য বললেন, তরা আমারে বড় জাম-গাছটার নিচে নিয়া আইছস্ !

তিনজন ওরা এবার একসঙ্গে হেসে উঠল। বলল, ঠাকুরদা কইতে পারল না।

মহেন্দ্রনাথ আরও সামান্য সময় চিন্তা করলেন। কতদিন পর ঘর থেকে বের হয়েছেন, সূর্যোদয় দেখবেন বলে ! আর নিজের এই বাসভূমি যা তিনি তিলে-তিলে অর্জন করেছেন, যে ভালবাসা তাঁকে এখনও ঈশ্বরের সংসারে ডুবে যেতে দেয় না, সেই জগৎ এত অপরিচিত হয়ে গেল ! তিনি এমন ভুল বলে ফেললেন ! প্রায় শতবর্ষের অভিজ্ঞতা এই মাটি এবং মানুষ সম্পর্কে—তিনি এই তিন নাবালকের কাছে কিছুতেই হার স্বীকার করতে চাইলেন না। তিনি এই স্মৃতির ভিতর ডুবে মণি-মাণিক্য অনুসন্ধানের মতো কোথায় কোন গাছের পরে কি গাছ ছিল, কখন কোন গাছ তিনি কেটে ফেলেছেন—সব মনে-মনে অনুসন্ধান করে বেড়ালেন। তেঁতুল গাছটার পর জামরুল গাছের পাতার গন্ধ আসছিল নাকে, তারপর মনে হল রোদ মাথায় মুখে—তবে বড় জাম গাছটা হবে ঠিক। কিন্তু পলটু তারা যেভাবে হেসে উড়িয়ে দিল তাতে তিনি বড় মুষড়ে পড়েছেন। নাকে বড়-বড় শ্বাস টানলেন—যদি নিশ্বাসে কোন অন্য পরিচিত গন্ধ ভেসে আসে। যদি তাঁর জল মাটির জন্য ভালবাসা তাঁকে ফের অন্তর্যামী করে তোলে।

এবার মহেন্দ্রনাথ বললেন, খেজুর গাছের নিচে আইছি।

নাবালক তিন নাতি আরও জোরে হেসে উঠল। ঠাকুরদাকে নিয়ে এবার তারা খেলায় মেতে গেল। সেই যেন চোর-চোর খেলা। ঠাকুরদা অন্ধ। অন্ধ বলেই ওরা ধরে নিল ঠাকুরদার চোখ বাঁধা। ওরা ঠাকুরদার চারপাশে চোর-চোর খেলছিল অথবা চোর চোর বলে চিৎকার করছিল—ঠাকুরদা ওদের ছুঁতে পারছে না। ওরা ঠাকুরদাকে নিয়ে শক্ত খেলায় মেতেছে। ওরা এবার ঠাকুরদাকে সামনের মাঠে নিয়ে যাবে এবং যেতে যেতে বলবে, আপনি কোথায় ? ঠাকুরদা বলবেন, আমি থামার বাড়িতে। তারপর ওরা যতদূর হেঁটে যাবে, উত্তরে দক্ষিণে যেদিকে চোখ যায়—ফের এক প্রশ্ন, আমরা কোথায় ? তিনি যেন বলবেন, আমরা ভিটা জমির ওপর। খেলার মতো ঘটনাটা হয়ে গেল। এমন খেলা বুঝি হয় না। ওরা প্রশ্ন করছিল আর বিজ্ঞের মতো ঠাকুরদার দিকে তাকিয়ে উত্তরের প্রত্যাশা করছিল। সোনা কেবল হরিণ শিশুর মতো ঠাকুরদা চারপাশে লাফাচ্ছে। ঠাকুরদা ঠিক বলতে পারলেই আবার টেনে নিয়ে যাওয়া রথের মতো—ওরা এক পুরোনো রথ যেন ভালবাসার পথ ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

জরাজীর্ণ রথটি পথের ওপর অতিকায় এক বটবৃক্ষের মতো দাঁড়িয়েছিল। হাতে লাঠি, গায়ে শাল, লাল টুপি এবং হাতে শীতের দস্তানা। তিনি গরম মোজা পায়ে দিয়েছেন, পায়ে সাদা কেডস জুতো—তিনি হাঁটতে-হাঁটতে ভাবছিলেন, তাঁর প্রিয় নাবালকেরা কোথায় তাঁকে টেনে নিয়ে এসেছে। তিনি একবার ভাবলেন ডেকে বলবেন, দ্যাখ, বৌমারা, তোমার পোলারা আমারে কই লইয়া যাইতাছে। কিন্তু বলতে পারলেন না। কেমন যেন পুকুর পাড়ে নেমে এসে তিনি মজা পেয়ে গেছেন। তিনি চুপচাপ লাঠিটা ঝোপে-জঙ্গলে ঠুকে ঠুকে এগুতে থাকলেন। এক সময় মনে হল লাঠিতে শক্ত একটা কিছু ঠেকেছে। এতক্ষণে মনে হল তিনি বড় জামগাছটা কেটে একটা অর্জুন গাছ লাগিয়েছিলেন। ওঁর মুখ চোখ এবার আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল—তোমরা আমারে অর্জুন গাছটার নিচে নিয়া আইছ।

ঠাকুরদা এবার ঠিক বলে ফেলেছে। সোনা মনে মনে চাইছিল, ঠাকুরদা ঠিক-ঠিক বলে ফেলুক। কারণ তিনি যে ভাবে নিরালম্ব মানুষের মতো এই পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন এবং বড়দা মেজদা যে-ভাবে ঠাকুরদাকে হেনস্থা করছে—তাতে ওর কষ্টটা কেবল বাড়ছিল। যেই সঠিক বলে ফেলেছে, যেই তিনি বুঝতে পেরেছেন ওঁকে অন্য পথে পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে নিয়ে আসা হয়েছে এবং মুখে নাবালকের মতোই যখন আর গর্বের অন্ত নেই, তখন সোনা আনন্দে একটা লাফ না দিয়ে থাকতে পারল না ; যেন উত্তরটা মহেন্দ্রনাথ দেয় নি, উত্তরটা সোনা দিয়েছে।

ওরা মহেন্দ্রনাথকে আরও টেনে নামাতে চাইলে তিনি বললেন, আমি আর যামু না। আমারে তোমরা ঝোপে-জঙ্গলে নিয়া যাইতে চাও। বান্দরের মত নাচাইতে চাও। আমি আর নাচমু না। বলে তিনি অর্জুন গাছটার নিচে বসে পড়লেন। দূর্বাঘাস ছিল কিছু, রোদ এসে পড়েছে কখন। ঘাসে কোন শিশিরবিন্দু ছিল না। বসে পড়ে তিনি চারধারে কি খুঁজতে থাকলেন।

সোনা বলল, কি খোঁজেন !

—আমারে।

সোনা বুঝতে পারল না কথাটা।

—আমারে খুঁজি। আমারে তোমরা এইখানে রাইখা দিয় ! তারপর তিনি কি ভেবে চুপ করে গেলেন। হয়তো তাঁর এই তিন নাতি ওঁর এই প্রিয় স্থানটুকুর খবর রাখে না। তিনি মাটির ওপর ফের ভালবাসার হাত রাখলেন। সব ছেলেদেরই বলে রেখেছেন, তাঁর এই ভালবাসার মাটিতে তাঁকে যেন দাহ করা হয়। তিনি নিজেই স্থানটি নির্বাচন করে রাখার সময় স্মারক হিসাবে অর্জুন গাছ লাগিয়েছেন।

সূর্যের আলো গাছের মাথায় পড়ায় বেশ উষ্ণ মনে হচ্ছিল চারিদিকটা। মাঠে মেলার গরু নেমে যাচ্ছে। কিছু ইতস্তত গাছের ছায়া পুকুরের পাড়ে-পাড়ে।

বুড়ো মানুষ মহেন্দ্রনাথ পা ছড়িয়ে নাতিদের নিয়ে অর্জুন গাছের ছায়ায় বসে রয়েছেন। দেখলে মনে হয় চোখ বুজে কিছু ভাবছেন। বোধ হয় স্মৃতিতে তাঁর একমাত্র পাগল ছেলের জন্য কষ্ট। তিনি পলটুর মাথায় হাত রেখে বললেন, পড়াশুনা কইর। বাবারে কষ্ট দিয় না।

মাঠে আবেদালির বিবির কবরটা দেখা যাচ্ছে। কবরের পাশে তিনটে জিয়ল গাছ পোঁতা। একটা মোরগ কবরটার ওপর এক পায়ে দাঁড়িয়ে শীতের সূর্যকে দেখছে। আর এই জালালিকে নিয়ে পাগল ঠাকুর গত রাতে ফিরে এসেছেন। মণীন্দ্রনাথ, বড় ছেলে তাঁর, পাগল ছেলে, সে এখন কোথায় কে জানে!

পলটু কোন উত্তর করল না। বাপ সম্পর্কে পলটুর একটা অসম্ভব রকমের ভীতি আছে। সে বাপের সঙ্গে কোথাও যায় না। বরং সোনার সঙ্গে ভাব বেশি। পলটু অন্য কথায় এল। সে বলল, চলেন ঠাকুরদা, আমরা গোপাটে নাইমা যাই।

মহেন্দ্রনাথ পলটুর কথা শুনেও শুনলেন না। তিনি এখন অন্য কথা ভাবছিলেন। জালালি জলে ডুবে মরেছে। কবরে একটা মোরগ উত্তর-দক্ষিণ ঘুরছে। আর সূর্যের উত্তাপ সমানভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছিল। গতকাল পার্বণের দিন গেছে। পূজার শেষে বলির বাজনা যেন থামছে না। আর অঞ্চলের বয়সী মানুষটি এখন তাঁর প্রিয় মাটিটুকুর ওপর বসে আছেন। এখানেই তিনি চিরকালের মতো মহানিদ্রায় মগ্ন হবেন। এখানেই তাঁর দেহ সবাই ধরাধরি করে নিয়ে আসবে—চোখের ওপর তিনি দৃশ্যটা ঝুলতে দেখলেন। ছেলেরা চারপাশে ঘিরে থাকবে, গ্রামের পর গ্রাম থেকে লোক জড় হবে—অঞ্চলের মানুষেরা হরিসংকীর্তন করবে, চন্দনের কাঠ পুড়বে, ঘৃত-দধি দুগ্ধ ঢেলে দেওয়া হবে, তার ভিতরে তিনি যজ্ঞের হবির মতো জ্বলতে থাকবেন। এবং তাঁর পাগল ছেলে তখন অর্জুন গাছটায় হেলান দিয়ে জ্বলন্ত মানুষটাকে দেখতে দেখতে দু'হাত তুলে চিৎকার করে উঠবে। সহসা এই পাগল পুত্রের মুখ তাঁকে কেমন বিষণ্ণ করে দিল। পাগল পুত্র চিতার আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন নালিশ—বাবা, আপনি আমার সর্বনাশ করেছেন। আপনি আমার সব ভালবাসা কেড়ে নিয়েছেন। আপনার ধর্মবোধ আমার জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আমি এক পাগল, আমার চিন্তাশক্তি নাই. আমার পাগল চিন্তার সমভাগী হতে কেউ চায় না—কেবল যেন মনে হয় মাথার ভিতর এক স্বপ্ন নিরালম্ব মানুষের মতো পাক খাচ্ছে, কেবল কে যেন সেই স্বপ্নের ভিতর চলে যেতে ডাকে। আপনি সেই মানুষ, আত্মার কাছাকাছি আমার যে যুবতী ছিল, যুবতীর নাম পলিন, উঁচু লম্বা এবং নীল চোখ তার, তাকে আপনি দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। সমুদ্র আমি দেখি নি বাবা, কিন্তু বসন্তের আকাশ দেখেছি, আকাশের নিচে সোনালী বালির নদীর জল, জলে তার মুখ ভাসে। আকাশের কোন বড় নক্ষত্র অন্ধকারে জলে প্রতিবিম্ব ফেললে মনে হয়, সেই মেয়ে কত দূরদেশ থেকে ডাকছে, মণি, যাবে না। উইলো ঝোপের পাশে বসে আমরা দুজনে সান্তাক্লজের গল্প করব। তুমি যাবে না। আর দেখেছি শীতের মাঠে ঘাসে ঘাসে কত শিশিরবিন্দু। শিশিরবিন্দুর মতো সেই পবিত্র মুখ আপনি কেড়ে নিয়েছেন বাবা। নালিশ দিতে দিতে চিতার আগুনের দিকে তাকিয়ে বিদ্বান বুদ্ধিমান পাগল ছেলে হাউহাউ করে কাঁদছে।

মহেন্দ্রনাথ লাঠিটা এবার আরও জোরে চেপে ধরলেন। মনের ভিতর কতকাল থেকে অনুশোচনা। মৃত্যুর জন্য যত প্রস্তুত হচ্ছেন তত এই পাগল ছেলের জন্য অনুশোচনা বাড়ছে। তত তিনি নিজেকে অসহায় ভাবছেন। তাঁর কেন জানি মনে হয়, আর দেরি করে লাভ নাই। তাড়াতাড়ি চন্দ্রায়ণটা করে ফেলতে হয়। দ্বাদশ ব্রাহ্মণভোজনের ব্যবস্থা করতে হয়। ব্রাহ্মণ খাইয়ে প্রায়শ্চিত্তটা সেরে ফেললেই—সংসার থেকে চিরদিনের জন্য নির্বাসনের দলিলটা মিলে যাবে। ঈশ্বরে সমর্পিত প্রাণ আর সাংসারিক দুঃখবোধে পীড়িত না হলেই যেন ভাল হয়। তিনি পলটুকে বললেন, আমারে ঘরে নিয়া যা। বলে তিনি পলটুর কাঁধে ঘরে ফেরার জন্য হাত রাখলেন।

বস্তুত তিনি নিজের সংসারে ফিরতে চাইলেন। ওরাই যেন তাঁকে তাঁর নির্দিষ্ট ঘরটিতে পৌঁছে দেবে। যে-ঘর থেকে একদা সূর্যোদয় দেখবেন বলে বের হয়েছিলেন, ঠিক সেই ঘরে। অন্ধকার ঘর, বায়ুশূন্য এবং মাঝে মাঝে ঝিল্লীর ডাক শোনা যায়—কেমন নিঃশব্দ এবং নির্জন, পাশে কেউ নেই। সব শূন্য। একটা শূন্যের মতো বায়ুশূন্য ঘরে ফের ফিরে যাওয়া। তিনি চোখ বুজলে তেমন একটা আলোহীন বায়ুহীন ঘরের দৃশ্য দেখতে পান।

কিন্তু দুষ্ট বালকদের মতলব বোঝা দায়। ওরা ওদের ঠাকুরদাকে নিয়ে বেশ রঙ্গ-তামাশা আরম্ভ করে দিল। ওরা ওদের প্রিয় ঠাকুরদাকে ধরে ধরে নিয়ে যেতে থাকল। গোপাট পার হয়ে অশ্বত্থ গাছের নিচটাতে এসে দাঁড়াল তারা। ওরা মহেন্দ্রনাথকে গাছতলায় ছেড়ে দিয়ে বলল, এবারে কন ত কোনখানে আইছেন!

বৃদ্ধ তাদের খুব অনুনয়-বিনয় করতে থাকলেন—কারণ তিনি বুঝতে পারছিলেন, ওদের হাতে যখন পড়েছেন, তখন তাঁর হেনস্থার শেষ নেই। ওরা ওঁকে নিয়ে খেলায় মেতে গেছে। ওরা ওঁকে ঝোপে-জঙ্গলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ভয় দেখাচ্ছে। তিনি প্রায় করজোড়ে বললেন ওদের, সোনাভাই, ধনভাই, বড়ভাই, তোমরা বড় লক্ষ্মী পোলা। তোমরা আমারে ঘরে নিয়া যাও।

সোনা বলল, ঠাকুরদা, ডর নাই। টোডারবাগের বটগাছটার নিচে আইছি।

লালটু বলল, আমরা আপনের লগে মাঠে পলান্তি খেলমু। বলেই ওরা মহেন্দ্রনাথকে গাছের নিচে ধীরে ধীরে বসিয়ে দিল। যেন মহেন্দ্রনাথ ওদের সমবয়সী বন্ধু। তারপর ওরা ছুটে ছুটে বেড়াল—চিৎকার করে সবাইকে যেন বলতে চাইল—রাজা হুই গাছের নিচে বইসা আছে। রাজারে ছুঁইয়া দিলেই জিত। মহেন্দ্রনাথ এমন খেলায় ঘরের কথা ভুলে গেলেন। গাছের ডালে পাখি, পাখিরা সব কলরব করছে। কোথাও দূরে গরু-বাছুরের ডাক, অনেক দূরে কে যেন কাঠ কাটছে। আর অনেক দূর দিয়ে কে যেন হেঁটে চলে যায়। বুঝি সেই পাগল ছেলে। আর মনে হল তাঁর, চারপাশে প্রকৃতির কোলে সেই এক শৈশব ঘুরেফিরে আসে। তিনি লাঠি কোলে রেখে বসে আছেন। স্থির। প্রায় বুদ্ধমূর্তির মতো চোখ বুজে তিনি বসে আছেন। দূরে সোনালী বালির নদীর জলে নৌকা ভাসে, বাদামে লাল নীল রঙের পাখি—তিনি বসে বসে সেই শৈশবকে যেন দেখতে পাচ্ছেন, শৈশব ঘুরে ফিরে চলে আসে, সেই এক নাও নদী ধরে যায়, পাশে সেই এক লাল নীল পাখি উড়ে উড়ে আসে। তাঁর চারপাশে শৈশব এখন খেলা করে বেড়াচ্ছে। তিনি পুরোনো শৈশবের প্রতীক। ওরা এখন গান গাইছে মাঠে, লুকোচুরির গান। গ্রামের অন্য সব বালক এই খেলায় ভিড়ে গেছে। সুভাষ, কিরণী, কালাপাহাড় এমনকি টৌডারবাগ থেকে ছোট্ট ফতিমা পর্যন্ত নেমে এসেছে।

মহেন্দ্রনাথের চোখে এখন আর পাগলপুত্রের মুখ ভাসছে না। কারণ, সংসারে সুখ সব সময় থাকে না। সংসারে দুঃখও সব সময় ভাসে না। শুধু এক দূরের শৈশব বার বার এই প্রকৃতির কোলে ঘুরেফিরে চলে আসে। তিনি মনে মনে নিজের সেই হারানো শৈশবকে ফিরে পাবার জন্য গুনগুন করে লুকোচুরির গান গাইতে থাকলেন। শৈশবে বুঝি মাথার ওপরের বটবৃক্ষ অত বড় ছিল না। তবু তিনি তাঁর শৈশবের সাঙ্গপাঙ্গদের গাছের নিচে দেখতে পেলেন। ওরা খেলা করে বেড়াচ্ছে। এবং তিনি যে গান গাইছিলেন, সেই গান সমস্বরে ওরা গেয়ে চলেছে। কিন্তু সময় বড় সামান্য। কত আর সময় হবে—তাঁর মনে হল সহসা, ওরা কেউ বেঁচে নেই, ওরা এই বটবৃক্ষের নিচে কি করে আর ফিরে আসবে। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। ভিতর থেকে কে যেন কেবল বলছে, তারা কেউ বেঁচে নেই, একা তুমি পুরী পাহারা দিচ্ছ। যেন এতদিনে ধরতে পারলেন, এই গাছপালা পাখির ভিতর তিনি আর কেউ নন। তিনি পরিত্যক্ত মানুষ। সবুজ বনে মৃত বৃক্ষের মতো তিনি শুধু জায়গা দখল করে আছেন। অথবা জীর্ণ মঠের মতো, মঠ থেকে সন্ন্যাসী পুণ্য করতে তীর্থে বের হয়ে গেছে। তিনি আর বসে থাকতে পারলেন না। একা একা সবার অলক্ষ্যে তিনি নদীর দিকে পাগলের মতো নেমে যেতে থাকলেন।

সোনা-ই প্রথমে চিৎকার করে উঠল, ঠাকুরদা গাছতলাতে নাই।

ওরা সকলে এত মশগুল ছিল খেলাতে, ঝোপে জঙ্গলে ওরা এত বেশি ছুটছিল যে, টেরই পায় নি কখন বুড়ো মানুষটা নদীর দিকে নেমে গেছে। ওরা সবাই এবার গ্রামের দিকে চিৎকার করে বলতে বলতে উঠে আসছে—ঠাকুরদা হারাইয়া গেছে। গাছতলাতে নাই, কোনখানে নাই।

ঈশম চরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল। চারিদিকে তরমুজের লতা। হলুদ রঙের ফুল। বড় বড় লতার ফাঁকে ফাঁকে উটের ডিমের মতো তরমুজ। যেন এক অতিকায় উটপাখি এই বালির চরে ডিম পেড়ে রেখে গেছে। কালো কুচকুচে রঙ। এবার শীত যেতে না যেতেই তরমুজে ছেয়ে গেল। মেলায় এবার অনেক তরমুজ যাবে। ছোটঠাকুর ব্যাপারীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে। সে আল নিয়ে মামলা করবে ভেবে বাড়ি থেকে নেমে এসেছিল। পথে ব্যাপারীর সঙ্গে দেখা। সে জমিতে চলে এল। এসে তাজ্জব বনে গেল। ঈশম ওকে একবারও বলে নি, ফলন এত ভাল হয়েছে। ক'দিনের ভিতর জমিটার চেহারা পাল্টে গেছে। মেলায় যাবে তরমুজ। কাল পরশু থেকে এই পথে অথবা চরের পাশ দিয়ে বড় বড় ঘোড়া উঠে যাবে। মেলায় ঘোড়দৌড় হবে। সোনালী বালির নদীতে পাল তুলে নৌকা যেতে আরম্ভ করেছে। এ-মাসটাই নৌকা চলবে। তারপর জল কমে গেলে পারাপার করতে হাঁটু জল থাকে। ঈশম জমি থেকে এক দুই করে তরমুজ সংগ্রহ করছে।

ঈশম ছুটে যাচ্ছে। পাতার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখছে। তারপর টোকা মারছে। ডাঁসা তরমুজ খেতে স্বাদের হয়। সে টোকা দিয়ে বুঝতে পারে কোন তরমুজ জমি থেকে তুলে নেবার সময় হয়েছে। এক-একটা তরমুজ বিশ-ত্রিশ সের ওজনের। সে একসঙ্গে দুটো তুলে আনতে পারছে না। এমনকি কোন কোন তরমুজ সে বুকের কাছে তুলে প্রায় যেন পাঁজাকোলে নিয়ে আসছে। সে ছইয়ের পাশে এক-দুই করে তরমুজ জড় করার সময়ই দেখল, এদিকে একটা মানুষ টলতে টলতে নেমে আসছে। সে প্রথম ভাল করে লক্ষ্য করে নি। নিবিষ্ট মনে সে এখন শুধু তরমুজ জড় করছে। তার যেন হাতে সময় নেই। সময় চলে যাচ্ছে। সে দূরে দেখল বাতাসে তরমুজের পাতা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, ফাঁক হয়ে গেলেই বড় একটা তরমুজের পিঠ সে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল। বাতাস আর নেই। কাছে গিয়ে দেখল বড় বড় পাতা তরমুজটাকে ঢেকে দিয়েছে। সে চারিদিকে চোখ মেলে খুঁজতে থাকল। পাতার ভিতর পড়ে থাকলে টের পাওয়া যায় না। তরমুজ ফেটে নষ্ট হয়ে যায়। সে আর একবার বাতাসের জন্য অপেক্ষা করল। বাতাস উঠলেই পাতার ফাঁকে তরমুজটা সে দেখে ফেলবে—এই ভেবে চোখ তুলতেই দেখল, মানুষটা দু'বার আছাড় খেয়েছে,

দু'বার উঠে দাঁড়িয়েছে। টলছে। কে এই মানুষ। শীতের রোদে পাগলের মতো নদীর দিকে নেমে আসছে। সে একবার ভাল করে লক্ষ্য করতেই বুঝল, আরে এ যে সেই মানুষ, সে ছুটতে থাকল। নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এত সাহস হল কি করে, চোখে দেখতে পায় না, তাজ্জব! মানুষটা লাঠি ঘুরিয়ে যেন তার যৌবনকাল, যেন বাতাসের সঙ্গে মানুষটা লড়ছে, লাঠি ঘোরাচ্ছে, ছাখো, আমি মহেন্দ্রনাথ এখনও কতদূর হেঁটে যেতে পরি, দ্যাখো, আমি মহেন্দ্রনাথ কতকাল এই মাটিতে বসবাস করছি, এখন কিনা আমার পোলারা কয় চন্দ্রায়ণ করেন বাবা। কি সাহস! মানুষটা লাঠি ঘুরিয়ে হাঁটতে গিয়ে বার বার মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। আর একটু হলেই গড়িয়ে গিয়ে নদীর জলে পড়বে। ঈশম ছুটতে ছুটতে গিয়ে ধরে ফেলল। তারপর পাঁজাকোলে তুলে নিতেই দেখল, হাত পা ছিঁড়ে গেছে। রক্ত পড়ছে। এমন কেন করছেন তিনি! এখন যেন ঠিক একটা পুতুলের মতো মুখ—মানুষটার, সেই জবরদস্ত চেহারা নেই। একেবারে ছোট মানুষ হয়ে গেছে। ছোট্ট শিশুর মতো কাঁদছে।

—আপনের কি হয়েছে কর্তা। কোনদিকে যাইবেন ঠিক করছেন!

—আমারে তুই কই লইয়া যাইতাছস?

—বাড়ি যাইবেন।

—বাড়ি! বৃদ্ধ এবার চোখ বুজে ফেললেন। তিনি এটা কি করতে যাচ্ছিলেন! তিনি তাঁর বড় ছেলের মতো নিরুদ্দেশে হাঁটছিলেন কেন! মনের ভিতরে কিসের এই আবেগ! নিজের ছেলেমানুষীর জন্য কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।—আমারে নামাইয়া দে।

—শরীর কি হইছে দ্যাখছেন?

—কি হইছে?

ঈশম এখন আর কিছু বলল না। শরীরে রক্ত নেই বোঝা যাচ্ছে। কোন কোন জায়গা কেটে গেছে অথচ রক্তপাত হচ্ছে না। সে তাড়াতাড়ি পুকুর পাড়ে উঠলেই সকলে ছুটে এল। সেই বৃদ্ধ মানুষ, আলখেল্লা পরা মানুষ, অঞ্চলের সর্বশেষ মানুষ পথ হারিয়ে ফেলেছিল। তিনি সকলকে অন্তত এমনই বললেন।

এ-ভাবেই শেষে মেলার দিন এসে গেল। ঘোড়া উঠে আসতে আরম্ভ করল এক দুই করে। গোপাট ধরে বড় বড় ঘোড়া চলে যাচ্ছে। মাসাধিককাল মেলা। শনিবারে ঘোড়দৌড় হবে। গলায় ঘণ্টা বাজলে মানুষেরা মাঠে নেমে ঘোড়া দেখে, কার ঘোড়া যায়! নয়াপাড়ার ঘোড়া কি বিশ্বাসপাড়ার ঘোড়া! মাঠে ঘোড়ার মুখ ভাসলেই মানুষগুলি ঘোড়া যায় বলে চিৎকার করতে থাকে।

মেলায় যাবে সকলে। রঞ্জিত যাবে, মালতী যাবে। আবু শোভা যাবে। ছোট ঠাকুর যাবে। তরমুজ যাবে নৌকায়। এখন নৌকায় তরমুজ বোঝাই হচ্ছে। যাবে না শুধু সোনা। লালটু পলটু পর্যন্ত প্যাণ্ট জামা পরে ঠিক হয়ে আছে, সূর্য উঠলেই ওরা হাঁটতে শুরু করবে। সোনা যাবে না, কারণ সোনার এতদূর হেঁটে যেতে কষ্ট হবে।

সোনা অনেকক্ষণ বারান্দায় বসে থাকল। সে সব কিছু দেখছে এবং মনে মনে অভিমানে ভেঙে পড়ছে। কারো সঙ্গে কথা বলছে না। ছোট কাকা না বললে সে মেলাতে যেতে পারবে না। বাড়ির কেউ সাহস করে কাকাকে বলতে পারছে না। সোনা মাকে সকাল থেকে বলছে, আমি যামু, তুমি ছোট কাকারে কও, আমি যামু। মা পর্যন্ত সাহস পায় নি বলতে। ধনবৌ গতকাল একবার বলেছিল, সোনা যদি মেলায় যায়? ছোটকাকা ধনবৌকে মেলার ভিড়ের কথা বলেছিল, এতদূর সে যেতে পারবে না হেঁটে, এসব বলেছিল। আর ধনবৌ বলতে সাহস পায় নি।

সোনা থামে হেলান দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সব কিছু দেখছে, এবং লালটু পলটু পাটভাঙা প্যাণ্ট জামা পরে ছুটোছুটি করছে, দেখতে পেয়ে ভ্যাক করে কেঁদে দিল। যত সকলের সময় হয়ে যাচ্ছে মাঠে নেমে যাবার, তত সে ভেঙে পড়ল। কারণ শেষ পর্যন্ত আশা ছিল ছোটকাকা তাকে কাঁদতে দেখে মেলায় যেতে বলবে।

ঈশম আসছিল তরমুজ মাথায় করে। সে এত বড় একটা তরমুজ আবিষ্কার করে অবাক। প্রায় এক মণের চেয়ে বেশি ওজন। সে তরমুজটা ব্যাপারির নৌকায় তুলে দেয় নি। বাড়িতে নিয়ে এসেছে। সবাইকে কেটে কেটে খেতে বলবে। আর কাটলেই ভিতরে লাল রঙ, কালো বীচি, বসন্তকালে এই তরমুজের রস মিছরির শরবতের মতো। সে উঠোনে উঠেই ডাকল, সোনাবাবু কই গ। দাওটা আনেন।

রঞ্জিত ছিল উঠোনে দাঁড়িয়ে। শোভা আবু এসেছে উঠোনে। মালতী এসেছে। যারা মেলায় যাবে তারা সবাই উঠোনে ভিড় করছে। গাঁয়ের নিচে

থ, পথ ধরে মানুষেরা সার বেঁধে মেলায় যেতে আরম্ভ করছে। সবাই মেলায় যাবে, যাবে না শুধু সোনা। সে ঈশমের ডাক শুনতে পেয়েছে। কিন্তু উঠোনে নেমে গেল না। থামে হেলান দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে শুধু।

রঞ্জিতকে বলল ঈশম, ন্যান, কাইটা সকলরে ন্যান।

ঈশম বড় ছুটো কলাপাতা কেটে আনল। প্রথম তরমুজ ঠাকুরের জন্য কিছুটা আলাদা করে রাখা হয়েছে। বাকিটা রঞ্জিত কেটে সবাইকে দিল। দেবার সময় ঈশম বলল, সোনাবাবু কৈ? তাইনরে দ্যাখতাছি না।

লালটু বলল, সোনা কানতাছে।

—কান্দে ক্যান!

—মেলায় যাইব বইলা।

—আপনেরা যাইবেন, সোনাবাবু যাইব না?

—ছোটকাকায় না করছে।

—না করলেই হইব। বলে সে ভিতরে ঢুকে ডাকল, সোনাবাবু কই! কেডা কইছে আপনে মেলায় যাইবেন না। আমি আপনেরে মেলায় লইয়া যামু। কার সাধ্য আছে না করে দ্যাখি।

ছোট কাকা বললেন, এতদুর হাঁইটা যাইতে পারব না। কে অরে কোলে নিয়া হাঁটব।

—আমি হাঁটমু। চলেন কর্তা।

যেন সহসা আকাশের সব মেঘ কেটে গেল। সোনার কি যেন হারিয়ে গিয়েছিল, সহসা মিলে গেছে। সে মাকে বলল, মা আমারে ছোট কাকায় যাইতে কইছে। ঈশম দাদা আমারে লইয়া যাইব। সোনা ছুটে ছুটে সকলকে বলতে থাকে। ঠাকুমাকে বলল, ঠাকুরদাকে বলল, আমি মেলাতে যামু। ঈশম দাদা আমারে লইয়া যাইব। মেলায় যাবার নামে সে প্রায় আত্মহারা হয়ে গেল। এ যেন অন্য এক জীবন, মেলা, বান্নি, নদীনালা সব মিলে মানুষের প্রাণে এক বন্যা বয়ে আনে। রহস্যটা এতদিনে সোনা জানতে পারবে। মেলাতে কি রহস্য, কারা জাগে মেলাতে, ঘোড়দৌড় হলে বাজি জেতার জন্য সবাই আকুল হয় কেন—এসব মনে হচ্ছিল সোনার। সোনা ঈশমের হাত ধরে সবার আগে আগে মাঠে নেমে গেল। কিছু হেঁটে কিছু কাঁধে চড়ে এবং যখনই সোনা আর হাঁটতে পারছিল না, ঈশম কাঁধে তুলে নিচ্ছে। বেশিদুর যেতে না যেতেই বালিয়াপাড়া পার হলে নদীর পাড়ে সোনা জলছত্র দেখল। তারপর গাছের নিচে, সারি সারি হিজল গাছের নিচে সোনা বিন্নির খৈ এবং লাল বাতাসা দেখল। দু'পয়সার বিন্নির খৈ, এক পয়সার বাতাসা কিনে দিল ঈশম। ছোটকাকা থাকলে কিছুতেই খেতে পারত না, খেতে দিত না। কেউ কেউ আগে উঠে গেছে। সোনা দু'পকেটে বিন্নির খৈ রেখেছে, ঠোঙাতে বাতাসা। সে হাঁটছিল আর বিন্নির খৈ খাচ্ছিল। খেতে খেতেই দেখল দূরের বড় মাঠে তাঁবু পড়েছে। তাঁবুর মাথায় পতাকা উড়ছে। যজ্ঞেশ্বরের মন্দির দেখা যাচ্ছে। অশ্বত্থ গাছ ফুঁড়ে মন্দিরের ত্রিশূল আকাশের দিকে উঠে গেছে। আর সারি সারি ঘোড়া দরগার জমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কেউ তাল পাতার বাঁশি বাজাচ্ছে। নদীতে কত নৌকা লেগে রয়েছে। ওদের একটা নৌকা আসবে। তরমুজের নৌকা। নদীনালা ঘুরে আসতে সময় লেগে যাবে।

রঞ্জিতের একটা দল আসবে নারায়ণগঞ্জ থেকে। এই মেলাতে দলটা ছোরা খেলা লাঠি খেলা দেখাবে। ভুজঙ্গ, গোপাল সবাই দু'দিন আগে চলে গেছে। তাঁবু ফেলতে হবে। ছোট ছোট, এই তের চোদ্দ বছরের মেয়েরা আসবে, সাদা ফ্রক গায়ে, কালো প্যান্ট পরে এবং পায়ে কেডস জুতো। কথা ছিল, বাবুদের কাছারি বাড়িতে ওরা থাকবে। সমিতির নির্দেশে এইসব হচ্ছে। রঞ্জিত এমনভাবে চলাফেরা করছে, দলটার সঙ্গে তার যেন কোন সম্পর্ক নেই। বরং ভুজঙ্গই সব করছিল।

মালতী ঠিক যজ্ঞেশ্বরের মন্দিরে উঠে যাবার মুখেই দেখল, জব্বর ইস্তাহার বিলি করছে মেলাতে। সে মালতী দিদিকে দেখে এক গাল হেসে দিল।—দিদি, আপনে আইছেন। মালতী দেখল, ওর পাশে অপরিচিত দু' চারজন মুসলমান পুরুষ, মালতী ভয়ে হাসতে পারল না। একবার ইচ্ছা হল জানতে, মেলায় সামু এসেছে কিনা, কিন্তু জব্বরের দু'পাশের লোকগুলি এমনভাবে তাকাচ্ছিল যে, সে কিছুতেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। নদী থেকে স্নান করে আসতে হবে। কিছু ফুল বেলপাতা তিল তুলসী লাগবে—মালতী সোজা মন্দিরে উঠে গেল।

আর তখনই একটা বাচ্চা ছেলে, ছেলের বয়স আর কত হবে, মেলায় হারিয়ে গিয়েছে। হাতে তার একটা ছোট্ট ছাগশিশু। দিদি গেছে স্নান করতে নদীর ঘাটে। ওকে গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছে। দিদি আসবে, এলেই মন্দিরে উঠে যাবে।

সংসারে তখন জ্বালা যন্ত্রণার কথা উঠেছে। ভিতরে এক মন আছে মানুষের, পাগলের মতো সেই মন নদী দেখলে কেবল উথাল পাতাল করে। মেলায় এমন সুন্দরী হিন্দু মেয়েদের ভিড়! স্নান করে উঠে এলে, ভিজা কাপড়ে উঠে এলে, কি যে দেখায়, যুবতী মেয়ের সর্ব অঙ্গে কালসাপ যেন, কেবল দেখলেই ছোবল মারতে ইচ্ছা যায়। স্থির থাকা যায় না।

গোপালদির বাবুদের ছেলেরা গোটা মেলাতে ভলান্টিয়ার দিয়েছে।—ওহে মানব জাতির সন্তানেরা, মিলেমিশে থাক, কুকাজ করলে ধরে বেঁধে নিয়ে যাব। জলছত্র দিয়েছে। কেউ হারিয়ে গেলে তার সন্ধান দিচ্ছে। ব্যাজ পরা বাবুদের ছেলেরা কেউ কেউ ঘোড়ায় চড়ে দিকে দিকে খবর নিয়ে যাবার সময়ই

শুনল, কে কার স্তন টিপে দিয়েছে। যুবককে ধরে ফেলেছে। লুঙ্গি পরা, গলায় গামছা বাঁধা, বগলে পাচনের লাঠি, মাতব্বর মানুষের মতো মেলা দেখতে এসেছিল। লোভে, যখন ভিড়, স্নানের ঘাটে ভিড়, তখন পরিচিত মেয়ের স্তনে হাত দিলে সব গোপন করে রাখবে—কিন্তু হিন্দু নারী, সে তার মানসম্মানের জন্য বোকার মতো হাউহাউ করে কেঁদে দিল। বাবুদের এক ছেলে দেখে ফেলেছে। কড়া নজর সবদিকে। মুঠিতে ধরে পাছায় এক ধাই করে লাথি মারল। সঙ্গে সঙ্গে মেলায় খবরটা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। কেউ কিছু বলতে সাহস করছে না। দরগার ঘোড়াগুলো ঘাস খাচ্ছে। বিকেল হলে মাঠে নেমে যাবে। কত বড় প্রশস্ত মাঠ। দূরে দূরে সব লাল নীল নিশান উড়ছে। দুটো একটা ঘোড়া, বোধ হয় মুড়াপাড়ার স্বরেশবাবুর ঘোড়াটা এখন ধুধু মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সাদা রঙের ঘোড়া তীরবেগে ছুটে আসছিল।

আর তীরবেগে ছুটে যাচ্ছিল জব্বর। সে দেখল তার স্বজাতিকে টেনে বেঁধে নিয়ে কাছারি বাড়িতে তোলা হচ্ছে। কেউ একবার মুখ ফুটে কিছু বলছে না। তার স্বজাতিরা মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে। সে প্রায় যেন যোজন দূরে লাফ মেরে যেতে পারে, তেমনি লাফ দিয়ে ছুটে গেল এবং ভিড়ের ভিতর পড়ে হুংকার দিয়ে উঠল, কই লইয়া যান অরে।

কে একজন বলল, কাছারি বাড়ি।

—হ্যায় কি করছে!

—স্তন টিপা দিছে।

—দিছে ত কি হইছে! বলেই সে ভিড় ঠেলে আরও এগিয়ে গেল। ওর দলটাও এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওরা সেই যুবকের নাগাল পেল না। একদল ব্যাজ পরা লোক আনোয়ারকে কাছারি বাড়িতে তুলে নিয়ে গেল। পাছায় লাথি, কিল চড় ঘুষি, হায় আনোয়ার, তোমার মনে যে কি ইচ্ছা, এমন সুন্দর স্তনে ফোটা পদ্মফুলের মতো স্তনে তুমি নাকি জলের অতলে স্বপ্ন দেখছিলে—ষ্যান এক রূপালী মাছ ভাইস্যা যায়। তুমি তারে খপ করে ধরতে গেছিলে।

ক্রমে সূর্য নেমে যাচ্ছিল। বড় তাঁবুতে যেখানে ফরাস পাতা, সেখানে বাবুদের মেয়েরা বসবে। সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার গায়। দেবীর মতো মুখ। ঝলমল চোখে ঘোড়দৌড় দেখবে। অথবা নদীতে যে হাজার নৌকা ভেসে রয়েছে—সেইসব নৌকা থেকে দাসদাসী উঠে এলে মেলাময় আনন্দ, দরগা থেকে তখন এক দুই করে ঘোড়া ঠিক এই তাঁবুর নিচে প্রথম নেমে আসবে, বাবুদের প্রথম সেলাম দিয়ে কদম দিতে দিতে মাঠে নেমে যাবে—যেন আমরা এসেছি দূর দেশ থেকে, বাজি জিতে আমরা চলে যাব, আপনারা মেহেরবান লোক আপনাদের এই মাঠে ঘোড়া ছোটাব। বাজি জিতব। বলে ঘোড়াটার

খেলা দেখাতে শুরু করেছিল। এক দুই করে ঘোড়া তার পা তুলে বাবুদের ছোট ছোট মেয়েদের নাচ দেখাচ্ছিল।

তখন মেলাতে দুটো দল। কাছারি বাড়িতে হিন্দু যুবকেরা উঠে গেছে। নিচে মুসলমান যুবকেরা। পুলিস এসেছে। ওরা বাবুদের সপক্ষে কথা বলছিল। আইন আছে। বিচার আছে। থানায় চালান দেওয়া হবে।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! কাছারি বাড়ি ভেঙে আনোয়ারকে ওরা কেড়ে নিতে গেলে বাবুদের বন্দুক গর্জে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া নাচছিল দূরে, সেই ঘোড়া ভয় পেয়ে ছুটতে থাকল। যে যেদিকে পারছে ছুটতে থাকল। ঈশম তরমুজ বিক্রি করছিল। সোনা লালটু পলটু সার্কাসের তাঁবুতে বাঘ সিংহের খেলা দেখছে। ব্যাগপাইপ বাজছিল, বাঘটা থাবা চাটছে। উঁচু রিঙে একটি ফুটফুটে মেয়ে খেলা দেখাচ্ছে, তখন সেই বন্দুকের গর্জনে সারা মেলাটায় কিরকম যেন অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ল।

দুটো লাশ পড়ে গেছে। ক্রমে অন্ধকারে মশালের আলো দেখা যেতে থাকল। কাছারি বাড়িতে বাবুদের মেয়েরা উঠে গেছে। দরগা থেকে সব ঘোড়া এক এক করে নেমে আসছে। সহিসের হাতে মশাল। মেলাময় মশাল জ্বলছে। মাঝে মাঝে আল্লা হো আকবর ধ্বনি উঠছিল। কাছারি বাড়িতে হিন্দুরা প্রাণ রক্ষার্থে যেন চিৎকার করছে, বন্দে মাতরম্।

কে কোথায় ছিটকে পড়ছে বোঝা যাচ্ছে না। ঈশম সোনা, লালটু, পলটুকে তাঁবুর ভিতরে বসিয়ে দিয়ে চলে এসেছিল। সার্কাস ভেঙে গেলে ওরা ঈশমের কাছে চলে আসবে এমন ঠিক ছিল। ঈশম মেলাতে দাঙ্গা বাধতেই সার্কাসের তাঁবুর দিকে ছুটে যাচ্ছে। অন্ধকার হয়ে গেছে। লোকজন যে যেদিকে পারছে ছুটছে। সেই ছোট্ট ছাগশিশু এবং বাচ্চাটা কারা চেপ্টে দিয়ে চলে গেছে। দিদির আশায় সে দাঁড়িয়েছিল, দিদি এলেই মন্দিরে উঠে যাবে। যখন ঘটনাটা ঘটে দুপুর হবে, আর এই দুপুর থেকেই গুঞ্জন। ক্রমে জব্বর এলে সেই গুঞ্জন বাড়তে থাকে—সবাই ভেবেছিল, মেলাতে বান্নিতে এমন হামেশাই ঘটে। মাতব্বর মানুষেরা এসে সব মিটমাট করে দেয় কিন্তু তাজ্জব এবার এই জব্বর—সে সকলকে বলছিল, আপনেগ ইজ্জত নাই। আপনেরা গরু ঘোড়া আর কতদিন হইয়া থাকবেন। ঠিক সামুর গলার স্বরে সে চিৎকার করছিল। ওর এত মানুষজন দেখে কেমন জুস এসে গেছিল ভিতরে। সে এবার নিজেকে, সে যে কত বড়, এবং ইচ্ছা করলে কি না করতে পারে, বলে আনোয়ারকে কেড়ে নেবার জন্য কাছারি বাড়িতে উঠে যাবার সময় দেখলে বন্দুক গর্জে উঠছে। সে এতটা আশাই করতে পারে নি। পর পর দুটো লাশ ওর সামনে মুখ থুবড়ে পড়ল। আগুন জ্বলতে কতক্ষণ। এবার যেন সকলে মশালের আলো নিয়ে ছুটে আসবে এবং সব তছনছ করে

কাছে পিঠে যার যা কিছু অমূল্য মনে হবে ফেলে মাঠের ভিতরে দৌড়াতে থাকবে।

ঈশমও সার্কাসের তাঁবুর দিকে ছুটছে। হায় গেল, সব গেল। সে চিৎকার করে ডাকছে। সোনাবাবু! তাঁবুর সামনে এসে দেখল, তাঁবু আর নেই। সব তছনছ করে দিয়েছে। তাঁবুর একটা দিকে আগুন জ্বলছে। বাঘ সিংহ কঁকড়ে মরছিল। কাছে কোথাও কোন লোকজন নেই। যেন নিমেষে সব লুটপাট করে তুলে নিয়ে গেছে।

ঈশম কি করবে স্থির করতে পারছে না। সে বড় মুখ করে সোনাবাবুকে নিয়ে এসেছে। হায়, কি হবে! সে আকুল হতে থাকল। আর পাগলের মতো কাছারি বাড়ির দিকে উঠে যাবে ভাবল। কিন্তু কাছে গিয়ে মনে হল— ওরা যে-ভাবে রুখে আছে, ওর পরনে লুঙ্গি, সে কিছুতেই আর সে দিকে যেতে সাহস পেল না। তারপর মনে হল তিন নাবালক এদিকে ছুটে আসতে পারে না। কারণ ওরা পথ হারিয়ে ঠিক যেখানে সে তরমুজ বিক্রি করছিল সেদিকেই ছুটে যাবে। সে আর দাঁড়াল না। গোটা মেলাটা ক্ষেপে গেছে। চারপাশে আগুন। এই আগুন যেন কতকাল থেকে মাটির ভিতর এতদিন আত্মগোপন করেছিল। কত দিনের অপমান এইসব মানুষ হজম করে এখন বদলা নিচ্ছে। সে কি করবে ভেবে পেল না। আগুনের ভিতর দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে থাকল, সোনাবাবু কৈ গ্যালেন গ। লালটুবাবু। আমি গাঁয়ে ফিরমু কি কইরা। মুখ দ্যাখামু কি কইরা। সে পাগলের মতো আগুনের ভিতর কেবল ডাকতে থাকল। সে ডাকতে ডাকতে ছুটছিল। চারধারে কাচ ভাঙা, কাচের চুড়ি ভেঙে পথটা লাল নীল সবুজ মিহিদানার মতো পথ, পথে ছুটতে গিয়ে ওর হাত-পা কেটে যাচ্ছে। ওর হুঁশ ছিল না। ওরা হয়তো গাছের নিচে ওর জন্য দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু হায়, এসে দেখলে সেখানে কেউ নেই। শুধু বড় বড় তরমুজ চারিদিকে কারা ছড়িয়ে দিয়ে মাঠের অন্ধকারে মিশে গেছে। তরমুজে সব চাপ চাপ রক্ত। ওর শরীর শিউরে উঠল। পাগলের মতো হেঁকে উঠল, কেডা আমার মানুষ কাইড়া নিছ কও। বলে সেও সেই উন্মত্ত মেলাতে কাদের হত্যা করার জন্য যেন ছুটে গেল। সে ফাঁকা মাঠের ভিতর দাঁড়িয়ে উন্মত্তপ্রায় চিৎকার করে ডাকতে থাকল, সোনাবাবু কৈ গ্যালেন। রা করেন! কোন আনধাইরে লুকাইয়া আছেন কন, আমি ঈশম। আমি আপনেগ বাড়ি নিয়া যামু। বাড়ি নিয়া না যাইতে পারলে আমার জাত-মান কুল সব যাইব।

ঘোড়াগুলি দ্রুতবেগে ছুটছে। যেসব ঘোড়া দরগায় ছিল তারা প্রায় সকলে জব্বরের হয়ে যেন লড়ছে। এটা যে কি হয়ে গেল—দোকানপাট লুট, মনিহারি দোকান, কাপড়ের দোকান এবং কামার কুমোরেরা এনেছে হাঁড়ি

কলসি দা বঁটি নিয়ে—সে সবও লুটাপাট হচ্ছিল। সার্কাসের তাঁবু থেকে দু-তিনটে মেয়ে উধাও হয়ে গেল। এবং মানুষেরা নদীর পাড়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সামনের বড় বড় সব তরমুজের নৌকা হাঁড়ি পাতিলের নৌকা, আর কিছুই টের পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু জলের ভিতর হাহাকারের শব্দ। কেউ কোনদিকে তাকাচ্ছে না। যে যার প্রাণ/নিয়ে পালাচ্ছে। ঘোড়ার পায়ের নিচে অথবা আগুনের ভিতর কার কখন প্রাণ যায় বোঝা দায়। শড়কি, বর্শা, সুপুরির শল। হাজার হাজার দু'দলের ভিতর কোথা থেকে সহসা আমদানি হয়ে গেল। যেন এক যুদ্ধক্ষেত্র। দীঘির দু'পাড়ে দু'দল অন্ধকারে প্রতীক্ষা করছে। রাত বাড়লেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

রঞ্জিত বিকেলের দিকেই প্রথম আঁচ পেয়েছিল। সে তার দলবল নিয়ে কাছারি বাড়িতে উঠে গেল। এখন সোনা লালটু পলটু আর মালতীকে খুঁজে বের করতে হবে। মেলাতে এলে মালতী অধিক সময় মন্দিরে কাটায়। সে ওদের কাছারি বাড়ি তুলে দিয়ে প্রথম মালতীর খোঁজে চলে গেল। মালতী ঠিক যেখানে বড় একটা ভাঙা মঠ আছে, মঠের দরজায় যেখানে ভিড়, ভিড়ের ভিতর মালতী পূজা দেবার জন্য প্রায় যেন হামাগুড়ি দিচ্ছে। রঞ্জিত ওর আঁচল ধরে ফেলল। বলল, শোভা আবু কোথায়?

—ওরা মন্দিরে আছে।

—ওদের নিয়ে চলে এস।

মালতী ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে।

রঞ্জিত বলল, দেরি কর না। আমি সার্কাসের তাঁবুতে যাচ্ছি। ঈশমকে খবর দিতে হবে। অনেক কাজ। মেলায় গণ্ডগোল হতে পারে।

রঞ্জিত হনহন করে হাঁটছে। দীঘির এ-পাড়ে হাজার রকমের কাচের চুড়ির দোকান। তারপর ফুল ফলের দোকান। তারপর বাতাসা বিন্নির খৈ। মিষ্টির দোকান কত। তেলেভাজার দোকানগুলি পার হয়ে এলেই ফাঁকা মাঠ। মাঠে এখন তাঁবুর ভিতর গোপালদির বাবুরা বসে আছে। এই মাঠ পার হলে সার্কাসের তাঁবু, দুটো ছোট বড় সার্কাস। রঞ্জিত টিকিট কিনে দিয়েছে। ঈশম ওদের বসিয়ে দিয়ে বের হয়ে এলে কথা ছিল—সার্কাস দেখা শেষ হলে যেখানে ঈশম তরমুজ বিক্রি করবে সেখানে চলে যাবে। রঞ্জিত দেরি করতে পারল না। এখানে সে ছদ্মবেশী মানুষ। তার পরিচয়ের জন্য লোক হাঁটাহাঁটি করতে শুরু করেছে। সে যতটা পারল দ্রুত সার্কাসের তাঁবুতে ঢুকে যাবার জন্য হাঁটতে থাকল। জিলিপির দোকান থেকে তখনও একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এমন কুৎসিত আকার নেবে মেলাটা অন্তত জিলিপি ভাজার এমন মনোরম গন্ধ থেকে তা টের পাওয়া যায় নি। কেবল রঞ্জিত এবং অন্য কেউ কেউ বুঝি ভেবেছিল —সময়টা দুঃসময়। মেলা ছেড়ে এখন যার যার মতো ঘরে ফেরা দরকার।

মেলাতে শচীন্দ্রনাথের আসার কথা ছিল। সে এলে এই জব্বরকে কব্জা করতে পারত। শচীন্দ্রনাথকে জব্বর ভয় পায়। কারণ আবেদালির সুখে-দুঃখে শচীন্দ্রনাথ আত্মীয়ের মতো। রঞ্জিত হাঁটতে হাঁটতে এসব ভাবল। সে সার্কাসের তাঁবুতে আসতেই দেখল, সার্কাস ভেঙে গেছে। গণ্ডগোলের আঁচটা ওরাও টের পেয়েছে। সব খেলা না দেখিয়ে, বাঘের খাঁচায় বাঘ, সিংহের খাঁচায় সিংহ পুরে দিল। রঞ্জিত গেট থেকে ওদের তিনজনকে দেখে বলল, তোদের আর ওদিকে যেতে হবে না। আগে তোমাদের কাছারি বাড়ি দিয়ে আসি। রঞ্জিত ভেবেছিল, ওদের কাছারি বাড়ি তুলে দিয়ে ঈশমকে খবর দেবে এবং ঈশমকে সব তরমুজ নৌকায় তুলে দিতে বলবে। কাছারি বাড়ি পর্যন্ত রঞ্জিত যেতে পারল না। সূর্য অস্ত যাচ্ছে তখন—বন্দুকের গর্জন, এবং হল্লা। মানুষজন নিহত হচ্ছে।

রঞ্জিত তাড়াতাড়ি একটু পিছনের দিকে হেঁটে গেল। ওর মনে পড়ে গেল মালতীকে সে বলে এসেছে, সার্কাসের তাঁবুর গেটে সে থাকবে। তাড়াতাড়ি সে তাঁবুর গেটে এসে দাঁড়াতেই দেখল, পেছনের দিকটায় কে তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সে এই বালকদের নিয়ে কি করবে! মালতী এখনও আসছে না, অথবা মালতী কি ওদের না দেখে ফের মন্দিরে চলে গেছে! এখন তো হাতে প্রাণ—কখন প্রাণ যায়, আর মালতীর মতো সুন্দরী যুবতী—সে এবার কেমন আকুল হয়ে ওদের নিয়ে সোজা মন্দিরের দিকে ছুটে গেল। সোনা ঠিক কিছুই বুঝতে পারছে না। সহসা কেন এমন হল। যেন পঙ্গপালের মতো সব মানুষ নদীর দিকে ছুটে যাচ্ছে। সে দেখল আবু একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। সোনা বলল, মামা ঐ ছাখেন আবু।

রঞ্জিত বলল, তোর পিসি কোথায়?

আবু কাঁদছিল শুধু। বুঝল আবু এই মেলাতে হারিয়ে গেছে। এখন আর মালতীকে খোঁজা অর্থহীন। ওর বুকটা কেঁপে উঠল। ওদের কোন নিরাপদ স্থানে পৌঁছে না দিতে পারলে সে স্বস্তি পাচ্ছে না। কিন্তু কিভাবে কাছারি বাড়ির দিকে উঠে যাওয়া যায়! সে পিছনের দিকে তাকাতেই দেখল—আগুন জ্বলছে। একমাত্র নদীর দিকেই নেমে যাওয়া যেতে পারে। নৌকা আছে। তরমুজের নৌকা। সে ওদের নিয়ে ছুটতে থাকল। অন্ধকার হয়ে গেছে। মানুষজন সব আর চেনা যাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে দূরের আগুন সহসা হল্কা ছাড়লে কিছু কিছু মুখ দেখা যাচ্ছে। নির্বিচারে হিন্দু-মুসলমান—এদিকটাতে মিলেমিশে আছে। সবাই প্রাণের দায়ে নিরাপদ স্থানের জন্য ছুটছিল।

রঞ্জিত দেখল নৌকাটা কে আল্গা করে দিয়েছে। একটু দূরে ভেসে রয়েছে। সে জলে ঝাঁপ দিল। এবং মাঝ নদী থেকে নৌকা টেনে আনার জন্য সাঁতরাতে থাকলে দেখল, জলের ওপর কি সব ভেসে রয়েছে। সে বুঝতে

পারল সেই ভীত সন্ত্রস্ত মানুষেরা জলে ভেসে রয়েছে। আগুন থেকে এবং হত্যা থেকে প্রাণ রক্ষার্থে ডুবে ডুবে নদী পার হচ্ছে। সে দেখল কিছু কিছু নৌকা তীরবেগে ছুটে যাচ্ছে। সে আর দেরি করল না। নৌকায় উঠে গেল। এবং মনে হল তার ছায়ামূর্তির মতো সেই নৌকায় কারা জাগে।

রঞ্জিত চিৎকার করে উঠল, তোমরা কে?

কোন শব্দ ভেসে আসছে না!

—কে তোমরা?

এবার বুঝি গলা চিনতে পেরে মালতী কেঁদে ফেলল, আমি মালতী।

—তুমি! পাশে কে?

—শোভা। আবুরে পাইতাছি না।

এখন আর কথা বলার সময় নয়! নৌকাটা তীরের দিকে টেনে নিয়ে যাবার সময় বলল, আবুকে পাওয়া গেছে। আবু সোনা লালটু সবাই পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর একটু থেমে বলল, বৈঠা দেখছি না, লগি নেই—কোথায় গেল সব।

মালতী কোন জবাব দিল না। তার এখন আর কোন ভয় নেই। সে প্রাণপণ রঞ্জিতকে সাহায্য করার জন্য হাতে জল টানছিল। নৌকা পাড়ে এলে রঞ্জিত অন্ধকারে দেখল সেই মশালের আলো এদিকেই ছুটে আসছে। সর্বনাশ! ওরা টের পেয়েছে নদীর জলে মানুষ ভেসে পার হয়ে যাচ্ছে ওপারে। সে এ-মুহূর্তে কি করবে ভাবতে পারল না। মনে হচ্ছে নিশ্চিত হত্যা—নির্বিচারে হত্যা। সে সোনার চোখ দেখল। সোনা কিছুই বুঝতে পারছে না যেন। এমন একটা হাসিখুশির মেলা, মেলাতে কত পাখি উড়ে এসেছে, কত রঙ-বেরঙের ঘোড়া, তালপাতার বাঁশি, তিলাকদমা, বাতাসা, কি সুন্দর সব লাল-নীল নিশান উড়ছিল—এখন সে সবের কিছু নেই—কি করে সব তছনছ হয়ে গেল—শুধু চারিদিকে আগুন জ্বলছে। মাঠে সেই সব অশ্বারোহী পুরুষ—কদম দিচ্ছে। হাতে মশাল। মশালের আলোতে মৃত্যুর কাছাকাছি যে মানুষ তাদের মুখ দেখার বাসনা। রঞ্জিত, সবাই উঠে এলে জোরে নৌকাটা নদীতে ঠেলে দিল। তারপর প্রাণপণ সবাই জল টানতে থাকল হাতে। তরমুজের নৌকো, রঞ্জিত একতুই করে সব তরমুজগুলি জলে ফেলে পাড়ের দিকে ভাসিয়ে দিতে থাকল। অন্ধকারে এইসব তরমুজ জলে ভেসেছিল। জলে ভেসে ভেসে মানুষের মাথার মতো, যেন কত শত মানুষ জলে চোখ ডুবিয়ে এই পৈশাচিক উল্লাস থেকে আত্মরক্ষা করছে।

আর ঠিক মাঝ নদীতে এসেই মনে হল সেই মশাল হাতে দলটা মাঠ শেষ করে নদীর কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। ওরা যদি দেখতে পায়, বর্শা ছুঁড়ে দিতে পারে। অথবা জল সাঁতরে চলে আসতে পারে। সে সবাইকে এবার নৌকা

থেকে জলে নামিয়ে দিল। তারপর নৌকাটা জলে কাৎ করে রাখল। দূর থেকে দেখলে মনে হবে—খালি একটা নৌকা ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে। বরং কাছেপিঠে যেসব তরমুজ ভেসে যাচ্ছে অন্ধকারে, ওরা সেইসব তরমুজ মানুষের মাথা ভেবে যে যার বল্লম অথবা সুপারির শলা ছুঁড়ে দিলেই হাত খালি হয়ে যাবে, তখন আর নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না, মাঠের দিকে উঠে যাবে। ওরা নৌকার ওপাশে শরীর লুকিয়ে জলের ভিতর মাছ হয়ে থাকবে এবং সন্তর্পণে নৌকাটাকে টেনে ওপারে নিতে পারলেই যেন ভয়ডর কেটে যাবে। ওরা নৌকাটাকে গুণ টানার মতো নিয়ে যাবে তারপর।

মালতী একপাশে। মাঝে সোনা লালটু পলটু এবং আবু শোভা—শেষ মাথায় রঞ্জিত। শুধু সবার হাতদুটো নৌকার কাঠে। আর গোটা শরীর মুখ নৌকার ছায়ায় আড়াল করা। যেন এই নৌকায় কিছু মানুষজন ছিল, এখন ওরা নদীর জলে ডুবে গেছে। খালি নৌকা কাটা মাথা নিয়ে যায়। দু-চারটা তরমুজ গলুইর ওপর ইতস্তত ছড়ানো। অন্ধকারে এমন একটা দৃশ্য তৈরি করে রাখল রঞ্জিত।

কখন কি যেন হয়ে যায় মানুষের ভিতর। যারা ঘোড়ায় চড়ে এই হত্যাকাণ্ডে মেতে গেছে, রঞ্জিত জানে—ওরা, ঘরে বিবি বেটা রেখে এসেছে। বাজি জিতে গেলে পালা-পার্বণের মতো উৎসব লেগে যাবে। গ্রামে গ্রামে সেই বাজি জেতার মেডেল গলায় ঝুলিয়ে মানুষের কাছে দোয়া ভিক্ষা করবে। এখন দেখলে কে বলবে—এরাই সেইসব মানুষ। অন্ধকারের ফাঁক থেকে সে দেখল, ওদের হাতে সুপারির শলা, যেন এক হত্যার খেলায় মেতে গেছে। ওরা সুপারির শলা, বল্লম সেইসব তরমুজের বুকে সড়কির মতো গেঁথে দিতে থাকল আর উল্লাসে ফেটে পড়ছিল। ওরা কাফের হত্যা করছিল।

আর তখন এক মানুষ নদীর পাড়ে পাড়ে যায়। অন্ধকারে সে মানুষটা ডাকছে, সোনাবাবু কৈ গ্যালেন গ।

অন্ধকার থেকে সাড়াশব্দ আসছে না।

দূরে তখন নৌকা ভাসিয়েছে রঞ্জিত। ওরা পাড়ে উঠে এবার ছুটতে থাকবে।

মানুষটা ডাকছিল, আমি কারে লইয়া ঘরে ফিরমু। মানুষটা এ-পারে ডাকছে! ও-পারের মাঠে তখন ছুটতে গিয়ে আছাড় খেল সোনা। দূর থেকে, অনেক দূর থেকে কে যেন তাকে ডাকছে। সোনা ডাকল, মামা! আমারে কে ডাকে!

রঞ্জিত অন্ধকার মাঠে ওকে কোলে তুলে দিল। বলল, কথা বলো না। ছোটো। সে ফিসফিস করে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, সামনে হিন্দুগ্রাম পড়বে। রাত সেখানে কাটাতে হবে। অন্ধকারে মালতীকে নিয়ে যেতে

সে সাহস পাচ্ছে না। সারারাত না হেঁটে সামনের গ্রামে সে আশ্রয় নেবে ভাবল।

মানুষটার ডাক ক্রমে কেমন ক্ষীণ হতে হতে এক সময় বাতাসের সঙ্গে মিশে গেল। সোনাবাবু আছেন! আমি ঈশম? আমি কারে লইয়া বাড়ি যাই কন!

সোনার বার বার মনে হচ্ছিল, ওকে কে নদীর ওপারে ডাকছে! কে যেন এই নদীর পাড়ে পাড়ে ওকে অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে। দূর থেকে, সেই গলার স্বর সে কিছুতেই চিনতে পারছে না। সে ভয়ে পড়ি মরি করে ছুটতে থাকল। ভয়, নিশিটিশি হতে পারে। তাকে নিশিতে ডাকছে।

মেলার দাঙ্গা মেলাতেই শেষ হয়ে গেল। ঈশম বাড়ি ফিরে এসেছিল সকলের শেষে। শীর্ণ চেহারা, দুর্বল। দেখলে মনে হবে, শরীর থেকে প্রাণপাখি ওর উড়ে গেছে। সে সেই যে ডাকছিল, মাঠে মাঠে, নদীর পাড়ে পাড়ে, ডাক আর থামে নি। কেমন চোখ ঘোলা—যেন সে কোন নাবালককে হত্যা করে ফিরছে। কে যেন বলল, ঈশমকে দেখে এসেছে বিলের পাড়ে বসে বিড়বিড় করে কি বকছে। শচীন্দ্রনাথ আর দেরি করে নি। মেলার দাঙ্গা এদিকে ছড়ায় নি। রাতে রাতে শেষ হয়ে গেছে। রূপগঞ্জ থেকে একদল পুলিশ নারায়ণগঞ্জ থেকে লঞ্চে একদল আর্ম পুলিস এসে শেষপর্যন্ত দাঙ্গা আয়ত্তে এনেছে। মাতব্বর মানুষেরা আবার সবাইকে মিলেমিশে থাকতে বলে ভাবল—যাক, এবারের মতো ফয়সালা হয়ে গেল। সামু খবর পেয়ে ঢাকা থেকে ছুটে এসেছে। বিলের পাড়ে যাবার সময় সামুর সঙ্গে শচীন্দ্রনাথের দেখা—সামু বলল, কর্তা কৈ যান ?

—যামু ফাওসার বিলে।

—এই সকাল সকাল !

—ঈশমটা ত ফিরে নাই। দাঙ্গাতে ঈশম বুঝি গ্যাল মনে হইল। এখন শুনতাছি ঈশম বিলের পাড়ে দুই দিন ধইরা বইসা আছে।

শচীন্দ্রনাথ ঈশমকে প্রায় বিলের পাড় থেকে ধরে এনেছিল ; চোখমুখ দেখলে আর বিশ্বাসই করা যায় না এই সেই ঈশম। সোনা লালটু পলটু ঈশমের সামনের গিয়ে দাঁড়ল। ওদের দেখে ওর কেমন শরীর কাঁপছিল। সে হাসতে পারল না। সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না—ওরা ফিরে আসতে পারে। সে নাবালকদের মাথায় মুখে হাত দিয়ে বলল, বাবু, আপনেরা বাইচ্যা আছেন ! বাবু গ, বলে তার ভিতর থেকে কেমন এক কান্নার আবেগ উঠে আসছিল।

শচীন্দ্রনাথ একবার ধমক দিল।—এই, ওঠ। যা, এখন সান কইরা খা। তারপর ঘুমাইবি। তরমুজ খেতে আজ আর নাইমা যাইতে হইব না। তোমরা যাও। অরে একটু বিশ্রাম নিতে দ্যাও, বলে সোনা লালটু পলটুকে বৈঠকখানার ঘর থেকে নেমে যেতে বলল। ওরা নেমে না গেলে ঈশম সারাদিন ওদের সামনে বসে থাকবে এবং পাগলের মতো হাউমাউ করে আবেগে সুখের কান্না কাঁদতে থাকবে।

মেলা থেকে মালতীও ফিরে এসে কেমন ভয়ে ভয়ে দিন কাটতে থাকল। রাত হলে সে ঘরের বার হত না। কুপি জেলে বসে থাকত। রাত হলে শোভা আবুকে বুকে নিয়ে কেবল দুঃস্বপ্ন দেখত। এক একদিন বলার ইচ্ছা হত, ঠাকুর আর পারি না। রাইতে ঘুম নাই চোখে, মনে হয় কারা য্যান রাইতে বাড়ির উঠানে ফিসফিস কইরা কথা কয়। তোমারে ঠাকুর বুঝাইতে পারি না, পরানে কি জ্বালা। সেই যেন জালালির মতো, জ্বালা সহে না প্রাণে। জ্বালা মরে না জলে। ঠাণ্ডা হাত। কিছু উষ্ণ স্পর্শের জন্য মালতীকে কাতর দেখাচ্ছে। অথবা যেন বলার ইচ্ছা, ঠাকুর, আমারে নিয়া যেদিকে দুই চক্ষু যায়, চইলা যাও। কিন্তু সকাল হলে, যখন টোডারবাগের মাঠে মোরগেরা ডাকে, সূর্য গাব গাছটার ফাঁকে উঁকি মারে তখন কিছু আর মনে থাকে না। তখন মনটা পাগল পাগল লাগে, কোন ফাঁক-ফিকির খোঁজা, কি করে মানুষটারে ত্যাখা যায়।

একদিন সে রঞ্জিতকে বলল, আমারে একটা চাকু দিবা ঠাকুর ?

—চাকু দিয়ে কি করবে ?

—আমারে দ্যাও না। কাঠের চাকু দিয়া আর খেলতে ইসছা হয় না

—হাত তোমার এখনও ঠিক হয় নি মালতী। ঠিক হলে এনে দেব।

মালতীর বলার ইচ্ছা হত, আমার হাত ঠিক নাই কে কয় ! তুমি আমারে আইনা দ্যাও, দ্যাথ একবার কি খেলাটা খেলি। বুঝি মরণ খেলার সখ। অমূল্য বড় বেশি বাড় বাড়ছে। রঞ্জিত আসার পর থেকেই অমূল্য কেমন মরিয়া। সে ফাঁক-ফিকিরে আছে, মালতীকে পেলেই ঘাড়টা মাঠে, ঝোপে জঙ্গলে অথবা কবিগান হলে, যাত্রা গান হলে যখন কেউ বাড়ি থাকবে না, তখন কামড়ে ধরবে। মালতী বাড়ি পাহারা দেবার জন্য শুয়ে থাকে, থাকতে থাকতে দরজায় শব্দ, কে তুমি ! আরে কথা কও না ক্যান, দরজা খুইলা চইলা আস, দ্যাখি একবার চাঁদের লাখান মুখখানা, বলেই ভিতরে ভিতরে মরণ খেলার জন্য মালতী প্রস্তুত হতে থাকে। তখনই মনে হয় যেন জব্বর দাঁড়িয়ে আছে গাছতলাতে, ইস্তাহার বিলি করছে। বলছে, মালতী দিদি আইলেন। ওর পাশের মানুষগুলি দাঁত বের করে মালতীকে দেখছে। ঠিক এমন একটা ছবি ভাসলেই, ওর বায়না রঞ্জিতের কাছে, ঠাকুর দ্যাও না, বড় একটা চাকু, দিবা আমারে, সূর্য ডুবলে আমার বুকে জল থাকে না।

দাঙ্গার পর থেকে এই লাঠিখেলা ছোরাখেলা রাতের আঁধারে। অথবা অন্য কোথাও ডে-লাইট জেলে। এবং বড় দালান বাড়ির মাঠকোঠা পার হলে যে নির্জন জায়গা—গ্রামের মানুষেরা সেখানে জমা হত। এখন আর রঞ্জিত এসব দেখে বেড়ায় না। সে দূরে দূরে চলে যায়, কোথায় যায়, কেন যায় কেউ জানে না। কবিরাজ এবং গোপাল দেখাশোনা করছে। ফাল্গুন-চৈত্র গেল। বোশেখ মাস বড় গরম। গরমে জ্যোৎস্না উঠলে ডে-লাইট জ্বালা হত না। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় খেলা হত। মুখগুলো তখন ভাল করে যেন চেনা যেত না। মালতী শোভা আবুকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুরবাড়ি চলে আসত। ধনবৌ, বড়বৌ থাকত। পালবাড়ি থেকে সুভাষের মা আসত। হারান পালের বৌ আসত। চন্দদের

বড় বড় তুই মেয়ে মতি ও গগনি আসত। ধীরে ধীরে খেলা জমে উঠলে, সোনাদের নতুন মাস্টারমশাই শশীভূষণ সকলের হাতে ভিজা ছোলা গুড় দিতেন। এই দেশে কোথায় কবে গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে। তিনি ইতিহাসের ছাত্র। যখন স্বাধীনতা আসে, এমন গৃহযুদ্ধ বেধে যায়। বেধে গেলে এইসব লাঠিখেলা আপন প্রাণ রক্ষার্থে কাজে আসে।

কোথাও যুদ্ধ হচ্ছে, তুর্ভিক্ষ হচ্ছে। ঠিক এ-অঞ্চলে বাস করলে টের পাওয়া যায় না। সুজলা সুফলা দেশ। অভাবে অনটনে মানুষ চলে আসছিল, শশী-ভূষণ এই দলের বুঝি। সে চাকুরি নিয়ে চলে এল। স্কুলের প্রধান শিক্ষক। সোনা শশিভূষণের পায়ের কাছে বসে ইতিহাসের গল্প শুনত, ট্রয় যুদ্ধ, ট্রয়ের সেই কাঠের ঘোড়া। শহরের দরজায় কাঠের ঘোড়াটা কারা রেখে গেল। এত বড় ঘোড়া! নগরীর শিশুরা সেই কাঠের ঘোড়ার চারপাশে ঘুরে ঘুরে গান গাইছিল। সেই কাঠের ঘোড়া সমুদ্রের বালিয়াড়িতে দাঁড়িয়ে আছে—কি বড় আর উঁচু! এবং ভিতরে হাজার হাজার সৈন্য। সেই ট্রয়ের নগরী এবং সমুদ্রের বালিয়াড়ির কথা মনে হলেই সোনার মনে হয় রাজার এক দেশ আছে। বাবার কাছে সে গল্প শুনেছে। মুড়াপাড়ার বাবুদের বাড়ি নদীর পাড়ে পাড়ে। প্রাসাদের মতো অট্টালিকা। নদীর চরে কাশফুল এবং বড় চর পার হলে পিলখানার মাঠ। মাঠে সব সময় হাতিটা বাঁধা থাকে। বাবুদের মেয়ে অমলা কমলা। কমলা ওর বয়সী মেয়ে। ওরা কলকাতায় থাকে। পূজার সময় ওরা আসে। কেন জানি সোনার ট্রয় নগরীর কাঠের ঘোড়াটার কথা মনে হলে, নদীর চরে হাতিটার কথা মনে হয়। অমলা কমলার কথা মনে হয়। আর মনে হয় সেই অট্টালিকার মতো প্রাসাদের কথা। বড়দা মেজদা পূজা এলেই যায়। সে যেতে পারে না। মেলা থেকে এসে এবার কেন জানি তার মনে হল, দাদাদের মতো সেও এবার মুড়াপাড়া যেতে পারবে। বাবুদের হাতি, শীতলক্ষা নদী, পিলখানার মাঠ এবং নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে সেই স্টীমারটা দেখতে পাবে। কি আলো, কি আলো! সারা নদী উথালপাথাল করে আলোটা গ্রামের তু'পাশে মাঠের ঘাসে ঘাসে, নদীর চরে, কাশবনে কিছুক্ষণের জন্য স্থির উজ্জ্বল হয়ে থাকে। সোনা মেলা থেকে এসেই কেন জানি ভাবল সে বড় হয়ে গেছে। সে এবার মুড়াপাড়া তুর্গাপূজা দেখতে যেতে পারবে।

এই শশীভূষণ ভোর হলে তক্তপোশে বসে থাকত। তুলে তুলে কি সব বই পড়ত। সোনা চেয়ারে বসে পা দোলাত এবং মনোযোগ দিলে ওর পড়া শিখতে বেশি সময় লাগত না। তারপর এদেশে বর্ষাকাল এলে নৌকায় করে স্কুল। মাস্টারমশাই কাঠের পাটাতনে মাঝখানে বসে থাকতেন। ঈশম লগি বাইত। ওরা তিন ভাই, গ্রামের অন্য চার পাঁচজন ছেলে একসঙ্গে মাস্টারমশাইকে নিয়ে বিদ্যালয়ে চলে যেত।

বর্ষা এলেই কত শালুক ফুল ফুটে থাকে চারিদিকে। তখন এসব অঞ্চলে আর হাতি ঘোড়া উঠে আসতে পারে না। কেবল জল আর জল। ধানের জমি, পাটের জমি। জলে জলে দেশটা ডুবে থাকে। মাছ, ছোট বড় রুপোলী মাছ জলের নিচে। স্ফটিক জল। ধান খেতে পাট খেতে কত রাজ্যের সব পোকামাকড়। ছোট বড় নীল সবুজ রঙের কাঁচপোকার মতো আবার হলুদ রঙ কোন পোকার। সূর্য উঠলে এইসব পোকামাকড় পাতার নিচে লুকিয়ে থাকে। সোনা নৌকায় উঠলেই কৌটোয় যত সোনাপোকা ধরে আনে। একবার সে একটা আশ্চর্যরকমের পোকা পেয়েছিল—সোনালী রঙের কাঁচ-পোকা। টিপ দেবার মতো। পোকাটাকে পোকা বলে চেনাই যায় না। মুক্তো বিন্দুর মতো মাঝখানে উজ্জ্বল। চারিদিকে তার সোনালী রঙ। কালো একটা বর্ডার দেওয়া, হয়তো পা বলে কিছু নেই। যেন জীবন্ত এক কাঁচপোকা। সে ফতিমার জন্য সেই কাঁচপোকা কৌটার ভিতর রেখে দিয়েছিল। কবে ফতিমা আসবে! এখন দেখা হয় না। বর্ষা এলে এ-গ্রামে ছুট করে চলে আসতে পারে না ফতিমা। সে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে গোপনে কাঁচপোকাটা ওর স্যুটকেসে তুলে রাখল। বর্ষা শেষ হলে সে ফতিমাকে কপালে টিপের মতো পরিয়ে দেবে।

সোনা এইসবের ভিতর বড় হতে হতে একদিন দেখল, মেজ-জ্যাঠামশাই নৌকা পাঠিয়েছেন। মুড়াপাড়া থেকে নৌকা এসেছে। ছোটকাকা বললেন, সোনা, তুমি যাইবা তুগগা ঠাকুর ছাখতে! কান্দাকাটি কইর না কিন্তু। সোনা এবার দূরদেশে যাবে। আকাশে বাতাসে পূজার বাজনা বেজে উঠল। মুড়াপাড়া থেকে নৌকা এসেছে। অলিমদ্দি বড় একটা মাছ তুলে আনল। সোনা, লালটু, পলটু মাছটাকে টেনে রান্নাঘরে তুলছে। কত বড় মাছ। ওরা তিনজনে নাড়তে পারছে না। বড়বৌ, ধনবৌ মাছটা দেখে তাজ্জব। ঢাইন মাছ! পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ এত বড় মাছটা দেখে উঠোনের ওপর নাচতে থাকল।

সোনা বলল, আমি মুড়াপাড়া যামু দাদা।

—কে কইছে তুমি যাইবা?

—কাকায় কইছে।

লালটু ভেবেছিল মা হয়তো বলেছেন। মা বললে এ সংসারে কিছু হয় না। আর কিছু বলার কোন অধিকার নেই। ছোট কাকা যখন বলেছে, তখন যথার্থই যাবে সোনা। কেউ বাধা দিতে পারবে না। লালটু কেমন বিরক্ত হয়ে বলল, ভ্যাক্ কইরা কাইন্দ্যা দিলে হইব না, আমি বাড়ি যামু—বলে লালটু সোনাকে মুখ ভেংচে দিল। এই অভ্যাস লালটু পলটুর। সোনাকে ওরা সহ্য করতে পারে না। এ বাড়িতে সোনা সবার ছোট বলে ওর আদর বেশি।

এতদিন সে মুড়াপাড়া যেতে পারে নি—এটা একটা সান্ত্বনা মতো ছিল। সেই সোনা ওদের সঙ্গে যাচ্ছে।

সোনা অন্যদিন হলে ভেংচি দিত উল্টে। কিন্তু সে দুগগা ঠাকুর দেখতে যাবে। ওর প্রাণে কি যে আনন্দ। সে দূরদেশে যাবে। কতদূর! একদিন লেগে যাবে যেতে। কত নদী বন মাঠ পড়বে যেতে। সে লালটুকে মন প্রফুল্ল থাকলে দাদা বলে ডাকে। পলটুকে বড় দাদা। সে এখন মোটামুটি স্কুলের ভাল ছাত্র। সে এখন দূরের মাঠে একা নেমে যেতে পারে। যব খেতে লুকোচুরি খেলতে আজকাল আর ভয় পায় না।

ধনবৌ সোনার মুখ দেখতে থাকল। বড় করে কাজল টেনে দিয়েছে চোখে। সুন্দর মুখ। যত লাবণ্য চোখে। বয়সের অনুপাতে লম্বা বেশী। একটু মাংস থাকলে শরীরে এ-লাবণ্য সবুজ দ্বীপের মতো। সোনার চোখ বড়। কাজল দিলে সে চোখ আরও বড় দেখায়। কপালের এক পাশে কড়ে আঙুলে ধনবৌ লম্বা করে কাজল টেনে দিল। বাঁ পা থেকে সামান্য ধুলো নিয়ে সোনার মাথায় দিল এবং সামান্য থুথু ছিটিয়ে দিল শরীরে। তারপর সোনাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। চুমু খেল কপালে। সোনার কেমন সুড়সুড়ি লাগছিল—কাতুকুতুর মতো। সোনা খিলখিল করে হাসছিল।

সোনা একেবারে পুরোপুরি পাগল মানুষের মুখ পেয়েছে। শরীরের গড়ন দেখলে বোঝা যায়, তেমনি লাবণ্যময় শরীর তার, বয়সকালে উঁচু লম্বা হবে খুব। ধনবৌ সোনাকে কোলে নিয়ে আদর করতে চাইল। কিন্তু সোনার সংকোচ হচ্ছে। সে লজ্জা পাচ্ছিল। বলল, আমার লজ্জা করে। আমি কোলে উঠমু না মা।

দূরদেশে যাবে ছেলে। সাত আটদিন ধনবৌ এই ছেলে বুকে নিয়ে শুতে পারবে না। বুকটা কেমন টনটন করছিল। বলল, লও, তোমারে নৌকায় দিয়া আসি। এই বলে জোরজার করে কোলে তুলে নিতে চাইল।

সোনা কিছুতেই উঠল না।

ধনবৌ বলল, আমার যে ইচ্ছা করে তোমারে একটু কোলে লই। বলে ফের ছেলেকে দু'হাত বাড়িয়ে তুলে নিতে গেল।

—ধ্যাৎ, তুমি কি যে কর না মা! আমারে তুমি কোলে নিবা ক্যান! আমি বড় হই নাই!

—অ—মারে! আমার সোনা বড় হইছে। বড়দি শুইনা যান, কি কয় সোনা। সোনা নাকি বড় হইছে। কোলে উঠতে লজ্জা!

নৌকা ঘাটে বাঁধা। ওরা তিনজন যাবে মুড়াপাড়া। দুগগা ঠাকুর দেখতে যাবে। গ্রামের পুজো প্রতাপ চন্দ করে। কত বছরের এক মামলা আছে।

কেউ সেবাড়ি ঠাকুর দেখতে যেতে পারে না। ছোট বালকদের মন মানবে কেন! পুজোর সময় হলেই ভূপেন্দ্রনাথ নৌকা পাঠিয়ে দেন।

সুতরাং সোনা লালটু পলটু যাচ্ছে মুড়াপাড়া। ঈশম নিয়ে যাচ্ছে। এ-ক'দিন অলিমদ্দি বাড়ির কাজ করবে। ঈশমেরও যেন ক'দিন ছুটি। সে এই দলবল নিয়ে বেশ হৈচৈ করে ফিরে আসবে। সে সকলের আগে গিয়ে নৌকায় উঠে বসে আছে। ভাল লগি নিয়েছে। বৈঠা নিয়েছে। অন্যের লগি বৈঠা ওর পছন্দ নয়। পালের দড়িদড়া ঠিক আছে কিনা দেখে নিচ্ছে। খুঁটিনাটি কাজ। দূরদেশে যাবে। একদিন লেগে যাবে। সে সবকিছু, এমন কি হুঁকো-কলকি ঠিক করে নিল। দশ ক্রোশের মতো পথ। এখন এই সকালে রওনা হলে পৌঁছাতে রাত হয়ে যাবে। ঘুরে ফিরে যেতে হবে। নদীতে এবং বিলে বাতাস পেলে, স্রোতের মুখে তুলে দিতে পারলে তবে সকাল সকাল যেতে পারবে।

সোনা ঠাকুর্দাকে প্রণাম করল তখন, দাদু আমরা মুড়াপাড়া পূজা দ্যাখতে যাইতাছি।

বুড়ো মানুষটি খুঁজেপেতে চিবুক ধরে বলল, তাই বুঝি!

লালটু বলল, দাদু দশরায় আপনের লাইগা কি কিনমু?

বুড়ো মানুষটা কোন উত্তর দেবার আগেই পলটু ঠাট্টা করে বলল, ঝুমঝুমি বাঁশি কিনমু।

—দ্যাখছ, দ্যাখছ বড়বৌ—কি কয় তোমার পোলা! আমারে ঝুমঝুমি বাঁশি কিনা দিব কয়।

—ঠিকই বলেছে। আপনি ছেলেমানুষের মতো কাঁদেন। আপনাকে কেউ খেতে দেয় না কন।

—আমি কই বুঝি!

—কন না!

—আমার কিছু মনে থাকে না বৌ।

পলটু নৌকায় উঠে দেখল, পাগল মানুষ গলুইতে বসে আছে চুপচাপ। সে কখনও বাবা বলে ডাকে না। এই মানুষ বড় অপরিচিত তার কাছে। এই মানুষের পাগলামি কেমন বিরক্তিকর। সে যত বড় হচ্ছে, এক পাগল মানুষ তার জনক ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। দূরে দূরে থাকার একটা স্বভাব গড়ে উঠেছে পলটুর ভিতর। কিছুটা যেন শাসনের ভঙ্গী। এই মানুষের কোন অসম্মান ওকে পীড়া দেয়। নানাভাবে সেসব অসম্মান থেকে মানুষটাকে রক্ষা করার বাসনা। কিন্তু সে আর কি মানুষ যে,—এই পাগল মানুষকে ধরে বেঁধে রাখবে।

নৌকার গলুইয়ে চুপচাপ বসে আছেন তিনি। পাটাতনের ওপর পদ্মাসন করে বসে আছেন। পলটু নৌকায় উঠেই বলল, আপনে নামেন। কই যাইবেন আপনে?

পাগল ঠাকুর পলটুর কথায় কোন জবাব দিল না। কেমন ফিক্‌ফিক্‌ করে হাসছেন। পলটু এবার রেগে গিয়ে বলল, আপনে নামেন। নামেন কইতাছি।

মণীন্দ্রনাথ এতটুকু নড়ল না। কথা বলল না। বরং কাপড়টা বেশ যত্ন নিয়ে পাট করে পরলেন। পোশাকে কোন অশালীন কিছু আছে, এইভাবে কাপড়টা বেশ গুটিয়ে পরলেন যেন। হাতকাটা শার্ট গায়ে। শার্টটা টেনেটুনে দিলেন। মাথার চুল হাতেই পাট করতে থাকলেন। ছাখো, এই চুল আমার, এই বসনভূষণ আমার—এবার আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে পারি। বলে ধ্যানী পুরুষের মতো ফের পদ্মাসনে বসে পড়লে পলটু হাত ধরে টানতে আরম্ভ করল, নামেন আপনে। মা। মা—আ। সে চিৎকার করতে থাকল। যেন বড়বৌ এলেই সব ফয়সালা হয়ে যাবে। কিন্তু বড়বৌর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

ঈশম কিছু বলছিল না। সে বেশ মজা পাচ্ছে। সে চুপচাপ ছইয়ের ওপাশে বসে আছে। কিছু দেখতে পাচ্ছে না মতো বসে বেতের ঝোপে বোলতার চাক খুঁজছে।

পলটু বলল, নামেন এখন। নৌকা ছাইড়া দিব।

কে কার কথা শোনে! এমন শরৎকালের সকাল, ঠাণ্ডা হাওয়া ধানখেত থেকে ভেসে আসছে, কোড়ার ডাক ভেসে আসছিল। নদীতে নৌকায় পাল দেখা যাচ্ছে। পাল তুলে নদীতে গ্রামোফোন বাজাতে বাজাতে কারা যেন যায়। সোনালী বালির নদী থেকে সব বড় বড় মাছ ধান খেতে শ্যাওলা খেতে উঠে আসছে। কত শস্যক্ষেত্র দু'পাশে অথবা স্ফটিক জল—কারণ পাট কাটা হলে গ্রাম মাঠ দ্বীপের মতো। চারপাশে যেন দীঘির জল টলটল করছে। বিশাল জলরাশি নিয়ে এইসব বাড়ি জমি এবং নদী ভেসে রয়েছে। মণীন্দ্রনাথের কতদিন থেকে কোথাও যাবার বাসনা। বর্ষা এলেই তিনি বন্দী রাজপুত্রের মতো শুধু অর্জুন গাছটার নিচে বসে থাকেন। মুড়াপাড়া থেকে নৌকা এসেছে শুনেই ওঁর দূরদেশে যাবার ইচ্ছা হল। সবার আগে এসে যা কিছু পরনে ছিল, তাই নিয়ে তিনি বসে পড়েছেন। চুল কি সুন্দরভাবে পাট করেছেন! ভদ্র মানুষের মতো চুপচাপ। একেবারে সেই এক সরল বালক যেন। পলটু যত এসব দেখছিল তত ক্ষেপে যাচ্ছিল। সে এবার ভয় দেখাবার জন্য বলল, ডাকমু ছোট কাকারে?

মণীন্দ্রনাথ খুব অনুনয়ের চোখে পলটুর দিকে তাকালেন। যেন বলার ইচ্ছা—বাছা, আর ডেকো না, আমি তোমাদের পাশে চুপচাপ বসে থাকব। মণীন্দ্রনাথের বড় অবলা জীবের মতো চোখ। চোখে এক অসামান্য অসহায় দুঃখ ভেসে বেড়াচ্ছে—আমি যে এক পাগল মানুষ। কতকাল ধরে হাঁটছি। তবু সেই দুর্গের মতো প্রাসাদে পৌছাতে পারছি না। তিনি তাঁর জাতককে এমন কিছু বুঝি বলতে চাইছেন।

লালটু পলটু উঠে এল। ছোট কাকা ঘাটে এসেই বললেন, ভিতরে কে বইসা আছে রে?

সঙ্গে সঙ্গে মণীন্দ্রনাথ ছই-এর ভিতর থেকে গলা বাড়িয়ে দিলেন। হামাগুড়ি দিয়ে যেন কত বাধ্যের ছেলে, বের হয়ে পাটাতনে দাঁড়ালেন। ধনবৌ বড়বৌ এসেছে ঘাটে। ওরা নৌকা ছেড়ে দিলে চলে যাবে। তখন মণীন্দ্রনাথ পাড়ে উঠে আসছেন। চোখেমুখে কি ভয়ঙ্কর উদাসীনতা! নৌকার গলুইয়ে জল দিয়ে ঈশম ঘাট থেকে দড়ি ছেড়ে দিলে পাগল মানুষ ছুটে যেতে চাইলেন। বড়বৌ এখন ঘাটে। সুতরাং কোন ভয় নেই। সে যেমন দু'হাত ছড়িয়ে অন্যান্যবার আগলে রাখে এবারেও আগলে রাখল। বলল, এস, বাড়ি এস। বড়বৌর সেই এক বিষণ্ণ মুখ। কত আর বয়েস এই বড়বৌর। ত্রিশ হতে পারে, তেত্রিশ হতে পারে। বড়বৌর বয়স মুখ দেখে ধরা যায় না। বড়বৌর দিকে তাকিয়ে পাগল মানুষ আর নড়লেন না। সোনা ছইয়ের ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখল, বড় জেঠিমা জ্যাঠামশাইকে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। সোনার বড় কষ্ট হতে লাগল। সে এবার গলা ছেড়ে হাঁকল, জ্যাঠামশয়।

মণীন্দ্রনাথ কেমন দু'হাত ওপরে তুলে দিলেন। আশীর্বাদ করার মতো ভঙ্গীতে দু'হাত ওপরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকলেন। সোনা এবার চিৎকার করে বলল, দশরা থাইকা কি আনমু?

পার তো আমার জন্য কপিলা গাইর দুধ এনো—যেন এমন বলার ইচ্ছা। আর যদি পার, শীতলক্ষার চরে এখন যেসব কাশফুল ফুটে থাকবে, বাতাসে তা আমার নামে উড়িয়ে দিও। সেই এক মেয়ে, পলিন যার নাম, পার তো তার নামে কিছু কাশফুল জলে ভাসিয়ে দিও।

সোনা দেখল জ্যাঠামশাই কিছুই বলছে না। জেঠিমা চুপচাপ। ক্রমে নৌকা ভেসে যেতে থাকল। ক্রমে ধানখেত পার হলে, সোনালী বালির নদী। নদীতে নৌকা নেমে গেলে আর কিছু দেখা গেল না। সোনাও এবার ছইয়ের ভিতর চুপচাপ বসে থাকলে ঈশম বললে, কি ছাখছেন সোনাবাবু?

বিলের জলে নৌকা ছেড়ে দিয়েছিল ঈশম। সোনাকে এমন চুপচাপ দেখে কথা না বলে পারছিল না।

সোনা অপলক শুধু দেখছিল। এমন অসীম জলরাশি, পারাপারহীন জলরাশি—কত দূর চলে গেছে—বুঝি আর এই নাও এবং মাঝি বিল পার হবে না—জল শুধু জল। সোনা বিস্ময়ে হতবাক। সোনা কিছু বলল না। এই বিলে আবেদালির বৌ ডুবে মরেছে। এই বিলের জলে এক ময়ূরপঙ্খী নাও আছে—সোনার নাও, পবনের বৈঠা। সোনার বলতে ইচ্ছা হল ঈশমকে—এই যে জল, জলের নিচে যে নাও, সোনার নাও পবনের বৈঠা—পারেন না আপনে সেই নাও তুলে আনতে। আমি, আপনে আর পাগল জ্যাঠামশাই

সেই নাও নিয়ে বিল পার হয়ে চলে যাব। যেন এমন নাও মিলে গেলেই ওরা সেই রেমপার্টে চলে যেতে পারবে। চোখ নীল, সোনালী চুল মেয়ের—আহা, বড় ডুব দিতে ইচ্ছা করছিল বিলের জলে। ডুব দিয়ে ময়ূরপঙ্খী নৌকাটা তুলে আনতে ইচ্ছা হচ্ছিল সোনার।

ভোরবেলা উঠে মালতী যেমন অন্যদিন সে তার হাঁস কবুতর খোঁয়াড় অথবা টঙ থেকে ছেড়ে দেয়, যেমন সে অন্য কাজগুলো করে চুপচাপ কিছুক্ষণ উঠানের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে তেমনি সে আজও দাঁড়িয়ে থাকল। হাঁসগুলো জলে ভেসে দূরে চলে যাচ্ছে। রাতে ভাল ঘুম হয় নি মালতীর। কারা যেন সারারাত অন্ধকারে ফিসফিস করেছে। দাঙ্গার পর থেকেই মালতীর প্রাণে অহেতুক ভয়। নরেন দাসের বৌ বলেছে, তর যত কথা! কে তরে আর নিতে আইব।

সুতরাং সকালবেলা রাতের সেই ফিসফিস শব্দের কথা কাউকে সে বলতে পারল না। ভয়ে সে যথার্থই রাতে দরজা খুলে বের হয় নি। দু-একবার ওঠার অভ্যাস রাতে। সে সব চেপেচুপে সারা রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। —কে কে! এমন কি সে রাতে দু-তিনবার কে কে বলে চিৎকার করে উঠেছিল।—কারা কথা কয় গাছের নিচে। সে একবার ঝাঁপ তুলে দেখবার চেষ্টা করেছে। কখনও মনে হয়েছে—সেই দাঙ্গা, দাঙ্গার আগুন চোখের ওপর জ্বলছে। সে এসব দেখলেই আঁতকে উঠত—তারপর মনে হত, না, স্বপ্ন! জব্বরকে মালতী দু'দিন উত্তরের ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। নরেন দাস তেড়ে গেছে, তুমি এখানে ক্যান মিঞা! তারপর বলত, তর বাপ আইলে, না কইছি ত···। জব্বর হাসত। হাসতে হাসতে দাড়িতে হাত বুলাত। বড় দাড়ি-গোঁফ, চেনা যায় না—জব্বর এখন মাতব্বর মানুষ যেন। সে ওর মায়ের মৃত্যুর পর এদিকে অনেকদিন ছিল না। কোথায় কোন গঞ্জে সে এখন তাঁত কিনে ব্যবসা করার চেষ্টা করছে। আবেদালির সঙ্গে ওর আর কোন সম্পর্ক নেই। আবেদালি আবার নিকা করে ভাঙা ঘরে শন দিয়েছে। বিবির জন্য আতাবেড়া দিয়েছে। আবেদালির হাঙ্গা করা বৌ মল বাজিয়ে এখন ঘরের ভিতর শুয়ে-বসে থাকে। আবেদালিকে জব্বর আর পরোয়া করে না। এমন কি সেদিন বাপ-বেটাতে বচসা। লাঠালাঠি। আবেদালি বলেছিল, হারে পুত, তুই জননীর গায়ে হাত তুলস। সেই জব্বর এখন এদিকে এলে আর বাপের কাছে ওঠে না। সে ফেলু শেখের বাড়ি এসে ওঠে। এবং যে ক'দিন থাকে, ফেলুর বিবিকে আতর কিনে এনে দেয়। সুগন্ধ তেল কিনে আনে হাট থেকে এবং বড় ইলিশ মাছ কিনে এনে দু-চার রোজ প্রায় যেন জব্বর এক নবাব

—পয়সার ওপর উড়ে বসে বেড়ায়। ফেলুর বিবি তো জব্বর এলেই উল্লাসে আর বাঁচে না। ফেলু সব বোঝে। সেই এক উক্তি তার—হালার কাওয়া! ভয় ডর নাই! তারপর কব্জিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। ডান হাতটাতে সামান্য নিরাময়ের চিহ্ন ফুটে উঠছে। বাঁ-হাতের কব্জি তেমনি ফুলে ফেঁপে আছে। কালো রং। কুমীরের চামড়ার মতো খসখসে। মরা চাম উঠছে কেবল। কালো তারে সাদা কড়ি এবং আলকাতরার মতো চ্যাটচ্যাটে তেল মাখতে মাখতে হাতটা আর হাত নেই। জব্বর এলে বিবি তার নাচে গায়, ফুরফুরে বাতাসে উড়ে বেড়ায় আর কি সব শলা-পরামর্শ—ফেলু তখন ছেঁড়ামাদুরে জামগাছটার নিচে শুয়ে থাকে। নিদেন যখন চক্ষে আর সয় না, বাগি বাছুরটা নিয়ে মাঠে নেমে আসে। তারপর রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার—হালার কাওয়া, আমারে ডরায় না! সেই বিবি পর্যন্ত কিছুদিন হল জব্বরের সঙ্গে কথা কয় না, কি এমন ঘটনা—ওর জানার ইচ্ছা ছিল, কি এমন ঘটনা ওদের দু'জনকে মাঠের মতো বোবা বানিয়ে রেখেছে। সে আর আসে না, সে না এলে ফেলুর এখন আহার জোটা দায়।

কোন কোন দিন জব্বর সোজা উঠোনে উঠে আসত। তারপর মালতীকে ডেকে বলত, দিদি, আছেন!

মালতী বাইরে এলে জব্বর বলতো, আপনের শ্বশুরবাড়ি যাইতে ইচ্ছা হয় না! আপনে শ্বশুরবাড়ি আর যাইবেন না?

—না রে কই যামু! কে আর আছে আমার! কি আর আছে আমার।

—কি যে কন দিদি, কি নাই আপনের?

মালতীর চোখে তখন জ্বালা ধরে যেত। মালতীর চেয়ে ছোট এই জব্বর। কিছু ছোট হবে। কত ছোট হতে পারে—সকালের হাওয়া মুখে লাগবার সময় এমনি ভাবল। আর দেখল এক কদর্য মুখ, মুখে এখন জব্বরের কি যেন লালসা। সে বুঝি ঘুর ঘুর করতে ভালবাসছে। সময় অসময় নাই সে লোক নিয়ে উঠোনের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। এইসব দেখলেই মালতীর ভয়টা বাড়ে। তখন যেন বলার ইচ্ছা, তোমার ঠ্যাং ভাইঙ্গা দিমু। অথবা সেই মানুষটার কাছে চলে যেতে ইচ্ছা হয়—ঠাকুর, দিবা আমারে একটা বড় চাকু, আইনা দিবা!

জব্বরের কথা মনে আসতেই মালতীর শরীর কেমন শক্ত হয়ে গেল। সে আর দাঁড়াল না। হেঁটে হেঁটে দীনবন্ধুর ডেফল গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়াল। সে একটু আড়াল দেওয়া জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সে মানুষটাকে খুঁজছে। না, নেই মানুষটা। সে দুটো লেবুপাতা ছিঁড়ল, যেন সে এখন এখানে লেবুপাতা তুলতে এসেছে। মানুষটার বদলে সে শশিভূষণকে বৈঠকখানা ঘরে দেখতে পেল। তিনি গোছগাছ করছেন—স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, তিনি দেশে ফিরে

যাবেন। কিন্তু সে গেল কোথায়? এ সময়ে মানুষটা জানালায় বসে থাকে। টেবিলের ওপর গাদা বই। কেবল বইয়ের ভিতর মানুষটা ডুবে থাকে। সে গেল কোথায়! মালতী আর অপেক্ষা করল না। কাঁখে জলের কলসী থাকলে এত ভয়ের কারণ থাকে না। একটা অছিলা থাকে। তবু যখন ভাবতে ভাবতে ঠাকুরবাড়ির উঠোনে উঠে এসেছে তখন আর ফেরা যায় না। সে ভিতর বাড়িতে ঢুকলে দেখতে পেল, ঘাট থেকে বড়বৌ ধনবৌ উঠে আসছে। মালতী এ-বাড়ির সকলকেই দেখতে পেল। কেবল রঞ্জিত নেই। রঞ্জিতকে কিছু বলা দরকার। একমাত্র মানুষ এই সংসারে যাকে সব বলা যায়। সে সোনাকে অনুসন্ধান করল। সে থাকলে তাকে বলা যেত, সোনা, তোমার মামা গ্যাছে কোনখানে? কিন্তু সোনা, লালটু পলটু কেউ নেই।

বড়বৌ মালতীকে দেখেই যেন ওর ভিতরের ভয়টা ধরে ফেলল। বলল, তোর মুখ এমন কালো কেন রে? কিছু হয়েছে! কেউ কিছু বলেছে?

—কি হবে আবার!

—চোখ দেখলে মনে হয় সারা রাত না ঘুমিয়ে আছিস।

মালতী এবার লজ্জা পেল। সে বলতে পারত, অনেককিছু—না ঘুমিয়ে সে থাকবে কেন, সে তো বিধবা মানুষ, তার আর কার জন্য রাত জেগে থাকা। সুতরাং সে যা-ও ভেবেছিল, রঞ্জিত কই বৌদি, অরে দ্যাখতেছি না, এমন কথায় সে তাও বলতে পারল না।

মালতী উঠোন পার হয়ে এল। ঠাকুরঘরের পাশে সেই শেফালি গাছটা, সে গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল। ফুলে ফুলে গাছের চারপাশটা সাদা হয়ে আছে। খুব ভোরে যারা ফুল তুলে নেবার নিয়ে গেছে। এর পরও ফুল ফুটেছে এবং ফুল ঝরে পড়েছে। মালতী কি ভেবে কোঁচড়ে ফুল তুলতে বসে গেল। কিছু কাজ ছিল না হাতে অথবা এও হতে পারে, কি করে এই উঠোনে কোন অছিলায় দেরি করা যায়—যদি রঞ্জিত কোথাও গিয়ে থাকে, তবে এক্ষুনি চলে আসবে। ফুল তুলতে তুলতে সে হয়তো চলে আসবে। সে রঞ্জিতের জন্য গাছের নিচে ফুল তোলার অভিনয় করছে। মালতীর খোঁপা খুলে গিয়েছিল—খালি গা মালতীর—সাদা থানে মালতীকে এই সকালে সন্ন্যাসিনীর মতো দেখাচ্ছে। কি পুষ্ট তার বাহু। এমন পুষ্ট বাহু আর শরীর নিয়ে সে কি করবে! রঞ্জিতের কাছে সে বুঝি এমন একটা প্রশ্ন করতেই এসেছে—আমি কি করি! আমি কি যে করি! তখনই উঠোনে পায়ের শব্দ। বুঝি রঞ্জিত। সে চোখ তুলে দেখল ছোটকর্তা। পিছনে অলিমদ্দি। অলিমদ্দিকে নিয়ে তিনি বোধ হয় যজমান বাড়ি যাচ্ছেন। পূজা-পার্বণের সময় এটা। দুর্গা পূজার সময়—সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, দশমীর পর ফাঁকা-ফাঁকা ভাবটা পূর্ণিমাতে এসে ভরে যায়। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা—রাতে কোজাগরী জ্যোৎস্না কি সাদা! কত ইচ্ছা তখন মালতীর। নদীর চরে সাদা জ্যোৎস্নায় তরমুজ খেতে চুপচাপ রঞ্জিতকে পাশে নিয়ে বসে থাকে। অঞ্জলিতে দু হাত তুলে বলে, আমি বড় দুঃখিনী! তুমি আমারে নদীর পাড়ে নিয়া যাও—অথবা যেন বলার ইচ্ছা, জলে নাও ভাসাওরে। মালতীর কেবল রঞ্জিতকে নিয়ে সাদা জ্যোৎস্নায় সোনালী বালির নদীর জলে নিভৃতে সাঁতার কাটতে ইচ্ছা হয়। জলে নাও ভাসাতে ইচ্ছা হয়।

সে রঞ্জিতের প্রতীক্ষাতে বসে থাকল। সে এল না। দু'বার বড়বৌদি এদিকে এসেছিল, দুবারই বলবে ভেবেছিল, বৌদি রঞ্জিতকে দ্যাখতাছি না! কিন্তু বলা হয় নি। সঙ্কোচে সে বলতে পারে নি। বৌদি বৌদি, মনের ভিতর আকুতি তার, বৌদি বৌদি, আমি ফুল নিতে আসি নাই বৌদি, আমি···।

বড়বৌ বলল, কিছু বলবি আমাকে?

—বৌদি, রঞ্জিতকে দ্যাখতাছি না!

—ও ঢাকা গেছে।

—ঢাকা গ্যাল! কেমন বিস্ময়ের সঙ্গে বলল।

—হ্যাঁ, গেল। সন্ধ্যায় দেখি তোর এক মানুষ এসে হাজির। বাউল মানুষ। এ বাড়িতে তো তোর মানুষের শেষ নেই। বৈরাগী বাউল লেগেই আছে। খাবে-দাবে, শোবে, রাত কাটাবে। ভোর হলে যেদিকে চোখ যাবে সেদিকে নেমে যাবে। ভাবলাম সেই বুঝি। ওমা, রাতে দেখি, কি সব ফিসফিস করে কথা! আমাকে বলল, দিদি, ঢাকা যাচ্ছি, কবে ফিরব ঠিক নেই, ফিরব কিনা আর, তাও বলতে পারি না। এক নিশ্বাসে বলে গেল বড়বৌ।

মালতী আর বড়বৌর সামনে দাঁড়াতে পারল না। সে বুঝি ধরা পড়ে যাবে। সে ছুটে বের হয়ে গেল। তুমি এমন মানুষ রঞ্জিত! সে যেন আর পারছে না। কোথাও ছুটে গিয়ে বুঝি ঝাঁপ দেবার ইচ্ছা। সে তেঁতুল গাছটা পার হয়ে গেল এবং বড় যে জাম গাছটা পুকুর পাড়ে ছায়া ছায়া ভাব সৃষ্টি করে রেখেছে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। এখানে সে হাউ-হাউ করে বুঝি প্রাণ খুলে কাঁদতে পারবে। কেউ টের পাবে না। সে ফুলগুলি এবার জলে ফেলে দিল। এবং দাঁড়িয়ে থাকল। ফুলগুলি জলে ভেসে কত দূরে যায়! রাতের অন্ধকারে ফিসফিস করে কারা কথা বলে! আমি কই যাই ঠাকুর! মালতী সহসা চিৎকার করে উঠতে চাইল। কিন্তু পারল না। অভিমানে চোখ ফেটে শুধু জল নেমে আসছে তার।

ঈশম সহসা হেঁকে উঠল, কর্তারা ঠিক হইয়া বসেন। নৌকাটাকে খাল থেকে ঠেলে শীতলক্ষার জলে ফেলে দেবার সময় এমন হেঁকে উঠল।—স্রোতের মুখে পইড়া গ্যালেন। পানিতে পইড়া গ্যালে আর উঠান যাইব না। সামনে বড় নদী, শীতলক্ষা নাম তার।

এত বড় নদীর নাম শুনে সোনা ছইয়ের ভিতর ঢুকে বসে থাকল। লালটু পলটু ছইয়ের ওপর বসে ছিল এতক্ষণ। বড় নদীতে পড়ে গেছে শুনেই লাফিয়ে পাটাতনে নামল। দেখল—বড় নদী তার দুই তীর নিয়ে জেগে রয়েছে। স্রোতের মুখে নৌকা পড়তেই বেগে ছুটতে থাকল। সারা পথ বড় কম সময়ে পার হয়ে এসেছে। পালে বাতাস ছিল। উজানে নৌকা বাইতে হয়নি। আর কি আশ্চর্য, নদীতে পড়তেই ঢাক-ঢোলের বাজনা। পূজার বাজনা বাজছে। দুই পাড়ে গাছ-পালা-পাখি এবং গাছপালা পাখির ভিতর সোনা বড় অট্টালিকা আবিষ্কার করে কেমন মুহ্যমান হয়ে গেল। সারি-সারি অট্টালিকা। এত বড় যেন সেই বিল জুড়ে অথবা সোনালী বালির নদীর চর জুড়ে—গ্রাম মাঠ জুড়ে—শেষ নেই বুঝি অট্টালিকার। রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি। সে আর ছইয়ের নিচে বসে থাকতে পারল না। হামাগুড়ি দিয়ে বের হতেই দেখল জলে সেইসব ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রাসাদের প্রতিবিম্ব ভাসছে। যেন জলের নিচে আর এক নগরী। সে তার গ্রাম ছেড়ে বেশিদূর গেলে মেলা পর্যন্ত গেছে। কোথাও সে এমন প্রাসাদ দেখে নি—সে এবার উঠে দাঁড়াল। নৌকার মুখ এবার পাড়ের দিকে ঘুরছে। সামনে স্টীমার ঘাট, ঘাটের পাশে বুঝি নৌকা লাগবে।

পাড়ে পাম গাছ। সড়ক ধরে পাম গাছের সারি অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। সড়কের ডাইনে নদীর চর এবং কাশফুল। উত্তরের দিকে পিলখানার মাঠ, মাঠ পার হলে বাজার এবং আনন্দময়ী কালীবাড়ি। ঘাটে রামসুন্দর এসেছিল ওদের নিতে—সে পাড়ে উঠে যাবার সময় এমন সব বলল।

নদী থেকে যত কাছে মনে হয়েছিল, যেন নদীর পাড়েই এই সব অট্টালিকা—নদীর পাড়ে নেমে মনে হল সোনার, তত কাছে নয়। ঠিক সড়কের পাশে পাশে হাঁটু সমান পাঁচিল। পাঁচিলের মাথায় লোহার রেলিঙ। ছোট-বড় গম্বুজ। কোথাও সেই গম্বুজে লাল-নীল পাথরের পরী উড়ছে। দু'পাশে সারি-সারি ঝাউ গাছ। গাছের ফাঁক দিয়ে দীঘিটা চোখে পড়ছে। দু'পাড়ে বিচিত্র বর্ণের সব পাতাবাহারের গাছ, ফুলের গাছ, কত রকমারী সব ফুল ফুটে আছে, যেন ঠিক কুঞ্জবনের মতো। সাদা পদ্মফুল দীঘিতে—দু'পাড় বাঁধানো এবং ঝরনার জল যেন পড়ছে তেমন কোথাও শব্দ শুনে সোনা চোখ তুলে তাকাল। দেখল পাশে

ছোট্ট এক ফালি জমি। কি সব কচি ঘাস, লোহার জাল দিয়ে বেড়া। ভিতরে কিছু হরিণ খেলা করে বেড়াচ্ছে।

লালটু-পলটু এই হরিণ অথবা চিতাবাঘের গল্প করেছে। সে মনে-মনে একটা বিস্ময়ের জগৎ আগে থেকেই তৈরি করে রেখেছিল। কিন্তু কাছে, এত কাছে এমন সব হরিণশিশু দেখে সোনা হতবাক। রামসুন্দর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। লালটু-পলটু পিছনে আসছে। সে ছুটে-ছুটে এতটা পথ এসেছিল। তারপর গেলেই বুঝি সেই চিতাবাঘ এবং ময়ূর। ময়ূরের পালক সে যাবার সময় নিয়ে যাবে ভাবল। তখনই মনে হল ঘোড়ার খুরে শব্দ উঠছে। নুড়ি বিছানো রাস্তা। সাদা কোমল আর মসৃণ। সে দুটো-একটা নুড়ি তাড়াতাড়ি পকেটে পুরে ফেলল। তারপর মুখ তুলতেই দেখল, খুব সুন্দর এক যুবা এই অপরাহ্নে ঘোড়ায় কদম দিতে দিতে ফিরছেন। পিছনে ফুটফুটে একটি মেয়ে। গায়ে সাদা ফ্রক। জরির কাজ ফ্রকে। ঘাড় পর্যন্ত মসৃণ চুল। সোনার মতো ছোট্ট এক মেয়ে—যেন সেই রেলিঙ থেকে একটা বাচ্চা পরী উড়ে এসে সেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসেছে। সোনাকে পলকে দেখা দিয়েই সহসা উড়ে গেল। সদর খুলে গেছে ততক্ষণে। ঘোড়ার পিঠে সেই যুবা দীঘির পাড়ে বাচ্চা পরী নিয়ে উধাও হয়ে গেল। সোনা কেমন হতবাকের মতো তাকিয়ে থাকল শুধু।

তার মনে হল ছোট্ট এক পরী ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়ে চলে গেছে। যেদিকে ঘোড়া গেছে, সোনা সেদিকে ছুটতে থাকল। ছুটতে ছুটতে সেই সদর দরজা। লোহার বড় গেট, ভিতরে একটা মানুষের গায়ে বিচিত্র পোশাক। হাতে বন্দুক, কোমরে অসি। মাথায় নীল রঙের পাগড়ি। দরজা বন্ধ বলে সোনা ঢুকতে পারছে না ভিতরে। ঘোড়াটা এত বড় বাড়ির ভিতর কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! সোনার কেমন ভয় ভয় করছে। পেছন দিকে তাকিয়ে দেখল, রামসুন্দর, লালটু পলটু আসছে।

সোনা ছোট্ট এক প্রাণপাখির মতো অট্টালিকার নিচে দাঁড়িয়ে থাকল। যেন সে এক রাজার দেশে চলে এসেছে। রাজবাড়ি। এই সদরে মানুষ-জন বেশি ঢুকছে না। দীঘির দক্ষিণ পাড় দিয়ে মানুষ-জন যাচ্ছে। এ-ফটক অন্দরমহলের। সোনা নিরিবিলি এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে দেখে রামসুন্দর তাড়াতাড়ি হেঁটে গেল।

মহলের এই ফটকে সবাই ঢুকতে পারে না। কেবল আপনজনেরা ঢুকতে পারে। অথবা কিছু আমলা যারা এই পরিবারে দীর্ঘকাল ধরে আশ্রিত। বিশেষ করে ভূপেন্দ্রনাথ, যার সততার তুলনা নেই, পারিবারিক সুখ-দুঃখে যে মানুষ প্রায় ঈশ্বরের সামিল। সোনা ঘোড়ার পিছু-পিছু, ছুটে ভেতরে ঢুকতে চাইলে মল্ল মানুষের মতো দুই বীরযোদ্ধা ফটক বন্ধ করে ছোট্ট এক প্রাণপাখিকে

ভিতরে ঢুকতে মানা করে দিল। সোনা প্রথম গরাদের ফাঁকে মুখ ঢুকিয়ে দিল। সে ভিতরটা দেখার চেষ্টা করছে। অনেক দূর থেকে যেন কি এক সুর ভেসে আসছে। কে গান গাইছে যেন। সামনে সারি-সারি থাম, কারুকাজ করা কাঠের রেলিঙ। মাথার ওপরে ঝাড়লণ্ঠন। সে প্রায় ফড়িঙের মতো উড়ে-উড়ে ভিতরে চলে যেতে চাইছে।

তখন কোথাও এক নর্তকী নাচছিল। ঘুঙুরের শব্দ কানে আসছে। তখন কোথাও ঢাকের বাদ্যি বাজছিল। ছাদের ওপর সারি-সারি পাথরের পরী উড়ছে। ওরা বাতাসে শরীরের সব বসনভূষণ আল্গা করে ওড়াচ্ছে। অথবা পা তুলে হাত তুলে নাচছিল। চারপাশে সব মসৃণ ঘাসের চত্বর। কোমল ঘাসে-ঘাসে পোষা সব বুলবুলি পাখি। ছোট-ছোট কেয়ারী করা গাছ। গাছে-গাছে ফুল ফুটে আছে। দক্ষিণ থেকে এ-সময় কিছু পাখি উড়ে এসেছিল। সেসব পাখি কলরব করছে। সে ফটকে মুখ রাখতেই দেখল—লাল অথবা হলুদ রঙের পোশাক পরে, ছোট-ছোট মেয়েরা লুকোচুরি খেলছে তখনই রামসুন্দর হাঁকল, ফটক খুলতে হয়। ভুইঞা কর্তার পরিজন আইছে। সঙ্গে-সঙ্গে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ তুলে লোহার ফটক খুলে গেল। সোনাকে সেই মল্ল মানুষেরা আদাব দিল। লালটু পলটু কি গম্ভীর। চাপল্য ওদের বিন্দুমাত্র নেই।

ওরা শেষে একটা জলের ফোয়ারা দেখতে পেল। সোনা যত দেখে, তত চোখ বড়-বড় হয়ে যায়। সেই মানুষ দু'জন বন্দুক ফেলে সোনাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে চাইলে, সোনা রামসুন্দরের পেছনে চলে গেল। কিছুতেই ওরা সোনাকে কাঁধে তুলে নিতে পারল না। ভুইঞা কর্তার পরিজন এই সোনা, ছোট্ট সোনা। জাদুকর-এর পালিত পুত্রের মতো মুখ চোখ। ওরা সোনাকে কাঁধে তুলে ভূপেন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে যেতে চাইল। যেন নিয়ে গেলেই ইনাম মিলে যাবে তাদের—কিন্তু সোনা হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইছে। কেমন একটা ভয়-ভয় ভাব। বেশি জোরজার করলে হয়তো সে কেঁদেই ফেলবে।

সোনা হেঁটে যেন এ-বাড়ি শেষ করতে পারছে না। সে যে এখন কোথায় আছে, কিছুই বুঝতে পারছে না। মাথার ওপর বড়-বড় ছাদ। ছাদে ঝাড়-লণ্ঠন দুলছে। লম্বা বারান্দা, জালালি কবুতর খিলানের মাথায়, জাফরি -কাটা রেলিঙের পর্দা—কত দাস-দাসীর কণ্ঠ—এসব যেন কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। রামসুন্দর হাত ধরে মহলার পর মহলা পার করে নিয়ে যাচ্ছে। আহা, এ-সময় পাগল জ্যাঠামশাই থাকলে সোনার এতটুকু ভয়ডর থাকত না। দেওয়ালে বড়-বড় তৈলচিত্র পূর্বপুরুষদের। তারপরই নাটমন্দির। এখানে এসেই সে আবার আকাশ দেখতে পেল। ওর যেন এতক্ষণে প্রাণে জল এসেছে।

ভূপেন্দ্রনাথ কাছারি বাড়িতে বসে ছিল। পূজার যাবতীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের

হিসাবপত্র নিচ্ছিল। তখন কানে গেল—ওরা এসে গেছে। সে মোটা পুরো গদীতে বসে ছিল। সাদা ধবধবে চাদর বিছানো। মোটা তাকিয়া। মানুষজন কিছু প্রজাবৃন্দ নিচে বসে রয়েছে। সে সব ফেলে ছুটে গেল। কারণ এবার কথা আছে সোনা আসবে পূজা দেখতে। শেষ পর্যন্ত শচী ওকে পাঠাল কিনা কে জানে। সকাল থেকেই মনটা উন্মনা হয়ে আছে। রামসুন্দরকে ঘাটে বসিয়ে রেখেছে দুপুর থেকে। কখন আসবে, কখন আসবে এমন একটা অস্থির ভাব। সে সব ফেলে ছুটে গেলে দেখল, নাটমন্দিরে সোনা দেবী প্রণাম করছে। পরনে নীল রঙের প্যান্ট। পায়ে সাদা রাবারের জুতো, সিল্কের হাফশার্ট গায়। শুকনো মুখ। সেই কখন খেয়ে বের হয়েছে। ভূপেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি গিয়ে সোনাকে বুকে তুলে নিল। দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে—কত কিছু চেয়ে নেবার ইচ্ছা এই বালকের জন্য। কিন্তু আশ্চর্য, কিছু বলতে পারল না। বড় বড় চোখে দেবী ওদের দিকে তাকিয়ে আছেন। হাতে তাঁর বরাভয়। মা-মা বলে চিৎকার করে উঠল ভূপেন্দ্রনাথ। সোনা সহসা এই চিৎকার কেঁপে উঠল। ভূপেন্দ্রনাথের চোখে জল।

দেবীর প্রতি অচলা ভক্তি। যেন পূজা নয়, প্রাণের ভিতর এক বিশ্বাসের পাখি নিয়ত খেলা করে বেড়ায়। সোনাকে বুকে নিয়ে ভূপেন্দ্রনাথ দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে দেবীর অপার মহিমা, মহিমা না হলে এই সব সামান্য মানুষ বাঁচে কি করে, খায় কি করে, প্রাচুর্য আসে কিভাবে! এই যে সোনা এসেছে, সেও যেন দেবীর মহিমা। নির্বিঘ্নে এসে গেছে, এবং এই দেশে মা এসেছেন। শরৎকাল, কাশ ফুল ফুটেছে, ঝাড়লণ্ঠনে বাতি জলবে। চরের ওপর দিয়ে হাতি যাবে। ঘণ্টা বাজবে হাতির গলায়। হাতিটাকে শ্বেতচন্দনে, রক্তচন্দনে সাজানো হবে। সবই দেবী এলে হয়। দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে ভূপেন্দ্রনাথ—এই সব নাবালকের জন্য মঙ্গল কামনা করল। দেবীর বড়-বড় চোখ। নাকে লম্বা নোলক, হাতের শঙ্খ-পদ্ম-গদা সব মিলে যেন কোথাও এক বরাভয়। আনন্দময়ীর বাড়ির পাশের জমিতে নামাজ পড়বে মুসলমান চাষাভূষো মানুষেরা। ওটা মসজিদ নয়। ভাঙা প্রাচীন কোন দুর্গ, ঈশা খাঁর হতে পারে, চাঁদ রায় কেদার রায় করতে পারে, এখন সেই ভাঙা দুর্গে নামাজ পড়ার জন্য লোক ক্ষেপানো হচ্ছে। আজ সকালে এমন খবরই কাছারি বাড়িতে দিতে এসেছিল—মুসলমানরা বিশেষ করে বাজারের মৌলবীসাব, যার দুটো বড় সুতার কারবার আছে, যে মানুষের চরে লম্বা ধানের জমি, খাসে রয়েছে হাজার বিঘা, সেই মানুষ বাবুদের পিছনে লেগেছে। বোধ হয় এই যে দেবী, দেবীর মহিমাতে সব উবে যাবে। কার সাধ্য আছে দেবীর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়! যেন হাতের শাণিত তরবারি এখন সেই মহিষাসুরকেই বধে উদ্যত। ভূপেন্দ্রনাথের মনে বোধ হয় এমন একটা ছবি ভেসে উঠেছিল। সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকার, মা-মা! তোর এত মহিমা! তোর এত

মহিমার কথা সে উচ্চারণ করে নি। কেবল সোনা, জ্যাঠামশাইর চোখে জল দেখে ভাবল, মানুষটা তাদের কাছে পেয়ে কাঁদছে। মা মা বলে কাঁদছে।

সোনা এতটা পথ বাড়ির ভিতর হেঁটে এসেছে, অথচ সেই ছোট্ট মেয়ে কমলকে সে কোথাও দেখতে পেল না। কোথায় আছে এখন কমলা! সে ভেবেছিল, ভেতরে ঢুকে গেলেই কমলাকে দেখতে পাবে। কিন্তু না সে নেই। সে খেতে বসে পর্যন্ত সন্তর্পণে চারিদিকে তাকাচ্ছিল। কত বালক-বালিকা ছুটোছুটি করছে। কেবল সেই মেয়ে যে ঘোড়ায় চড়া শেখে তাকে দেখতে পাচ্ছে না। ছোট্ট মেয়ে ঘোড়ায় চড়ে ছুটে গেলে বড় আশ্চর্য দেখায়। সোনা যতক্ষণ এই ভিতর বাড়িতে ছিল কমলাকে দেখার আগ্রহে চারিদিকে যেন কি কেবল খুঁজতে থাকল।

শচীন্দ্রনাথ সকাল থেকে খুব ব্যস্ত ছিল। ছেলেরা সব পূজা দেখতে চলে গেছে। দুপুরে মনজুর এসেছিল সালিশি মানতে। মনজুর এবং হাজিসাহেবের ভিতর বিরোধ ক্রমে ঘনিয়ে আসছে। হাজিসাহেবের বড় ছেলে, মনজুরের যে সামান্য জমি আছে সেখানে গত গ্রীষ্মে কোদাল মেরে আল নামিয়ে দিয়েছে। বর্ষায় যখন পাট কাটা হয়, কিছু পাট জোর-জবরদস্তি করে কেটে নিয়ে গেছে। মনজুর একা। হাজিসাহেবের তিন ছেলে। হাজিসাহেবের বড় সংসার। পাটের এবং আখের বড় চাষ। অথচ সামান্য জমির প্রলোভনে একটা খুনোখুনি হয়ে যেতে পারে। সুতরাং সারা বিকেল শচীন্দ্রনাথ হাজিসাহেবের বাড়িতে বসে একটা ফয়সালার জন্য অপেক্ষা করছিল। ফয়সালা হলেই চলে যাবে। উঠোনের জলচৌকিতে সে বসে ছিল। পানতামুক আসছিল। শচীন্দ্রনাথ কিছুই খাচ্ছে না। এখন আসতে পারে ইসমতালি, প্রতাপ চন্দ। বড় মিঞা আসতে পারে। তবু শচীন্দ্রনাথই সব। সে এক সময় হাজিসাহেবের মেজ ছেলেকে খোঁজ করল।

—আমির কৈ গ্যাছে?

—আমির নাও নিয়া গ্যাছে বড় মিঞারে আনতে।

বড় মিঞা ঘাট থেকে উঠে এসে শচীন্দ্রনাথকে আদাব দিল। বলল, কর্তা ভাল আছেন?

—আছি একরকম। তা তোমার এত দেরি!

—কইবেন না, একটা বড় নাও নদীর চরে কেডা বাইন্দা রাখছে।

—নাও কার জান না?

—কার বোঝা দায় কর্তা। দুই মাঝি। আর আছে বড় একখানা বৈঠা। পাল আছে। নাওডারে দ্যাখতে গ্যাছিলাম।

—মাঝিরা কি কয়?

—কিছু কয় না। কই যাইব, কোনখান থাইকা আইছে কিছু কয় না।

—কিছুই কয় না!

—না। রাইতের বেলা আপনের গান শোনা যায় কেবল।

—কি গান!

—মনে হয় গুণাই বিবির গান। চরে সারা রাইত ঝম-ঝম শব্দ হয়।

—গ্যাছ একবার রাইতে?

—কর্তা, ডর লাগে। রাইতের বেলা গান শুনতে গ্যাছিলাম। যত যাই তত দ্যাখি নাও জলে-জলে ভাইসা যায়। দিনের বেলাতে গ্যালাম, দ্যাখি দুই মাঝি বইসা আছে। বোবা কালা। কথা কয় ইশারায়।

—কার নাও, কি জন্য আইছে কিছুই জানতে পারলা না!

—না কর্তা।

—আশ্চর্য!

—হ কর্তা। বড় আশ্চর্য।

মনজুর আসতেই অন্য কথা পাড়ল শচীন্দ্রনাথ। হাজিসাহেব মাদুরে বসে—প্রায় নামাজের ভঙ্গীতে, হাতে লাঠি, লাঠির মুখে চাঁদের বুড়ি—বুড়ো হাজিসাহেব সালিশি মেনে নিলেন। কথা থাকল, যে পাট কাটা হয়েছে, সব ওরা ফিরিয়ে দেবে। এবং জল নেমে গেলে কথা থাকল জমির আল সকলে মিলে ঠিক করে দেবে।

শচীন্দ্রনাথ এবার মনজুরকে বলল, হা রে মনজুর, নদীর চরে নাকি বড় নাও ভাইসা আইছে।

—আইছে শুনছি।

—চরের কোনখানে!

—সে অনেক দূর কর্তা।

অনেক দূর বলতে যথার্থই অনেক দূর। নদী-নালার দেশ। বর্ষাকালে এইসব গ্রাম অন্ধকারে দ্বীপের মতো জেগে থাকে। তারপর জল শুধু জল। নদী-নালা তখন দু'পাড়ের সঙ্গে মিশে যায়। বড় বড় বাগ, ফলের এবং আনারসের। আর অরণ্য কোথাও জলে নাক ভাসিয়ে জেগে থাকে। দক্ষিণে শুধু গজারির বন। বনে বাঘ থাকে। ইচ্ছা করলে সেই নাও নিমেষে গজারি বনে পালিয়ে যেতে পারে। ইচ্ছা করলে এই নাও জলে জলে নিমেষে উধাও হয়ে যেতে পারে। টের পাবার জো নেই। প্রায় যেন এক লুকোচুরি খেলা। খালে বিলে, বিলের দু'পাশে বড় গজারির অরণ্য—দশ-বিশ ক্রোশ জুড়ে অরণ্য। সে সব অরণ্যে এখন এ-সময় ভিন্ন ভিন্ন দুর্ঘটনা ঘটা খুবই স্বাভাবিক।

ঘাটে ওঠার আগে শচীন্দ্রনাথ বলল, অলিমদ্দি, ল একবার ঘুইরা যাই।

—কই যাইবেন?

—নদীর চরে। বড় নাও আইছে। অসময়ে বড় নাও।

অলিমদ্দি লগি মেরে মাঠে এসে পড়ল। এসব মাঠে জল কম। কম জল বলে অলিমদ্দি অনেক দূর নৌকা বাইল। নদীর জলে পড়তেই সে বৈঠা বের করে পাল তুলে দিল। তারপর চারিদিকে চোখ মেলে বলল, কই গ কর্তা, নাও ত ত্যাখতাছি না।

—চরে নাও নাই!

—কই আছে! থাকলে ত্যাখা যাইত না!

শচীন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়াল। পাটাতনে দাঁড়িয়ে দেখল যথার্থই চরে কোন নৌকা নেই। বড় নৌকা দূরে থাকুক, হাটে গঞ্জে যাবার কোষা নৌকা পর্যন্ত সে দেখতে পেল না। সে বিস্ময়ে বলল, আশ্চর্য!

ঘরে ঘরে এখন লণ্ঠন জ্বলছে। আশ্বিন মাস বলে রাতের দিকে শীত পড়ার কথা। কিন্তু গরমই কাটছে না। ঠিক ভাদ্র মাসের মতো ভ্যাপসা গরমে শচীন্দ্রনাথের শরীর ঘামছিল। অলিমদ্দি এসে গোয়ালঘরে ধোঁয়া দিচ্ছে। গরুর ঘরে একটা বড় লম্বা মশারি টাঙানো। ধোঁয়া উঠে এলে অলিমদ্দি মশারি ফেলে দিল। তখন শচীন্দ্রনাথ বড় ঘরে ঢুকে বলল, বাবা, নদীর চরে শুনেছি একটা বড় নাও ভাইসা আইছে—

—কার নাও!

—তা কইতে পারমু না।

—ত্যাখ, ত্যাখ, কার নাও! লক্ষ্মীর নাও হইতে পারে, আবার অলক্ষ্মীর নাও হইতে পারে! ত্যাখ, একবার খোঁজখবর কইরা।

—সকাল হইলে ভাবছি বড় মিঞার নাও, হাজিদের নাও আর চন্দদের নাও নিয়া বাইর হমু—কোনখানে নাওটা অদৃশ্য হইয়া থাকে দেখতে হইব।

কারণ বর্ষাকাল এলেই ডাকাতির উপদ্রব বাড়ে। সুতরাং এই এক বড় নৌকা ভেসে এসেছে, এবং দিনের বেলা কোথায় অদৃশ্য হয় কেউ জানে না, রাত নিঝুম হলে সকলে ভয়ে ভয়ে থাকে। রাত হলে এইসব গ্রাম জলে-জঙ্গলে একেবারে নিঝুম পুরীর মতো। কারণ গ্রামের বাড়ি সব দূরে দূরে। শুধু নরেন দাসের বাড়ি, ঠাকুরবাড়ি এবং দীনবন্ধুর বাড়ি সংলগ্ন। তারপর পাল-বাড়ি। হারান পালের দুই ছেলে, ভিন্নমুখি দুই ঘর এক উঠোনে করে নিয়েছে। রাত হলে সব কেমন নিঝুম হয়ে আসে। মালতীর আর তখন ঘুম আসে না। রঞ্জিত এতদিন ছিল বলে ভয় ভয় ভাবটা কম ছিল। রঞ্জিত চলে গেলে ওর আর কি থাকল! যা হবার হবে। সে জোর করে খুব একটা রাত না হতেই শুয়ে পড়বে ভাবল।

আশ্বিনের এই রাতে এমন গরম যে দরজা বন্ধ করলে হাঁসফাঁস লাগে। এখনও নরেন দাস জেগে আছে। তাঁতঘরে কি যেন করছে নরেন দাস।

শোভারানী বাসন মাজতে ঘাটে গেছে। আবু গেছে হ্যারিকেন নিয়ে। সে ঘাড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। দরজা খোলা রেখে একটু হাওয়া খাওয়ার জন্য পাটিপাতে মালতী শুয়ে পড়ল। গরমে গরমে শরীর যেন তার পচে গেছে। এই গুমোট, রাতের অন্ধকার সব মিলে মালতীকে নানারকম নৈরাশ্যবোধে পীড়িত করছে। কিছুই নেই আর। হায়, জীবন থেকে তার সব চলে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে। গরমের জন্য সায়া সেমিজ শরীর থেকে আল্গা করে দিতে দিতে এমন সে ভাবল। মানুষটা এখন কোথায় আছে, কি কাজ এমন সে করে বেড়ায়, যার জন্য নানা স্থানে তাকে ছদ্মবেশে পালিয়ে বেড়াতে হয়। এ নামটা তার কেউ জানে না। ওর একটা ছবি সে দেখেছে, ছবিতে রঞ্জিতকে চেনাই যায় না। লম্বা দাড়ি, মাথায় পাগড়ি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা—যেন এক প্রৌঢ় সন্ন্যাসী। মালতী এই ছদ্মবেশ কিছুতেই বিশ্বাস করে নি। একদিন তখন লাঠিখেলা ছোরাখেলা হয়ে গেছে। যে যার মতো যার-যার বাড়ি চলে গেছে। মালতীকে জ্যোৎস্নায় সহসা পিছন থেকে কে এসে আঁচল টেনে ধরল—দেখল সেই সন্ন্যাসী। রুদ্র মূর্তি, মালতী ভয়ে মূর্ছা যাবার মতো। রঞ্জিত তখন বলল, আমি মালতী, চিনতে পারছ না! মালতী কাপড়টা বুকের কাছে জমা করে রাখার সময়, সেই দৃশ্য মনে করে কেমন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সেদিনই কেবল রঞ্জিত একবার মাত্র ওকে দু'হাতে জাপ্টে ধরে ভয় ভাঙিয়ে দিল, আমি রঞ্জিত, তুমি চিনতে পারছ না। মালতী এখন ভাবছে সে বোকা। ভাল করে মূর্ছা গেলে মানুষটা নিশ্চয়ই পাঁজাকোলে তুলে নিত। ঘরে দিয়ে আসত। সে খিলখিল করে হেসে উঠে তখন দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সহসা অবাক করে দিতে পারত। আর মানুষটা নিজেকে বুঝি তখন কিছুতেই ধরে রাখতে পারত না। মনে হতেই ভিতরটা ওর উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপে উঠল। এবার সে সায়া সেমিজ পুরোপুরি আল্গা করে ঘাটের দিকে তাকাল। অন্ধকারের জন্য ঘাটের কিছু দেখা যাচ্ছে না। গাব গাছটার নিচে জল উঠে এসেছে। সেখানে সে জলে মাছ নড়লে যেমন শব্দ হয় প্রথমে তেমন একটা শব্দ পেল। অমূল্য থাকলে এ-সময় বড়শিতে মাছ আটকেছে ভেবে ছুটে যেত। কিন্তু মালতী জানে—নরেন দাস কোন বড়শি জলে পাতে নি। একা মানুষ বলে সারা দিন খাটা-খাটনি গেছে। এখনও রাত জেগে তাঁতঘরে সুতা ভিজাচ্ছে মাড়ে। কাল ফিরবে অমূল্য। কাজের চাপ তখন কমবে।

শোভা সকাল সকাল শুয়ে পড়েছে। শরীর ভাল নেই। জ্বর-জ্বর হয়েছে। আবু এসে ঘরে ঢুকলেই দরজা বন্ধ করে দেবে ভাবল মালতী। ঘাটে হ্যারিকেন তেমনি জ্বলছে। আবুকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু আলোটা সহসা নিভে গেল মনে হল এবং বাসন পড়ার শব্দ শোনা গেল। মালতী ভাবল, ঘাট বুঝি পিছল ছিল, উঠে আসার সময় বৌদি পা ঠিক রাখতে পারে নি, পড়ে গেছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁতঘরে ঢুকে কারা যেন ধস্তাধস্তি শুরু করে দিয়েছে। মালতী এবার উঠে বসল। এ-সময়ে চোর ছ্যাঁচোড়ের উপদ্রব বাড়ে। সে ডাকল, দাদারে তর ঘরে লড়ালড়ি ক্যান! কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার—না কোন শব্দ, না কোন চিৎকার। ফের সব নিঝুম। সে তাড়াতাড়ি সায়া-সেমিজ ঠিক করে উঠে বসল। আলো জ্বালাবে এই ভেবে হ্যারিকেনটা টেনে আনার জন্য উঠে দাঁড়াতেই দুই ছায়ামূর্তি দুই পাশে। সে চিৎকার করবে ভাবল—কিন্তু দুই ছায়ামূর্তি অন্ধকারে সাপ্টে ধরে মুখে কাপড় ঠেসে দিল। এই ঘরে এখন ধস্তাধস্তি। শোভা জেগে গেল। অন্ধকারে শুধু ফোঁস-ফোঁস শব্দ। কিল লাথি এবং মহামারীর মতো ঘটনা। সে ভয়ে ডাকতে থাকল পিসি-পিসি। তারপর আর কোন শব্দ নেই। কারা যেন ভূতের মতো এই গৃহ থেকে যুবতী মেয়ে তুলে বর্ষার জলে ভেসে গেল।

সোনা খেয়ে উঠে নাটমন্দিরের সিঁড়িতে নেমে এল। লালটু পলটু এখন বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে ভিড়ে গেছে। সোনা এ-বাড়ির কাউকে চেনে না। সেই আকাশ আবার মাথার ওপর। সে যেন অনেকক্ষণ কোঠা বাড়ির ভিতর দিয়ে হেঁটে এসে আকাশটাকে দেখে ফেলল। সব কিছুই নতুন। অপরিচিত মুখ। জ্যাঠামশাই আগে আগে হেঁটে যাচ্ছেন। সে প্রায় সব সময় জ্যাঠামশাইর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে। সে একটা সাদা হাফ শার্ট গায়ে দিয়েছে। নীল রঙের প্যাণ্ট। চুল ছোট করে ছাঁটা। চোখ বড় বলে অপরিচিত মানুষজনেরা ওকে ঘিরে ধরছে। ওর নাম কি, জিজ্ঞাসা করছে। জ্যাঠামশাই তখন সামান্য হাসছেন। নাম বলতে বলছেন। এবং সে যে চন্দ্রনাথ ভৌমিকের ছোট ছেলে, বিকেলের ভিতরই সেটা ছড়িয়ে পড়ল। নাটমন্দিরের পুরোহিত মশাই সোনাকে দুটো সন্দেশ দিল খেতে। সে সন্দেশ দুটো খেল না। জ্যাঠামশাইকে দিয়ে দিল রেখে দিতে। সে জ্যাঠামশাইকে ফেলে খুব একটা দূরে যেতে সাহস পাচ্ছে না। লালটু পলটু ওকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। দীঘির পাড়ে ব্যাডমিণ্টন খেলা হবে, সোনা যায় নি। বস্তুত সোনা যেতে সাহস পায় নি। ঈশম এলে সে যেন যেতে পারত। ঈশম এখন নদীতে আছে। এ ক'দিন সে নদীতেই থাকবে। ছইয়ের ভিতর সে শুয়ে বসে অথবা মাছ ধরে, বেলে মাছ এবং পুঁটি মাছ ধরে কাটিয়ে দেবে। নিজেই নৌকায় রান্না করবে এবং খাবে।

মাঝে মাঝে সোনার আর যা মনে হচ্ছিল, সে এক মেয়ের কথা, যে মেয়ে বাপের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে অন্দরে ঢুকে গেল। সোনার সেই জগতে মাঝে মাঝে চলে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল। ছোট ছোট মেয়েরা ছেলেরা, লুকোচুরি খেলছে জরির টুপি পরে, সিল্কের ফ্রক গায়ে দিয়ে। সোনার ইচ্ছা হল সেই বড় উঠোনটাতে চলে যেতে। যেখানে সে ফুল ফুটে থাকার মতো মেয়েদের ফুটে থাকতে দেখে এসেছে। সে জানত, ওরা এত বড় যে, তাকে তারা খেলায় নেবে না। সে একপাশে শুধু দাঁড়িয়ে থাকবে। সে খেলবে না। খেলা দেখবে। ওর মুখে তখন দুঃখী রাজকুমারের ছবি ভেসে উঠবে। তখন হয়তো কোন ছোট্ট মেয়ে ওর হাত ধরে বলবে, এস, আমাদের সঙ্গে খেলবে। আমরা লুকোচুরি খেলব। সেই জগৎটাতে যাবার বড় প্রলোভন হচ্ছিল সোনার। পরী কি হুরী হবে কে জানে, ছোট্ট এক মেয়ে তার চোখের ওপর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল—এখন আর সোনার অন্য কথা মনে আসছে না। কাছারিবাড়িতে বসে শুধু সেই ছোট্ট মেয়ের মুখ মনে ভাসছে। তখন জ্যাঠামশাই ডাকলেন, সোনা, আয়!

কোথায় যাবে! সোনা এখন ঠিক বুঝতে পারছে না। জ্যাঠামশাই একটা শার্ট গায়ে দিল। ধুতি পাট করে পরল। তারপর ওরা যেদিকে খেতে গিয়েছিল, সেদিকে না গিয়ে একটু বাঁ দিক ঘেঁষে বারান্দার নিচে যে কেয়ারি করা ফুলের বাগান আছে তার ভিতরে ঢুকে গেল। যেন এই মহলাতে ঢুকতে হলে তুমি কিছু প্রথমে ফুল ফল দেখে নাও—তেমনি দৃশ্য এই ঢোকার মুখে। নানা রকমের গাছ এবং ফুল ফল। এ-রাস্তাটা যে বাড়ির ভিতরই আছে অনুমান করতে পারে নি। আর এ-কি বাড়ি রে বাবা, যেন সেই কি বলে না, শেষ নেই তার, সোনা একপথে এসে এখন আবার অন্য পথে নেমে যাচ্ছে। তার বাড়ি সেই অজ পাড়াগাঁয়ে। সেখানে মাত্র প্রতাপ চন্দের বাড়িতে দালান, অন্য বাড়ি সব টিন-কাঠের। ওদের বাড়ির দেয়াল এবং মেঝে সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো। দক্ষিণের ঘর, পুবের ঘর, সব ঘরের একটা নাম আছে। এখানে কোন নাম নেই। এখানে সব হলঘরের মতো ঘর। জ্যাঠামশাই যেতে যেতে সব ঘরগুলির নাম বলে যাচ্ছেন। দেয়ালে বড় বড় তৈলচিত্র। সে-সব তৈলচিত্র কার, কে কোন সালে মারা গেছে, কার জন্ম কোন মাসে, বাবুদের হাতি কবে কেনা হয়েছে, যেতে যেতে জ্যাঠামশাই হাতি কেনার গল্প করতে থাকল। তারপর একটা সিঁড়ি। দোতলায় উঠে গেছে। কার্পেট পাতা। সোনা এ-সবের কি নাম কিছু জানে না। জ্যাঠামশাই সোনাকে সব বলে যাচ্ছে। কি সুন্দর আর নরম কার্পেট। সোনার খালি পা ছিল। সে খুব আস্তে আস্তে বুঝি দ্রুত হেঁটে গেলে কার্পেটে পা লাগবে—সে তেমনি ভাবে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেল। দু'পাশে সব রেলিঙ্। কেবল মেয়েরা এখানে গিজগিজ করছে। ভূপেন্দ্রনাথ এমন মানুষ যে তার কাছে অন্দর সদর সমান। সে একটা পর্দার পাশে দাঁড়িয়ে ডাকল, বৌঠাইরেন, আমি আইছি। সোনা পাশে চুপচাপ পলাতক বালকের মতো দাঁড়িয়ে থেকে এই ভিতর বাড়ির ঐশ্বর্য এবং বৈভব দেখতে দেখতে কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল। ওর মনে হল এখানে

মানুষ থাকে না, দেবদেবীরা থাকে। সে যতটা এবার পারল জ্যাঠামশাইর জামাকাপড়ের ভিতর নিজেকে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করল।

সোনা কান পেতে থাকল। কে সাড়া দিচ্ছে, কোনদিকের দরজা খুলছে, সেই মেয়েটা কোথায়? এসব ভাবনার সময়ই মনে হল পর্দা নড়ছে। পর্দার ওপাশে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ভূপেন্দ্রনাথের সবুর সইছে না। সে পর্দার এপাশ থেকে বলে উঠল, বৌঠাইরেন, সোনা আইছে।

বৌঠানের পাশে রাঙা চেলি পরে ছোট্ট এক মেয়ে—কেবল সেই থেকে ঘুর-ঘুর করছে। শালিক না চড়ুই কি পাখির ছানা তার চাই। সে পুতুলের ঘর সাজাবে। পুজোর দিন বলেই রাঙা চেলি পরেছে। পায়ে আলতা। কপালে টিপ লাল রঙের। চুলে বব-ছাঁট। চোখে লম্বা কাজল। হাতে সাদা হাতির দাঁতের কারুকাজ করা বালা। কমলা পুজোর দিনে কত রকমের গয়না পরেছে। সেও ঠাকুমার পায়ে পায়ে বের হয়ে এল।

ভূপেন্দ্রনাথ ফের বলল, সোনা আইছে বৌঠাইরেন।

বৌঠান চারিদিকে তাকালেন। কোথায় সেই ছেলে! সোনা জ্যাঠামশাইর পিছনে এমন লেগে আছে যে সহসা দেখা যায় না। কমলা বলল, দাদু, সোনা কোথায়?

ভূপেন্দ্রনাথ জোর করে সোনাকে পেছন থেকে টেনে আনল, এই হইল সোনা!

কমলা বলল, দেখি সোনা তোমার মুখ। কেমন পাকা পাকা কথা কমলের! সেই মেয়ে! সোনা লজ্জায় আরও আড়ষ্ট হয়ে গেল।

বৌঠান সোনাকে অপলক দেখল। ভূপেন মিথ্যা বলে নি। দেখেই বোঝা যায় এই সোনা ভূপেন্দ্রনাথের বড় আদরের। চন্দ্রনাথের ছোট ছেলে সোনা। চন্দ্রনাথ বিকালে এ-বাড়ির কাছারিবাড়িতে রোজ আসে। ভোরের দিকে কোন কোন দিন দেখা করে যায়। পুজোর সময় কাজের চাপ বলে বোধ হয় ভোরে দেখা করে যেতে পারে নি। এবার শচীন্দ্রনাথ সোনাকে আসতে দিয়েছে, ভূপেন্দ্রনাথের প্রাণে বড় আনন্দ। পূজার ক'টা দিন সে খুবই ব্যস্ত থাকবে, তবু আপন রক্তের এই তিন বালকের উপস্থিতি তাকে বড় মহিমময় করে রাখছে। ভূপেনের মুখ দেখলে এ-সব যেন টের পাওয়া যায়। বাড়ি থেকে ফিরে এলেই সে বৌঠাকুরানীকে বলত, বোঝলেন বৌঠাইরেন, সোনা যে কি হাসে না, কি বড় চোখ না, কি সুন্দর হইছে পোলাটা—আপনেরে আর কি কমু। বড় হইলে আপনেরে আইনা ছাখামু। সেই সোনা এ বাড়ি আসতে আসতেই এখানে টেনে নিয়ে এসেছে, ছাখেন আনছি। ছাখেন, মুখখানা একবার ছাখেন বৌঠাইরেন।

বৌঠাকুরানী সোনার মুখ দেখতে দেখতে শুধু ভাবলেন, ভূপেনের কথায়

কোন অতিশয়োক্তি ছিল না।—পোলার মুখ ত রাজার মত হইছে। কুষ্ঠি করাইছ নি!

—কুষ্ঠি সূর্যকান্তরে দিছি করতে। বলে সে সোনাকে বলল, প্রণাম কর। জ্যাঠিমা হন।

সোনা উবু হয়ে প্রণাম করলে দু'হাতে তুলে ধরলেন এবং চিবুক ধরে আদর করার সময়, হাতে একটা চকচকে রুপোর টাকা দিলেন। হাতে ওর রুপোর টাকা। সে নেবে কি নেবে না ভাবছিল। জ্যাঠামশাইর দিকে সে তাকাল। তিনি যেন চোখের ইশারায় সোনাকে অনুমতি দিয়েছেন। সোনাকে এই প্রথম দেখলেন বড় বৌঠাকুরানী। এই সোনা, এত বড় বৈভবের ভিতর প্রথম ঢুকেছে। সোনাকে তিনি বুঝি রুপোর টাকা দিয়ে বরণ করে নিলেন। হাতে টাকা, এমন টাকা-পয়সা কত আঁচলে বাঁধা থাকে, এ-যেন এক আশ্চর্য যোগাযোগ, টাকাটা নিয়ে শালিক চড়ুইর বাচ্চা ধরে এনে দেবার জন্য দিতে যাবেন, তখন সোনা দরজায় দাঁড়িয়ে—তিনি টাকা দিয়ে সোনাকে আশীর্বাদ করলেন।

কমল যেন মনে মনে ফুঁসছিল। ভূপেন্দ্রনাথ ওর সম্পর্কে দাদু হন। ভূঁইঞা-দাদু সে ডাকে। দাদু কোন কথা বলছেন না। কমল যে এ-বাড়ির মেজবাবুর মেয়ে, ওরা যে দু-বোন ঠাকুরমার কাছে শরৎকাল এলেই চলে আসে, মেজবাবু আসেন এসব বলছে না। মেজবাবু সরকারী অফিসে বড় চাকুরি করেন, বিদেশে তার প্রবাসজীবন দীর্ঘদিন কেটেছে। আর মা মাঝে মাঝে তাঁর দেশের গল্প করেন। সে দেশটাতে একটা নদী আছে, নাম টেমশ নদী, সে দেশটাতে একটা গ্রাম আছে, নাম লুজান। একটা গীর্জা আছে সকলে ওকে সেণ্ট পলের গীর্জা বলে, দু'পাশে গাছ আছে, ওরা নাকি উইলো গাছ, দুপাশে জমি আছে, শোনা যায় সন্ধ্যা হলে স্কাইলার্ক ফুল ফুটে থাকে। অমলা কমলা সে সব গল্প শোনার সময় তন্ময় হয়ে যায়। আর সামনে এই বালক সোনা নাম, তাকে সেইসব দেশের গল্প না বলতে পারলে, এতবড় নদী পার হয়ে আসা, এত বড় বাড়িতে বসবাস করা বৃথা, এবং ছুটতে না পারলে, সে যে কমল, মা তার বিদেশিনী, এ সব যেন বোঝানো যাচ্ছে না। দাদু মাকে বাবাকে ভালবাসে না। বাবার জন্য দাদু কলকাতায় আলাদা বাড়ি করে দিয়েছে। বুঝি মাকে নিয়ে এমন সম্ভ্রান্ত পরিবারে ঢোকা বারণ। না, এসব সোনাকে বলা যাবে না। দিদি এখন থেকে ওকে কি সব শেখাচ্ছে। দিদি বলে দিয়েছে, সবকিছু সবাইকে বলতে নেই। আমি তোমাকে সোনা সব কিন্তু বলব না। আমাকে ঠাকুমা শালিকের বাচ্চা এনে দেবে। আমি পুতুল খেলব। তোমার মুখ দেখলে কেবল আমার পুতুল খেলতে ইচ্ছা হয়।

সোনা হাতের টাকাটা পকেটে রাখল। তখন কমল আর সহ্য করতে

পারল না। সোনা এবং ভূঁইঞা-দাদু চলে যাবে। সোনা ঠাকুমাকে তার ভাল নাম বলেছে। ভাল নাম ওর অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক। কি নাম রে বাবা। কত বড় নাম। সেই মার দেশে যেমন নাম জন ম্যাথুয়েল। কি সব নাম মামাদের! সে মনেই রাখতে পারে না। সোনার নামটাও প্রায় তাই। সে আর সহ্য করতে পারল না। বলেই ফেলল, ঠাকুমা, সোনা আমাকে কি বলে ডাকবে।

বোধ হয় ভূপেন্দ্রনাথ কমলের কথা লক্ষ্য করে নি। বৌঠাকুরানী এবং ভূপেন্দ্রনাথ কিছু পারিবারিক কথাবার্তা বলছিল। ওদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় কে একজন অনেকদিন পর পূজা দেখতে এসেছেন। দেখাশোনার জন্য যেন আলাদা লোক দেওয়া হয়, এ-সব কথা বলছিলেন। তখন সোনা কেন জানি কমলের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসছে। আমি তোমাকে আবার কি ডাকব। কমল ডাকব। পুচকে মেয়ে, বুঝি এমন বলার ইচ্ছা সোনার।

—দাদু, আমাকে সোনা কমল পিসি ডাকবে না? বলে সোনার দিকে গরবিনীর চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকল।

এতক্ষণে সোনার মনে হল কমলের চোখ ঠিক কালো নয়। ঠিক নীল নয়। ঘন নীল অথবা কালো রঙের সঙ্গে হলুদ মিশালে এক রঙ—কি যে রঙ চোখে বোঝা দায়। তারপর মনে হল বেঁথুন ফলের মতো রঙ। বেথুন ফল পাকলে খোসা ছাড়িয়ে নিলে এমন রঙ হয়। সোনা দেখল, কমল ওর দিকে টগবগ করে তাকাচ্ছে। গাল ফুলিয়ে রেখেছে। সোনা ছড়া কাটতে চাইল, গাল ফুলা গোবিন্দের মা চালতা তলা যাইও না। কিন্তু এই বাড়ি, এতবড় বাড়ির বৈভব ওকে এখনও ভীতু করে রেখেছে। সে কিছু বলতে পারল না।

এ-সময় ভূপেন্দ্রনাথ বলল, তোমারে, সোনা কমল-পিসি ডাকব। কি ক'ন বৌঠাইরেন। কমল সোনার বড় হইব না।

—তা তোমার হইব। আট দশ মাসের বড় হইব।

সোনা যেন একটু মিইয়ে গেল। বৌঠাকুরানী বললেন, মায়রে ছাইড়া থাকতে পারব ত?

—পারব।

—না পারলে ভিতর বাড়িতে পাঠাইয়া দিও।

—দিমু।

বস্তুত এই সংসারে ভূপেন্দ্রনাথ যথার্থই আত্মীয়ের মতো। এই তিন বালক, আত্মীয়ের সামিল। লালটু পলটুর সমবয়সী বৌঠাকুরানীর দুই বড় নাতি, ওর বড় ছেলে অজিতচন্দ্রের ছেলে এবং ছোট ছেলের শ্যালক নবীন। লালটু পলটু এলে কাছারিবাড়ির লনে অথবা দীঘির পাড়ে খেলা—ব্যাডমিণ্টন খেলা। বাবুদের আরও সব আমলা কর্মচারীর ছেলেরা সমবয়সী না হলেও—এক সঙ্গে

পূজার ক'টা দিন খুব হৈচৈ—যেন প্রাণে আর ঐশ্বর্য ধরে না। সারাদিন পূজার বাজনা। কেবল বাদ্য বাজে। ঢাক ঢোল বাজে, কাঁসি বাজে। আর অষ্টমীর দিনে বাবুদের বাড়ি বাড়ি পাঁঠা বলি। শীতলক্ষার পাড়ে পাড়ে তখন কি জাঁকজমক। নবমীতে মোষ বলি, হাড়কাঠে তখন পাঁঠা, মেষ মোষের সমারোহ। ভোর থেকে কমল বৃন্দাবনীর সঙ্গে ফুলের জন্য বাগানে ঠিক মৌমাছি হয়ে ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়। কলকাতার কমল গাঁয়ে এসে পূজার এ-ক'টা দিন ফুরফুরে পাখি হয়ে যায়।

সেই কমল সোনার হাত ধরে সারা প্রাসাদ ঘুরে ঘুরে বেড়াল। হা-হা করে হাসল। হাসবার সময় সে বড় হলঘরে তার এই হাসির প্রতিধ্বনি কেমন শোনায় কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। হাত ধরে সে ছুটল। বড় বড় খিলান আর টানা লম্বা বারান্দা। ছোটার সময় সে পকেট ধরে রেখেছিল। পকেটে টাকাটা আছে। ছুটতে ছুটতে ওরা অন্দরের দিকটায় এসে গেল। কেমন নিঝুম, বাড়ির পিছনে বড় বড় গাছ সব। সারি সারি সুপারি ফলের বাগান। কমল হাত ধরে এবার ফিরে আসার সময় বলল, সোনা, ঐ দ্যাখ আমার দিদি দাঁড়িয়ে আছে। যাবি?

সোনা ঘাড় কাত করল। সে এখনও কমল অথবা কমল-পিসি কিছুই বলছে না। কেবল কমলের হাত ধরে সে হাঁটছে।

বারান্দায় রেলিঙে সেই মেয়ে। সোনা নাম বলে দিতে পারে। মেয়ের নাম অমলা। রেলিঙে উবু হয়ে সেই মেয়ে এখন ওকে দেখছে। লম্বা ফ্রক হাঁটুর নিচে। ঘাড়ের কাছে চুল। একেবারে সোনালী রঙ চুলের। আর কাছে যেতেই দেখল চোখ একেবারে নীল।

কমল বলল, সোনা।

দিদি যেন ওর ঘুম থেকে জেগে উঠছে এমনভাবে তাকাল। কমল বলল, কি সুন্দর নাম!

অমলা যেন শুনতে পায় নি।—কি নাম তোমার?

এই মেয়ে কথা বলছে, কি যে ভাল লাগছিল! সে এইসব বালিকার মতো কথা বলতে চাইল, আমার নাম শ্রীঅতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক।

—আমাকে তুমি কি বলে ডাকবে? অমলা বলল।

কমল বলল, সোনা, তোর পিসি হয়। অমলা পিসি।

আর ডল পুতুলের মতো এই মেয়ে কমলা। ডাকে সবাই কমল বলে। সোনা খুব ধীরে ধীরে ওদের মতো উচ্চারণ করতে চাইল, তুমি আমার কমল পিসি। তুমি আমার অমলা পিসি।

কমলা খুব যেন খুশী। অমলা আবার রেলিঙে ঝুঁকে কি যেন দেখছে।

সোনা বলল, কমল, তুমি ঘোড়ায় চড়তে পার?

কমল বলল, হ্যাঁ রে, তুই আমার নাম ধরে ডাকছিস। আমি দাদুকে কিন্তু তবে বলে দেব।

সোনাকে কেমন বিমর্ষ দেখাল। সে বলল, আমি জ্যাঠামশয়র কাছে যামু। সে রাগ করলে কমল অন্য কথায় এল। বলল, আমি ঘোড়ায় চড়তে পারি। সোনাকে কাছে এনে বলল, যামু কিরে, যাব বলবি।

সে তবু যেন খুশী হল না। অথবা ওর যেন এখন বলার ইচ্ছা, আমার এক পাগল জ্যাঠামশাই আছেন। কিন্তু সে তা না বলে বলল, ছাদে বড় বড় পুতুল। কেবল উইড়া যায়।

কমল বলল, নদীর পাড়ে কাশবনে ফুল ফুটলে ওরা স্থির থাকতে পারে না। বাকিটুকু বলল না। বাকিটুকু অমলাদি ওকে বলেছে। কাশ ফুল ফুটলে বসন-ভূষণ ঠিক থাকে না। সব ফেলে কেবল নদীর চরে উড়ে যেতে চায়।

পরীদের কথা শুনেই অমলা কেমন ফের ঘুম থেকে জেগে ওঠার মতো সোনাকে দেখল। সে যেন এই প্রথম দেখছে। সে সোনার চুলের ভিতর হাত রাখল এবার। সব ভুলে গেছে মতো বলল, কাদের ছেলে রে!

—অমা, তুমি জান না! এই না বললাম তোমাকে! আমাদের সোনা। চন্দ্রনাথ দাদুর ছেলে।

—ও মাঃ, তাই বুঝি। তবে তো আমাদের জিনিস—এমন এক মুখ করে সে সোনাকে বুকের কাছে সাপ্টে ধরতে চাইল। সোনা একটু সরে দাঁড়াল। মেয়ের শরীরে কি যেন গন্ধ—মিষ্টি, বাগানে বেল ফুল ফুটলে সে এমন একটা গন্ধ পেত। মেয়ের চোখ এত নীল যে আকাশকে হার মানায়। সোনার একবার ইচ্ছা করছিল চোখ দুটো ছুঁয়ে দিতে। বিষণ্ণ গোলাপের পাপড়ি ঝরে গেলে যেমন কাতর দেখায় এই চোখ এখন তেমন কাতর দেখাচ্ছিল। কেবল হাই তুলছে অমলা। তুমি সোনা এস, বলে সে সহসা সোনাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে চাইল।

সোনা বলল, আমি জ্যাঠামশয়র কাছে যামু।

—কি রে তুই দিদিকে ভয় পাস কেন!

অমলা বলল, এই শোনো। বলে কেমন ঝলমল করে উঠল খুশীতে। সোনার এমন মুখ, হাসিখুশী মুখ, ঝলমল আকাশের মতো মুখ দেখতে বড় ভাল লাগল।—এস, আমার সঙ্গে এস। এস না, ভয় কি! কমলের মতো আমি তোমার পিসি। আমাকে তুমি অমলা পিসি ডাকবে। এস না।

কমল বলল, আয় না। ভয় কি!

ওরা সিঁড়ি ধরে নামার সময় ছোট বৌরানী বলল, কার ছেলে রে!

—সোনা, চন্দ্রনাথ দাদুর ছেলে।

বৌঝিরা বলল, ওমা, এ কে রে?

কমল গর্বের সঙ্গে যেন পরিচয় দিল, জান না! চন্দ্রনাথ দাদুর ছেলে।

—এ ছেলে কথা বলে না! ওমা, একি ছেলে রে! অমলা হাসতে থাকল।

সোনা বলল, আমি জ্যাঠামশয়র কাছে যামু।

কমলা যেন সোনার চেয়ে কত বড় এমন চোখে মুখে কথা বলল, না, লক্ষ্মী, তুমি এস। দিদি তুই সোনাকে ভয় দেখাস কেনরে!

অমলা বলল, ভয় কোথায় দেখালাম। সোনা, এস।

লোকজন ভিড় ঠেলে ওরা ঠাকুমার ঘরে ঢুকে গেল। এ-ঘরটাও সেই বড় হলঘরের মতো। বড় বড় খাট পড়েছে। বারান্দায় ময়না পাখি। যাবার সময় অমলা খাঁচাটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে গেল। কমল কি যেন কথা বলল পাখিটার সঙ্গে। বলল, এর নাম সোনা। পাখিটা দাঁড় থেকে নেমে ডাকল, কমল, কমল, নাম বল। সোনা সোনা নাম বল। পাখির গলায় সোনা তার নাম শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল। সোনাকে দেখে পাখিটা এখন খাঁচার ভিতর থেকে বের হয়ে আসতে চাইছে।

বড় এই ঘরটাতে ঢুকেই অমলা লাফ দিয়ে খাটে উঠে গেল। সে আলমারির ওপর থেকে বড় একটা চামড়ার সুটকেস টেনে নামাল। কি যেন ওরা দেবে সোনাকে। কমল ওর বাক্স খুলে ফেলল। ওরা কে আগে কি দেখাবে সোনাকে সেজন্য সুটকেস থেকে সব টেনে নামাল। অমলার বয়স আর কত, এই এগারো বারো, কমলের বয়স কত এই নয় দশ—কে জানে কার সঠিক বয়স—তবু দু'জনের ভিতর সোনাকে খুশি করার জন্য প্রতিযোগিতা, এই দ্যাখো সোনা বলে, পুঁতির মালা, ঝিনুক এবং ছোট ছোট নুড়ি পাথর বাক্স খুলে দেখাল। কমল বলল, তুমি কি নেবে সোনা!

সোনা বলল, আমি কিছু নিমু না।

অমলা বলল, এই দ্যাখো কি সুন্দর ছবি, ছবি নেবে?

—না, আমি কিছু নিমু না।

অমলা বলল, এই দ্যাখো কি সুন্দর ময়ূরের পালক, পালকের কলম দিয়ে তুমি লিখতে পারবে।

—আমি জ্যাঠামশয়র কাছে যামু কমল।

—ও মা! দিদি, দ্যাখ সোনা আমাকে কমল ডাকছে! পিসি ডাকছে না!

অমলা হাসল। পুচকে মেয়ের কি বড় হবার সাধ। সে এবার বলল, বাইস্কোপের বাক্স নেবে সোনা! এখন যেন অমলা কমলা যে যার তূণ থেকে শেষ অস্ত্র বের করছে। অমলা বলল, চোখ রাখো, দ্যাখো কি সুন্দর ছবি সব

দেখা যাচ্ছে। ছাখো কি সুন্দর একটা মেয়ে ডালিম গাছের নিচে, খোঁপায় ফুল গোঁজা। তারপর অমলা আর একটা ছবি লাগিয়ে বলল, ছু'জন সিপাই, মাথায় ফৌজি টুপি। পাশে ছুটো বাঁদর। গলায় গলায় ভাব। পা তুলে সোনাকে দেখে নাচছে।

সোনা এবার ফিক্ করে হেসে দিল। বাঁদর নাচছে ছু'পাশে। সে এবার সাহস পাচ্ছে যেন।

অমলা বলল, এই ছাখো। অমলা ছবিটা পাল্টে দিতেই সোনা দেখল, একটা-ঝরনা। একটা প্রজাপতি। এবং ঝোপের ভিতর মস্ত এক বাঘ। সোনা চোখ বড় বড় করে বলল, অমলা, একটা বাঘ।

—এই রে! তুমি আমাকেও নাম ধরে ডাকছ। বলেই খুশীতে গালে গাল লেপ্টে দিল সোনার।

সোনাকে নিয়ে অমলা কমলা এক সময় ছাদে উঠে এল। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে শীতলক্ষার বুকে নেমে আসছে। ডায়নামোর শব্দ ভেসে আসছে। চারিদিকে আলোতে আলোময়। মনে হয় যেন এখানে এসে সব পৃথিবীটা খুশীতে ঝলমল করে ফুটে উঠছে। কতদুর পর্যন্ত আলো, আলোতে আলোময় এই মাটি এবং গাছ ফুল পাখি। কি উঁচু ছাদ। সে ছাদের ওপর ছুটে বেড়াল। কার্নিশের কাছে ঝুঁকে দাঁড়াল। নিচে দীঘির জল। জলে আলোর প্রতিবিম্ব ভাসছে। দূরে শীতলক্ষা নদী এবং পাশে চর, তারপর পিলখানার মাঠ। মাঠে হাতিটা বাঁধা থাকে। ছাদে দাঁড়িয়ে সে সব যেন দেখার চেষ্টা করল। অমলা কমলার সঙ্গে সেই থেকে তার ভাব হয়ে গেছে, সে বাড়িময় ছুটে বেড়িয়েছে। অমলা কমলার শরীরে কি যেন মৃছ সৌরভ। এই সৌরভ মনের ভিতর এক আশ্চর্য রং খুলে ধরছিল। অমলা কমলা ওর ছু'পাশে দাঁড়িয়ে কোথায় কি আছে, কোনদিকে গেলে মাঠ পড়বে, মাঠের সিঁড়িতে সাদা পাথরের ষাঁড়, গলায় তার মোতি ফুলের মালা, আরও কি সব খবর দিচ্ছিল। এখন সে ছাদে উঠে এসেছে ছাদের ছু'পাশে ছুই মেয়ে তাকে কেবল বড় হতে বলছে। সে মাকে ফেলে অনেক দূরে চলে এসেছে। সে যেন ক্রমে বড় হয়ে যাচ্ছে। ওর ভয় ভয় ভাবটা থাকছে না। যেমন মেলায় বিন্নির খৈ খেতে খেতে অথবা ঘোড়দৌড়ের মাঠে কালু শেখের ঘোড়া দেখতে দেখতে সে পৃথিবীর যাবতীয় মাধুর্য শুষে নিত, ঠিক তেমনি এই ছাদে আজ গ্রহ নক্ষত্র দেখতে দেখতে আকাশের মাধুর্য শুষে নেবার সময় তার মায়ের মুখ মনে পড়ে গেল। এই ছুই মেয়ের ভালবাসা তাকে আর ছোটাতে পারল না। ছাদের এক কোণে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছে তাকে। অমলা কমলা আদর করতে চাইলে সে প্রায় কেঁদে ফেলেছিল। এত দূরদেশে এসে মায়ের জন্য ভিতরের প্রাণপাখিটা কেবল এখন ছটপট করছে।

ভয়ঙ্কর অন্ধকার। গাছে গাছে পাতা নড়ছিল না। ক্রমে এই গ্রাম অন্ধকারে ডুবতে থাকল। বুঝি চরাচরে কেউ জেগে নেই। ভেসে ভেসে সেই নৌকা কোথায় যে যায়, কোথায় যে থাকে কেউ জানে না। চরের বুকে রাতের গভীরে সেই নৌকা এসে হাজির। বড় ছুই কোষা নাও। ছু'পাশের মানুষেরা বাঁধাছাদা একটা জীবকে নৌকায় তুলে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মহেন্দ্রনাথ তখন ডাকলেন, শচী, শচীরে!

কোন সাড়াশব্দ নেই। তিনি ফের ডাকলেন, অলিমদ্দি, অ অলিমদ্দি!

কেউ সাড়া দিচ্ছে না। পুবের বাড়িতে হায় হায় রব। তোমরা ওঠ সকলে। কে কোথায় আছ! দীনবন্ধুর বৌ চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে। দীনবন্ধু উঠোনে নেমে চিৎকার করে উঠল, সকলে আপনেরা জাগেন। সর্বনাশ হইয়া গ্যাছে। শচীন্দ্রনাথ জেগেই মাথার কাছ থেকে একটা বর্শা তুলে নিল হাতে। অলিমদ্দি বলল, কর্তা, আমি একটা সুপারির শলা নিলাম।

ভুজঙ্গ এল, কবিরাজ এল, কালোপাহাড়, চন্দদের ছুই বেটা এবং গৌর সরকার সদলবলে মুহূর্তে এসে হাজির।— কি হইছে!

—কি আর হইব! তোমার আমার মান-সম্মান গ্যাছে।

সবাই অন্ধকারে বের হয়ে পড়ল। মেঘলা আকাশ। গ্রহ নক্ষত্র কিছু দেখা যাচ্ছে না। নয়াপাড়াতে খবর দেওয়া হল। টোডার বাগ থেকে ছুটে এল মনজুর, আবেদালি আর হাজিসাহেবের তিন বেটা। বলল, কোনদিকে যাওয়ন যায়!

শচীন্দ্রনাথ বলল, চরের দিকে লও। রাইতে যদি সেই নাও জলে জলে ভাইসা যায়!

জয়, জয় মা, মঙ্গলচণ্ডির জয়। মা গো, তর ছাওয়াল পাওয়াল—তুই যারে রাখস মা তারে কে মারে! মা গো, তুই অবলা জীবের প্রাণ, তর কাছে মা জিম্মায় থাকল দুঃখিনী মালতী।

শচীন্দ্রনাথ নৌকায় উঠে বলল, জব্বর কইরে! সে গাঁয়ে আইছিল, সে নাই ক্যান।

এবার আবেদালি হা হা করে কেঁদে উঠল, কর্তা গ, আমার জানমান আর নাই। পোলার কসুর আমি আর কি দিয়া শোধ দিমু। সকলে থ।

একদল থানায় গেল। সবিরুদ্দিনসাবকে খবর দিতে হয়।

শচীন্দ্রনাথ তখন বলল, জব্বরের কাম। তোমরা নৌকা ভাসাও জলে।

জলে নাও ভাসাও রে, কিংবদন্তির নাও ভাসাও। সোনার নাও পবনের

বৈঠা। নাও রে—জলে নাও ভাসাও। মানুষগুলি রাতের অন্ধকারে জয় জয়মালা, গন্ধেশ্বরী, ওমা তুই পটেশ্বরী, তর দেশে জলে স্থলে দুঃখ মা, আখেরে বনিবনা হবে কি হবে না কে জানে! শচীন্দ্রনাথ চিৎকার করে উঠল, তিনদিকে চইলা যাও। একদল ফাওসার বিলে বিলে যাও। অন্যদল সোনালী বালির নদীর চরে। যারা পশ্চিমে যাবা সঙ্গে নিবা পালের নাও। পশ্চিমা বাতাসে পাল তুইলা দিবা।

নৌকা এখন না ছাড়লে নাগাল পাওয়া দায়। শচীন্দ্রনাথ বলল, আর আমি যাই, সঙ্গে নরেন দাস যাউক—সেই যেখানে চরে আলো জ্বলে সেইখানে। ওরা এবার সকলে নৌকায় উঠে বৈঠা মাথার ওপর তুলে চিৎকার করে উঠল, মাগো, তর এমন সুজলা সুফলা দ্যাশ, মাগো তুই ক্যান আবার জ্বইলা উঠলি। সংসারে বনিবনা হয় না—একি কাণ্ড মা সিদ্ধেশ্বরী। তুই মা ওর মুখ রক্ষা কর দিকি ইবারে।

—আর কে যাইবা জলে? গজারির বনে বনে অন্ধকার, আলো জ্বলে না, জোনাকি জ্বলে না। নিশুতি রাতে সাপে বাঘে বনিবনা হয় না। সেই বনের দিকে বড় নাও নিয়ে শচীন্দ্রনাথ ভেসে পড়ল। এতক্ষণ গ্রামের ভিতর ভীষণ চিৎকার চেচাঁমেচি ছিল। বাড়ি থেকে বাড়িতে, গ্রাম থেকে গ্রামে নৌকার পর নৌকা ছুটে এসেছে। টেবার দুই ভাই ছুটে এসেছে। মেয়ে মহলে গুঞ্জন। চোখে মুখে ভয়ঙ্কর ভীতির ছাপ—কি হল দেশটাতে! এমন দেশ উচ্ছন্নে যায়—হায়, আর সর্বনাশ হতে কি বাকি! সকলে চুপচাপ এখন জেগে বসে আছে। কেউ সে রাতে আর ঘুম যেতে পারল না।

শচীন্দ্রনাথ, বড় মিঞা, মনজুর এবং নরেন দাস নিচের দিকের পাটাতনে। ওপরের দিকের পাটাতনে অলিমদ্দি, গৌর সরকার, প্রতাপ চন্দের দুই ছেলে। সকলের হাতে বৈঠা। আর ওপরে আকাশ। মেঘলা আকাশ ক্রমে কেমন পাতলা হয়ে আসছে। থেকে থেকে হাওয়া উঠছে। সবগুলি দাঁড় এক সঙ্গে উঠছে, নামছে। দ্রুতবেগে প্রায় ঘণ্টায় দশ বিশ ক্রোশ তারা পাড়ি জমাতে পারে এখন। হালে মনজুর শক্ত হয়ে বসে থাকল। এই অসম্মান এখন যেন শুধু নরেন দাসের নয়—একটা জাতির, মনজুর মুখচোখ রাঙা করে হাঁকল—জব্বইরা, তুই মুখে চুনকালি মাখাইলি।

সেই বড় নৌকার সন্ধানে ওরা চরের মুখে এসে থামল। কোথায় নৌকা! কোন চিহ্ন নেই নৌকার। চারিদিকে শুধু জল, চুপচাপ ওরা জলের ওপর দাঁড় তুলে বসে থাকল। না নেই, কোথাও নেই। আদিগন্ত জলের ভিতর ইতস্তত মাছের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। ধানখেতে দুটো একটা বালিহাঁসের শব্দ। শচীন্দ্রনাথ তখন বলল, নাও ইবারে দক্ষিণে ভাসাও।

সামনে গজারি গাছের বন! মাথার ওপর গজারি গাছের অন্ধকার। নিচে জল, কোথাও বুক জল, কোথাও হাঁটু জল আর কোথাও ঝোপ জঙ্গল

জলের নিচে অরণ্য সৃষ্টি করে রেখেছে। নৌকা গাছের ফাঁকে ফাঁকে জলের ভিতর ঢুকলে, ওরা প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না। জলের ভিতর জোনাকিরা জ্বলছে। কত হাজার লক্ষ্য, যেন এক আলো-অন্ধকারময় জগৎ। এমন আলো-অন্ধকারে ওরা কিছুই দেখতে পেল না। নরেন দাস বলল, আনধাইরে আর কারে খোঁজবেন?

কিছু পাখি ডাকল। চুপচাপ সকলে যেন আড়িপাতার মতো ভাব। এদিকটাতে কোন গ্রাম নেই, অনেক দূরে নৌকা বাইলে সুন্দরপুর গ্রাম। ওরা যত বন-জঙ্গলের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে তত ক্রমে সব শব্দ মরে আসছে। পাতার খসখস শব্দ হচ্ছে না। নিচে জল বলে, পাতা খসে পড়লে শব্দ হচ্ছে না। এত বড় গভীর বনে আগাছা নেই, বেতের ঝোপঝাড় চারদিকে ছড়ানো, মাথার ওপর হাজার রকমের লতা ঝুলছে। ভয়াবহ এই অন্ধকারে, যদি কোন আলো জ্বলতে দেখা যায়, যদি অন্য কোন নৌকার শব্দ কানে ভেসে আসে। কারণ দ্রুত পালাবার মতো পথ এখানে নেই। বরং রাত কাটিয়ে দেবার জন্য এই গজারি গাছের বন। আঁধারে আঁধারে এই বন পার হলে মেঘনা নদী। নদীতে পাল তুলে দিলে ঠিক যেন আত্মীয়স্বজন যায়। অথবা নদীতে কার নৌকা ভেসে যায়, কেবা তার খোঁজ রাখে। এই গজারির বনে ওরা তন্ন তন্ন করে মালতীকে খোঁজার চেষ্টা করল। ওরা ফিসফিস করে কথা বলছিল। দুটো একটা গজারি গাছের পাতা ঝরে পড়ছে। জলে জলে সেই পাতা ভেসে ভেসে অন্ধকারে নদীতে নেমে যাচ্ছে। ওরা সেই পাতা অথবা পাখপাখালির ডাকের ভিতর নিজেদের আত্মগোপন করে রাখল। ওরা এভাবে বনের ভিতর বড় নৌকার সন্ধানে থাকল।

না নৌকা, না সেই গুনাইবিবির গান। এমন হারমাদ মানুষ কি করে মালতীর মতো এক জবরদস্ত যুবতীকে হাফিজ করে দিল।

শচীন্দ্রনাথ কেমন বিপর্যস্ত গলায় বলল, নাও নদীতে ভাসাইয়া দ্যাও। বড় নাও জলে জলে দূরে চইলা গ্যাছে।

—জব্বর, যুবতী কি কয়!

—কিছু কয় না মিঞা।

—কিছু না কইলে পার পাইব ক্যামনে?

—ইট্টু সবুর করেন মিঞা।

—সকাল হইতে আর যে দেরি নাই জব্বর।

জব্বর এবারে পাটাতনে উঠে দাঁড়াল। নৌকা এবার গজারি বন পার হয়ে নদীতে পড়েছে। মেঘনা নদী উত্তাল। ক্রমে নদীর সব বড় বড় বাউড় অদৃশ্য

হয়ে যাচ্ছে। নৌকা চালাবার নির্দিষ্ট কোন পথ নেই। শুধু জলে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা এবং ধরে আনা যুবতীকে বশ করা। হিন্দু রমণী—সুন্দরী যুবতী মাইয়া মালতীরে বশ করে শহরে নিয়ে যাওয়া। সবুর সয় না পরানে—হেন কাজ কে করে! সবুর না সইলে জোর জবরদস্তিতে হেনস্থা করবে মিঞাসাব। কিন্তু ছইয়ের ভিতর যায় কার সাধ্য। মালতী এখন সাপ বাঘের মতো। ভিতরে গেলেই ছুটে কামড়াতে আসছে। কখনও হিক্কা উঠছিল। কখনও পাগলের মতো চিৎকার করছিল, আর ভয়ে দু' কসে থুথু জমছে। গলা কাঠ। হাত-পা বাঁধা মালতীর। হাত-পা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। তবু এই যুবতী ছইয়ের ভিতর গড়াগড়ি দিচ্ছে। কখনও চুপচাপ পড়ে থাকছে। চার মাঝি, মিঞাসাব তার দুই সাকরেদ আর জব্বর। জব্বর মাঝে মাঝে ঢুকে যাচ্ছে ছইয়ের ভিতর। বশ করার কথাবার্তা বলছে। আখেরে এই মহাজন মানুষ মালতীকে ঘরের বিবি করে ফেলবে। দুই চারদিন নৌকায় নৌকায় ঘুরে বেড়ানো, গায়ে পায়ে হাওয়া বাতাস লাগানো, তারপর ঘরে ফিরে যাওয়া। এমন বর্ষার দেশে এসে গেলে মন আর মানে না। উথাল পাথাল কইরা মন নদীর চরে ছুইটা যায় কেবল। আর এমন শরীর নিয়ে জলে পুড়ে থাক কে কবে হয়! জব্বর এখন পয়সার লোভে মাতালের মতো রংদার বাঁশি বাজিয়ে যাচ্ছে কানের কাছে—মালতী দিদি, উঠেন, কথা কন, জলপানি খান। আসমান ছ্যাখেন, কত বড় নদীতে নাইমা আইছি ছ্যাখেন। গতরে দিদি আগুন জ্বালাইয়া বইসা আছেন. ইবারে আগুনে পানি ছ্যান। বলতে বলতে দড়াদড়ি খুলে দিচ্ছে। খুলে দিলেই এমন যুবতী মাইয়া ভালমাইনসের ঝি বইনা যাইব। আশায় আশায় জব্বরের এখন চক্ষু চড়কগাছ।

গলুইর দিকে তিনজন লোক। ডোরাকাটা লুঙ্গি পরনে, কালো গেঞ্জি গায়। পয়সার লোভে জব্বর মালতীকে করিম শেখের নৌকায় তুলে আনল কারণ জব্বরের দুটো তাঁত না হলে চলছে না। করিম শেখ মেলায় মালতীকে দেখেছে। মেলাতে মালতীর রূপ দেখে তাজ্জব বনে গেছে। এখন তো এই সময়—মেলাতে দাঙ্গা হয়ে গেছে। দাঙ্গার সময় মেলাতে করিম শেখ দলবল নিয়ে সারা মেলা ছুটে বেড়িয়েছে, মালতী কোথায়! কোথাও সে মালতীকে খুঁজে পায় নি, সেই থেকে নেশার মতো জব্বর নারানগঞ্জের গদিতে সুতা আনতে গেলেই বলত, কিরে জব্বইরা, তর দিদি কি কয়?

—কেবল আপনের কথা কয়। পয়সা খসানোর তালে ছিল জব্বর।

—আমার কথা ক্যান কয় রে! আমারে চিনে।

—চিনব না আপনেরে! কয়, মালতী দিদি কয়, হা রে, জব্বইরা, মেলাতে যে তর লগে সুন্দর মত মানুষটা ছ্যাখলাম, মানুষটা কেডারে—

—তুই কি কইলি!

—কইলাম খুব মেহেরবান মানুষ। জবরদস্ত আদমি। নাম করিম। নারানগঞ্জ শহরে তারে চিনে না এমন কেডা আছে!

—এত বড় কইরা দিলি আমারে!

—দিমু না! আপনে কত বড় মানুষ, কন!

—আর কি কইলি?

—কইলাম সোনার মানুষ।

—শুইনা কি কয়?

—কয় সোনার মানুষের বুঝি সখ থাকে না।

—তুই কি কইলি?

—কইলাম সখ থাকে না কি কন! সখ সুখ সব থাকে।

তারপরই একরাতে গদিতে বসে করিম বলল, রাইতে আঁখিতে ঘুম থাকে না রে, জব্বর! য্যান এক স্বপ্নের হুঁরী উইড়া উইড়া আসে।

—হুঁরী! কেমন চোখ বড় বড় করে দিল জব্বর। শুধু হুঁরী বললে যেন অসম্মান করা হয় মালতীকে। হুঁরী পরী বশ মানে। মালতী দিদি আমার আসমানের তারা। আসমানের তারা খসাইতে ম্যাও লাগে। এই বলে জব্বর একটা বড় অঙ্কের টাকার আভাস দিতে চাইল।

—কত ম্যাও লাগে?

জব্বর প্রথম চারখানা তাঁত কিনতে কত টাকা লাগতে পারে ভেবে নিল। তারপর বলল, হাজার টাকা।

—হাজার টাকায় হুঁরী পরী আসমানের তারা সব এক লগে কিনন যায় মিঞা।

—একটা কিনতে কম লাগে তবে! বুঝি ফসকে গেল সব, সে ঢোক গিলে বলল, কম লাগে তবে!

—লাগে না?

—তবে লাগুক। ছ্যান যা মনে লয়।

জব্বর শেষ পর্যন্ত দর-দাম করে পাঁচশত টাকা নিল। বাকি খরচপত্র করিমই সব করবে কথা থাকল। নৌকা, মাঝি, এবং রাত-বিরাতের ফুর্তি সব করিম শেখের খরচে। প্রথম ভেবেছিল করিম নৌকায় নিজে থাকবে না, কিন্তু কেন জানি ওর অবিশ্বাস জন্মে গেল, হারমাদ জব্বর, কোনদিকে শেষে নাও ভাসাবে কে জানে—তবে তার আসমানের তারাও যাবে, নগদ টাকাও যাবে। শেষ পর্যন্ত সে নৌকায় পর্যন্ত উঠে এল।

জব্বর টাকার লোভে, দুই তাঁত করে তাঁতি হবার লোভে সময়ে-অসময়ে গ্রামে চলে আসত। খরচ করত দু'হাতে, ফেলুকে নিয়ে সলাপরামর্শ করত, আর যাদের সে এ-অঞ্চল দেখাতে এনেছিল—কত বড় অঞ্চল ছ্যাখেন মিঞারা.

এই অঞ্চলে আমার মালতী দিদি বাড়ে দিনে দিনে, তারে লইয়া যান সাগরের জলে। মালতীকে দূর থেকে দেখাবার সময় যাদের সে এমন বলত, তারা সবাই করিম শেখের লোক। দিনক্ষণ দেখে, সময় বুঝে—যখন রঞ্জিত গ্রামে নেই, যখন আনধাইর রাইত এবং যখন কেউ বলে না দিলে বোঝা দায়—কার নৌকা, কেবা এল নদীর চরে, তখন কাজটা হাসিল করতে সময় লাগবে না। সামসুদ্দিনও এখানে নেই। সে ঢাকা গেছে। সুতরাং এ-সময়েই কামটা হাসিল কইরা ফ্যালতে হয়, এমন পরামর্শ দিল ফেলু। ফেলু বিনিময়ে দুই কুড়ি দশ টাকা পেল। বিবি আন্নু তার ডুরে শাড়ি পেল। কথা ছিল, ফেলুর বিবি সঙ্গে যাবে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফেলু রাজী হয় নি। তার সাহস হয় নি। ধরা পড়ার ভয়ে ফেলু এতটুকু হয়ে গেছিল।

এখন সূর্য উঠছে। মৃদুমন্দ বাতাস পালে খেলছে। ভোরের সূর্য নদীর বুক থেকে প্রায় ভেসে ওঠার মতো। মেঘনা নদীর প্রবল ঘূর্ণির ভিতর নৌকা পড়ে না যায়—মাঝিরা খুব সন্তর্পণে বৈঠা চালাচ্ছে। হাল ধরে আছে। ছইয়ের দু'দিকে কাঠের দরজা। ভিতরটা ঘরের মতো। ঠিক যেন এক পান্সী নাও। ভিতরে কথাবার্তা হলে গলুই থেকে বোঝা দায়। ছইয়ের ভিতর মালতী ফোঁপাচ্ছে। জব্বর উবু হয়ে বসে আছে পাশে—এবং ঠিক সেই আগের মতো রংদার বাঁশি বাজিয়ে চলেছে। ফেলুর বিবি নৌকায় থাকলে এখন সুবিধা হত। দশ কুড়ি দশ টাকা দিতে রাজী, তবু বিবিটাকে ফেলু আসতে দেয় নি। যদি বশ না মানাতে পারে, বনের বাঘ খাঁচায় ঢুকে যদি হালুম-হালুম করতে থাকে কেবল—তা হলে কি যে হবে না! জব্বরের মুখ ভয়ে শুকিয়ে আসছে। সুতরাং জব্বর মরিয়া হয়ে পায়ের কাছে বসে বলল, দিদি ওঠেন। দুধ গরম কইরা দেই, দুধ খান। বল পাইবেন গায়ে গতরে।

কে কার কথা শোনে! মালতী এখন পাটাতনে ঝড়ো কাকের মতো। চোখে-মুখে কলঙ্কের ছাপ। চোখের নিচে এক রাতে কি ভয়ঙ্কর কুৎসিত কালো দাগের চিহ্ন। হাতে-পায়ে এখন দড়ি-দড়া নেই। দরজার ফাঁকে সকালের আলো ওর পায়ের কাছে এসে পড়েছে।

জব্বর ডাকল, মালতী দিদি, উঠেন। মুখ ধুইয়া নাস্তা করেন।

মালতী ঘাড় গুঁজে বসে থাকল, যেন ফের বিরক্ত করলে গলা কামড়ে দেবে। জব্বর ভয়ে ভয়ে ছইয়ের ভিতর থেকে বের হয়ে এল। তেজ এখনও মরে নি। মুখ-চোখ মালতীর পাগলের মতো লাগছে।

—কি কয়? করিম শেখ পাটাতনে বসে হুঁকা টানছিল।

—কয় বুড়া মাইনসের জান, সামলাইতে পারব ত!

—কি যে কও! বয়স কত আমার! এই দুই কুড়ি মোতাবেক।

—তা যখন পারেন, তখন সব ঠিক হইয়া যাইব।

হুঁকা টানতে টানতেই বলল করিম, তুমি যে কইলা, তোমার দিদি আমার কথা কয়, এহনে ত ত্থাখছি, দিদি তোমার পাগলের মত বইসা আছে।

—আরে না মিঞা! বনের বাঘ খাঁচায় উঠাইলে তা ইট্টু এমন করে। বশ মানতে সময় লাগে।

—বশ না মানাইতে পারলে নদী-নালায় আর কয় রাইত ঘুরবা? কবে থাদি ছাইড়া বাইর হইছি। বড় বিবি কয়, কই যান মিঞা?

—কি কইলেন?

—কইলাম মৎস্য শিকারে যাই। নদী-নালার ত্থাশ, পানিতে ভাইসা গ্যাছে যদি ম্যাঘনার পানিতে টাইন মাছ পাই। একটু থেমে কলকের আগুন জলে ফেলে দিলেই ফস করে আগুনটা নিভে গেল। তারপর বলল, মাছ ত বঁড়শিতে আটকাইছে, এহনে মৎস্য ডাঙ্গায় তুলতে পারতেছ না—এডা ক্যামন কথা।

—ডাঙ্গায় তুইলা ফ্যাললে আর থাকলটা কি কন? দুই চারডা লম্ফঝম্ফ। তারপর খতম। পাঁজ দোয়ারে আপনের মিষ্টি কথা ভাইসা বেড়াইব। বনের বাঘ বশ মানলে মিঞা তখন আবার ক্যান জানি সখ যায়—শিকারে গ্যালে হয়। ভাল লাগে না, পানিতে স্বাদ-সোয়াদ থাকে না। মনটা তখন আপনের আবার মৎস্য শিকারে যাইতে চায় না মিঞা? বলে জব্বর বলল, তামুক সাজি।

—সাজ। তামুক খাইয়া সুখ পাইলাম না।

এই খাল-বিলের দেশে করিম শেখ মুখটা ভোঁতা করে বসে থাকল। নৌকা কোন গঞ্জের পাশ দিয়ে যাচ্ছে না। খাদ্যদ্রব্য যা ছিল সব শেষ। ঘুরে-ফিরে—যতদিন না মালতীর প্রাণে বিশ্বাস জাগে ততদিন এই খালবিলে এবং নদীর মোহনাতে ঘুরে বেড়াতে হবে। এখন শুধু ভাল ব্যবহার, জবরদস্তির কাজ নয়। একমাত্র সরল অকপট ব্যবহারই মালতীকে আপনার করে নিতে পারবে। এই ভেবে করিম শেখ বলল, মনের ভিতর এক পঙ্খী বাস করে জব্বর।

—তা করে মিঞা।

—পঙ্খীটা উড়াল দিতে চায় মিঞা। কি যে চায় পঙ্খী! পঙ্খীরে তুমি কি চাও? নূতন বিবির জন্য মন কেমন উদাস হইয়া যায়? পানির স্রোতে বিড়াল ভাসে—অ মন তুমি এক মাঝি। মনে পড়ে জব্বর জবরদস্ত বিবি হালিমা—তারে বশ মানাইতে কয়দিন লাগছিল। তোমার মনে থাকনের কথা না রে, কি যে ভাবি। কেমন ছাড়া ছাড়া কথা মনের কোণে জেগে উঠছে করিমের। এখন যেন সে কত উদার মোতাবেক মানুষ। সরল ব্যবহারের চিহ্ন ওর মুখে। দেখলে মনেই হবে না—করিমের ভিতরের মানুষটা বড় কুটিল, সর্পিল স্রোতের মতো। মুখে মনে এক ছবি এখন করিমের। যা খুশি মনে লয় কর, গঞ্জের ঘাট থাইকা ইলিশ কিনা নেও। পদ্মার ইলিশ, মেঘনার ইলিশ। তারপর জলে জলে ভাইসা

যাও। আর পাটাতনে বসে ইলিশ মাছের ঝোল, গরম ভাত এবং নদীর জলে ময়ূরপঙ্খী নাও ভাসাও। বড় লোভ আমার, যেন বলার ইচ্ছা করিম শেখের। হিঁদুর মেয়ে, যৌবন যার বিফলে যায় এমন যুবতী মাইয়ারে লইয়া ঘর করতে সখ যায়।—অ যুবতী, পরানে তরি কি কষ্ট, তুই ক্যামন কইরা যৌবন বাইন্দা কাইন্দা মরস, তরে লইয়া যামু সাগরের জলে, ভাবতে ভাবতে করিম শেখ ফুরৎ ফুরৎ করে দু'বার ধোঁয়া ছেড়ে দিল আকাশে। তারপর হুঁকাটা জব্বরকে দিয়ে বলল, টান মিঞা, পরান ভইরা সুখটান দ্যাও! বলে, কেমন হামাগুড়ি দিয়ে চৌকাট পার হতে চাইলে জব্বর খপ করে দু ঠ্যাং জড়িয়ে ধরল, আরে মিঞা সাব, করতাছেন কি!

—কি, করতাছি কি!

—সাপ লইয়া খেলা করতে চান?

—সাপের বিষদাঁত ভাইঙা দিতে চাই।

—খুব সোজা মনে হইছে!

—তা মনে হইছে।

—সুতা বিচাকিনার মত মনে হইছে!

—হইছে।

—মিঞা, এত সোজা না!

—সোজা কিনা দ্যাখি। বলে সে হামাগুড়ি দিয়ে দরজা অতিক্রম করে ছইয়ের ভিতর ঢুকে গেল। এবং লেজ গুটিয়ে শেয়াল যেমন তার গর্তের ভিতর নিরিবিলি বসতে চায়, সে তেমনভাবে একটু তফাতে নিরিবিলি বসল। মালতীকে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঘাড় গুঁজে বসে আছে মালতী। নৌকায় তুলে আনতে জোর জবরদস্তি করতে হয়েছিল বলে শরীরের নানা জায়গায় ক্ষত। এবং রক্তের দাগ। অথবা কেউ যেন শরীরের সর্বত্র আঁচড়ে খামচে দিয়েছে। সে যেন ভালবাসা দিচ্ছে তেমনভাবে হাত রাখতে গিয়ে দেখল, গলুইর মাঝি এদিকে তাকাচ্ছে। সে পাল্লাটা এবার ঠেলে ভেজিয়ে দিল। লালসায় এখন মানুষটার জিভ চুকচুক করছে। পদ্মফুলের মতো তাজা, গোলাপের মতো কোমল এবং স্নিগ্ধ অথবা লাবণ্যময় শরীরে যেন যৌবন কেবল নদীর উজানে যায়। করিম শেখ উত্তপ্ত লোহার ওপর হাত রেখে দ্রুত সরিয়ে নেবার মতো বার দুই ছুঁতে চেষ্টা করল, বার দুই কপালে হাত রেখে ভালবাসা দিতে চাইল। মালতী এখন কেমন ভালমানুষের ঝি হয়ে গেছে। করিমকে কিছু বলছে না। এবার সাহস পেয়ে করিম একেবারে রাজা-বাদশার মতো হাকল, চরে নাও বান্দ মিঞারা। ইলিশের ঝোলে ভাত খাইয়া লও। তারপরই পাটাতনে যুবতী মালতীর সঙ্গে করিম শেখ এক খেলায় মেতে যাবে এমন চোখ মুখ নিয়ে ছইয়ের বাইরে এসে নদীর চরে তাকাতেই কাঁশবনের ভিতর

বড় এক কুমির ভেসে উঠতে দেখল বুঝি। কুমিরটা ভিতরে ভিতরে এত বড় হাঁ খুলে রেখেছে ভাবতেই করিমের মুখে রক্ত এসে গেল।

চরে নাও বেঁধে ইলিশ মাছের ঝোল, ভাত। গ্রাম অনেক দূরে। নদীর দক্ষিণপাড়ে, কাশবন পার হলে আস্তানাসাবের কবরখানা। কতদূরে এখন এইসব জমি এবং মাঠ চলে গেছে। সামনে হোগলার বন। জল ক্রমে কমতে কমতে ডাঙার দিকে উঠে গেছে। সূর্য ক্রমে মাথার ওপর উঠে আসছে। ওরা পাটাতনে বসে খেল। মালতী কিছু খেল না। চুপচাপ মালতী নদীর জল দেখছে। ওরা তখন সবাই অন্যমনস্ক। করিম নামাজ পড়ছে।

মালতী আর ফিরতে পারছে না। কোথায় ফিরবে! ওকে হারমাদ মানুষেরা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। সে রঞ্জিত অথবা অন্য কোন মুখ এ-সময় মনে করতে পারছে না। মাথার ভিতর কি জ্বালা যন্ত্রণা। থেকে থেকে অসহায় আর্তনাদ। সে হায়, কি করবে এখন? কোথায় যাচ্ছে, তার কি ইচ্ছা, সে কে, কেন এমন করে চুপচাপ বসে আছে? কিছু কি তার করণীয় নেই। এত বড় নদী, নদীর জল—এই অতল জলে ঠাঁই হবে না জননী, বলে সবাই যখন ঝোল ভাত খেতে ব্যস্ত করিম যখন নিবিষ্টমনে নামাজ পড়ছে তখন মালতী জলে লাফ দিল। জয় মা জাহ্নবী, জননী মা তুই, তর বুকে ভেসে গেলাম। কোথায় কি করে স্রোতের মুখে পড়তেই নিমেষে দূরে গিয়ে ভেসে উঠল মালতী। মাঝিরা সকলে নাস্তা ফেলে হৈহৈ করে উঠল। জব্বর প্রমাদ গুণে তাড়াতাড়ি জলে লাফ দিয়ে পড়ল। মাঝিরা দাঁড় খুলতে গিয়ে দেখল, গিঁট লেগে গেছে, ওরা তাড়াতাড়ি দাঁড় খুলতে পারছে না। মালতী স্রোতের মুখে ভেসে অনেকদূর চলে গেছে। মালতী কখনও ডুবে যাচ্ছে কখনও ভেসে উঠছে। করিম পাটাতনে দাঁড়িয়ে হাঁকল, সেই এক হাঁক এ-অঞ্চলের, কে ডুইবা যায়! করিম নৌকা স্রোতের মুখে ছেড়ে দিলে মালতী চরের বুকে হোগলার জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ল।

নৌকাটা স্রোতের মুখে কচ্ছপের মতো ভেসে যাচ্ছিল। সামনে কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু জলের ঘূর্ণি। ডানদিকে চর, চরের বুকে ধানখেত। সকলে ভাবল, জলের নিচে বুঝি মালতী ডুবে গেছে। কিন্তু বর্ষায় মালতী সোনালী বালির চর পার হয়ে যেত, ঘূর্ণিতে মালতী ডুবে ডুবে বালিমাটি তুলে আনত নদীর বুক থেকে। সেই মালতী জলে ডুবে যাবে জব্বর বিশ্বাস করতে পারল না। সে নৌকায় উঠে চারিদিকে তাকাল। পাশে শরবন। শরের মাথা ফাঁক করে যেমন মাছ নদীর জলে সাঁতার কাটে তেমন এক মানুষ যেন শর বনে সাঁতার কাটছে।

জব্বর চিৎকার করে উঠল, ঐ যায় দ্যাখেন!

মাঝিরা বলল, মাছ, মিঞা, মানুষ না!

করিম বলল, হ মাছ, বড় মাছ। মাছের পিছনে এখন ছোটা ভাল না।

করিম বরং সতর্ক দৃষ্টি রাখছে মাঝনদীতে। কারণ ভয় করিমের—একবার এই নদী পার হয়ে গেলে জেল হাজত করিমের। ঘরে তুলে না নিতে পারলে, নদীর জলে, শরবনে, যেখানে থাকুক, মাথায় মালতীর লগির বাড়ি, তখন জলের তলায় ডুবে যাবে মালতী! খাল বিল নদীর জলে কে কবে ভেসে যায় কে জানে! বর্ষার জল, এমন জলে যুবতী নারী ডুবে মরলে আত্মহত্যার সামিল হবে। করিম বলল, কইরে মিঞা যুবতী মাইয়া কই?

জব্বর কিন্তু সেই শরবনের দিকে তাকিয়ে আছে। বন ক্রমে ডাঙার দিকে উঠে গেছে। সেখানে এতবড় নাও ভাসালে চড়ায় নাও আটকে যাবে। এবং সেখানে শুধু এখন কাদা জল, কি করবে জব্বর! এই অসময়ে আল্লার বান্দা কে এমন আছে ধইরা আনে যুবতী মাইয়ারে—জব্বর রাগে দুঃখে এখন চুল ছিঁড়তে থাকল। এবং যেদিকে শরবন কাঁপছে অথবা নড়ছে সেদিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকল। আর সহসা দেখতে পেল, শরবন পার হয়ে মালতী অন্ধের মতো কবরখানার দিকে উঠে যাচ্ছে। করিম পাগলের মতো হাহা করে হাসতে থাকল। পথ হারাইছে যুবতী মাইয়া, যুবতীর সন্ধানে চল। সে এবার লাফ দিল। জব্বর দেখাদেখি লাফ দিয়ে জলে ভেসে গেল। করিমের সাকরেদ পর্যন্ত লোভে লালসায় জল সাঁতরাতে থাকল। যতদূর চোখ যায় শুধু জল, মনুষ্যবিহীন এই বনে জঙ্গলে একটা শশকের পিছনে একদল নেকড়ে যেন দ্রুতবেগে ছুটছে। সামনে সেই ডাঙা। আস্তানাসাবের দরগা, আর চারিদিকে গভীর জল। দূরে কতদূরে গেলে যেন লক্ষ যোজন দূরে মানুষের বসতি। এই ডাঙায় আটকা পড়লে নির্ঘাত মালতী পাগল হয়ে যাবে। অথবা ঝোপ জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে যদি কোনরকমে পাঁচ সাত মাইল নদীর উজানে ভেসে গিয়ে লোকালয়ে উঠতে পারে তবে জব্বর, তোমার জেল হাজত। তোমার দুই তাঁতের বোনাবুনি শেষ। লোভ লালসা শেষ। যত দ্রুত পালাচ্ছে মালতী তত দ্রুত ছুটছে জব্বর, করিম, ওর সাকরেদ। শর বনের ভিতর দিয়ে ছুটছে। শরীর কেটে রক্ত পড়ছে। ওদের এখন অমানুষের মতো দেখাচ্ছিল। ভূতের মতো অথবা প্রেতের মতো যেন শ্মশানভূমিতে নৃত্য করে বেড়াচ্ছে।

মানুষজনের সাক্ষাৎ এ-অঞ্চলে চোখে পড়বে না। দু' দশ ক্রোশের ভিতর প্রায় লোকালয়বিহীন এই অরণ্য, বনজঙ্গল এবং যে পরবে দরগায় মোমবাতি জ্বালানো হয়, সে পরব বাদে মানুষ এ-পথে কেউ আর আসে না। এই অরণ্যের ভিতর যেন মৃত এক জগৎ-সংসার চুপচাপ প্রকৃতির খেলা দেখে চলছে। আর আসে দশ-বিশ ক্রোশ দূর থেকে মানুষ, মৃত মানুষ। ইন্তেকালে মানুষ এসে এই কবরখানায়, অরণ্যের ভিতর আশ্রয় নেয়। এবং দরগার কবরে ইন্তেকালের সময় শোনা যায়—আল্লা এক, মহম্মদ তার একমাত্র রসুল।

এখন সূর্য আকাশে পশ্চিমের দিকে হেলে পড়তে শুরু করেছে। ওরা তিনজন হোগলা বনে ঢুকেই কেমন দিশেহারা হয়ে গেল। কারণ কোন শব্দ পাচ্ছে না। জলে কাদায় মানুষ ছুটলে একরকমের ছপছপ শব্দ হয়, সেসব শব্দ চুপচাপ কেমন মরে গেছে। ওরা সেই শব্দ শুনে এতক্ষণ ছুটছিল। বাতাসে শরবন কেঁপে যাচ্ছে। ঝোপে জঙ্গলে কত সব কীটপতঙ্গ এবং পোকামাকড়। বর্ষার জন্য সাপের ভয়। এই অঞ্চলে বিষধর সব সাপ, মাঠে এবং নদীর চরে গ্রীষ্মের দিনে যারা ঘুরে বেড়াতো তারা জলের জন্য সব উঁচু জমিতে উঠে যাবে। অথবা ঝোপে জঙ্গলে ঘাসের মাথায় জড়াজড়ি করে পড়ে থাকবে। আর জলজ ঘাস, জোঁক এবং এক ধরনের ফড়িংয়ের ভয় আর প্রায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই—এই এক যুবতী এসে ওদের তিনজনকে বনের ভিতর কাদায় ঘুরিয়ে মারছে। যত ঘুরে মরছে তত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে জব্বর এবং পাগলের মতো চিৎকার করছে করিম, অশ্লীল সব কটূক্তি। দড়িদড়া খুলে না দিলেই হত। এখন কি করা। হায় এমন পদ্মফুলের মতো যে মালতী সে এখন কোথায়! এখন প্রায় ফাঁসির আসামীর মতো মুখ নিয়ে খোঁজাখুঁজি। ছুঁতে পারল না ভাল করে, সাপ্টে ধরতে পারল না, সাপ্টে ধরে সোহাগে কচুপাতার মতো নরম চুলে হাত ঢুকিয়ে হায়, সে কিছুই করতে পারল না। সব বিফলে গেল, ভাবতেই করিম নিজের মূর্তি ধারণ করল এবার। একেবারে জানোয়ারের মতো মুখ। বলল, হালা, তুমি আমারে গরু ঘোড়া পাইছ। বলেই সে এক লাথি মারল জব্বরের পাছাতে। সঙ্গে সঙ্গে জব্বর ভয়ে ভয়ে বলল, আসেন মিঞা। মনে হয় উত্তরের ঝোপে জলে কাদায় মানুষ হাঁইটা যায়। আসেন।

না আর না! জব্বর মনে মনে কসম খেল। পেলেই সাপ্টে ধরবে। ইজ্জতের মাথা খাবে। করিম ভাবল, না আর না। আর সোহাগ দেবে না। পেলেই জানোয়ারের মতো লাফিয়ে পড়বে ঘাড়ে। টানা হ্যাঁচড়া, টানতে টানতে ঝোপের ভিতর ফেলে, ভাবতেই করিমের চোখমুখ নেশাখোরের মতো দেখাচ্ছে। যা হয় হবে, একবার মাটির ভিতর আবাদের চারা তুলে দিতে পারলে জমি তার, কার হিম্মত আর বলে, জমি তোমার না মিঞা, জমি আমার। সে এবং জব্বর সাকরেদ নাদির হন্যে হয়ে ছুটছিল এবং ছুটতে ছুটতে মনে হল সন্ধ্যায় মালতী ডাঙায় উঠে গেছে। ওরা ডাঙায় উঠে কবরখানার ঝোপ জঙ্গলে ওৎ পেতে থাকল। মালতী একা একা এই সাদা জ্যোৎস্নায় অরণ্যের ভিতর পথের উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়ালে খপ করে ধরে ফেলবে।

মালতী অভুক্ত। সারাক্ষণ শরবনের ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে অবসন্ন। সে এই অরণ্যের ভিতর ঢুকে দেখল দর দর করে রক্ত পড়ছে। গোটা শরীর কেটে গেছে। গায়ে কাপড় নেই। সেমিজ ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে। কোথায় কোন জঙ্গলের লতায় পাতায় বেতঝোপের ভিতর ওর কাপড় এখন নিশানের মতো উড়ছে কে জানে। ওর হুঁশ ছিল না। সেমিজের একটা দিক ফালা-

ফালা। সে টলতে টলতে নির্জন বনভূমিতে ঢুকে আহত হরিণ যেমন তার শরীর ঝোপের ভিতর টেনে নেয়, সন্তর্পণে চুপচাপ পড়ে থাকে, মালতী তেমনি নিজেকে ঝোপের ভিতর অদৃশ্য করে দিল। ওপরে সাদা জ্যোৎস্না। সামান্য সময় এই জ্যোৎস্না আকাশে থাকবে। তারপর ক্রমে কেমন ক্ষীণ এক শব্দ উঠে আসছে মনে হল; নদীর জলে শব্দ। পাড়ে ঢেউ ভাঙার শব্দ। সহসা ঝোপে জঙ্গলে কোন অতর্কিত শব্দ শুনলে সে আঁৎকে উঠছে। ক্রমে সে নিস্তেজ হয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল সে মরে যাচ্ছে। দূরে দূরে সে হরিণীর দ্রুত ছুটে যাওয়ার শব্দ পেল। দূরে দূরে আকাশে এক ভেলার মতো রঞ্জিতের মুখ, মুখের ছবি, দুই চোখ রঞ্জিতের ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে। মালতী ক্রমে এ-ভাবে সংজ্ঞা হারাচ্ছে বুঝতে পারছিল। আর ঠিক তক্ষুণি দেখল ওর পায়ের কাছে তিন যমদূতের মতো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। ওকে তারা নিতে এসেছে। সে এবার যথার্থই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল ভয়ে। কিছু খচমচ শব্দ, হরিণ হরিণীর দ্রুত পালানোর শব্দ এবং জলে ঢেউ ওঠার শব্দ—সারারাত সংজ্ঞাহীন মালতীর কোমল শরীরে পাশবিকতার সাক্ষ্য রেখে মালতীকে মৃত ভেবে কবর ভূমিতে ফেলে অন্ধকারে ওরা সরে পড়ল। সকাল হতে না হতেই শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে যুবতীকে। কেউ টের পাবে না, বনের ভিতর এক যুবতী মাইয়া মইরা পইড়া আছে।

সোনা সারা রাত ঘুমের ভিতর স্বপ্ন দেখল, সেই এক বড় সমুদ্র যেন, বালিয়াড়িতে কারা একটা বড় কাঠের ঘোড়া টানতে টানতে নিয়ে এল। কি উঁচু আর লম্বা ঘোড়া! মানুষগুলো চলে গেলেই সে দেখতে পেল, ঘোড়াটা কাঠের নয়, ঘোড়াটা তাজা ঘোড়া—ওর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে। সে একা ছিল না, কমলা অমলা যেন সঙ্গে আছে। ঘোড়াটা ওর কাছে এসে ঠিক পায়ের কাছে শুয়ে পড়ল—যেমন মুড়াপাড়ার হাতিকে সেলাম দিতে বললে অথবা হেঁট-হেঁট বললে হাঁটু ভেঙে শুয়ে পড়ে তেমনি ঘোড়াটা এসে ওর সামনে হাঁটু ভেঙে শুয়ে পড়ল। সে, কমলা এবং অমলা পিঠে চড়তেই ঘোড়াটা ছুটতে থাকল। ঠিক বালিয়াড়ির শেষে সমুদ্রের প্রায় হাঁটু জলে নেমেই ঘোড়াটা আবার কেমন কাঠের হয়ে গেল—নড়ছে না। সে, অমলা কমলা নামতে পারছে না। ক্রমে ঘোড়াটা উঁচু হতে-হতে একেবারে আকাশ সমান হয়ে গেল। মেঘ ফুঁড়ে এত উঁচুতে উঠে গেছে যে, নিচের কিছুই ওরা দেখতে পাচ্ছে না। সে মুঠো মুঠো মেঘ ছিঁড়ে খেতে থাকল, কি মিষ্টি আর সুস্বাদু। ঠিক মেলাতে সে যেমন আঁশ-আঁশ চিনির তৈরি তুলোর বল ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খেত, সে ঘোড়ার পিঠে উঠে তেমনি সেই মেঘ ছিঁড়ে, মোয়ার মতো হাতে নিয়ে গোল করে করে অমলা কমলাকে দিতে থাকল। আর তখন নিচের দিকে তাকাতেই মনে হল, কারা যেন সেই হাজার লক্ষ হবে, পিলপিল করে ঘোড়ার পা বেয়ে উঠে আসছে। ঠিক যেন ওদের স্বর্গে ওঠার সিঁড়ি মিলে গেছে। সে এখন কি করবে ভেবে পেল না। হাতের কাছে আকাশ। আর একটু পৌঁছাতে পারলেই আকাশ চিরে মাথা গলিয়ে দিতে পারবে, এবং দেব-দেবীদের রাজত্বে কার্তিক গণেশ অথবা শিবঠাকুর কিভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছেন, দেখতে পাবে। কিন্তু কি আশ্চর্য, যেই না এমন ভাবা, ঘোড়াটা আবার ছোট হতে হতে একটা ছোট্ট খেলনা হয়ে গেল। সে, কমলা অমলা এখন সেই খেলনার ঘোড়া বুকে নিয়ে সমুদ্রের বালিয়াড়িতে উঠে আসছে এবং উঠে আসার মুখেই মনে হল, বড় জ্যাঠামশাই আশ্বিনের কুকুর নিয়ে হেঁটে হেঁটে নদীর পাড়ে চলে যাচ্ছেন। সহসা জ্যাঠামশাই বিরক্তিতে চিৎকার করে উঠলেন, গ্যাৎচোরেৎশালা! সঙ্গে-সঙ্গে সোনার এমন সুন্দর স্বপ্নটা ভেঙে গেল। ওর মাথার কাছে, ঠিক জানালায় শরতের সূর্য সোনালী জলের রঙ যেন, ওর পায়ের নিচে সূর্যের আলো। সে ধড়ফড় করে উঠে বসল।

প্রথম সে বুঝতেই পারল না কোথায় সে আছে। ওর মনে হচ্ছিল, সে বাড়িতে আছে। এবং বিছানায় শুয়ে স্বপ্ন দেখছে। এখন মনে হল, এটা কাছারিবাড়ি। এটা মেজ-জ্যাঠামশাইর বিছানা। সে মেজ-জ্যাঠামশাইর

পাশে শুয়ে ঘুমিয়েছে। সে এবার ভাল করে চোখ মুছল। অমলা কমলার কথা মনে হল। ওরা এখন কোথায়? তারপর রোদ উঠলে সে দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল। জ্যাঠামশাই কোথায়? এত বড় কাছারিবাড়িতে কেউ নেই। সকলেই যেন নদীর পাড়ে চলে গেছে। দরজা পার হলে বারান্দা। বারান্দার পর সবুজ মাঠ। আর দীঘির দক্ষিণ পাড়ে বড় মঠ। সোনা গতকাল মঠ দেখতে পায় নি। সোনা বস্তুত রাত হলে এদিকটায় এসেছে। অমলা কমলা ওকে জ্যাঠামশাইর কাছে দিয়ে গেছে। বাড়ির উত্তরে থাকলে বোঝাই যায় না দীঘির পাড়ে এত বড় এক মঠ আছে। শুধু ছাদের ওপর যখন সে দাঁড়িয়েছিল, অমলা কমলা বলেছে, মঠের সিঁড়িতে একটা শ্বেতপাথরের ষাঁড় আছে। ষাঁড়ের গলায় মেথিফুলের মালা। আর সেই ছাদের অন্ধকারটা এখন যেন ওর কাছে এক রহস্যময় জগৎ। ঘুম থেকে উঠেই পূজার বাজনা কানে আসছিল। অর্জুন নায়েব নদী থেকে স্নান করে ফিরছে। রামসুন্দর কাঁধে লাঠি নিয়ে কোথাও যাবে বোধ হয়। লালটু পলটু এখন কোথায়? এ-বাড়িতে এসে বড়দা মেজদাকে সে দেখতেই পাচ্ছে না। ওরা কোথায় আজ শিকারে যাবে। সকাল সকাল হয়তো নদীর চরে শিকারের জন্য বের হয়ে গেছে। আর তখনই মনে হল মাঠ পার হয়ে দীঘি, দীঘির ওপারে এক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। সে যেন চিনতে পারছে মানুষটাকে, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছে না। অস্পষ্ট। লম্বা এবং স্থির, প্রায় যেন সমুদ্রের বালিয়াড়িতে সেই ট্রয় নগরীর কাঠের ঘোড়া, শহরের দিকে মুখ করে তাকিয়ে আছে। সোনা দাঁড়াল না। ঠিক স্বপ্নের মতো, যেন স্বপ্নটা হুবহু মিলে যাচ্ছে। সে পাগলের মতো ছুটতে থাকল। অর্জুন নায়েব বলল, সোনা, কোনখানে যাইতাছ। তোমার জ্যাঠামশায় নদীতে সান করতে গ্যাছে। কে কার কথা শোনে এখন। সে মাঠ পার হয়ে, হরিণেরা যেখানে থাকে, তাদের নিবাস পার হয়ে, ময়ূরের ঘর ডাইনে ফেলে, ফুল-ফলের গাছ পার হয়ে এক ছায়াস্নিগ্ধ ঝাউগাছের নিচে এসে দাঁড়াল। আবার ঘাড় তুলে দেখল। ঠিক মিলে যাচ্ছে কিনা। কারণ সে বিশ্বাসই করতে পারছে না। এদিকটায় বিচিত্র সব দেশী-বিদেশী ফুলের গাছ, ঝোপ-জঙ্গলের মতো জায়গা, সে গাছের ডালপাতা ফাঁক করে দেখল সব ঠিকই আছে। দীঘি থেকে যা স্পষ্ট দেখতে পায় নি, এখানে এসে স্পষ্ট হয়ে গেল। সে আবেগে ছুটতে ছুটতে ডাকল, জ্যাঠামশয়। বড় জ্যাঠামশয়। আমি সোনা। জ্যাঠামশয়, জ্যাঠামশয়। কি আকুল আবেগ! সে পড়ি-মরি করে ছুটছে! তার সেই আপন মানুষ মিলে গেছে। সে দেখল কুকুরটা পর্যন্ত সোনাকে দেখে আনন্দে লেজ নাড়ছে। জ্যাঠামশাই এতটুকু চোখ তুলে তাকাচ্ছেন না। হাতে-পায়ে ধানপাতার কাটা দাগ। জলে জলে হাত-পা সাদা হয়ে গেছে। কখনও ঘুরে ঘুরে, কখনও জলে জলে কুকুর নিয়ে তিনি একলাই বুঝি বের হয়ে পড়েছেন।

সোনা কাছে যেতেই কুকুরটা ডেকে উঠল, ঘেউ। এই সেই কুকুর, কবে থেকে বাড়ি উঠে এসেছে, বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, বড় অবহেলাতে এই কুকুর সংসারে বড় হচ্ছে। যা-কিছু উচ্ছিষ্ট থাকে, এই কুকুর খায়। বাড়িতে যে কুকুরটা থাকে বোঝাই যায় না। কেউ আদর করে না, কিন্তু এখন এই আশ্বিনের কুকুর সোনার কাছে কত মূল্যবান। তার কত নিজের জিনিস এসে গেছে। সে আর এখন কাকে ভয় পায়! সে, যেমন ট্রয় নগরীর বালকেরা কাঠের ঘোড়া টানতে টানতে শহরের ভিতর টেনে নিয়ে গিয়েছিল, তেমনি সে এই মানুষকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। এত দূরে এসেই পাগল মানুষের কেমন যেন লজ্জা এসে গেছে প্রাণে। সে যেতে চাইছে না ভিতরে। কারণ এত বড় বাড়ি দেখে বুঝি তার সেই দুর্গের কথা মনে পড়ে গেছে! একদিন সে একটা কালো রঙের টাই পরেছিল। পলিনের উক্তি, তুমি নীল রঙের টাই পরবে মণি, তুমি সাদা অথবা কমলা রঙের টাই পরবে, কালো রঙ দেখলে তোমার মতো মানুষকে কেমন নিষ্ঠুর মনে হয়। অথবা যেন এই যে তার বসন-ভূষণ এমন প্রাসাদের মতো বাড়িতে তা মানায় না। সে চারিদিকে তাকাতে থাকল। জলের লাল মতো শ্যাওলা, যেন মানুষ নন তিনি, এক জলের দেবতা, নানা রকম শ্যাওলা এবং গাছ লতাপাতা জলের, শরীরে গজিয়ে উঠেছে। সোনা টানতে-টানতে নিয়ে যাবার সময় দীঘির সিঁড়িতে জ্যাঠামশাইকে বসাল। সে অঞ্জলিতে জল তুলে এনে শরীর থেকে শ্যাওলা, লতাপাতা পরিষ্কার করে দিতে থাকল। পাগল মানুষ যেন এই সিঁড়িতে পাথরের এক মূর্তি, বসে বসে আকাশ দেখছেন। চোখ না দেখলে বোঝাই যায় না মানুষটার ভিতর প্রাণ আছে।

দীঘির অন্য পাড়ে কমলা বৃন্দাবনীর সঙ্গে পূজার ফুল তুলছে। ফুল তুলতে তুলতে দেখল, সিঁড়িতে সোনা কি যেন করছে। একবার লাফিয়ে লাফিয়ে জলে নামছে আবার উঠে যাচ্ছে। সিঁড়ির শানে এক মানুষ, সোনা মানুষটার শরীরে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। পাশে এক কুকুর। সে সোনার সঙ্গে ঘাটে বার বার এসে নামছে আবার সোনার সঙ্গে সিঁড়ি ধরে উঠে যাচ্ছে। কি এত কাজ করছে নিবিষ্ট মনে সোনা! কমল ছুটতে থাকল, সে সেই সব হরিণ অথবা ময়ূরের ঘর পার হয়ে সবুজ গালিচা পাতা ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটল। তারপর সিঁড়িতে এসে দেখল, সোনা হাঁটু গেড়ে মানুষটার শরীর থেকে কি সব বেছে বেছে দিচ্ছে। সে দেখল, সোনা শ্যাওলা বেছে দিচ্ছে। শাপলা-শালুকের পাতা বেছে দিচ্ছে। মানুষটা কে! কমলা যে এসে পাশে দাঁড়িয়ে আছে, উঁকি দিয়ে দেখছে, আশ্চর্য চোখে কুকুর এবং এই পাথরের মতো মানুষকে দেখছে—সোনা তা দেখেও কোন কথা বলছে না। কমল বাধ্য হয়ে বলল, কে রে সোনা?

—আমার জ্যাঠামশয়।

—তোর জ্যাঠামশাই।

—আমার বড় জ্যাঠামশয়।
—কথা বলে না!
—না।
—বোবা!
—না।
—তবে কথা বলে না কেন?
—কথা বলে —শুধু বলে গ্যাৎচোরেৎশালা।
—আর কিছু বলে না?
—না।
—এ মা, একি কথা রে। শুধু গ্যাৎচোরেৎশালা বলে।
সোনা আর উত্তর করল না। সোনা নিবিষ্ট মনে হাত পা থেকে শেষ শাপলা-শালুকের পাতা, দাম এবং জলজ ঘাস তুলে বলল, ওঠেন জ্যাঠামশয়।
কমল বলল, জলে ভিজে গেছে কেন?
সোনা বলতে পারত, সাঁতার কেটে জ্যাঠামশাই এসেছে। ওরা ওকে নিয়ে আসে নি। তিনি কুকুর নিয়ে চলে এসেছেন।
—তোর জ্যাঠামশাই পাগল!
সোনা রেগে গেল। বলল, হ, কইছে! পাগল কে কইছে!
—তবে কথা বলে না কেন!
সোনার কেন জানি ভীষণ রাগ হচ্ছিল। জ্যাঠামশাইকে পাগল বললে সে স্থির থাকতে পারে না। সে যেন তাড়াতাড়ি কমলের কাছ থেকে জ্যাঠামশাইকে নিয়ে দূরে সরে যেতে চাইল। তখন কমল বলল, আসুন দাদু। আমি সোনার পিসি হই। সোনা আমি তোর পিসি হই না রে?

এবার যেন সোনা খুব খুশী। বলল, আমার কমল পিসি জ্যাঠামশায়।
মণীন্দ্রনাথ কমলকে দেখল। চোখ নীল কেন এ-মেয়ের। সে হাঁটু গেড়ে বসল। যেন কোন দৈত্য এখন হাঁটু গেড়ে বসে পুতুলের মতো ছোট্ট এক মেয়েকে দু' হাতে তুলে চোখের কাছে নিয়ে এল। বলতে চাইল, তুমি কে মেয়ে! তোমাকে যেন চিনি!

এমন যে ডাঁহাবাজ মেয়ে তার চোখ পর্যন্ত ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল। সোনা ভিতরে ভিতরে মজা পাচ্ছিল। সে প্রথম কিছু বলল না, কিন্তু দেখল কমল কেঁদে দেবে, সে বলল, ভয় নাই কমল। বলে সে জ্যাঠামশাইর দিকে তাকাল। আর তক্ষুনি সেই মানুষ, যেন মন্ত্রের মতো চোখ সোনার, চোখে রাগ, এতটুকু ছেলের এমন চোখে দেখে মণীন্দ্রনাথ কমলকে নামিয়ে দিল। হয়তো কমল ছুটে পালাত, কিন্তু সোনা কি নির্ভীক এখন, কমল নিজেকে খুব ছোট ভাবল সোনার কাছে। সোনা এতটুকু ভয় পাচ্ছে না, সে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এত বড় মানুষ

সোনার একান্ত বশংবদ, সোনার ভয়-ডর নেই, কমলেরও ভয়-ডর থাকল না। সে বাঁ হাতটা ধরল, সোনা ডান হাত ধরেছে। কুকুরটা আগে আগে যাচ্ছে।
ট্রয়ের ঘোড়া নিয়ে নাটমন্দিরের সামনে ঢুকতেই প্রায় একটা সোরগোল পড়ে গেল। সেই মানুষ এসেছে আবার এই দেশে। পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ হাবাগোবা মুখ নিয়ে নাটমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে দুর্গাঠাকুর দেখতে থাকল। আর বাড়ির আমলা-কর্মচারী, ছোট-ছোট বালক-বালিকা এমন কি মেজবাবু এসে গেলেন। তিনি ভূপেন্দ্রনাথকে ডাকতে পাঠিয়েছেন। বল গিয়ে ভূঁইঞাকাকাকে, ওঁর বড়দা এসেছেন। শান্তশিষ্ট বালকের মতো মানুষটা এখন দাঁড়িয়ে দুর্গাঠাকুর দেখছেন। ওপরে ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। তিনি ঘুরে-ফিরে সব দেখতে থাকলেন।
সোনা বলল, দুগগাঠাকুররে নম করেন।
মণীন্দ্রনাথ একবারে সটান হয়ে শুয়ে পড়ল। কেউ যেন ওঁকে আর এখন তুলতে পারবে না। দু' হাত সামনে সোজা। বালকেরা হাসাহাসি করছে। সোনার এসব ভাল লাগছে না। সে এখন পারলে এখান থেকেও নিয়ে সরে পড়তে চায়। মেজবাবু অর্থাৎ অমলা কমলার বাবা ধমক দিলেন। সামনে কেউ দাঁড়িয়েছিল বোধ হয়, কর্মচারী কেউ হবে—মেজবাবু সকলকে চেনেন না—এই পূজার সময়ে দূর দেশের সব কাছারিবাড়ি থেকে নায়েব-গোমস্তারা চলে আসে, সঙ্গে পূজা-পার্বণের জন্যে আখ, কলা, দুধ, মাছ যে অঞ্চলে যার যা কিছু শ্রেষ্ঠ, পূজার সময় সব নিয়ে হাজির হয় ওরা। ওদের একজনকে বললেন, ভূঁইঞাকাকা এখনও আসছেন না কেন দেখ তো!
পাগল মানুষ তেমনি সোজা সটান। প্রণিপাতের মতো শরীর শক্ত। সোনা দেখল, জ্যাঠামশাই সোজা হয়ে শুয়ে আছেন। সোনা বুঝতে পারল, না বললে তিনি উঠবেন না। সে এবার নুয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, উঠেন জ্যাঠামশয়। আর নম করতে হইব না। বলে হাত ধরতেই তিনি উঠে পড়লেন। ভিজা কাপড়ে সব কাদা-মাটি লেগে আছে।

ভূপেন্দ্রনাথ এসে তাজ্জব। মণীন্দ্রনাথ ভূপেন্দ্রনাথকে দেখেই সোনার দিকে তাকান। কি হবে সোনা! ছাখছ মানুষটা আমার দিকে কিভাবে তাকাচ্ছে! সোনার দিকে তাকিয়েই মণীন্দ্রনাথ বিষণ্ণ হয়ে গেলেন। যেন তাঁর মনেই ছিল না, এখানে ভূপেন্দ্রনাথ থাকে। এখানে এলে তাঁকে ভূপেন্দ্রনাথের পাল্লায় পড়তে হবে। তিনি এবার হাঁটতে চাইলেন। ভূপেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি হাত ধরে ফেলল। কোথায় কোনদিকে আবার চলে যাবে, ভূপেন্দ্রনাথ হাত ধরে রাখল। সে এবার সকলকে চলে যেতে বলল। ভিড় করতে বারণ করে দিল। সে প্রশ্ন করল না কি করে এই মানুষ এত দূর চলে এসেছে! বোধ হয় সাঁতার কেটে চলে এসেছে। কি যে পারে না এই মানুষ, সে ভাবতে-ভাবতে নিজের

ভিতর কেমন দুঃখে ডুবে গেল। দুর্গাঠাকুরের দিকে মুখ তুলে তাকাল, মা, মাগো, বলার ইচ্ছা। দুর্গাঠাকুর বড় বড় চোখে দুই ভাইকে দেখতে দেখতে বুঝি হাসছিল। সে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে পড়তে চাইল, কারণ সে জানত, নাটমন্দিরের দোতলায় জাফরি কাটা অন্দরে এখন শতেক চোখ পর্দার আড়াল থেকে নিশ্চয়ই ওঁকে দেখছে—এমন সুপুরুষ মানুষকে দেখে নিশ্চয়ই ওরা হা-হুতাশ করছে। কি চেহারা তাঁর! গৌরবর্ণ। লম্বা এবং শিশুর মতো সরল। নাবিক যেমন সমুদ্রে পথ হারিয়ে বিষণ্ণতায় ভোগে, এখন এই মানুষের চোখে তেমনি এক বিষণ্ণতা। ভূপেন্দ্রনাথের এসব ভেবে কেন জানি চোখে জল এসে গেল।

জোটন সকাল থেকেই মুখ গোমড়া করে বসে আছে। আসমানে চাঁদ দেখলে, নীল আকাশ দেখলেই টের পায় জোটন, শরৎকাল এসে গেছে। এখন দুর্গাপুজার সময়। এই দরগায় বসেও তা টের পাওয়া যায়। দরগা তো নয়, য্যান বিশাল বনের ভিতর বনবাসী জোটন। দু' সাল থেকে, কি আরও বেশি হবে—সে বাপের ভিটাতে যেতে পারছে না। ফকিরসাব নিয়ে যাচ্ছে না। শরৎকাল এলেই আকাশে চাঁদ বড় হয়ে দেখা দেয়। সারা রাত এই বনের ভিতর জ্যোৎস্না ছড়ায়। আকাশের দিকে তাকালেই মনের ভিতর কেমন করে! প্রতাপ চন্দের বাড়িতে দুগ্‌গা ঠাকুর, ঠাকুরের মুখ-চোখ এবং নাকে নথ সব সে বসে বসে মনে করতে পারছে। মনে হলেই ভিতরটা কেমন করে। কতবার ফকিরসাবকে বলেছে, দ্যাশে লইয়া যাইবেন? মানুষটা তখন রা করে না। দিন-দিন ফকিরসাবের শরীর ভেঙে আসছে। আর বুঝি সে বাপের ভিটাতে ফিরে যেতে পারবে না। মানুষটার কাছে দরগার এক কোণে ছোট ছইয়ের মতো নিবাসের যেন তুলনা নেই। ছইয়ের ভিতর বসে ফকিরসাব কেবল হুঁকা খায় আর কি সব বয়াৎ বলে, যা জোটন আদৌ বোঝে না। বাংলা করে দিলে জোটন কেবল হাসে।

—ফ্যাক-ফ্যাক কইরা হাসেন ক্যান?

—হাসলাম কই আবার!

—আপনে হাসলেন না?

—ঠিক আছে। হাসি পাইলে আর হাসমু না। বিমর্ষ মুখ নিয়ে সে বসে থাকল।

ফকিরসাব বলল, মন খারাপ ক্যান।

জোটন উত্তর করছে না।

—কি, কথা কন না ক্যান।

—কি কমু কন?

—যা মনে লয়।

—মনে লয় দ্যাশে যাই।

—দ্যাশে গিয়া থাকবেন কই? আপনের ভাইজান ত আবার সাদি করছে। নতুন মানুষ আপনেরে চিনতে পারব?

—চিনতে পারব না ক্যান? গ্যালে ঠিকই চিনতে পারব।

—বড় দূর যে! এত দূর নাও বাইতে পারমু?

—নাও জলে জলে মাঠে পড়লে না হয় আমি লগি ধরমু।

—মাইনষে দ্যাখলে কি কইব? বলেই ফকিরসাব আবার কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। পেটের ভিতরটা মোচড়াচ্ছে।

শরৎকাল বলে ঝোপ-জঙ্গলে এখন কীট-পতঙ্গ বাড়ছে। শরৎকাল বলে জলে এখন পচা গন্ধ উঠতে থাকবে। কারণ নদী-নালা, ঝোপ-জঙ্গল থেকে জল নামতে থাকলেই, ঘাস শ্যাওলা দাম সব পচে যাবে। দরগার চারপাশে শুধু হোগলার বন। বনের ফাঁকে কোন পথ নেই এখন।

দরগায় আসতে হলে নৌকা ঠেলে ঠেলে নিয়ে আসতে হয়। দরগার পুবে বড় নদী মেঘনা, মেঘনার পাড়ে-পাড়ে এই বন নিশুতি রাতে নির্জন অরণ্যের মতো চুপচাপ। এমন কি কোন কীট-পতঙ্গের ডাকও ভয়াবহ লাগে। চারপাশে বড় বড় রসুন গোটার গাছ, অশ্বত্থ গাছ আর নিচে তার হাজার বছর ধরে অঞ্চলের কবরখানা। কোথাও ভাঙা মসজিদ ভাঙা কুয়ো, বেদি। জীর্ণ অন্ধকূপের মতো সব ছোট-ছোট ইঁটের কোঠা, কোন-কোনটা মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। আর লতাপাতা, গাছ-গাছালি এত ঘন যে, দু' পা যেতে লতাপাতায় জড়িয়ে যেতে হয়। একটা সরু পায়ে হাঁটা পথ গ্রীষ্মের দিনে দেখা দেয়। বর্ষাকালে কেউ আর বনের ভিতর ঢুকতে চায় না। জলের কিনারে কবর দিয়ে চলে যায়। মানুষের ইন্তেকালের সময় কিছু মানুষজন চোখে পড়বে, দু' ক্রোশ পথ হাঁটলে ক'ঘর বসতি আছে। পারতপক্ষে এদিকে কেউ মাড়ায় না। ওখানে এক ফকিরসাব আছে, দুঃসময়ে শুধু দোয়া ভিক্ষার জন্য সাবের কাছে চলে আসে মানুষ। জমিতে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলে ফকিরসাব ঝোপ-জঙ্গল ভেঙে নিচে নেমে মালা-তাবিজ যখন যা দরকার প্রয়োজন মতো দিয়ে আসেন। মানুষেরা কেউ বনের ভিতর এক অলৌকিক ভয়ের জন্য ঢুকতে চায় না। পাশে একটা লম্বা খাল আছে। মৃত অজগর সাপের মতো খালটা নিশিদিন শুয়ে থাকে। বর্ষাকাল এলে এই খাল জেগে ওঠে, কিছু উজানি নৌকা পথ সংক্ষিপ্ত করার জন্য এই খালে উঠে আসে। খাল দিয়ে যায়, আর আল্লা অথবা ঈশ্বরের নাম নিতে নিতে কোন রকমে এই কবরখানা ভয়ে-ভয়ে পার হয়ে যায়।

মানুষ মরলে ফকিরসাবের পরবের মতো উৎসব। ফকিরসাব তখন দু' গণ্ডা মতো পয়সা পান। পান খান। আর মালাতাবিজ গলায় ঝুলিয়ে

আল্লা এক রহমানে রহিম বলতে-বলতে সেই মৃত মানুষটার চারপাশে ঘুরতে থাকেন। কখনও বনের ভিতর লুকিয়ে নানা রকমের খেলা দেখাতে ভালবাসেন অর্থাৎ কবরখানায় মৃত মানুষ এলেই ফকিরসাবের কেরামতি বেড়ে যায়। কালো আলখেল্লাতে পা পর্যন্ত ঢেকে, গলায় লাল নীল হলুদ রঙের রসুনগোটার মতো বড়-বড় পাথর ঝুলিয়ে, চোখে কালো সুর্মা টেনে এবং মাথায় ফেটি বেঁধে মনে হয় তখন এক পীর এসে গেছে। সাদা কোঁকড়ানো চুল তার। উর্ধ্বমুখী বাহু তার। চাপ দাড়িতে রসুন গোটার তেল চপ-চপ করছে। যারা কবর দিতে এল, দেখল এক মুসকিলাশানের লম্ফ হাতে নিয়ে বনের ভিতর কে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লোকগুলি ভয়ে কাঠ হয়ে গেলে বনের ভিতর থেকে মুসকিলাশানের লম্ফ নিয়ে সহসা উদয়। মনে হবে তখন তিনি যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এসেছেন। তারপর যার যা খুশি—দু' গণ্ডা পয়সা এবং যার ইন্তেকাল হল তার কিছু তৈজসপত্র মিলে গেলে এই মানুষের অন্নসংস্থান। জোটন তখন ছইয়ের ভিতর বসে মানুষটার এই কেরামতি দেখে ফিক ফিক করে হাসে। দিনের বেলাতেও কালো আলখেল্লাতে হাজার জায়গায় তালি মারতে-মারতে জোটন মানুষটার নাচন-কোদন দেখে। তখন দেখলে কে বলবে এই মানুষ নিরীহ জীব, কে বলবে অপকট সরল এই মানুষ প্রকৃতপক্ষে ভিতু লোক। অথচ অন্নসংস্থানের জন্য কবরে মানুষ এলেই এই মানুষ অন্য মানুষ হয়ে যায়। পীর বনে যাবার লোভে মানুষটা সকলের চোখে ভিন্ন-ভিন্ন অলৌকিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া দেখতে ভালবাসে। এই অলৌকিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার জন্য ফকিরসাব দিন-রাত উপায় উদ্ভাবন করেন। আর ইন্তেকালের সময় মানুষের চোখে নিজের খেলা দেখান। রাতের বেলা গাছের মাথায় আগুন জ্বালিয়ে বসে থাকেন।

সুতরাং কোথায় কোন দুর্গোৎসবের জন্য জোটনের প্রাণে দুঃখ জেগে থাকে, বোঝার উপায় থাকে না ফকিরসাবের। সমবৎসর এই দরগায় ছইয়ের ভিতর তিনি শুয়ে থাকেন। সময়ে অসময়ে তিনি রসুনের গোটা কোঁচড় ভরে সংগ্রহ করে আনেন। মাচনের নিচে স্তূপীকৃত রসুনের গোটা। বড় বড় মাটের মতো হাঁড়িতে সব ভিজানো থাকে। ছেঁচা রসুন গোটা জলে পচলে একরকমের ঘন তেল, সেই তেলে ছইয়ের ভিতরকার আলো জ্বলে, মুসকিলাশানের লম্ফ জ্বলে এবং কিছু তেল পাতিলে পাতিলে গাছের মাথায় বসিয়ে রাখেন। সময়ে অসময়ে ইন্তেকালের সময় যারা আসে, তাদের অলৌকিক কিছু দেখাবার জন্য গাছের মাথায় আগুন জেলে বসে থাকেন। আরও কি সব কাণ্ড তার। প্রথমে জোটন হেসে আর বাঁচত না! একটা হাড় রেখেছেন। কিছু জড়িবুটি রেখেছেন। সেই মাঠে দাঁড়িয়ে মানুষ হাঁক পাড়লে—হেই কে আছে, আমি এক নাচারি ব্যারামি মানুষ, তখনই ফকিরসাব যেন অন্য মানুষ হয়ে যান। পীর হবার জন্য তিনি তাঁর সেই মুখস্থ বয়াৎ বলতে বলতে জড়িবুটি নিয়ে মাঠে

নেমে যান। পয়সা চাই সোয়া পাঁচ আনা। দরগার থানে সিন্নি দেবার জন্য এই পয়সা। সেই ফকিরসাব কি করে বুঝবেন, জোটন, যার নিবাস ছিল হিন্দু পল্লীর পাশে, পরবে পার্বণে যে চিড়া কুটে দিত, ধান ভেনে দিত, কেন সে ব্যাজারমুখে কাঠ কুড়াতে বনের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে।

সূর্য উঠবে উঠবে করছে। গাছপালা এত ঘন যে, সূর্য উঠলেও অনেকক্ষণ দেখা যায় না। সূর্যের আলো গাছের ডালপালায় পড়ছে। বড় সন্নিবিষ্ট এই গাছপালা বৃক্ষ। জোটন দু'হাতে বন-ঝোপ-লতা পাতা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। সে অনেকগুলো কবর পার হয়ে খালের পাড়ে নেমে এল। তারপরই সব হোগলার বন। এখন আশ্বিন-কাতিক মাস বলে জলের কচ্ছপ পাড়ে উঠে আসবে। ডিম পাড়বে। এ-অঞ্চলে গ্রাম মাঠ নেই, ধানের খেত নেই, হিন্দু-পল্লী নেই—যে জমিতে নেমে শামুকের খোলে কট করে ধানের ছড়া কাটবে, ডিম নিয়ে ঠাকুরবাড়ি উঠে যাবে। ডিমের বদলে পানগুয়া চেয়ে নেবে। এখানে শুধু এই নির্জনে গাছপালা বৃক্ষ। জোটনের জোরে জোরে ফকিরসাবকে শুনিয়ে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছিল। ফকিরসাব আর নৌকা বাইতে পারে না। ফকির সাব ক্রমে লবেজান হয়ে যাচ্ছে। ফকিরসাব একটা কোড়া পাখি ধরার জন্য বিলের জলে আঁতর পেতে রেখেছিল। কোড়া পাখির কলিজা খেলে গায়ে বল ফিরে আসতে পারে। ফিরে এলেই জোটন বাপের ভিটাতে বেড়াতে যাবে। ভাবতেই মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল। আর মন প্রসন্ন হতেই দেখল, দুটো সাদা পা যেন। হোগলার জঙ্গলে দুটো সাদা পা, কি সুন্দর আর যেন দুর্গাঠাকুরের পা। ওর বুকটা কেঁপে উঠল। পায়ের ওপর সূর্যের আলো চিকচিক করছে। একটা ফড়িং কোত্থেকে উঠে এসে বার বার পায়ের ওপর বসছে। ওপরে গাছপাতা নড়লে ছায়া পড়ছে পায়ে। ফড়িংটা ভয় পেয়ে তখন উড়ে যাচ্ছে। এই রোদ এবং পাতার ছায়াতে মনে হচ্ছিল, পায়ে মল বাজলে যেমন শব্দ দ্রুত বনের ভিতর হারিয়ে যায়, তেমনি এক শব্দ বুকের ভিতর বাজতে বাজতে কোন্ অতলে ডুবে যাচ্ছে জোটনের। জোটন দেখল পা-দুটো এখন যথার্থই দুর্গা-ঠাকুরের হয়ে গেছে। সেই যেন গৌরী, শিবের জন্যে বনবাসে এসে হোগলা বনে লুকিয়ে আছে। অথবা চৈত্র মাসে নীলের উপোসে গৌরী নাচে, নাচের মুদ্রা পায়ে যেন খেলে বেড়াচ্ছিল। জোটন বড় বড় চোখে এ-সব দেখছে এবং এখন কি করবে স্থির করতে পারছে না। সে সামনে এগিয়ে যেতে সাহস পাচ্ছে না। এক যুবতী কন্যার পা দেখা যাচ্ছে। শুধু পা-দুটো, বাকি শরীর হোগলার জঙ্গলে। খুনটুন হবে হয়তো। কিন্তু এই দরগায়, পীরের থানে কার এমন সাহস আছে খুন করে! জোটন কাঁপতে কাঁপতে দু' হাতে হোগলার বন ফাঁক করে দিতেই দেখল, নদীর জলে প্রতিমা বিসর্জন দিলে, দশ হাত-দুর্গাঠাকুর যেমন চিৎ হয়ে থাকে, তেমনি মালতী হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। যেন

অসুরনাশনী। মা-জননী তুই, অ মালতী, তুই চিৎপাত হইয়া পইড়া আছস! চুল খাড়া কইরা, চোখ উর্ধ্বমুখী কইরা পইড়া আছস! তরে নিয়া আইছে কে! সে প্রায় মায়ের মতো শিয়রে বসে মাথাটা কোলে তুলে নিল। বুকে, মুখে এবং শরীরের যেখানে যা-কিছু পুষ্ট সব হাতড়ে দেখল, না প্রাণ আছে। শুধু হুঁশ নেই। নাভির নিচটা কারা সারারাত খাবলে খুবলে খেয়ে গেছে। মৃতপ্রায় ভেবে মালতীকে কারা ফেলে চলে গেছে। শরীরের কোথাও কোথাও দাঁতের চিহ্ন। রক্তের দাগ। সে আর দাঁড়াল না। যেন এক অশ্ব ছুটে যায়, বনের ভিতর দিয়ে জোটন ছুটতে থাকল। আর ডাকতে থাকল, ফকিরসাব, অ ফকিরসাব, গ্যাখেন আইসা পীরের থানে কি হইছে। তাড়াতাড়ি করেন ফকিরসাব! হোগলা বনে কারা দুগ্‌গাঠাকুর বিসর্জন দিয়া গ্যাছে। যেমন দু'লাফে সে ছুটে এসেছিল ফকিরসাবকে খবর দিতে, তেমনি দু'লাফে সে তার ছইয়ের ভিতর থেকে একটা ডুরে শাড়ি বের করে বলল, আপনে আমার পিছনে আসেন।

জোটন একটু দূরে দাঁড়িয়ে, ফকিরসাবকে বলল, কি গ্যাখা যায়?

—দুই পা গ্যাখা যায়।

—কার পায়ের মত!

—দুগ্‌গাঠাকুরের পা য্যান!

—তা'হলে আপনে খাড়ন। বলে জোটন নিজে প্রথম হোগলার জঙ্গলে ঢুকে শাড়িটা দিয়ে মালতীকে ঢেকে দিল। তারপর বন ফাঁক করে ইশারা করে ডাকল, আপনে মাথার দিকটা ধরেন। আমি পা ধরি।

এমন জবরদস্ত লাস টানতে উভয়ের বড় কষ্ট হচ্ছিল। ওরা একটু গিয়েই গাছের ছায়ায় ঘাসের ওপর শুইয়ে রাখছে। আবার টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ফকিরসাব বললেন, বিবি, আপনের দুগ্‌গাঠাকুর, তবে দরগাতে আইসা গেল। গ্যাশে গিয়া আর কাম কি!

জোটন হাঁপাচ্ছিল। সে উত্তর দিতে পারল না। ওর হাত এখন রক্তে অথবা পিচ্ছিল এক পদার্থে চ্যাট চ্যাট করছে। পাতা দিয়ে ঘাস দিয়ে সে-সব মুছে আবার টেনে নেবার জন্য তুলে ধরছে। মাঝে মাঝে মালতীর কাপড়টা লতায়-পাতায় আটকে সরে যাচ্ছে। এমন পুষ্ট শরীর যে সামান্য বাতাস লাগতেই কাপড় উড়ে পড়ে যায়। জোটন ফকিরসাবের দিকে তাকাল। বলল না না, এইটা ভাল না। আপনের চোখ গাছপালার দিকে গ্যান। এদিকে না।

ফকিরসাব বলল, আমি ফকির মানুষ, আমার চোখে দোষের কিছু থাকে না।

জোটন বলল, আপনে পুরুষমানুষ। চক্ষু আপনের এখন গাছপালা পাখি গ্যাখুক।

—আপনের যখন তাই ইচ্ছা...বলে ফকিরসাব চোখ বুজে থাকলে জোটন বলল, কি কইলাম আর আপনে কি করলেন।

—কি কইলেন।

—গাছপালা পাখি গ্যাখতে কইলাম।

—তাই গ্যাখতাছি।

—চোখ বুইজা বুজি গ্যাখা যায়।

—খুইলা রাখলে যা গ্যাখি, বুইজা রাখলে বেশি গ্যাখি।

—তা'হলে খুইলাই রাখেন।

এবার জোটন ডেকে উঠল, মালতী অ মালতী, গ্যাখ কই আইছস। আল্লার বান্দার কাছে আইছস। চোখ মেইলা তাকা একবার। মালতী, মালতী! হুঁশ নেই। সুতরাং জোটন তাড়াতাড়ি কিছু জল এনে চোখমুখে ছিটিয়ে দিল। হুঁশ কিছুতেই ফিরছে না। এখানে রোদ নেই গাছপালা এত নিবিড় যে, সামান্য শিশির পর্যন্ত ঘাসের ওপর পড়তে পারে না। আর একটু যেতে পারলেই ওদের ছই। মাচানে ফেলে পিঠে পায়ে এবং কোমরে গরম জলের সেঁক দিতে পারলে শরীরের ব্যথা মরে আসবে। তারপর সেই বিশল্যকরণীর মতো ফুলের রস—যেখানে যা-কিছু ক্ষত আছে এবং যেখানে যা-কিছু রক্তপাত ধুয়েমুছে রসুনগোটার তেলে ফুলের রস মিশিয়ে লাগাতে পারলে মালতী ফের চোখ মেলে তাকাবে।

ফকিরসাবের কিন্তু কিছুতেই এতটুকু ব্যস্তভাব নেই। হচ্ছে হবে ভাব। কেমন নিরিবিলি এই কবরখানায় দুর্গাঠাকুর আইসা গেল ভাব। সাতে নাই পাঁচে নাই, ফকিরসাবের তাড়াহুড়ো নাই। তিনি মালতীকে মাচানে ফেলে রেখে হুঁকাটা খুঁজতে থাকলেন।

—এখন আপনের হুঁকা খাওয়নের সময়!

—পানিটা গরম করেন। ইত্যবসরে হুঁকা খাই। হুঁকা খাইলে মাথাটা সাফ থাকে।

হুঁকা খাইলে মাথাটা সাফ থাকে এটা ফকিরসাবের কথার কথা। মনের কথা নয়। হয়তো এমনি মানুষটা। শত বিপদেও মানুষটার মাথা গরম হয় না। বেশ রয়েসয়ে বুঝেসুজে হুঁকা খেতে খেতে হাঁকল, কৈ গ, পানি আপনের গরম হইল!

তৈজসপত্র বলতে জোটনের চারটা পাতিল, একটা পিতলের বদনা এবং সামান্য এক ভাঙা আর্শি। বড় মাটের মতো, চারটা জালা আছে রসুন গোটা ভেজানোর জন্য। না হলে তাড়াতাড়ি এক জালা পানি এনে দিতে পারত ফকিরসাব। বদনা করে পানি আনছে জোটন। বর্ষায় পানি বেশি দূরে নয়। ছইয়ের নিচে জল। উনুনে জল গরম হলে জোটন বলল, এদিকে আর আইসেন না।

—ক্যান ! ফকিরসাব হুঁকা খেতে খেতে বলল।

—ক্যান আবার থুইলা কইতে হইব !

—দুগ্‌গাঠাকুরকে আপনে তবে খালি কইরা একলাই দ্যাখবেন।

জোটন কান দিল না। মানুষটার এই স্বভাব। সব জানবে, বুঝবে এবং এত বড় ইমানদার মানুষ, তবু মানুষটা ক্যান, কি হইব দ্যাখলে—আমি ত ফকির মানুষ, আমার কাছে সব সমান এমন বলবে।

জোটন সমস্ত শরীর ভাল করে গরম জলে ধুইয়ে দিল। জোটন সব ধুয়েমুছে মালতীকে আবার সেই বিধবা মালতী করে দিতে চাইল। সংসারে সব চাইলেই হয় না। সব চাইতেও নেই। কেন জানি বার বার মালতীর জন্য সুন্দর এক যুবা পুরুষের মুখ মনে পড়ছিল জোটনের। কবে থেকে মালতীর শরীর খোদার মাশুল তুলছে না—বড় কষ্ট এই শরীরের। ঈষদুষ্ণ জলে গা ধোয়াবার সময় জোটন মনে মনে নানা রকমের কথা বলছিল। কি পুষ্ট শরীর। জোটন হাত দিয়ে মালতীর কোমর থাবড়ে দিচ্ছে। উপুড় করে মালতীর কোমরে জল ঢেলে দিচ্ছে। ডানদিকে বসে ধীরে ধীরে জল ওপর থেকে ঢেলে থাবড়ে থাবড়ে মাজাতে যে সারারাত অমানুষের হাড়হালুম গেছে থাবড়ে থাবড়ে তা ঝেড়ে দিচ্ছে জোটন।

এ-ভাবে মনে হল মালতীর, কারা যেন তাকে একটা বড় জলাশয়ে ভাসিয়ে রেখেছে। শরীরে কে কি যেন মেখে দিচ্ছে। মনে হচ্ছিল, নরম হাত, ভালবাসার হাত—কিন্তু তাকাতে সে সাহস পাচ্ছে না। যেন তাকালেই সেইসব নরপিশাচের মুখ ভেসে উঠবে। সে তবু পালাবার জন্য ধড়ফড় করে উঠে বসলে জোটন চিৎকার করে উঠল, ফকিরসাব আসেন। দ্যাখেন আইসা, মালতীর হুঁশ ফিরা আইছে।

মালতী চোখ খুলে দেখল জুটি ওকে ধরে বসে আছে। কি বলতে গিয়ে চোখমুখ কাতর দেখাল মালতীর। সে বলতে পারল না। সে মাচানে যেন কতকাল পর দীর্ঘ এক মরুভূমি পার হয়ে এক মরূদ্যান উঠে এসেছে। মালতী ফের সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল।

জোটন এবার ফকিরসাবকে উদ্দেশ্য করে বলল, প্যাটটা পইড়া আছে।

—কি দিবেন খাইতে ?

ইট্টু দুধ নিয়া আসেন। গরম কইরা দেই। যদি খায়।

ফকিরসাব দেরি করলেন না। হুঁকা খাবার পর নানা রকমের প্রশ্ন এসে দেখা দিয়েছে। প্রথমত এই যুবতীকে কারা ফেলে দিয়ে গেল। কখন এবং ওরা কতজন ছিল। নানা রকমের সন্দেহ দেখা দিতে থাকল। মালতী ঘরে তার ফিরে যাবে কিনা, থানা-পুলিশ এবং অনেক ঝামেলা এর পিছনে রয়েছে। তিনি ফকির মানুষ। এখানে কতদিন আছেন। এমন ঘটনা এখানে কোন-

দিন ঘটে নি। তবে একবার এক সাধু এসেছিল, ভৈরবী সঙ্গে ছিল। এই দরগায় ক' রাত ওস্তাদের ভোজ খেয়ে বেশ যখন সরগরম, তখন সেই ভৈরবী তিলকচাঁদের সঙ্গে ভিড়ে গেল। ছিল ভৈরবী, হয়ে গেল পদ্মদীঘির ছোটবাবুর বহুরানী। তারপর সাধুবাবাজী বড় একটা রসুনগোটার মগডালে উঠে গলা দিল। ছোটবাবু মাথার ওপর ছিলেন বলে সে-যাত্রা ফকিরসাব থানা-পুলিসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল—কিন্তু এখন, এবারে! ফকিরসাব বড় ঘাবড়ে গেলেন। তবু তিনি মুখ ফুটে কিছু বললেন না। জল ভেঙে বাগের ও-পাশে ওর দুই ছাগলের দুধ দুয়ে আনার জন্য নেমে গেলেন। জল ভেঙে ওপাড়ে গিয়ে উঠবেন।

জোটন মালতীর মাথা কোলে নিয়ে বসে থাকল। বনের ভিতর ডাহুক পাখি ডাকছে। নিচে সেই জল এবং শরবন। যতদূর চোখ যায় সে দেখল বাতাসে সরবন কাঁপছে। শরৎকালের রোদ পাখ-পাখালির মতো উড়ে এসে এই দরগায় এখন নেচে খেলে বেড়াচ্ছে। সামান্য হাওয়া ছিল জলে। কত রকমের লাল নীল ফড়িং উড়ছে। কত রকমের বিচিত্র কীট-পতঙ্গের শব্দ কানে আসছে আর কতকাল আগে ইন্তেকাল হয়েছিল তার বড় সন্তানের—এই কবরভূমিতেই এখন সে সন্তান পাথর হয়ে আছে। যেন মাটি খুঁড়লেই সেই সন্তান বের হয়ে আসবে। জোটন সব ভুলে মালতীকে মায়ের মতো চোখে-মুখে হাত বুলিয়ে দিতে থাকল। চুলে বিলি কেটে দিতে থাকল। সন্তানস্নেহে জোটনের চোখ ফেটে জল আসছিল।

মণীন্দ্রনাথ এত বড় রাজপ্রাসাদের মতো বাড়িতে ঢুকেই মোটামুটি স্বাভাবিক মানুষ হয়ে গেলেন। তিনি এখন সোনাকে সঙ্গে নিয়ে কাছারিবাড়ির উঠোনে পায়চারি করছেন। ভূপেন্দ্রনাথ ট্রাঙ্ক থেকে তার কাপড় খুলে দিয়েছে, পাঞ্জাবি খুলে নিজেই পরিয়ে দিয়েছে। লম্বা মানুষ এবং বলিষ্ঠ বলে জামা-কাপড় সবই খাটো খাটো দেখাচ্ছে। রামপ্রসাদ দেখাশোনার ভার নিয়েছে—কোথায় কোন্‌দিকে একা একা চলে যায় দেখার জন্য রামপ্রসাদ লক্ষ্য রাখছে। অনর্থক এই দেখাশোনার ভার রামপ্রসাদের ওপর। মণীন্দ্রনাথ কেবল কথা বলছেন না এই যা। নতুবা দেখে মনে হবে তিনি ফের তাঁর প্রবাস-জীবন থেকে ফিরে এয়েছেন। এই মনোরম জগতে সোনার হাত ধরে কেবল তাঁর ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছা।

উৎসবের বাড়ি। মানুষজন আত্মীয়কুটুম কেবল আসছে। নদীর ঘাটে কত নাও এখন লেগে আছে। ঢাক-ঢোলের শব্দ নদীর জলে ভেসে যাচ্ছে। জ্যাঠামশাইর হাত ধরে টানতে টানতে সোনা নাটমন্দির পার হয়ে এল। সে মনে মনে কমলকে খুঁজছে। কমল কোথায়! এত বড় বাড়ির ভিতর থেকে কমলকে খুঁজে বার করা কঠিন। সে জ্যাঠামশাইকে ময়ূর দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। ছোট্ট এক চিড়িয়াখানা বাবুদের। ছোট দুটো বাঘ আছে, হরিণ আছে, ময়ূর আছে আর কচ্ছপ আছে। জ্যাঠামশাইকে সেই সব বাঘ দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। কমল সঙ্গে থাকলে বড় ভাল হত। কমল ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলেছে। সারাটা ক্ষণ সে কমলকে কাছে পেতে চায়।

কমলের জন্য সে চারিদিকে তাকাতে থাকল। বারান্দা পার হয়ে গেল। বড় বড় হলঘর পার হয়ে গেল। পরিচিত অপরিচিত মানুষজনের ভিতর দিয়ে সে চলে যাচ্ছে। জ্যাঠামশাই ওকে কেবল অনুসরণ করছেন মাত্র। মাথার ওপরে সেই ঝাড়লণ্ঠন। একটা চড়ুই পাখি ধুতরো ফুলের মতো কাচের জারে ফরফর করে উড়ছে। আর এখন দশটা বাজতে দেরি নেই। বড়দা মেজদা যে কোথায় থাকে! ওরা বড়বাবুর মেজ ছেলের সঙ্গে কোথায় এখন বন্দুক নিয়ে বিলের জলে হাঁস মারতে গেছে। সে কমলকে আর যেন কোথাও খুঁজে পেল না। সে জ্যাঠামশাইকে টানতে টানতে দীঘির পাড়ে নিয়ে এল। জ্যাঠা-মশাইকে বলতে চাইল—আমরা এক নতুন জায়গায় চলে এসেছি। এখানে বড় নদী শীতলক্ষা, চরে কাশবন, দীঘির পাড়ে চিতাবাঘ হরিণ ময়ূর, দূরে পিলখানার মাঠ, ঝাউগাছ, নদীর পাড়ে পামগাছের বন এবং দূরে চলে গেলে বাবুদের অন্য অনেক শরিক এবং তাদের দুর্গাপূজা—জ্যাঠামশাই এই যে দ্যাখছেন, এটা ময়ূর।

দ্যাখেন দ্যাখেন। সে জ্যাঠামশাইকে নিয়ে ময়ূরের খাঁচার পাশে বসে পড়বে ভাবতেই দেখতে পেল, দীঘির পাড় ধরে চন্দ্রনাথ হনহন করে ফিরছে। সোনা সে তার বাবাকে দেখে জ্যাঠামশাইর পিছনে লুকিয়ে থাকল। চন্দ্রনাথ মহালের আদায়পত্রের জন্য বের হয়ে গিয়েছিল, ফলে এ-দু'দিন এদিকে আসতে পারে নি। আজই সে নৌকায় মহাল থেকে ফিরে এসেছে। সোনা, জ্যাঠামশাইকে বাইরে নিয়ে এসেছে সব দেখাবে বলে। সোনা যেন কত অভিজ্ঞ প্রবীণ এবং জ্যাঠামশাই তার হাত ধরে হাঁটছে এমন ভাব। দূরে পিলখানার মাঠ পার হলে আনন্দময়ীর কালীবাড়ি, বাজার-হাট এবং রাতে সেই অদ্ভুত শব্দ—ডায়নামো চলছে। তার ইচ্ছা ছিল সব দেখিয়ে যে ঘরটায় ডায়নামো আছে, সেদিকে জ্যাঠামশাইকে নিয়ে যাবে। কিন্তু বাবাকে দেখেই সে ভয় পেয়ে গেল।

মহাল থেকে ফিরেই চন্দ্রনাথ শুনেছে, সোনা এবার পূজা দেখতে এসেছে। চন্দ্রনাথ নদীর পাড় ধরে হাঁটছিল। সে সোনার মুখ দেখার জন্য কেমন ব্যাকুল হয়ে আছে। দীঘির পাড়ে এসে দেখল, বড়দা মণীন্দ্রনাথ। একা ময়ূরের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মণীন্দ্রনাথকে দেখে চন্দ্রনাথ প্রথমে খুব বিস্ময় মানল। এই পাগল মানুষ একা এখানে দাঁড়িয়ে আছে! আর তিনি এলেনই বা কার সঙ্গে। মেজদা বলে পাঠিয়েছেন কেবল সোনা এসেছে। সুতরাং মণীন্দ্রনাথকে দেখতে পাবে আশাই করে নি। চন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি দাদার দিকে হেঁটে গেল। কাছে যেতেই দেখল পিছনে সোনা বড়দার গায়ের সঙ্গে লেপ্টে আছে।

—তুমি, সোনা, এখানে!

—জ্যাঠামশাইকে ময়ূর দেখাইতে নিয়া আইছি।

—লালটু পলটু কই?

—ওরা পাখি মারতে গ্যাছে।

পূজার ছুটিতে বাবুদের ছেলেরা শহর থেকে চলে আসে। ওরা বন্দুক নিয়ে পাখি শিকারের খেলায় মেতে ওঠে। চন্দ্রনাথ সোনাকে দেখেই কেমন আকুল হতে থাকল। সোনা তার মায়ের মুখ পেয়েছে। এই সময় যেন সেই মা অর্থাৎ দূরের এক গ্রামে, বড় বড় চোখে ধনবৌ নিত্য দিন শ্রম করে চলেছে সংসারের জন্য। দূরবর্তী গ্রামে কোমল এবং সুন্দর এক জননীর মুখ ভেসে উঠলে চন্দ্রনাথ সোনাকে বুকে নিয়ে আদর করতে চাইল। বলল, আয় তরে কোলে লই।

সোনা জ্যাঠামশাইকে আরও জোরে সাপ্টে ধরল। সে কোলে উঠতে চাইল না। কারণ সোনার কাছে এই পাগল মানুষ, চন্দ্রনাথের চেয়ে কাছের মানুষ। সে তার বাবাকে কদাচিৎ দেখতে পায়। বাবা সাধারণত তিন-চার মাস অন্তর বাড়ি যান। অধিকাংশ সময় রাতের বেলা। অধিক রাতে। সোনা টের পায় না। ভোর হলে সে দেখতে পায় বিছানাতে মা নেই। বাবা তাকে বুকে নিয়ে শুয়ে আছে। সোনা প্রথম ছোট ছোট চোখে তাকায়, তারপর

চোখ ক্রমে বড় করে দিলে সে বুঝতে পারে, তার বাবা প্রবাস থেকে ফিরেছেন, আখ, আনারস, যে দিনের যা তিনি নিয়ে এসেছেন। সোনা তখন চুপচাপ ভাল ছেলের মতো শুয়ে থাকলে, বাবা তাকে কত রকমের কথা বলেন, এবার উঠতে হয়, উঠে হাত মুখ ধুয়ে পড়তে হয়। লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে—এমন সব একের পর এক পুণ্যশ্লোকের মতো কথা, কিছু সংস্কৃত উচ্চারণ, ধর্মাধর্মের কথা, সূর্যস্তব আরও কি যেন তিনি এই ছেলে অথবা এই যে সংসার, গাছ ফুল মাটি, এবং গোপাটে অশ্বত্থ গাছ, তারপর দূরে দূরে সোনালী বালির নদী, নদীর চর, সব মিলে বুঝি তার জন্মভূমি, বাবা তাকে জন্মভূমি সম্পর্কে, জননী সম্পর্কে এবং গুরুজনদের সম্পর্কে আচার ব্যবহার শেখাতে শেখাতে গাছপালা পাখিদের ভিতর টেনে নিয়ে যান—সোনার মনে হয় তখন বাবার হাতে আলাদিনের প্রদীপ আছে, তার যা খুশি বাবা তাকে এনে দিতে পারেন। ফলে তার কাছে চন্দ্রনাথ সব সময়ই জাদুর দেশের মানুষ।

চন্দ্রনাথ কেবল সোনার সঙ্গে কথা বলছে, মণীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলছে না, এ-কারণে মণীন্দ্রনাথ বুঝি মনে মনে রেগে যাচ্ছেন। চন্দ্রনাথ বুঝতে পেরে বলল, আপনের শরীর কেমন? বড়বৌদির শরীর? এসব বলা নিরর্থক। তবু কুশল প্রশ্ন না করলে, এত বড় মানুষটা যে এখনও আছেন, এই সংসারে আছেন, যেন না থাকলেই বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগবে, মানুষটাকে শুধু সম্মান দেখানো—মানুষটা আছে বলেই যেন সব আছে। চন্দ্রনাথ এবার সোনাকে বলল, জ্যাঠামশাইকে ধইরা ভিতরে লইয়া যাও। কোন্‌দিকে আবার ছুটব, তখন তুমি ধইরা রাখতে পারবা না।

সোনা জ্যাঠামশাইর হাত ধরে কাছারিবাড়ির দিকে হাঁটছিল। চন্দ্রনাথ যেতে যেতে বলল, তুমি যে পূজা দ্যাখতে আইলা, তোমার মার কষ্ট হইব না!

সোনা বলল, মায় ত আমারে কইল আইতে।

চন্দ্রনাথ ছেলের মাথায় হাত রাখল, রাইতের ব্যালা কিন্তু কাইন্দ না।

সোনা চুপ করে থাকল। জ্যাঠামশাই ওর পাশে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি এখন বাড়ির ভিতরে যেতে চাইছেন না। অথচ চন্দ্রনাথের ইচ্ছা—এই গাছপালা রোদ্দুরের ভিতর সোনা না থেকে এখন কাছারিবাড়িতে চলে যাক। রোদ উঠেছে। এই রোদে ঘুরে বেড়ালে সোনা অসুস্থ হতে পারে। আর এই সোনা যার মুখ দেখলে কেবল ধনবৌর কথা মনে হয়, প্রবাসে সে কতদিন ধরে একা, এই পুজোর সময়ে চলে যেতে পারলে বড় মনোরম, সোনার মুখ দেখে চন্দ্রনাথ বাড়ি যাবার জন্য ভিতরে আকুল হয়ে উঠেছে। এখন বর্ষাকাল বলে আর যখন তখন বাড়ি যাওয়া হয়ে উঠছে না। গেলেই নৌকো করে যেতে হয়। শুকনোর দিনে সে মহালে বার হচ্ছে এই নামে তিনদিনের কাজ একদিনে সেরে বাড়ি চলে যায়, দু'রাত বাড়ি থেকে কাছারিবাড়ি ফিরে আসে, মহালে

আদায়-পত্রের নামে লুকিয়ে চুরিয়ে চলে যাওয়া। কোন ছুটিছাটার বালাই নেই, বাবুদের মর্জি, যাও, দুদিন ছুটি। আবার হয়তো ছ'মাসে কোন সময়ই আর উঠতে পারে না চন্দ্রনাথ। ভূপেন্দ্রনাথ ছোট ভাইর মুখ দেখে ধরতে পারে সব, সে বাবুদের বলে-কয়ে ছুটি করে দেয়। এ ছাড়া মহালের নাম করে চন্দ্রনাথ যখন বাড়ি চলে আসে তখন প্রায়ই খুব রাত হয়ে যায়, নিশুতি রাত। বেলায় বেলায় মহালের কাজ সেরে বাড়িমুখো হাঁটতে থাকে। দশ ক্রোশ পথ হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে চন্দ্রনাথ। নিশুতি রাতে কড়া নাড়লে ধনবৌ টের পায় মানুষটা আর থাকতে পারছে না, চলে এসেছে। ধনবৌ নিজেও কত রাত না ঘুমিয়ে থাকছে, কারণ ধনবৌ বলতে পারে না চন্দ্রনাথ কবে আসবে। দরজায় কড়া নাড়লেই বুকটা আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। খুব চুপি চুপি যেন সোনা টের না পায়, টের পেলেই উঠে বসবে, ঘুমাবে না, সারা রাত বাবা ওর জন্যে কি এনেছে এবং লালটু ওর তক্তপোশ থেকে উঠে এসে বাবার সঙ্গে শুতে চাইবে। ফলে ধনবৌ প্রায় লুকিয়ে দরজা খুলে দেয়। আহা, চন্দ্রনাথ দীঘির পাড় ধরে হাঁটার সময় ভাবল, ধনবৌ নিশ্চয়ই রাতে ঘাটে বাসন মাজতে মাজতে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। দূরের অন্ধকারে লগির শব্দ শুনলে কান পেতে রাখছে। মানুষটা বুঝি নৌকা করে নদীর চরে উঠে আসছে। ধনবৌ নিজেও বুঝি আর প্রতীক্ষা করতে পারছে না। রাতে জানালায় মুখ রেখে জেগে বসে থাকছে। দরজার কড়া বুঝি এক্ষুণি নড়ে উঠবে, চুপি চুপি দরজা খুলেই দেখতে পাবে তার স্বামী চন্দ্রনাথ, শক্তসমর্থ মানুষ, মোটা গোঁফ এবং ভাটা ভাটা চোখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। স্বামী তার পালিয়ে সহবাস করতে চলে এসেছে। ধনবৌ হাত-পা ধোবার জল এবং গামছা নিয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করে চন্দ্রনাথ কি খাবে? চন্দ্রনাথ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কিছু বলে না। শুধু লণ্ঠনের আলো মুখের কাছে নিয়ে যায়। ধনবৌর মুখ দেখতে দেখতে কি যেন সে বলতে চায়। বলতে পারে না। ধনবৌ তখন সব বুঝতে পেরে মিষ্টি মিষ্টি হাসে।

কি সব ভাবছে সে! চন্দ্রনাথ এবার মণীন্দ্রনাথকে বলল, সময় মত সান করবেন। সময় মত খাইবেন। ছুটাছুটি করলে বাবুরা কিন্তু রাগ করব।

মণীন্দ্রনাথ আর দাঁড়াল না। সোনার হাত ছেড়ে হাঁটতে লাগল। সোনা বলল, বাবা, যাই? বলে সে আর বাবার আদেশের অপেক্ষা করল না। সে জ্যাঠামশাইকে ছুটে গিয়ে ধরে ফেলল।

সোনা যেতে যেতে বলল, জ্যাঠামশয় আমি কিন্তু আপনার লগে সান করমু, আপনের লগে খামু। সোনা আরও বলতে চাইল, এই যে দেখছেন দীঘি, দীঘি পার হলে বাঘ আছে, বাঘের বাচ্চা আছে। সেই চিড়িয়াখানাতে নিয়ে যাবার ইচ্ছা এখন সোনার। সে টানতে টানতে বাঘের খাঁচার সামনে নিয়ে দাঁড় করাল। চিতাবাঘের দুটো বাচ্চা, চুকচুক করে দুধ খাচ্ছে। কান খাড়া

করে যেন বাঘদুটো সোনা এবং মণীন্দ্রনাথকে দেখতে থাকল। ডানদিকে হেঁটে গেলে ছোট্ট এক জলাশয়, পাড়ে পাড়ে লোহার রেলিঙ, জলাশয়ে কুমীর। শীতলক্ষার জলে কুমীরের ছা ভেসে এসেছিল। গোলা করে মাছের জন্য ডালপালা এবং ঘাসের ভিতর পচা এক শ্যাওলাভূমি তৈয়ার করে রাখলে এই কুমীর মাছ খেতে ঢুকে আটকা পড়ে গেল গোলাতে। সেই থেকে ছোট্ট কুমীরের জন্য এই জলাশয়। লালটু পলটু বাঘ, হরিণ, ময়ূরের গল্প করেছে, কিন্তু কুমীরের গল্প করে নি। কাল এসেই ওরা কুমীর দেখে এসেছে। সোনা তখন অমলা-কমলার সঙ্গে ছাদে উঠে নক্ষত্র দেখছিল—রাতে শুতে গেলে কাছারি-বাড়িতে এই গল্প। চিড়িয়াখানাতে এবার একটা কুমীর এসেছে। সে জ্যাঠা-মশাইকে, যেন জ্যাঠামশাই এক নাবালক, সোনা বড় মানুষ, সে যাচ্ছে আর কত কথা বলছে, বাঘে কি খায়, ময়ূরে কখন পাখা মেলে দেয়, হরিণেরা কি খেতে ভালবাসে, বাবুদের এইসব হরিণ কোত্থেকে ধরে এনেছে—বিজ্ঞের মতো যা সে এতদিন শুনেছে—এক এক করে বলে যাচ্ছিল।

বাঘের খাঁচার পাশে মণীন্দ্রনাথ সহসা দাঁড়িয়ে গেল। এবং গরাদ ধরে নাড়তে থাকল। সোনা তাড়াতাড়ি ভয় দেখাল মণীন্দ্রনাথকে, জ্যাঠামশয়, বাঘে কিন্তু মানুষ খায়। দুষ্টামি করলে কিন্তু বাঘে লাফ দিব। মণীন্দ্রনাথ সোনার কথা শুনে হা-হা করে হাসতে থাকলেন। তারপর ছাদের দিকে তাকিয়ে সহসা চুপ মেরে গেলেন। সোনা এতদূর থেকেও চিনতে পারল, ছাদে অমলা এসে রোদে চুল শুকাচ্ছে।

মণীন্দ্রনাথ এবার সোনাকে কাঁধে তুলে নিতে চাইল। সোনা জ্যাঠামশাইর কাঁধে উঠল না। বলল, আসেন ছাখি কে আগে যায়। বলে সোনা ছুটতে থাকলে দেখল, পাগল মানুষ ছুটছেন না। ছাদের দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন। অমলার চুল সোনালী রঙের। চোখ নীল। অমলাকে দেখে জ্যাঠামশাই কেমন স্থির হয়ে গেলেন। আর আশ্চর্য এই মানুষ যথার্থই সেই থেকে ভাল হয়ে গেল। সোনাকে তেল মাখিয়ে দিল গায়ে, স্নান করিয়ে দিল। একসঙ্গে খেতে বসল। সোনার মাছ বেছে দিল, এবং বিকেলে হাত ধরে নদীর পাড়ে বেড়াতে গেল।

আর তখনই সোনা দেখল একটা ল্যাণ্ডো গাড়ি আসছে। দুই সাদা ঘোড়া। অমলা কমলা হাওয়া খেতে বের হয়েছে। ওরা সোনাকে দেখে বলল, যাবি সোনা?

—জ্যাঠামশাইরে নিলে যামু।

ওরা গাড়ি থামাতে বলল। জ্যাঠামশাইকে তুলে নিলে সোনা। অমলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর জ্যাঠামশাইর দিকে চেয়ে বলল, আমার বড় জ্যাঠামশয়। কলিকাতায় চাকরি করত।

ওরা সাদা সিল্কের ফ্রক গায়ে দিয়েছে, পায়ে সাদা মোজা, কেডস। মণীন্দ্রনাথের সিল্কের পাঞ্জাবি আর পাট-করা ধুতি, সাদা জুতো। সোনার সোনালী রঙের সিল্ক, সাদা প্যান্ট। পায়ে রবারের জুতো। দুই সাদা ঘোড়া নদীর পাড় ধরে ওদের এখন হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছে। সোনা ঘাটে দেখল, নৌকায় ঈশম বসে মাছ ধরছে। সে চিৎকার করে উঠল, ঈশমদাদা যাইবেন? হাওয়া খাইতে যাইবেন?

সোনার কাছে ছোট-বড় ভেদ থাকল না। যেন এই গাড়িতে উঠে ইচ্ছা করলে সকলেই হাওয়া খেতে যেতে পারে। সে বলল, জ্যাঠামশয়, যাইবেন পিলখানার মাঠে, হাতি ছাখামু আপনেরে? কমল তুমি যাবে?

অমলা বলল, আমিও যাব। কমল, তুই, আমি সোনা। সে এবার পাগল মানুষটাকে দেখল, দেখতে দেখতে বলল, আপনি যাবেন! কিন্তু কোন কথা বলল না বলে জোরে জোরে অমলা বলল, আপনি যাবেন হাতি দেখতে? আমরা কাল ল্যাণ্ডোতে হাতি দেখতে যাব। কালীবাড়িতে যাব। নদীর চরে নেমে যাব। যাবেন!

এত করেও অমলা মণীন্দ্রনাথকে কথা বলাতে পারল না। এমনকি তিনি আজ গ্যাৎচোরেৎশালাও বললেন না। কেবল মাঠ, নদী এবং কাশফুল দেখতে দেখতে ফিরে ফিরে অমলাকে দেখলেন। অমলা উল্টে ওর মায়ের চেহারা পেয়েছে। মণীন্দ্রনাথ অমলার দিকে তাকিয়ে শিশুর মত অভিমান করে আছেন যেন।

আশ্বিনের সূর্য নদীর ওপারে নেমে যাচ্ছে। গাড়িটা এগুচ্ছে। ঘোড়ার পায়ে শব্দ। ঠক ঠক। বেশ তালে তালে, ঘোড়াদুটো যাচ্ছে, সোনা যেন কোথায় কবে একবার এমন দুটো সাদা ঘোড়াকে গাড়ি টেনে নিতে দেখেছে। খুব বরফ পড়েছে, গাছে গাছে পাতা ঝরে গেছে, চারিদিকে বরফের পাহাড়, মাঝে সিঁথির মতো পথ, কে যেন এমন করে তাকে কোথাকার রাজা-রানীর গল্প করেছিল। সোনা এবং মণীন্দ্রনাথ একদিকে, অমলা কমলা একদিকে। নানা রকমের পাখি নদী পার হয়ে চলে যাচ্ছে। ওপারের মানুষ প্রায় দেখা যাচ্ছে না বললেই হয়। জল নদীর নিচে নেমে যাচ্ছে ক্রমে। লাল ইটের বাড়ি ওপারে প্রায় ছবির মতো মনে হচ্ছিল সোনার। সে কত রকমের কথা বলতে চাইছে। তার মানে হল, সেই আলো জালার মানুষটা, আর কিছুক্ষণ পরই, যেই না সূর্য অস্ত যাবে, মানুষটা লম্বা পোশাক পরে আলো জ্বালবে। মানুষটাকে সোনার বড় ভাল লাগে, মেজ জ্যাঠামশাইকে মানুষটা যমের মতো ভয় পায়। কেবল দেখা হলেই আদাব দেয়। ঘাড় নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর পিঠের ছেঁড়া জামার ভিতর থেকে শীর্ণ শরীরটা কত রুগ্ন ধরা যায়। মানুষটা সন্ধ্যা

হলেই সেই কলটা চালিয়ে দেয়। ভটভট শব্দ হতে আরম্ভ করলেই ম্যাজিকের মতো সারা বাড়িতে লাল নীল আলো জ্বলতে থাকে।

লোকটা সোনাকে বলেছে, সে আলো জালার সময় সেই ম্যাজিক কলটা তাকে দেখাবে। ওর নাম ইব্রাহিম। সোনাকে সকালে উঠেই একটা আদাব দিয়েছে। সোনা দেখেছে বাড়ির নিয়মকানুন আলাদা। সকাল হলেই ফরাসের যত চাকর তারা সোনাকে দেখে আদাব দিয়েছে। তোষাখানার চাকরেরা আদাব দিয়েছে। এ-বড় আশ্চর্য সংসার। জ্যাঠামশাইকে দেখে মানুষগুলি দূর থেকে আদাব দিতে দিতে চলে যাচ্ছে। ইব্রাহিম নুয়ে গেছে কতকটা। আদাবের সময় আর তাকে নুইতে হয় না। যাত্রা গানে সোনা একবার আওরঙ-জেবের অভিনয় দেখেছিল। সোনার কাছে মানুষটা প্রায় সেই বাদশার সামিল। সাদা দাড়ি নাভি পর্যন্ত নেমে গেছে। লোকটার হাতে এত বড় বাড়ি, এবং তায় অন্ধকার," লোকটাকেও সোনার মনে হয় মহাভারতের দেশের মানুষ! অমিত তেজ এই মানুষের। হাতে তার জাদুর কাঠি, যন্ত্রে ছোঁয়ালেই ফুসমন্তরে কথা বলে ওঠে। ও মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলে ওঠে, দিলাম ফুস মন্তর কথা কবে যন্তর। সে গাড়িতে বসে দেখল বেলা পড়ে আসছে। ফিরতে দেরি হলে ইব্রাহিম তার জন্য অপেক্ষা না করে যদি সেই জাদুর ঘরে গিয়ে বসে থাকে! সোনা কমলকে দ্রুত গাড়ি চালাবার কথা বলল।

কমল বলল, গাড়ি তো চলছেই।

—আমরা ফিরে যাব কমল! সোনা যতটা পারছে কমলের মতো কথা বলতে চাইছে। খুব বেশি কঠিন না বলা। একটু বইয়ের ভাষায় কথা বলতে হয় এই যা। তবু উচ্চারণ ঠিক থাকে না বলে, অমলা কমলা ঠোঁট টিপে হাসে। সে ভাবল এবার থেকে বড় জ্যাঠিমার কথাগুলি মনে রাখার চেষ্টা করবে।

সোনা বলতে পারত, ফিরে না গেলে আলো জ্বলবে না। কারণ ইব্রাহিম বলেছে আমি গেলেই সে আলো জ্বালাবে।

কমল বলল, তোকে আমরা ছাদে নিয়ে যাব। সেখান থেকে ভাল দেখতে পাবি।

অমলা বলল, আমরা ছাদে আজকে লুকোচুরি খেলব। তুই আসবি সোনা!

অমলা সোনাকে দেখছিল। অমলা সোনার চোখ মুখ দেখে, কি সুন্দর চোখ, এবং কি মিষ্টি করে কথা বলে, আর এই বালক যেন সেই মায়ের মুখে বাইবেল বর্ণিত বালক, সাদা পোশাকে সোনাকে প্রায় মাঝে মাঝে তেমনই দেখাচ্ছে। সোনা এতটুকু আনন্দ পেলেই উৎসাহে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। সে ঘোড়ার ছুটে যাওয়া দেখছে, সে ঘোড়ার ঘাস খাওয়া দেখছে। ওরা গাড়ি থামিয়ে নদীর পাড়ে কিছুক্ষণ বসে থাকল। এদিকটা গঞ্জের মতো

জায়গা। সারি সারি লোক যাচ্ছে। অমলা কমলাকে দেখে মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে যাচ্ছে।

তারপর ক্রমে গাড়িটা এসে এক মাঠে পড়ল। মণীন্দ্রনাথ চুপচাপ বসে এতক্ষণ নদীর দু'তীর দেখছিলেন, এখন মাঠ দেখছেন। আর ফিরে ফিরে অমলাকে দেখছেন। যেন তার পলিন, শৈশবের পলিন—কি যে চেহারা তার! ধীর স্থির মণীন্দ্রনাথ অমলাকে আদর করার জন্যে মাথায় হাত রাখলে অমলা ভয় পেতে থাকল। সোনা বলল, ভয় নাই অমলা। আমার জ্যাঠামশায় কাউকে কিছু বলে না। অনিষ্ট করে না। আর আশ্চর্য এই বলতেই মানুষটা ঠিকঠাক হয়ে বসল। ওরা সকলে তীর্থযাত্রায় বের হয়েছে এমন মুখ মণীন্দ্রনাথের। অমলা গল্প করতে থাকল কবে সেই শিশু বয়সে ল্যাণ্ডোতে তারা এই মাঠে এসে পড়তেই ভীষণ কুয়াশা নেমে এসেছিল। ইব্রাহিম তখন ল্যাণ্ডো চালাত। দুই ঘোড়াকে ঘাস খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিয়েছিল। গাড়ি থেকে নেমে অমলা কমলা ছুটোছুটি করছিল মাঠে। কিন্তু সহসা কুয়াশা নামলে ইব্রাহিম ঘোড়া দুটোকে খুঁজে পেল না। শীতের দিন ছিল। ইব্রাহিম দুই কাঁধে দুই মেয়ে নিয়ে ফেরার সময় দেখেছিল, এক বৃদ্ধ রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে আছে। বৃদ্ধের হাতে লাঠি। সে মেজবাবুর ফ্লুট শুনবে বলে দেশ থেকে বের হয়েছে। অমলার বাবা সুন্দর ক্লারিওনেট বাজায়। তিনি দেশে এসেছেন, তিনি রাতে ফ্লুট বাজাবেন। কিন্তু কুয়াশায় সেই মানুষ রাস্তা হারিয়ে ফেললে ইব্রাহিম হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসেছিল। আর আশ্চর্য, সেই মানুষ এক বড় ক্লারিওনেট বাজিয়ে। সে তার চেয়ে বড় ওস্তাদ মেজবাবু জেনে এখানে চলে এসেছিল। কিন্তু পরে জানা যায়, মেজবাবু তার নিচের ঘরে সেই মানুষকে আটকে রেখেছিলেন। এবং ওস্তাদ স্বীকার করে সব সুর তান লয়—যা কিছু ফ্লুটের রহস্য জেনে নিয়েছিলেন। সেই ওস্তাদ মানুষ এত ভাল ফ্লুট বাজায় যে, সে বাজাতে আরম্ভ করলে অকালে কাশের বনে ফুল ফুটতে থাকে, পাখি উড়তে থাকে মাথার ওপর। মানুষটা সব কিছু উজাড় করে দিল মেজবাবুকে। নিজের বলতে কিছু আর রাখল না। এসেছিল কিছু নিতে, কিন্তু এসে দেখল, বড় কাঁচা হাত মেজবাবুর। এত বড় বাড়ির সম্মানিত ব্যক্তি তার কাছে হেরে যাবে, ভাবতেই সে কষ্ট পেয়েছিল বড়। নিচের ঘরে সারারাত দিন তখন মেজবাবু মানুষটার কাছে পড়ে থাকতেন। নাওয়া খাওয়ার সময় ছিল না। আর কি বিস্ময়ের ব্যাপার, সেই মানুষ সব দিয়ে থুয়ে নদীর জলে নেমে গিয়েছিল। মানুষটার আর কোন কিছুই ছিল না। সে দুঃখী মানুষ ছিল, সে হাটে বাজারে গঞ্জে ফ্লুট বাজাত, বড়বাবুর মেজছেলে তাও নিয়ে নিল। তার আর অহঙ্কারের কিছু ছিল না। যেন সে তার স্বর হারিয়ে ফেলেছে, সুর হারিয়ে ফেলেছে। সে একা একা নদীর পাড় ধরে চলে যেতে চাইলে মেজবাবু বললেন, তুমি থালেক,

বুড়ো বয়সে আর কোথায় যাবে? থেকে যাও। কে আর তোমার ফ্লুট শুনবে। তুমি তো বলেছ, যা তুমি আমায় দিয়েছ, হাটে বাজারে আর তুমি তা বাজাবে না। তুমি পয়সা পাবে কোথায় তবে? খাবে কি!

খালেক মিঞা প্রথম জবাব দিতে পারে নি। পরে বলেছে, যে আজ্ঞে হুজুর। হুজুরের ল্যাণ্ডোতে সে সেই যে এসে বসল আর নড়ল না। চোখে দেখে না ভাল, তবু গাড়িতে চড়ে বসলে খালেক মিঞা একাই একশ। খালেক এখন বাতাসের আগে ল্যাণ্ডো উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

নদীর ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। কাশফুলের মাথায় ক্রমে জ্যোৎস্না উঠবে এবার। নদীতে যেসব নৌকা আছে তার লণ্ঠন এবার এক দুই করে জ্বলবে। নদীর পাড়ে এসেই ল্যাণ্ডোটা বাঁক নিল। সূর্যাস্ত হচ্ছে বলে এখন একটা লাল রঙের আভা নদীর দু'পাড়ে, গ্রামে মাঠে। ল্যাণ্ডোর মানুষগুলোর মুখে পর্যন্ত সেই লাল রঙ। সূর্যাস্ত হলেই অন্ধকার, তারপর মাথার ওপর নীল আকাশ। শরতের আকাশে জ্যোৎস্না উঠলে বুঝি ঝাউগাছটার নিচে ল্যাণ্ডোটা এসে দাঁড়াবে। পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ তখন ল্যাণ্ডো থেকে নেমে যাবেন।

ঝাউগাছটার নিচে পৌঁছাতে ওদের অন্ধকার হয়ে গেল। ঘোড়াগুলো এখন কদম দিচ্ছে। এখন আর দ্রুত ছুটছে না ঘোড়া। কারণ ওরা প্রাসাদের কাছে নীল রঙের মাঠটায় এসে গেছে।

মণীন্দ্রনাথ নেমে গেলে অমলা বলল, তোর মনে থাকবে তো সোনা!

সোনা ঘাড় কাত করে তার মনে থাকবে এমন সম্মতি জানাল। ছাদের ওপর যখন জ্যোৎস্না উঠবে, সে কমলা অমলার সঙ্গে লুকোচুরি খেলবে। ঢাকের বাদ্য বাজবে, ঢোলের বাদ্য বাজবে, আর ওরা লুকোচুরি খেলবে, ছাদে অথবা রান্নাবাড়ি পার হলে অন্দরের যেসব দাসীবাঁদীদের ঘর আছে তার আশেপাশে। কিন্তু নীল রঙের মাঠে আসতেই সোনার কি মনে পড়ে গেল। সে বলল, আমি নামব অমলা।

—এখানে নামবি কেন? অমলাকে অধীর দেখাল।

সোনা বলতে পারত, সেই যে জাদুর ম্যাসিনটা আছে যা ঘোরালেই তারে তারে বিদ্যুৎ খেলে যায়, আলো জ্বলে ওঠে, ঘরে নীল লাল রঙের আলো জ্বালা হয়, এবং পুজার দিন বলে ছোট ছোট গাছে, পাতার ফাঁকে ফাঁকে টুনি ফুলের মতো আলোর মালা খেলা করতে থাকে—তার এখন সেই জাদুর ম্যাসিনটার পাশে গিয়ে দাঁড়ানো চাই। ইব্রাহিম বলেছে সে সেই ম্যাসিনটার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, হাতে তার জাদুর কাঠি ছোঁয়ালেই শব্দ হয় নানারকমের—কি বিচিত্র শব্দ, যেন নদীর জলে বৈঠা পড়ছে অথবা কাঠে বাড়ি মারছে খটখট—না শব্দটা ঠিক এমন নয়, শব্দটা ভটভট এই এক ধরনের শব্দ, আর ইব্রাহিম বড় বড় চোখে তার লম্বা জোব্বার ভিতর থেকে কত রকমারি জাদুর কাঠি বের

করে দেখাবে বলেছে। সোনা সেই আশায় লাফিয়ে নেমে পড়ল ল্যাণ্ডো থেকে।

কোথায় ইব্রাহিম এখন! সে চারিদিকে খুঁজতে থাকল। জাদুর ম্যাসিনটা যে ঘরে থাকে, সে সেখানে গেল হাঁটতে হাঁটতে। ল্যাণ্ডোটা এখন সদরে ঢুকে যাচ্ছে। কোথাও যেন সে ঘোড়ার ডাক শুনতে পেল। এবং কিছু বালক-বালিকা—ওরাও এসেছে দেখবে বলে, কারণ পূজার কটা দিন এই প্রাসাদ যেন গ্রামের ছেলে-বুড়োদের কাছে আশ্চর্য এক মায়াপুরী, এই পূজার ক'টা দিন প্রাসাদের দালান-কোঠা, নীল রঙের মাঠ, হ্রদের মতো বড় দীঘি এবং বিচিত্র বর্ণের ফুলের গাছ সব মিলে এক মায়াকানন। দূর থেকে মানুষরা হেঁটে হেঁটে চলে আসে। সোনা যেতে যেতে সেইসব মানুষদের দেখতে পেল নদীর পাড়ে বসে আছে। অথচ ডানদিকে সেই গোল ঘরটা লোহার জাল দিয়ে ঘেরা। আশ্চর্য, ইব্রাহিমকে সে দেখতে পাচ্ছে না। ইব্রাহিম বলেছে, তাকে আলো জ্বালানো দেখাবে। এই আলো জ্বালানো সোনার কাছে প্রায় এক অলৌকিক ঘটনার মতো। সে আর দেরি করতে পারল না। সে ছুটে গিয়ে জালে মুখ রাখতেই দেখল, ইব্রাহিম যন্ত্রটার ওপর ঝুঁকে কি করছে!

সে ডাকল, ইব্রাহিম।

ইব্রাহিম কোন উত্তর করল না। সূর্য অস্ত গেছে বলে এবং সন্ধ্যা নামছে বলে ঘরের ভিতরটা সামান্য অন্ধকার। ইব্রাহিমের মুখ অস্পষ্ট। ওর মুখে ঘাম। সে যেন যন্ত্রটাকে বশ মানাতে পারছে না। গোয়ার্তুমি করছে সেই জাদুর ম্যাসিনটা। যত গোয়ার্তুমি করছে তত সে টেনে টেনে কি সব খুলে ফেলছে, চারপাশে ঘুরে ঘুরে টেনে টেনে কি পরীক্ষা করছে, আর সে পাগলের মতো চোখ মুখ করে রেখেছে অথবা উদ্‌বিগ্ন চোখমুখ, এত যে বালক-বালিকা চারপাশে, সবাই ওর কৌশল দেখতে এসেছে, ইব্রাহিম মিস্ত্রী, নামডাক এত যে এই মানুষ প্রায় মরা হাতি লাখ টাকার মতো, সেই মানুষ এখন বিনা নোটিশে এমন ঘাবড়ে গেছে যে সোনা পর্যন্ত আর ডাকতে পারল না, ইব্রাহিম, তুমি আমায় আসতে বলেছিলে। কি করে এমন একটা জগৎকে নিমেষে জাদুর দেশের সামিল করে দাও দেখাবে বলেছিলে, এখন তুমি কিছু করছ না। তোমাকে ডাকলে সাড়া দিচ্ছ না!

সোনার এবার ভয় ভয় করতে থাকল। সে একা যাবে কি করে। ইব্রাহিম বলেছিল, আলো জ্বালা হলে, সে তাকে কাছারিবাড়ি পৌঁছে দেবে। এখন সেই ইব্রাহিম একেবারে মোল্লা মৌলবী হয়ে গেল। অথবা ফকির দরবেশ। কোন কথা বলছে না। সে যেন বিড়বিড় করে কোরানশরিফ পাঠ করছে। সোনা কিছুতেই বলতে পারল না, অ ইব্রাহিম, আমারে তুমি তবে আইতে কইছিলা ক্যান। এখন আমি যামু কি কইরা!

যদি সেই হেমন্তের হাতিটা ফিরে আসত এখন! ওরা গেছে ল্যাণ্ডোতে, আর বড়দা মেজদা গেছে বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে। হাতিতে চড়ে ওরা হাওয়া খেতে গেছে। হাতিটার গলায় ঘণ্টা বাজলেই সে টের পেত হাতিটা ফিরছে। না কোথাও কেউ ফিরছে না। শুধু অপরিচিত বালক বালিকা এবং মানুষজন যাদের সে চেনে না, যারা প্রতিমা দেখতে আসে এক মেটে, দু'মেটে হলে, তারাই আবার এই আলো জ্বালা দেখতে এসেছে। বাবুরা থাকেন শহরে। পূজায় এলে এই বাড়ির কলের একটা ম্যানিন ঘুরতে থাকে। তখন এই বাড়িঘর নিয়ে প্রাসাদের আলো নিয়ে এবং রকমারি সব পাথরের মূর্তি নিয়ে এই গ্রামটা শীতলক্ষার জলে শহর বনে যায়। সোনাও এসেছে এই শহরে। সে যা কিছু দেখছে তাতেই আশ্চয হয়ে যাচ্ছে।

অন্ধকারটা ক্রমে ভারি হচ্ছে। গাছপালা ঘন বলে আকাশে যে সামান্য জ্যোৎস্না, তা এই ঘরে অথবা ঘাসের বুকে গাছের ডালপালা এবং পাতা ভেদ করে নামতে পারছে না। সবাই বলছে, কি হইল ইব্রাহিম, তোমার পাগলি কথা কয় না ক্যান!

—কইব কইব। না কইয়া যাইব কই!

সোনা বলল, ইব্রাহিম, তুমি আমারে আইতে কইছিলা।

ইব্রাহিম যেন এতক্ষণে টের পেয়েছে সোনাবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। সে বলল, কর্তা, পাগলির যে কি হইল!

—কি হইছে?

—কথা কইছে না।

আর তখনই সোনা দেখল, মেজ জ্যাঠামশাই এদিকে ছুটে আসছেন। সঙ্গে অন্দরের চাকর নকুল। জ্যাঠামশাই পর্যন্ত চোখ মুখ উদ্‌বিগ্ন করে রেখেছেন। এখানে যে সোনা একা এবং অপরিচিত জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তিনি তা পর্যন্ত লক্ষ্য করছেন না। তিনি নিজে এবার ভিতরে ঢুকে টর্চ মেরে কি দেখলেন। ইব্রাহিমকে সরে যেতে বললেন, তারপর কি দেখে বললেন, এটা এখানে কেন!

সোনার মনে হল ডাক দেয়, আমি জ্যাঠামশয় এখানে!

কিন্তু সোনা মেজজ্যাঠামশাইকে মস্ত বড় মানুষ ভাবতেই সে ডাকতে সাহস পেল না। যেমন তিনি এসেছিলেন, তেমনি চলে গেলেন। সোনা কেমন বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকল। এখন আর অন্ধকার নেই। এত বড় আকাশ মাথার ওপর আর ছোট্ট এক ফালি চাঁদ এবং হাজার নক্ষত্রকে ব্যঙ্গ করছে এই মায়াকানন, প্রাসাদ। চারপাশে আলোর মালা। চারপাশে বড় বড় মেগ্‌নলিয়া ফুলের গাছ, তার বিচিত্র বর্ণের পাতা এবং ছোট ছোট কীটপতঙ্গের শব্দে সোনাকে কেমন মুহ্যমান করে দিল। সে একা একা হেঁটে যাচ্ছে। তার ভয়ডর কিছু থাকল না। এত আলো চারপাশে, এত গাছগাছালির ভিতর

অজস্র আলো, দূরে কারা এখন ছুটোছুটি করছে এবং পূজার বাজনা বাজছে নিয়ত—সোনার ভয়ডর একেবারে উবে গেল। ওর মনে একটা অতীব স্বপ্নের দেশ, দেশটার নাম কেবল সে এক মেয়ের মুখের সঙ্গে তুলনা করে মিল খুঁজে পায়—সে মেয়ে অমলা। তার অমলা পিসি। অমলা তাকে আজ ছাদে যেতে বলেছে। তুই সোনা ছাদে আসবি, আসবি কিন্তু। আমি তোর জন্য অপেক্ষা করব। সোনা ল্যাণ্ডোর সেই সুন্দর মুখ মনে করতে পারল। এবং কলকাতার মেয়ে অমলা। কলকাতা খুব বড় শহর, ট্রামগাড়ি, হাওড়ার পুল কি সব অত্যাশ্চর্য সামগ্রী নিয়ে বসবাস করছে কলকাতা। অমলা সেখানে থাকে, অমলা সেখানে বড় হয়েছে। আশ্চর্য রকমের নীল চোখ! এবং আলোর মতো মুখে নিয়ত কথা ফুটে থাকে, সোনা এই আলোর রাজ্যে হাঁটতে হাঁটতে কেমন সরল এক মায়ার টানে ছুটতে থাকল।

সোনা দীঘির পাড়ে-পাড়ে ছুটছে। ছুটতে-ছুটতে সোনা কাছারিবাড়ি ঢুকে গেল। কত লোকজন! কত আমলা-কামলা চারপাশে। সে সব ফেলে ছুটছে। এত জোরে ছুটতে দেখলে জ্যাঠামশাই বকবে, সে চারিদিকে একবার দেখে নিল। না, মেজ জ্যাঠামশাই কাছে কোথাও নেই। পূজামণ্ডপে নানা রকমের প্রদীপ জ্বালানো হচ্ছে। দেবীর মূর্তিতে গর্জন লাগানো হয়েছে। এবং ঝিলমিল রঙের সব গর্জন এখন চাকচিক্যময় হয়ে গেছে। সোনা এই প্রতিমার সামনে ধরা পড়ে যাবে, তুমি এক আশ্চর্য মায়ার টানে ছুটে যাচ্ছ সোনা—আমি সব টের পাচ্ছি। সোনা সেজন্য মণ্ডপে দেবীর মুখের দিকে তাকাল না পর্যন্ত। কিন্তু সিঁড়ি ভেঙে ডান দিকের বারান্দায় উঠতে সোনা দেখল একটা ইজিচেয়ারে বড় জ্যাঠামশাই শুয়ে আছেন। মুখ বুজে পড়ে আছেন। একটা সিল্কের পাঞ্জাবি, পায়ে দামী জুতো, পুজোর সময়ে এই পোশাক মেজ জ্যাঠামশাইর—যা কিছু ভাল পোশাক পাগল জ্যাঠামশাইকে পরতে দিয়েছেন, অথবা নিজে হাতে পরিয়ে দিয়ে এখানে বসিয়ে রেখেছেন। পায়ের নিচে রামসুন্দর, একটু দূরে বসে তামাক কাটছে। রাশি রাশি তামাক কাটা হচ্ছে। রাশি রাশি রাব ঢেলে এক সুগন্ধ তামাকের সৃষ্টি এবং পাশে পাগল জ্যাঠামশাই—সোনা আজ এখানে এসেও মুহূর্ত দেরি করল না। তার হাতে সময় নেই। ওর দেরি হয়ে গেছে। সেই কখন থেকে ছাদের ওপর অমলা ওর জন্য প্রতীক্ষা করছে। অমলা, অমলা পিসি। কলকাতার অমলা। কত বড় শহর কলকাতা। মেমরিয়েল হল, রূপালী রঙের বেড়া এবং দু'পাশে সব সুরম্য অট্টালিকা। সুদূর সেই কলকাতার মতো অমলার শরীরে এক দূরের রহস্য নিমজ্জিত। সোনার বয়স আর কত! তবু এই টান সোনাকে কেমন পাগলের মতো ছুটিয়ে মারছে। সে পাগল জ্যাঠামশাইর কাছ থেকে পালাবার জন্য ডান দিকের বারান্দায় উঠে এল না। সে বড় বড় থামের পাশে

নিজেকে প্রথম লুকিয়ে ফেলল। তারপর আবার ছুটে ওপরের সিঁড়ি ভাঙতে থাকল।

সিঁড়ি ভাঙার সময়ই সে ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেল। দীঘির ওপারে মঠ। মঠে কেউ এখন বড় ঘণ্টার শেকল টেনে ঘণ্টা বাজাচ্ছে। সকালে সোনা ভেবেছিল সন্ধ্যায় জ্যোৎস্না উঠলে সে এবং পাগল জ্যাঠামশাই সেই মঠে চলে যাবে। সে পাগল জ্যাঠামশাইকে সিঁড়িতে বসিয়ে রাখবে। যেখানে পাথরের বৃষ রয়েছে তার ডান দিকে সে দাঁড়াবে। শ্বেতপাথরের বাঁধানো মেঝে। সেই মেঝের ওপর দাঁড়ালে সে শেকলটা হাতে নাগাল পায়। সে এক-দুই করে ঘণ্টা বাজাবে আর জ্যাঠামশাই সেই ঘণ্টাধ্বনি এক-দুই করে গুনবেন। নিচে এসে বলবে—কত বার? জ্যাঠামশাই বলবেন, দশ বার। একমাত্র সে-ই এভাবে ক্রমে মানুষটাকে নানা কাজের ভিতর অথবা জ্যাঠামশাই যা ভালবাসেন, তার ভিতর নিয়ে যেতে যেতে এক সময় নিরাময় করে তুলবে। কিন্তু এই ঘণ্টাধ্বনি শুনে সোনা কেমন থমকে গেল। যেন পাগল জ্যাঠামশাই বলছেন, সোনা যাবি না, মঠের সিঁড়িতে ঘণ্টা বাজাবি না। আমি এক দুই করে গুনব। গুনতে গুনতে একশ ঠিক ক্রমান্বয়ে বলে যাব। সব ঠিক-ঠিক ক্রমান্বয় বলে গেলে দেখবি সোনা আমি একদিন ভাল হয়ে যাব।

সিঁড়িতেই সে থমকে দাঁড়াল। সে ওপরে যাবে, না, নিচে নেমে পাগল জ্যাঠামশাইকে নিয়ে মঠের সিঁড়িতে গিয়ে বসে থাকবে। এমন একটা দোমনা ভাব ভিতরে তার কাজ করছে। বরং ওর এখন ঐ মঠেই চলে যেতে বেশি ইচ্ছে হচ্ছে। সে এত উঁচু মঠ কোথাও দেখে নি। হাজার হবে টিয়াপাখি, নীল রঙের। পাখিরা সব মঠের ভিতর বাসা বানিয়ে নিয়েছে। জ্যোৎস্না রাত হলে পাখিরা চক্রাকারে মঠের চারপাশটায় ওড়ে। মঠটার কথা মনে হলেই এমন সব পাখিদের কথা মনে হয়। পাখিদের কথা মনে হলেই ওর গুলতিটার কথা মনে হয়। মেলা থেকে রঞ্জিতমামা তাকে একটা গুলতি কিনে দিয়েছিল। সে সেই গুলতি দিয়ে কাক, শালিক, টিয়াপাখি এবং কাঠবিড়ালি যা পেত সামনে, মারার চেষ্টা করত। কিন্তু সে এদের সঙ্গে পারত না। জামরুল গাছটার নিচে ছোট খোঁদল, খোঁদলে সেই কাঠবিড়ালি, সকাল হলেই গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ত। সোনা পড়া ফেলে ছুটত জীবটার পিছনে। ছোট্ট জীব এ-গাছ থেকে ও-গাছে লাফিয়ে পড়ত। সোনালী রোদে সে কটকট করে ডাকত। সোনা গুলতি মারলে বিড়ালটা হাতজোড় করে রাখত। কিন্তু সোনা কর্ণপাত না করলে তখন খেলা আরম্ভ হয়ে যেত। সোনার মনে হত এই যে এক জীব, ছোট্ট জীব। জীবের কি বড়াই! একেবারে ভয় পায় না। গাছের পাতায় পাতায় যেন উড়ে বেড়ায়। শুধু এই জীব কেন, যা-কিছু সুন্দর এবং সজীব, এই যেমন রোদ মাটি, শরতের বৃষ্টি, সব কিছুরই পিছনে তাড়া করতে সে ভালবাসে।

অমলা তার কাছে খুব এক দূরের রহস্য বয়ে এনেছে। সে সেজন্য নড়তে পারছে না। কার কাছে যাবে? পাগল জ্যাঠামশাই, বড় মঠ এবং জ্যোৎস্না রাতের মাঠ না অমলা, কমলা। সে অন্ধকারে কিছু স্থির না করতে পেরে সিঁড়ির মুখে যেমন চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়ে থাকল।

একজন পাইক অথবা বরকন্দাজের মতো মানুষ ওর পাশ কাটিয়ে গেল। ওকে দেখতে পায় নি। দেখতে পেলেই বলত, কে? অন্ধকারে কে জাগে। তাকে তাড়া করত! আর অন্ধকার থেকে আলোয় এলেই, আরে, এ যে, সোনাবাবু! আপনে এখানে কি করতাছেন। আশ্চর্য সোনা এই সব মানুষদের দেখে—কি লম্বা আর উঁচু! সব সময় করজোড়ে থাকে। ওকে দেখলে পর্যন্ত করজোড়ে কথা বলে। ওর ইচ্ছা হল সিপাইটাকে একটু ভয় পাইয়ে দেয়। এবং সে মুখ বাড়াতেই দেখল সামনে অমলা কমলা এবং অন্য সব ছোট ছোট মেয়ে অথবা ছেলে। দাসী-বাঁদীদের ঘর পার হয়ে সেই কোথায় যাবে বলে হৈ-হৈ করে নেমে যাচ্ছে।

সে এবারেও নড়ল না।

কমলার মনে হল কেউ যেন থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। বলল, কে রে তুই!

সোনা আলোতে এসে বলল, আমি।

—তোকে খুঁজতে যাচ্ছি। সেই কখন থেকে আমরা তোর জন্য বসে আছি।

ওরা ফের ওপরে উঠে যাবে মনে হল। কিন্তু দোতলার সিঁড়িতে উঠেই ওরা ছাদে গেল না। ওরা একটা ফাঁকা মতো জায়গায় চলে এল। এখান থেকে রান্নাবাড়ির কোলাহল পাওয়া যায়। মাছ ভাজার গন্ধ আসছে। ওরা একটা ঝুলন্ত বারান্দায় এসে গেল। এখন ওরা যে যার মতো দলে দলে ভাগ হয়ে যাবে। তারপর ছড়িয়ে পড়বে রান্নাবাড়ির চারপাশে।

সুতরাং ওরা অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়ল। অথবা বলা যায় লুকিয়ে পড়ল। অমলা সোনাকে নিজের দলে রেখেছে। সে প্রথম ভেবেছিল সোনাকে নিয়ে কোথাও সে লুকিয়ে পড়বে। কিন্তু সোনা যে কোথায় সহসা অদৃশ্য হয়ে গেল। সে একটা চিলে কোঠায় উঠে গেল। এখানে তাকে কেউ খুঁজে পাবে না।

আর সোনার এখন যেন এ-বাড়ির সব চেনা হয়ে গেছে। কোনদিকে তোষাখানা, কোনদিকে বালাখানা, কোথায় ঠাকুরবাড়ি, কোথায় সেই বৌরানীর মহল, এবং মহলের পর মহল পার হতে কত সময় লেগে যায় সে সব জানে। ওরা রান্নাবাড়ির চারপাশটা নিয়েছে। কেউ আর বেশি দূর যাবে না, গেলে সে বাদ যাবে।

সোনা কিন্তু কিছু দূর এসেই কেমন ভয় পেয়ে গেল। এদিকটা একেবারে ফাঁকা ফাঁকা। ভাঙা পাঁচিল নিচে। পাঁচিলের ওপাশে সেই বড় বনটা। সোনা

বেশি দূর যাবে না। বড় বড় দুটো আলোর ডুম জ্বলছে বলে এবং দাসী-বাঁদীদের কি নিয়ে বচসা হচ্ছে বলে ভয়টা তেমন জোরালো হচ্ছে না। তবু সে এমন একটা জায়গা চাইছে, যেখানে সে পালালে কেউ তাকে খুঁজে পাবে না। সে তেমন একটা জায়গা না পেয়ে কেমন হতাশায় ডুবে যাচ্ছিল আর তখন দেখল অমলা ওর পিছনে এসে বসেছে। যেন অমলা এতক্ষণ ওকেই খুঁজছে।

অমলা বলল, আমার সঙ্গে আয় সোনা।

অমলা সোনাকে সাহায্য করতে পারবে। সে অমলার পিছু পিছু নুয়ে নুয়ে হাঁটতে থাকল। মাথা তুলে দাঁড়ালেই ওপাশের রেলিং থেকে ওদের দেখতে পাবে।

সোনা এবং অমলা এই করে উত্তরের বাড়ি পর্যন্ত চলে এল। এখন বড় বড় দরজা পার হয়ে যে যার মতো লুকিয়ে পড়ছে। অমলা ফিস্‌ফিস্ করে এদিকে আয়, এদিকে আয় করছে। একটা অন্ধকার মতো লম্বা বারান্দায় ওরা এসে পড়ল। এখান থেকে অতিথিশালার দিকে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে। সিঁড়িটা ঘুরে ঘুরে নিচে নেমে গেছে। কাঠের সিঁড়ি। সোনা এবং অমলা ঘুরে ঘুরে নামছে। ওরা নামতে নামতে যেন একটা বিষণ্ণ জায়গায় চলে এল। নীল রঙের অল্প আলো। সোঁদা সোঁদা পাঁচিলের গন্ধ। সামনে একটা পরিত্যক্ত ঘর। হাট করে একটা পাট খোলা। কিছু ইঁদুর-এর শব্দ। ওপরে একটা গাছ। কি গাছ এই আলোতে চেনা যায় না। দুটো-একটা বাদুড়ের মতো জীব ওদের শব্দ পেয়ে উড়ে গেল। ওরা দরজা অতিক্রম করে পাঁচিলটার পাশে একটা কিছু ধ্বংসস্তূপের মতো দেখতে পেল। এককালে বোধ হয় এখানে একটা কুয়ো ছিল। কুয়োটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখানে এসেই অমলা বলল, চুপ করে দাঁড়া। এখানে আমাদের খুঁজতে কেউ সাহস পাবে না। আমরা রান্নাবাড়ির পেছনটাতে চলে এসেছি।

সোনা ভয়ে জবাব দিল না।

—কি রে, একেবারে চুপ করে আছিস কেন? আস্তে আস্তে কথা বল।

—আমার বড় ভয় লাগছে।

—ভয় কি রে? এখানে আমি বৃন্দাবনীর সঙ্গে রোজ আসি। সকালে ফুল তুলতে আসি। তারপরই ওদের মনে হল কেউ যেন কাঠের সিঁড়িটা ধরে নিচে নেমে আসছে। অমলা কোন কথা আর বলল না। মাঝপথে সে একেবারে চুপ হয়ে গেল। সোনা একেবারে অমলার পাশাপাশি সংলগ্ন হয়ে আছে। যেন সে এখন বলির পাঁঠা। অমলা যা-যা বলবে সোনা তাই করবে। সোনাকে অমলা দুটো সন্দেশ দিল খেতে। তারপর যখন দেখল সিঁড়ি থেকে শব্দটা আর উঠে আসছে না, কেউ বোধ হয় সিঁড়ি দিয়ে নেমে রান্নাবাড়ির দিকে চলে গেছে, তখন অমলা বলল, তুই কমলার সঙ্গে ভাব করবি না, কেমন?

আবার শব্দ হচ্ছে কাঠের সিঁড়িতে। বোধ হয় কমলা তার দলবল নিয়ে ওদের খুঁজতে আসছে। মলিনা, আলো, মধু কিংবা আরও কেউ কেউ হবে। যে-ই হোক, এদিকে আসতে ওরা সাহস পাবে না। মাথার ওপর একটা লম্বা ডাল। পাঁচিলের ওপাশ থেকে ডালটা এপাশে ঢুকে গেছে। আর তারই নিচে সেই ভূতুড়ে ঘরটা। ঘরটার অন্ধকারে অমলা সোনাকে জড়িয়ে ধরেছে। বলছে, ভয় কি রে! এই ত্যাখ, ত্যাখ না সোনা। বলে অমলা সোনার হাত নিয়ে কেমন খেলা করতে থাকল।

সোনা আবার বলল, এখানে না অমলা। আমার এসব ভাল লাগে না। সোনা বার বার অমলার মতো কথা বলতে চায়, ওর অমলার মতো কথা বলতে ভালো লাগে।

তখন কমলার দলবলটা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছে। সোনা বলল, কমলা আমাকে বাইস্কোপের বাক্‌স দেবে বলেছে।

অমলা বলল, আমি তোকে রোজ একটা স্থলপদ্ম এনে দেব। বৃন্দাবনী বাবার জন্য গোলাপের তোড়া বানাবে। তোকে আমি ফুলের তোড়া দেব। বলে আর সোনাকে কথা বলতে দিল না। ওর চুলে অমলা হাত দিয়ে আদর করতে থাকল। মাথাটা এনে নাকের কাছে রাখল। একেবারে রেশমের মতো নরম চুল। সোনা কেমন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছে। কলকাতার মেয়ে অমলা কত কিছু জানে। এই বয়সে সোনা আর কি করতে পারে! অমলা ওকে নিয়ে কি করতে চায়! তুই কি সুন্দর সোনা! তোর চোখ কি বড়। তোকে আমি কলকাতা নিয়ে যাব। কত বড় শহর দেখবি। কত বড় চিড়িয়াখানা, জাদুঘর।

সোনা বলল, বইয়ে আছে জাদুঘরে বড় একটা তিমি মাছের কঙ্কাল আছে।

—তুই গেলে দেখতে পাবি, কত বড় কঙ্কাল।

সোনা বলল, আমার ভয় লাগে।

অমলা বলল, একটু নিচে। তুই কি রে! ভয় পাস কেন এত।

সোনা বলল, ঈশম একটা বড় মাছ ধরছিল।

অমলা যেন আর পারছে না। সোনার কাছে কি চাইছে। সোনার হাতটা কোন অতলে যেন নিয়ে চলে যাচ্ছে। সোনার যেন কিছু জ্ঞানগম্য নেই। যেন সে কিছু জানে না। অমলা কেমন বিড়বিড় করে বকছে, সোনা, কত বড় মাছ রে?

—খুব বড়।

—দে, তবে হাত দে।

সোনা বলল, না!

—তবে তোকে চুমু খাই।

—না।

—কেন কি হবে ?

—গালে থুথু লাগবে।

—মুছে ফেলবি। তুই কি বোকা রে !

আবার সেই কথা সোনার মুখে। ওর ভয়, কেন জানি ভয়, এটা যে কি, কোন ওষধিতে গড়া, একবার খেলে আর খেতে নেই, ধরা পড়ে গেলে ভয়, তা ছাড়া এ বড় এক পাপ কাজ। সোনা নিজের কাছে নিজেই কেমন ছোট হয়ে যাচ্ছে, অথচ একটা ইচ্ছা-ইচ্ছা ভাব, রহস্য নিয়ে জেগে আছে কলকাতার মেয়ে, সে এক দূরের রহস্য, যা সে এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, কেবল নদীর জলে শাপলা ফুলের মতো ফুটে থাকার স্বভাব তার, সে যেন জলের ওপর ভেসে আছে, ওর লজ্জা ভয় সঙ্কোচ ওকে ক্রমে জলের ওপর ভাসিয়ে রাখছে, ওর হাত নিয়ে সেই অতলে ছেড়ে দিলেই সে জলের ভিতর ডুবে যাবে। পাপের ভিতর হারিয়ে যাবে।

সে বলল, না অমলা। না না !

অমলা বলল, লক্ষ্মী সোনা। দে, হাত দে। তুই আবার বাঙাল কথা বলিস কেন ?

সোনা কেমন গুটিয়ে আসছে। সে যেন পৃথিবীতে একটা বিশুদ্ধভাব নিয়ে বেঁচে ছিল এতদিন, অমলা তাকে সেখান থেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। ওর এখন ছুটে যেতে ইচ্ছা করছে। অথচ অমলার প্রীতিপূর্ণ চোখ, সোনালী চুল, চোখের নীল রঙ, আর শরীরে যেন উজ্জ্বল সোনালী বাতি জ্বলছে নিয়ত—এমন এক শরীর ছেড়ে ওর যেতে ইচ্ছা করছে না। সারাক্ষণ সে অমলার পাশে পাশে হাঁটতে ভালবাসে, কিন্তু এখন অমলা যা ওকে করতে বলছে—তা, কেন জানি ওর কাছে একটা পাপ কাজ বলে মনে হচ্ছে।

অমলা সোনাকে আর সময় দিল না। সোনার মুখটা টেনে টুক করে একটা চুমু খেল। তারপর বলল, ভাল লাগছে না ?

সোনা বুঝল কি বুঝল না টের পেল না। ভাঙা দরজটা বাতাসে সরে গেছে। নীলচে আলোতে সোনার মুখ অস্পষ্ট। অমলা সেই মুখ দেখে বলল, কি রে, চুপ করে আছিস কেন ? ভাল লাগছে না ?

ভাল লাগছে না বললে অমলা রাগ করবে। অমলা ওকে আর ভালবাসবে না। সন্দেশ দেবে না, ফুল-ফল দেবে না। সে বলল না কিছু। ঘাড় কাত করে সুবোধ বালকের মতো সম্মতি জানাল।

আর কথা নেই অমলার। যেন এবারে তার পাসপোর্ট মিলে গেছে। সে তাকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করছে। সোনারও কেমন ভাল লেগে যাচ্ছে। সেই হাত নিয়ে খেলা, নতুন খেলা, জীবনের এক অদ্ভুত রহস্যময় খেলা আরম্ভ হয়ে গেল।

অমলা প্যান্টের দড়ি বাঁধার সময় বলল, কি রে তোর ভাল লাগে নি !

সোনা ফিক করে হেসে দিল।

—হাসলি যে !

সোনা কিছু না বলে বাইরে এসে দাঁড়াল। কিছু না বুঝেই সোনা বোকার মতো হাসল। এবং বাইরে আসতে আবার সেই হাসি।

—কি রে, তোর কি হয়েছে সোনা ! এত হাসছিস কেন !

সোনা জোরে জোরে হাসতে থাকল। এটা কি একটা হয়ে গেল। অমলা পিসি তাকে এটা কি শেখাল। বেশ একটা খেলা, নতুন খেলা তার জীবনে এসে গেল। এখন তার অমলাকে নিয়ে ছাদের ওপর অথবা একটা নীল রংয়ের মাঠে কেবল ছুটতে ইচ্ছা করছে। এখন আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে না। কি সুন্দর লাগছে অমলাকে, অমলা নিত্যনতুন বিচিত্র সব অভিজ্ঞতায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। কিন্তু মায়ের মুখ মনে পড়তেই সে কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল। তার মনে হল সে একটা পাপ কাজ করে ফেলেছে। তার আর কিছু ভাল লাগছে না। একা, নির্জন এই ভাঙা পাঁচিলে সে বড্ড একা। পাশের এই অমলাকে এখন আর সে যেন চিনতে পারছে না। সে তার পর যথার্থই ছুটতে থাকল।

অমলা বলল, সোনা ছুটে যাস না। পড়ে যাবি সিঁড়ি থেকে। অমলাও দু' লাফে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে যেতে থাকল। সোনা এখন যেভাবে ছুটছে, পড়ে গেলে মরে যাবে। সে সোনার চেয়েও দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে সোনাকে সাপটে ধরল। —সোনা, এই সোনা, তোর কি হয়েছে ! এমন ছুটেছিস কেন ? অন্ধকারে পড়ে গেলে মরে যাবি।

সোনা অমলাকে দু' হাতে ঠেলে ফেলে দিল। অন্যসময় হলে অমলা কেঁদে ফেলত, কিন্তু এখন সোনার চোখ দেখে ভয়ে সে কিছু বলতে পারছে না। সে কাছে এসে বলল, তোকে একটা ভাল গল্পের বই দেব। আমার সঙ্গে আয়।

সোনা চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছে। অমলা তাকে বার বার ডাকল—সে উত্তর করল না। এখন ঢাকের বাদ্যি বাজছে মণ্ডপে। সে একটা বড় হলঘর পার হয়ে যাচ্ছে। কত রকমের ছবি ঘরটাতে। কতরকমের বাঘের অথবা হরিণের চামড়া। ঢাল-তলোয়ার সাজানো। এই হলঘরটাতে এলেই সোনা মনে মনে রাজপুত্র হয়ে যায়। মাথায় সোনার মুকুট, পায়ে নূপুর, কালো রঙের ঘোড়া এবং কোমরে রূপালী রঙের বেল্ট আর লম্বা তরবারি। এই হলঘরে এলেই সোনার এক রাক্ষসের দেশ থেকে বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধারের ইচ্ছা জাগে ! আজ আর ওর সেই ইচ্ছাটা জাগছে না। হলঘর পর্যন্ত পিছু পিছু অমলা এসেছে। তারপর আর আসতে সাহস পায় নি। দরজার মুখে সে দাঁড়িয়ে সোনার চলে যাওয়া দেখছে।

দরজা পার হতেই সে একবার পিছন ফিরে তাকাল। অমলা এখনও ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক বন্দিনী রাজকন্যার মতো মুখ করে রেখেছে। রাজপুত্র সোনা। কিন্তু এখন সে কি করবে। কোথায় যাবে। ওর মনে হচ্ছিল সবাই ওর এই পাপ কাজের কথা জেনে ফেলেছে। পাগল জ্যাঠামশাইর পাশে বসলেই তিনি যেন সোনার শরীরের গন্ধ শুঁকে বলে দেবেন, তুমি সোনা বড় তরমুজের মাঠ দেখে ফেলেছ। রহস্য তোমার অন্তহীন। তুমি সোনা, আমার পাশে বসবে না। সোনার এখন কেবল কান্না পাচ্ছে।

থামের আড়ালে এসে থামতেই সোনা দেখল, পাগল জ্যাঠামশাই ইজিচেয়ারে শুয়ে নেই। সব পরিচিত, অপরিচিত লোক গিজগিজ করছে মণ্ডপের সামনে। ওর সেখানে যেতে ইচ্ছা হল না। ওর কেবল কেন জানি মায়ের মুখ বার বার মনে পড়ছে। ঠিক পাগল জ্যাঠামশাইয়ের মতো মা-ও ওর চুলের গন্ধ শুঁকলেই টের পেয়ে যাবে। সে একটা পাপ কাজ করে ফেলেছে টের পেয়ে যাবে। এখন কি যে করলে সব পাপ তার ধুয়ে মুছে যাবে—সে কোথায় গিয়ে দাঁড়বে! মা বলেছে, নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে সব বলে দিলে পাপ খণ্ডন হয়ে যায়। সে জলের কাছে তার যা-কিছু পাপ সব বলে দেবে এবং ক্ষমা চেয়ে নেবে।

সে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে জল এবং জলের দেবতাকে উদ্দেশ করে বলবে, হে জলের দেবতা, আর তখনই সে দেখল সে কাছারিবাড়ি এসে গেছে। রামসুন্দর বসে রয়েছে একটা গোল মতো টেবিলে। চারপাশে কাঠের চেয়ার! বাবুদের ছেলেরা গোল হয়ে বসেছে। রামসুন্দর সুন্দর সুন্দর গল্প বলতে পারে। একটু দূরে পাগল জ্যাঠামশাই বসে আছেন। মাথার ওপর আকাশ, আর মৃদু জ্যোৎস্না। এই জ্যোৎস্নার আলোতে সে ভাবল, কাল ভোরে সে পাগল জ্যাঠামশাইকে নিয়ে নদীর পাড়ে চলে যাবে। মা যেমন দুঃস্বপ্ন দেখলে সকাল সকাল সোনালী বালির নদীতে চলে যান, জলের কাছে দুঃস্বপ্ন হুবহু বলে দেন, বলে দিলেই সব দোষ খণ্ডন হয়ে যায়, তেমনি সে বলে দেবে। দিলেই তার যত দোষ সব খণ্ডন হয়ে যাবে।

সোনার এমন একটা মহাপাপ করে কিছুই ভাল লাগছিল না। এমন কি এখন যে রামসুন্দর গল্প বলছে তাও শোনার আগ্রহ তার নেই। সে কাছারিবাড়ির ভিতরে ঢুকে মেজ জ্যাঠামশাইর বিছানায় শুয়ে পড়ল এবং সারাদিনের ক্লান্তিতে তার ঘুম এসে গেল।

সে ঘুমের ভিতর একটা কুঠিবাড়ির স্বপ্ন দেখল। সামনে বিস্তীর্ণ এক মাঠ। মাঠে কোন শস্য ফলে না। নুড়ি বিছানো পথ, পাশে খোয়াই। খোয়াই ধরে জল নেমে আসছে। সাদা নীল হলুদ রঙের পাথর। জল নির্মল বলে পাথরগুলির রঙ জলের ওপর নানা রঙ নিয়ে ভেসে থাকছে। আর কুঠিবাড়ির পিছনেই একটা পাহাড়। তার ছায়া সমস্ত কুঠিবাড়িটাকে শান্ত স্নিগ্ধ করে

রেখেছে। সোনা সকালের রোদে বের হয়ে পড়েছে। সে কার হাত ধরে গেল নিয়ত ছুটছে। সে তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না। পেছনের বেণী দুটো কেবল দুলতে দেখছে। লাল রিবন বাঁধা চুলে রুপোলী রঙের ফ্রক গায়ে মেয়েটা তাকে নিয়ে সেই খোয়াইর দিকে ছুটে চলেছে।

খোয়াইর পাড়ে এসে সোনা কেমন ভয় পেয়ে গেল। মনে হল তার, এমন গভীর জল এবং স্রোত পার হয়ে সে ও-পারে উঠে যেতে পারবে না। মেয়েটা বলছে, কি রে, ভয় কি! আয়। আয় না। দেখ আমি কেমন তোকে পার করে দিচ্ছি।

আল্লা হাতে সোনাকে যেন মেয়েটা খোয়াইর ওপারে নিয়ে যাবে বলে হাত বাড়াল। খোয়াইর জল পার হতে ছোট ছোট মাছ চারপাশে খেলা করে বেড়াচ্ছিল। ঠাণ্ডা জল। এমন জল এই সুন্দর সকালকে যেন মহিমময় করে রাখছে। সোনা আর কিছুতেই ওপারে উঠে যেতে চাইছে না।

—কি রে, খুব ভাল লেগে গেছে! আর উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না! সোনা মেয়েটার মুখ দেখতে পাচ্ছে না। ওকে কেবল পিছন ফিরে থাকছে। সোনাকে কেবল পিছন ফিরে কথা বলছে। সোনা বলল, খুব ভাল লাগছে।

এত ভাল লাগছে যে সোনার কেবল জলের মাছ হয়ে যাবার ইচ্ছা হচ্ছে। আর কি অবাক, যেই না তার ইচ্ছা জলের মাছ হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গেই সে জলের মাছ হয়ে গেল। মেয়েটা হাসল ওর দিকে তাকিয়ে, কি রে, তুই জলের মাছ হয়ে গেলি। বলতে বলতে মেয়েটাও জলের নিচে টুপ করে ডুব দিল। আর কি আশ্চর্য! সে এবং মেয়েটা দু'জনেই হলুদ এবং নীল রঙের চাঁদা মাছ হয়ে খোয়াইর হাঁটুজলে সাঁতার কাটতে থাকল। তারপর দু'জন এক ভয়ঙ্কর স্রোতের মুখে এসে আটকে গেল। উজানে উঠে যাবার জন্য নীল রঙের মাছটা লাফ দিতেই পাড়ে এসে পড়ল। এবার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। সোনা শ্বাস ফেলতে পারছে না। সে পাড়ে লাফ-ঝাঁপ দিচ্ছে। শ্বাসকষ্ট প্রায় মৃত্যুকষ্টের সামিল। সোনা ঘুমের ভিতর স্বপ্নে হাঁসফাঁস করছিল এবং এক সময় ঘুম ভেঙে গেল তার। সে ঘেমে গেছে! আর সে দেখল কে যেন তাকে পাঁজাকোলে রান্নাবাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। সে চোখ তুলে দেখল পাগল জ্যাঠামশাই নিয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণে মনে হল সোনার, সে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সে বলল, জ্যাঠামশয়, স্বপ্নে মাছ দ্যাখলে কি হয়?

পাগল মানুষ বললেন, গ্যাৎচোরেৎশালা।

অথচ সোনা জ্যাঠামশাইর মুখ দেখে বুঝতে পেরেছে তিনি যেন বলতে চেয়েছেন, রাজা হয়। স্বপ্নে মাছ দেখলে রাজা হয়।

পরদিন সকালে সোনা সূর্য উঠতে না উঠতেই জ্যাঠামশাইকে টানতে টানতে শীতলক্ষার পাড়ে নিয়ে গেল। সামনে ছোট চর। পাড়ে কাশবন। বাঁ দিকে

মঠতলায় স্টিমার ঘাট। দশটায় স্টিমার আসার কথা। নারানগঞ্জ থেকে আসে।

সকাল বলে এবং আশ্বিনের মাস বলে ঘাসে ঘাসে আবার শিশির পড়তে আরম্ভ করেছে। জ্যাঠামশাই, সোনা এবং প্রিয় আশ্বিনের কুকুর নদীর পাড়ে হাঁটছে। এরা তিনজন চরে নামতেই দেখতে পেল সেই হাতিটা, হেমন্তের হাতি। এখন আশ্বিনের শেষাশেষি চরের ওপর দিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে। ওর ইচ্ছা হল জোরে চিৎকার করে ডাকে, জসীম! আমারে জ্যাঠামশয়রে নিয়া যাও। আমি মার কাছে যামু গিয়া। আমার এখানে ভাল লাগে না। কিন্তু বলতে পারল না। ভয়ে সে বলতে পারল না। যদি আবার জ্যাঠামশাই হাতিতে চড়ে নিরুদ্দেশে চলে যান!

অথচ গতরাত্রের ঘটনা মনে হতেই সে তার মায়ের কাছে ফিরে যেতেও সাহস পাচ্ছে না। এখন কেবল মনে হচ্ছে খালেক মিঞার মতো সে পথ হারিয়ে ফেলেছে। এই কুয়াশা পার হলেই এক জগৎ, সেখানে নিয়ে যাবার জন্য অমলা তার সুন্দর চোখ নিয়ে অপলক প্রতীক্ষা করছে। সোনা জ্যাঠামশাইর হাত ধরে নদীর ঘাটে দাঁড়াল। অথচ পাপের কথা কিছু বলতে পারছে না। কি বলবে! সামনের জলে কিছু কাশফুল ভেসে যাচ্ছে। এই ফুল দেখতে দেখতে সে তার মহাপাপের কথা ভুলে গেল। ওর কেবল মনে হচ্ছে এতদিনে সেই দূরের রহস্যটা সে যেন কিছু কিছু ধরতে পারছে। এখন ওর চারপাশের ফুল-ফল, পাখি, দু'পাশে নদীর চর, নদীর জলরাশি এবং এই যে হাতি চলে যাচ্ছে নদীর পাড়ে-পাড়ে, জ্যাঠামশাই পিছনে তার সূর্য-ওঠা দেখছেন, কুকুরটা সকালের রোদে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর স্টিমার ঘাটে যাত্রীরা বসে আছে, কিছু কিছু ঘাসের নৌকা, খড়ের নৌকা মাঝনদীতে···সবাই যেন গান গায় তখন, কোনখানে ভাসাইবা নাও, দুই কূলের নাই কিনারা···য্যান এই নাও ভাসাইয়া দিছে সোনা, অমলা কমলা অথবা ফতিমারে নিয়া সোনাবাবু মাঝগাঙের মাঝি হইয়া গ্যাছে।

সোনা এই নদীকে সাক্ষী রেখে কোন পাপের কথা বলতে পারল না। সে সোজা উঠে এল ফের জ্যাঠামশাইর হাত ধরে। সকালের রোদ সোনার মুখে পড়ছে। যেন মুখটা সূর্যের আলোতে জ্বলছিল।

পাগল মানুষ সোনার মুখ দেখে কি যেন ধরতে পারছেন। তিনি আশীর্বাদের মতো সোনার মাথায় হাত রাখলেন!···তোমার ভিতর বীজের উন্মেষ হচ্ছে সোনা। এই হতে হতে কিছু সময় পার হলে তুমি কিশোর হয়ে যাবে! তখন দেখবে রহস্যটা যা এখন ছুঁতে পারছ না, তা ধরতে পারবে। আরও বড় হলে, দুই কূলের নাই কিনারা, তুমি জলের ভিতর ডুবে যাবে। না ডুবতে পারলে পাড়ে-পাড়ে তার সন্ধানে থাকবে। তারপর খুঁজে না পেলে আমার মতো পাগল হয়ে যাবে।

অন্দরের দিকে যেতে সারাদিন আর সোনার ইচ্ছা হচ্ছিল না। গাছের পাতার মতো নিরিবিলি এক লজ্জা অথবা সংকোচ ওকে ঘিরে ধরেছে। সুতরাং সে সারাদিন কাছারিবাড়ির বারান্দায় বসেছিল। এবং চারপাশে যে মাঠ আছে, সেখানে ঘোরাফেরা করেছে। সে কিছুতেই গতকাল অমলা কমলার সঙ্গে দেখা করে নি।

আজ নবমী। সুতরাং মোষ বলি হবে। সকাল থেকেই এই উৎসবের বাড়ি অন্যরকম চেহারা নিচ্ছে। লালটু পলটু কাছে কোথাও নেই। ওরা বাবুদের বাড়ি-বাড়ি দুর্গাঠাকুর দেখে বেড়াচ্ছে। নদীর পাড়ে সড়ক। নদীর পাড়ে পুরানো মঠ। মঠের পাশ দিয়ে পুরানো বাড়ির দিকে একটা পথ গেছে, সেই পথে সোনা গতকাল পাগল জ্যাঠামশাইর হাতধরে গিয়েছিল পুরানো বাড়িতে। সঙ্গে রামসুন্দর ছিল। সুতরাং এমন একটা নিরিবিলি পথ, দু'পাশে বাবুদের ইটের দালান-কোঠা, এবং দীঘির কালো জল তার কাছে ভয়ের মনে হয় নি। দীঘির পাড়ে বড় অশ্বত্থ গাছ, গাছের নিচে আশ্রম। আশ্রমের পাশ দিয়ে পথটা কতদূরে গেছে সোনা জানে না। কেবল ওর মনে হয়েছিল, এই পথ ধরে গেলেই, সেই বুলতার দীঘি, এবং দীঘির দু'পাড় দেখা যায় না। বড় বড় মাছ, মাছের কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। নদীর সঙ্গে যোগাযোগ দীঘির জলের, কালো জল, জলে অজস্র রূপালী মাছ, এবং বড় একটা জলটুঙি আছে দীঘির মাঝখানে। নিচে অতল জলের ভিতর বড় একটা দ্বীপ। সোনার এসব কোন বড় দীঘি দেখলেই মনে হয়। আর মনে হয় বার-বার অমলার মুখ, এবং এটা যে কি একটা হয়ে গেল! সে পাগল জ্যাঠামশাইর সঙ্গে আর তেমন বেশি কথা বলতে পারছে না। কেবল চুপচাপ দীঘির পাড়ে কোন অশ্বত্থের ছায়ায় বসে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে। মনে হয়েছিল অমলা তাকে রূপালী মাছের খেলা, জলের নিচে খেলা, কি-যে এক খেলায় সুন্দর এক রাজপুত্র বানিয়ে তাকে নদীর পাড়ে ছেড়ে দিয়েছে।

সোনা সেই পুরানো বাড়ি—বাড়ি বলতে আর কিছু নেই, শুধু ইট-কাঠ, ভাঙা দালান এবং চুন-বালি খসা নাটমন্দির। মন্দিরে পূজা হয় দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে। এই বাড়িতেই বাবুদের প্রথম জমিদারী আরম্ভ হয়েছিল। কি যেন নাম সেই পূর্ব-পুরুষের! সোনা এখন আর তা মনে করতে পারছে না। রামসুন্দর যেতে যেতে অন্য এক হাতির গল্প করেছিল, হাতি নদী পার হতে শেকলে পরশমণির স্পর্শ, এবং হাতি বাবুদের নসীব বদলে দিয়ে গেছে। এমন সব কিংবদন্তি রামসুন্দর কি সুন্দরভাবে গাছের ছায়ায় বসে বলতে ভালবাসে। আর সে

কাছারিবাড়ির একটা টুলে নিরিবিলি বসে দেখতে পাচ্ছে, মাঠের ভিতর নবমীর মোষটা ঘাস খাচ্ছে। মোষটা বলি হবে বলে সব ছেলে ঘুরে ফিরে অথবা একটু দূরে বসে মোষটার ঘাস খাওয়া দেখছে। একটু বাদে রামসুন্দর মোষটাকে স্নান করাতে নিয়ে যাবে। সোনা, একবার মোষের মাথা নিয়ে এক কাটা মোষ যায়, সে মাঠে কাটা মোষের মাথা দেখে ধড় দেখে বনের ভেতর পথ হারিয়ে ফেলেছিল। সে জ্যান্ত মোষ কোনদিন দেখে নি। ওর মোষটার কাছে যেতে কষ্ট হচ্ছে। একবার ভেবেছিল মোষটার কাছে গিয়ে বসে থাকবে এবং ঘাস খাওয়া দেখবে। কিন্তু বলি হবে বলে ওর ভিতরে ভিতরে মোষটার জন্য কষ্ট হচ্ছিল। কাছে যেতে তার খারাপ লাগছে। মোষটার পিঠে একটা শালিক পাখি বসে আছে। পিঠে শালিক পাখি দেখেই সোনার কেন জানি মোষটাকে দুটো ঘাস ছিঁড়ে দিতে ইচ্ছা হল। মোষটা জানে না কিছুক্ষণ পরই সে মরে যাবে।

সোনার খবর নিতে অমলা দু'দু'বার বৃন্দাবনীকে পাঠিয়েছে। দু'বারই সোনা কাছারিবাড়ির কোথাও না কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। সে সাড়া দেয় নি। বৃন্দাবনী তারপর হতাশ হয়ে চলে গেছে। সোনা শুনেছে এই বৃন্দাবনীই ওদের বড় করে তুলছে। মানুষ করে তুলছে। অমলা কমলার মা খুব সুন্দর। এবং চুপচাপ কলকাতায় ঘরে একা বসে থাকে। বড় একটা জানালা আছে। জানালায় দুর্গের রেমপার্ট দেখা যায়। মেয়েদের জন্মের পর তিনি আর সেই ঘর থেকে বের হন না। রবিবারে শুধু গীর্জায় যান। কমলার বাবার চোখমুখ দেখলেও সোনার কেন জানি কষ্ট হয়। কেমন বিষণ্ণ আর উদাস। সেজন্য সোনা অমলা অথবা কমলার সঙ্গে যতটা সহজে ভাবে সে আর ভাব করবে না, কথা বলবে না, তত ভিতরে ভিতরে সে নিজেই যেন কেমন দুর্বল হয়ে যায়। তবু সেই ঘটনাটা মনে হলেই ওর কেমন ভয় করে। অমলা নিজেও একবার কমলার সঙ্গে কাছারিবাড়ি চলে এসেছে। এই, তোরা সোনাকে দেখেছিস! সোনা কোথায়? সোনাকে দেখছি না! রামসুন্দরকে তখন জিজ্ঞাসা করলে বলেছিল, মইশডার কাছে বইসা আছিল সোনাবাবু।

ওরা মাঠে নেমে গেল। যেখানে মোষটা ঘাস খাচ্ছে সেখানে এক দঙ্গল ছেলেপিলে। ওরা মোষটার চারপাশে বসে রয়েছে। অমলা সোনাকে সেখানে দেখতে পেল না।

সোনাকে ওরা দেখতে পাবে না কারণ সোনা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। চুপি চুপি অমলাকে দেখছে। সে অমলাকে ডাকতে পারছে না। সেই ঘটনার পর থেকেই সোনা কেমন নদীর পাড়ের সোনা হয়ে গেছে। সে যতটা পারল, কমলা অমলার কাছ থেকে দূরে থাকতে চাইছে। অথবা পালিয়ে পালিয়ে এ-ক'টা দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই ফের নৌকায় দেশে ফিরে যাওয়া।

ওর আর ভাল লাগছে না। মায়ের জন্য ওর খুব কষ্ট হচ্ছে, সে জানে না মায়ের কাছে কবে কিভাবে যাবে, কবে তাকে সকলে সেই ছোট্ট নদীটির পাশে পৌঁছে দেবে।

মেজ জ্যাঠামশাইকে সে কাছেই পায় না। তিনি কোথায় কখন চলে যান সোনা টের পায় না। মাঝে মাঝে স্নানের অথবা আহারের আগে তিনি বাক্স থেকে জামাপ্যাণ্ট বের করে দেন। সোনা যেন তাড়াতাড়ি লালটু পলটুর সঙ্গে স্নান আহার শেষ করে নেয়। কারণ, উৎসবের বাড়ি, কে কার দেখাশোনা করে। শুধু পাত পেতে বসে পড়া।

সোনা সকালবেলা অন্যদিন অন্দরে ঘি আর সুগন্ধ আতপ চাউলের ভাত মেখে ডাল দিয়ে অথবা কচু-কুমড়া সেদ্ধ, বাবুদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেতে বসে যায়। কাল সকালবেলা সে পুরানো বাড়ি চলে গিয়েছিল, না হলে খেতে গেলেই দেখা হয়ে যাবে অমলার সঙ্গে। আজ কোথাও যেতে পারে নি বলে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তাকে খেতে ডাকবে কেউ না কেউ। বৃন্দাবনী এসেছিল, অমলা কমলা খুঁজে গেছে। তার ভাত নিয়ে ছোট বৌরানী বসে রয়েছে। সোনা এ-বাড়িতে এসে ছোট বৌরানীরও বড় প্রিয় হয়ে গেছে। সেই সোনাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। দু'দিন থেকে সে অন্দরে ছোট ছোট বয়সের ছেলে-মেয়ের সঙ্গে বাল্য-ভোগ খেতে আসছে না। বৌরানী সোনার খোঁজে বার বার কাছারিবাড়ি লোক পাঠিয়েছে।

ভূপেন্দ্রনাথ পূজামণ্ডপ থেকে নেমে আসার সময় এক ঠোঙা সন্দেশ এনেছিল। সেই খেয়ে সোনা নবমী পূজা দেখবে বলে সকাল সকাল পাগল জ্যাঠামশাইর সঙ্গে নদী থেকে স্নান করে এসেছে। পূজার নতুন জামা-প্যাণ্ট পরেছে। মোষ বলি হবে। ছোট সিং বলেই সোনার মনে হল মোষটার বয়স কম। কম বয়সের এই মোষ এখনও ঘাস খাচ্ছে। ঘাস খেলে খস-খস শব্দ হয়। সোনা শব্দটা শুনতে শুনতে চারিদিকে তাকাল। কি সমারোহ--কত কচি মোষ। ঘাস, ফুল, ফল খেতে দিচ্ছে মোষটাকে। সেই এক রক্তজবার মালা, এখন মালা পরে মোষটা যেন ঘাসের ভিতর রাজার মতো দাঁড়িয়ে আছে। ক্রমে যত কচি-কাঁচা বালক সেই সকাল থেকে যারা জড় হচ্ছিল চারপাশে তারা এখন মোষটার নীল রঙের চোখ দেখছে। বলির সময় চোখদুটো লাল রঙের হয়ে যাবে। সোনা হাঁটতে হাঁটতে মোষটাকে পিছনে ফেলে কাছারিবাড়ির সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল। লম্বা ঘর পার হয়ে নাটমন্দিরের চত্বরে ঢুকে গেলে দেখল, কি লম্বা আর চকচকে দুটো খড়্গ নিয়ে বসে রয়েছে রামসুন্দর। কিছু ছাগশিশু, অথবা পাঠা বলি হবে। মোষ বলি হবে। রামসুন্দর বসে আছে তো আছেই। দোতলার বারান্দায় কে যেন সব চিকগুলো ফেলে দিয়ে যাচ্ছে। মোষ বলির সময় পাঁঠাবলির সময় সব বৌরানী, আর পরিজন যত আছে, চিকের ভিতর মুখ

রেখে নৃশংস ঘটনা দেখতে দেখতে হা-মা দেবী কল্যাণী, তুমি কল্যাণবতী, সুন্দরী, মহাকালের আদ্যাশক্তি বলে করজোড়ে প্রণাম করবে। ভূলুণ্ঠিত হবে।

নবমী পূজার প্রসাদ এইসব পাঁঠার মাংস। মহাপ্রসাদ। পূজা শেষ হলেই এইসব আস্ত পাঁঠা গণ্ডায় গণ্ডায় রান্নাবাড়িতে চলে যাবে। বড় বড় টাগারি ধোয়া মোছা হচ্ছে। ছাল ছাড়াবার জন্য নকুল তিনজন মানুষ নিয়ে রান্নাবাড়ির বারান্দায় দড়ি ঝুলিয়ে রাখছে। যেন বলি শেষ হলে আর কিছু পড়ে থাকে না। নিমেষে বড় বড় কড়াইয়ে এইসব পাঁঠার মাংস জ্বাল হবে। মোষটাকে সেই বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে যাবে শীতলক্ষার ও-পারের মানুষেরা। রক্ষিত জ্যাঠামশাই কাটা মোষ যারা নিতে এসেছে তাদের সঙ্গে পাওনা গণ্ডা নিয়ে রফা করছেন।

সোনা রামসুন্দরের পাশে চুপচাপ বসল। সে রামদা ধার দিচ্ছে। দুটো রামদা। উল্টে পাল্টে রামসুন্দর কি নিবিষ্ট মনে ধার দিয়ে চলেছে। সেই যে সোনা একবার সোনালী বালির নদীর চরে প্রথম তরমুজ খেতে হারিয়ে গিয়েছিল—ঈশম ছইয়ের ভিতর তামাক টানছে, সে নদীর জল থেকে একটা মালিনী মাছ ধরে এনে তরমুজের পাতায় রেখেছিল, এবং মাছটা এক সময় মরে যাবে ভাবতেই সে যেভাবে দ্রুত ছুটে গিয়ে বালির ভিতর গর্ত করে জল রেখে মাছটা ছেড়ে ভেবেছিল এবার আর ভয় নেই, মাছটা বেঁচে যাবে, এবং গর্তের পাড়ে বসে নিবিষ্ট মনে প্রতীক্ষায় ছিল মাছটা বেঁচে যাচ্ছে কিনা—ঠিক তেমনি যেন রামসুন্দরের নিবিষ্ট মনে প্রতীক্ষা রামদায়ে ধার উঠছে কিনা! সে দু'বার ঘষেই হাতের আঙুলে জিভ থেকে একটু থুথু লাগিয়ে ধার পরীক্ষা করছে। এত বড় একটা জীবের গলা এক কোপে কাটা প্রায় যেন বিলের গভীর জলে ডুব দেওয়া। ভেসে উঠতে পারবে কিনা কেউ বলতে পারে না।

ঠিক দশটায় বলি। হাঁকডাক চারপাশে। কেউ যেন চুপচাপ বসে নেই। দু'বার ওকে অতিক্রম করে মেজ জ্যাঠামশাই লম্বা বারান্দা পার হয়ে গেলেন, দু'বার রামসুন্দর ধার দিতে দিতে চোখ তুলে লক্ষ্য করেছে ছোট একটা মানুষ এইসব দেখে তাজ্জব বনে যাচ্ছে। বড়দা, মেজদা, বাবুদের ছেলেরা সবাই ছুটে ছুটে কোথাও যাচ্ছে। ওকে কতবার যাবার সময় দেখেছে—অথচ কেউ কথা বলছে না। নবমীর পূজা শেষ হলেই যেন আবার সবাই সবাইকে চিনতে পারার কথা ভাববে। সেজন্য সোনাও চুপচাপ আছে। ওর খুব ক্ষিদে লেগেছে। কাউকে বলতে পারছে না। সকালে সে ভাত খায় নি। সকালে ওর ফ্যানা ভাত খাবার অভ্যাস। কষ্টটা প্রায় সেইদিনের মতো—যেদিন সে ফতিমাকে ছুঁয়ে দিয়েছিল বলে মা ভাত খেতে দেয় নি। সোনা চুপচাপ রামদা দুটো দেখছে। কি চকচক করছে! সোনার একবার রামদা দুটোতে হাত দিতে ইচ্ছে হল। কিন্তু রামসুন্দর দা দুটো পাশাপাশি সাজিয়ে রেখেছে। একটা পাঁঠা কাটার, একটা মোষ কাটার। সে দা দুটোকে অপলক দেখছে। রামসুন্দরের এমন মুখচোখ সে কোনদিন দেখে নি। ওর কেমন ভয় ভয় করতে লাগল।

বলি হবে দশটায়। ঠিক ঘড়ি ধরে দশটায়। সবাই যেন এখন ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে আছে। খুব জোরে জোরে মন্ত্র পাঠ হচ্ছে মণ্ডপে। দ্রুত তন্ত্রধার মন্ত্র পড়ে যাচ্ছেন। দশটা ঢাক বাজলে দশটা ব্যাগপাইপ বাজবে। ঢোল বাজবে দশটা। সব দশটা করে। পাঁঠাও দশটা, শুধু মোষ একটা। মোষটা বলি হবে—কি বর্ণনা তার! সোনা মনে মনে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। মোষ বলির কথা মনে হলেই বুকটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। ঠিক সেই ঠাণ্ডা ঘরটার মতো। যেমন সে লুকোচুরি খেলার রাতে কোন এক প্রাচীন ঠাণ্ডা ঘরে শ্যাওলার ভিতর—একটা কাক কা কা করে ডাকছিল, রাতে কাক ডাকা ভাল না, অমঙ্গল হয়, সারাক্ষণ অমলা যে ওকে নিয়ে কি করছিল…! এখন রামসুন্দর দায়ে ধার উঠে গেছে বলে নিশ্চিন্তে গোঁফে তা দিচ্ছে।

এই রামসুন্দর আজ মোষ বলি দেবে। সকাল থেকেই সে অন্য মানুষ। সকাল সকাল সে নদী থেকে স্নান করে এসেছে। টিকিতে জবাফুল বেঁধেছে। ঘরে বসে সে গাঁজা খেয়েছে। সে এখন একটা আসনে পদ্মাসন করে বসে আছে। রামদা দুটো সামনে। ডাক পড়তেই সে মণ্ডপের দিকে দুই দা দুই কাঁধে নিয়ে ছুটে যাবে। সিঁদুরের ফোঁটা চক্ষুর মতো এঁকে দেবে দায়ের মাথায়। তারপর আর কার সাধ্য আছে ওর সামনে যায়!

সে সোনাকে এমন চুপচাপ পাশে বসে থাকতে দেখে বিরক্তিতে কেমন বলে উঠল, সোনাকর্তা, এহনে যান। আমি দেবীর আরাধনা করতাছি। তারপর আর কোন কথা নয়। একেবারে গুম মেরে বসে আছে।

তা বসে থাকবে। এত বড় একটা জীবকে সে এক কোপে দু'খান করবে। কি বড় আর মোটা গর্দান মোষের। কালো কুচকুচে সবল মোষ। দশটা বিশটা মানুষে যে মোষ সামলানো দায় সেই মোষ সে এক কোপে কাটতে চায়। মোষ যারা ধরবে তারাও এক এক করে এসে পড়ল, গোল হয়ে বসল এবং গাঁজা খেল। ওরা উৎকট চিৎকার করে উঠল দু'হাত তুলে। সোনা তেমনি উবু হয়ে বসে আছে। সে নড়ছে না। সে কেমন এইসব মানুষ জন দেখে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। দেয়ালে সেই সব সড়কি, বল্লম, নানারকমের লম্বা ফলা এবং তরবারি সাজানো এবং এই ঘরটাতেই রামসুন্দর দিনমান পড়ে থাকে বুঝি। হাতে তার নানারকমের শিকারের ছবি। বাঘ ভাল্লুকের ছবি এঁকে রেখেছে সে সারা শরীরে। সে যতবার ভাওয়ালের গজারি বনে বাবুদের সঙ্গে বাঘ শিকারে গেছে ততবার সে হাতে, বুকে, পিঠে অথবা কব্জিতে উল্কি পরে এসেছে নারানগঞ্জ থেকে। সে ক'টা বাঘ শিকার করেছে, ক'টা হরিণ এবং ধনেশ পাখি ওর শরীর দেখলেই তা টের পাওয়া যাবে। সোনা মাঝে মাঝে

রামসুন্দর একা থাকল উঁকি দিয়ে গুনত—এক, দুই, তিন। তারপর বলত. আপনে তিনটা বাঘ মারছেন। রামসুন্দর হাসত। তারপর সে তার হাত তুলে বগল দেখাত।—ছ্যাখেন, এহানে একটা বাঘ আছে। বাঘটারে বগলের নিচে লুকাইয়া রাখছি।

সোনা বলত, ক্যান লুকাইয়া রাখছেন ?

—বাঘটার লগে আমার খুব ভাব-ভালবাসা আছিল।

—ভাব-ভালবাসা কি ?

—আপনের বিয়া হইলে টের পাইবেন।

সোনা বলত, যান! সে একটা ঠেলা দিত রামসুন্দরকে। তারপর বলত, আমারে একটা হরিণের বাচ্চা আইনা দিবেন।

সোনার ধারণা বনে গেলেই হরিণের বাচ্চা ধরা যায়। এই যে চিড়িয়াখানা বাবুদের এবং চিড়িয়াখানার বাঘ, কুমীর এবং জোড়া হরিণের খাঁচা, সবই এই মানুষের জন্য। যেন এই মানুষ যাবতীয় বন্য জন্তু এনে পোষ মানাচ্ছে।

সে বলত, বনে গেলে ধইরা আনবেন ত ?

—রাখবেন কোনখানে ?

—বাড়ি নিয়া যামু।

—খাওয়াইবেন কি ?

—ঘাস খাওয়ামু।

—ঘাস খাইতে চায় না। বন থাইকা ধইরা আনলে গোঁসা কইরা থাকে।

—গোসা করব ক্যান ?

—জঙ্গলের জীব যে জঙ্গলে যাইতে চায়।

—অমলা কমলার হরিণ আছে। অরা গোঁসা করে না ক্যান ?

—সুন্দর মুখ, কি সুন্দর চক্ষু অগ কন। রঙখানা কি! অরা কথা বললে আপনের গোঁসা থাকে ? কথা কইলে খেলা করতে ইসছা হয় না, ভালবাসতে ইসছা হয় না!

—যান ? আপনে কেবল মন্দ কথা কন।

সেই মানুষটা এখন গুম মেরে আছে। কথা বলছে না। এমনকি এদিকে বড় এখন কেউ আসতেও যেন সাহস পাচ্ছে না, কপালের বড় রক্তচন্দনের ফোঁটা দিয়ে বসে রয়েছে, কাউকে সে ভ্রূক্ষেপ করছে না। এমন কি অমলার বাবা মেজবাবু একবার এসেছিলেন, এদিকটাতে তিনি রামসুন্দরকে এমন অবস্থায় পা ছাড়িয়ে বসে থাকতে দেখে পালিয়েছেন। কারণ ওর চোখ জবাফুলের মতো লাল। সকাল থেকে পাশের ঘরটায় ঢুকে কি খাচ্ছে পালিয়ে পালিয়ে—একটা উৎকট গন্ধ এবং ঝাঁজ। সোনা দু'বার ঘরটায় ঢুকে পালিয়ে এসেছে।

সে এখন মণ্ডপের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁ-দিকে ঝাড়লণ্ঠনে একটা জালালি কবুতর সেই কখন থেকে ডাকছে। সে প্রথম ঝাড়লণ্ঠনে নিজের মুখ দেখার চেষ্টা করল। বাতাসে ছোট কাচের নকশি কাটা পাথরগুলো দুলছে। ঠিক প্রজাপতির মতো নকশি কাটা কাচগুলো ঘুরে ঘুরে দুলছে। কেমন রিনরিন শব্দ হচ্ছে। সেই শব্দে চকিতে মুখ তুলতেই দেখল, মণ্ডপে দেবী ওর দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছেন। সে সরে দাঁড়াল। মনে হল চোখ ঘুরিয়ে ওকে দেখছেন দেবী। সে কেমন ভয়ে ভয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। বলল, ঠিক অমলা কমলার মতো বলা, ভয় পেলে সে বইয়ের ভাষায় কথা বলতে চায় অথবা বড় জেঠিমা যেমন বলেন, তেমনভাবে সে বলল, মা দুগগা, আমার জ্যাঠামশাইকে ভাল করে দাও।

গর্জনে দেবীর মুখ চকচক করছে। ধূপের ধোঁয়ায় যেন মুখ, নাকের নোলক কাঁপছে। হাতের ত্রিশূল আরও শক্ত করে চেপে ধরেছেন। মেজ-জ্যাঠামশাই একটা গরদের কাপড় পরে সারাক্ষণ চণ্ডী পাঠ করছেন। পুরোহিত ফুল-বেলপাতা চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছেন। রাশি রাশি ভোগের নৈবিদ্য এবং ফলমূলের গন্ধ। এখন বলির সময়। ঢাক বাজছে দশটা। মোষটাকে কারা আনতে গেছে মাঠে। দেবীর চোখ যেন ক্রমে লাল হয়ে যাচ্ছে। যে যার মতো সকলে মোষ বলি দেখার জন্য জায়গা করে নিচ্ছে। সোনা সেই দেয়ালে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর নড়তে পারছে না।

তখন সেই মানুষটা কত সহজে দু' কোপে দুটো বাচ্চা পাঁঠা কেটে ফেলল। সে চোখ বুজে ফেলেছে। চোখ খুলতেই ধড়টা এবং পাগুলো তিড়িং করে লাফাচ্ছে। সে বলল, মা, আমি আর পাপ কাজ করব না।

সে একটা থামের আড়ালে আছে। দোতলার চিক ফেলা। বাবুদের পরিজনেরা, দাসদাসী সবাই সেই চিকের আড়ালে। ওরা বলি দেখার জন্য চলে এসেছে। অথচ কি যে করবে সোনা, ভয়ে সে নড়তে পারছে না, সারাক্ষণ দেবী তার দিকে অপলক রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে আছে।—তুমি কি করেছ সোনা, এটা কি করেছ, এমন বলছে।

সে বলল, আমি কিছু করি নি মা। তেমনি বাতাস বইছে। নকশি কাঁথার মতো ছোট ছোট বরফি কাচ আবার আগের মতো বাতাসে দুলছে। রিন-রিন করে বাজছে। জালালি কবুতরটা চুপচাপ একটা ধুতুরা ফুলের মতো কাচের গেলাসে বসে পাঁঠা বলি দেখছে। জায়গা নেই। পাখিটা বেশ জায়গা মতো বসে গেছে। সারা মণ্ডপে, এবং নিচে, চারপাশের বারান্দায় সর্বত্র লোক। আর দোতলার চিক ফেলা। যেন অমলা কমলা এই ভিড়ের ভিতর পাঁঠা বলি দেখছে না, সোনাকে খুঁজছে। কোথায় যে গেল!

এখন কেউ তাকে দেখতে পাবে না। তাকে তার সামনের মানুষজন ঢেকে ফেলেছে। দুগগা ঠাকুর ওকে দেখতে পাচ্ছে না। সে চুপি চুপি মাথা নিচু করে

ভেগে পড়ার জন্য কিছু মানুষ ঠেলে সিঁড়ির মুখে আসতেই কে তার হাত খপ করে ধরে ফেলল। এবং ছোট মানুষ সে। তাকে কাঁধে তুলে দাঁড়িয়ে থাকল।

আর মোষটাকে তখন কারা টেনে টেনে আনছে। ধূপধুনোর গন্ধে কেমন নেশা ধরে গেছে। দুগগা ঠাকুরের মুখ দেখা যাচ্ছে না। ধোঁয়ায় একেবারে সব অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু মোষটা সব দেখে ফেলেছে। নাকে বড় নোলক দুলছে দুগগা ঠাকুরের। আর কি অপার মহিমা দু'চোখে। মোষটা এবার আরাধনা করছে এমন চোখে মুখ তুলে তাকাল। তখনই ঠেলেঠুলে বিশবাইশ জন লোক মোষটাকে হাড়কাঠে ফেলে দিল। পায়ে দড়ি বাঁধা। গলাটা টেনে জিভ বের করে চারটা মানুষ পায়ের দড়িতে হ্যাঁচকা মারতে সবল জীবটা হুড়মুড় করে নিচে গাইগরুর মতো পড়ে গেল। জিভ থেকে লালা বের করছে। গঁ গঁ শব্দ করছে। এবারে ঘাড়টা চেপে দিতেই শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল। কেউ মোষের আর্তনাদ শুনতে পেল না। ঢাক এত জোরে বাজছে আর চারিদিকে দালানকোঠা বলে এমন গমগম শব্দ যে, এই বাড়ি ঘর প্রাসাদ, প্রবল-প্রতাপান্বিত মোষ আর সোনা দুলছে। সেই রিনরিন শব্দ বাতাসে জলতরঙ্গের মতো কাচের বরফি কাটা নকশাতে। সেই দুগগা ঠাকুরের মুখ ঝলমল করছে আর কেবল রক্তপাত হচ্ছে সামনে। পশু বলি হচ্ছে, মেজ জ্যাঠামশাই পশুর মুণ্ডু নিয়ে মণ্ডপে সাজিয়ে রাখছে। মাথায় ঘিয়ের ছোট ছোট মাটির প্রদীপ জ্বেলে দেওয়া হচ্ছে। সব শেষে মোষ বলি। বাদ্যি যারা বাজাচ্ছে, তারা নেচে নেচে বাজাচ্ছে। হাত তুলে সকলে জয়ধ্বনি করছে, দুগগা ঠাকুর কি জয়, শ্রীশ্রীচণ্ডীমাতা কি জয়, মা অন্নপূর্ণা কি জয়! আদ্যাশক্তি মহামায়া কি জয়! অসুরবিনাশিনী, মধুকৈটবসংহারিণী কি জয়, মা অন্নপূর্ণা কি জয়! রামসুন্দর সেই খাঁড়াটা নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। প্রতিমার মুখ কাঁপছে। যেন সে এখন মহিষমর্দিনী, এবং এই মহিষের রক্তপানে খড়্গ হাতে নিজেই নেচে বেড়াবে।

মোষটাকে যারা ঠেলেঠুলে হাড়কাঠে ফেলে দিয়েছিল তারা সবাই মোষটার পিঠে চেপে বসেছে। তাঁবুর খোঁটা পোঁতার মতো চারজন লোক চারপাশে দড়ি টেনে রেখেছে। মানুষগুলোর চাপে ঘাড়টা লম্বা হয়ে যাচ্ছে মোষের। কালো চামড়া নীল নীল হয়ে যাচ্ছে অথবা ফেটে যাচ্ছে মনে হয়। ক্রমান্বয়ে ঘি মাখানো হচ্ছে গর্দানে। সোনা উঁকি দিয়ে আছে। ওকে কে কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখন দেখার সময় নেই। সে চিকের আড়ালে আছে। এ-পাশে দাঁড়ালে চিক চোখে পড়ে না। সে এখন অপলক একবার দেবীর মুখ দেখছে আর রামসুন্দর যে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে খড়্গ হাতে এবং এসেই দেবীর শ্রীচরণে ভূপতিত হয়ে—মাগো, তুই মা অন্নপূর্ণা, তোর কি করুণা মা, বলে হাউহাউ করে কাঁদছে রামসুন্দর, এসব দেখে সে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। এই যে খড়কুটো দিয়ে তৈরি মাটির প্রতিমা, চিমটি কাটলে রঙ এবং মাটি উঠে আসবে,

এখন তার কি মাহাত্ম্য, করজোড়ে বাবুরা সব দাঁড়িয়ে আছে। আর পুরোহিত ঘণ্টা বাজাতেই, ফুল-বেলপাতা দিতেই রামসুন্দর মোষটার সামনে দাঁড়াল। এখন মোষটা লেজ গুটিয়ে নিচ্ছে। একটা লোক চুলের বেণীর মতো লেজটাকে দুমড়ে ধরে আছে। লেজটা সেজন্য কাঁপছে।

তখন রামসুন্দর মা মা বলে চিৎকার করে উঠল, মা তোর এত লীলা, মা মা, বলতে বলতে খড়্গ উপরে তুলল না বেশি। হাতখানেক উপর থেকে কোপ বসিয়ে দিল। খড়্গ সোনার চোখের সামনে তুলে উঠেই অদৃশ্য হয়ে গেল—কি যে হয়ে যাচ্ছে, মুণ্ড ছিটকে পড়েছে, ধড়টা গড়িয়ে পড়ছে। কলসী থেকে জল পড়ার মতো মোষের ঘাড়টা এখন রক্ত ওগরাচ্ছে। মেজ জ্যাঠামশাই সেই মুণ্ডুটা মাথায় তুলে নিলেন। তিনি যে কত শক্ত মানুষ, দেবীর সামনে তিনি যে কি মহাপাশে আবদ্ধ, এখন যেন সোনা তা টের পাচ্ছে। তিনি মাথায় মুণ্ডু নিয়ে হাঁটতে থাকলেন। সোনা বস্তুত রামসুন্দর উপরে খড়্গ তুলতেই চোখ বুজে ফেলেছিল। সে চোখ খুলতেই দেখল, জ্যাঠামশাই মোষের মুণ্ডু নিয়ে মণ্ডপে যাচ্ছেন। সেই মানুষটা সোনাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে এখন মোষের রক্ত ধরার জন্য খুরি নিয়ে হাড়কাঠের নিচে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। রক্ত নিয়ে সকলের কপালে ফোঁটা টেনে দিচ্ছে। মা ঈশ্বরী করুণাময়ী! চিমটি কাটলে তোর মা রঙ মাটি উঠে আসবে, খড় বেরিয়ে পড়বে, তুই মা দেখালি বটে খেলা। সেই পাগল মানুষ এখন এইসব মানুষের উন্মত্ত অবস্থা দেখে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ছে। সোনা ভিড়ের ভিতর জ্যাঠামশাইকে দেখতে পাচ্ছে না। যারা রক্ত কাড়াকাড়ি করে নিয়ে যাচ্ছে কচুপাতায় অথবা কলাপাতায়, যারা খুরি আনতে ভুলে গেছে তাদের থেকে সোনা সরে দাঁড়াল। ওরা কেমন পাগলের মতো হাতে পায়ে রক্ত লাগিয়ে ছুটোছুটি করছে। সে ভয়ে সিঁড়ির মুখে যেখানে পথটা অন্দরের দিকে চলে গেছে, তার একপাশে একটা থাম, সে থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখছে। এইসব দেখতে দেখতে ওর যে খুব খিদে পেয়েছে ভুলে গেল। নিজেকে বড় একা এবং অসহায় লাগছে। মার কথা মনে হল। কতদিন সে মার পাশে শুচ্ছে না। মার পাশে না শুলে তার ঘুম আসে না। মায়ের শরীরে একটা পা তুলে না দিলে, মাকে পাশবালিশের মতো ব্যবহার না করলে সোনার ঘুম আসে না। ভিতরে ভিতরে সে এখন মায়ের জন্য কষ্ট পাচ্ছে।

মার জন্য না ক্ষুধার জন্য বোঝা যাচ্ছে না—কারণ সোনা এখন থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সকাল থেকে সে প্রায় কিছুই খায় নি, চোখ-মুখ কি শুকনো দেখাচ্ছে, সে চারপাশে এত লোক দেখছে, অথচ কিছু বলতে পারছে না। সে আজ মেজ জ্যাঠামশাইকে কিছু বলতে ভয় পাচ্ছে। বড়দা মেজদা ওকে আমল দিচ্ছে না। মোষ বলি হলেই ওরা আবার বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেছে। এখন রান্নাবাড়িতে দশটা

পাঁঠার মাংস রান্না হচ্ছে। মহাপ্রসাদ হলেই পাত পড়বে বড় উঠোনে। সকলে খেতে বসবে, তখন সোনাও দুটো খাবে—সে থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি রান্নাবাড়ি থেকে কখন খাবারের ডাক আসে সেই আশায় দাঁড়িয়ে আছে। এবং তখন কেন জানি মায়ের কথা মনে হলেই চোখ ফেটে জল আসছে সোনার।

সিঁড়িতে তখন দ্রুত নেমে আসছে মনে হল কেউ। সে পিছন ফিরে দেখল অমলা কমলা। ওরা বলল, সোনা, তুই ফোঁটা দিস নি?

সোনা বলল, না।

আয়, ফোঁটা দিবি। বলে অমলা কোথা থেকে একটা খুরি নিয়ে এল। জমানো রক্ত। সেই রক্ত থেকে সোনার কপালে ফোঁটা দিয়ে দিল। বলল, এ-দিনে ফোঁটা না দিলে তুই বড় হবি কি করে? তোর পুণ্য হবে কি করে?

কিন্তু সোনা কিছু জবাব দিচ্ছে না। সে অন্ধকার মতো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সে কেবল ওদের দেখছে। সেই এক জরির কাজ করা ফ্রক গায়। হাতে ছোট্ট দামি ঘড়ি, এবং বালা, সরু আঙুলে হীরের আংটি। ববকাট চুলে সাদা রিবন বাঁধা। গায়ে পদ্মফুলের মতো সুবাস।

সেই আবছা অস্পষ্ট জায়গাটিতেও অমলা ধরতে পারল, সোনা কাঁদছিল। সে বলল, কি রে, তোকে আমরা সেই সকাল থেকে খুঁজছি। তুই ছিলি কোথায়?

সোনা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

কমলা বলল, চল, ছোট কাকিমা তোকে ডাকছে।

সোনা বলল, মোষ বলি আমি কোনকালে দেখি নি।

অমলা বলল, সোনা, তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলি!

—যা, আমি কাঁদব কেন।

—তুই ঠিক কেঁদেছিস। আমি সব দেখেছি।

সোনা ধরা পড়ে গেছে ভাবতেই বলল, ফোঁটা দিলে আমার আর কোন পাপ থাকবে না?

না। বলেই অমলা সোনার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, এদিকে আয়। সে সোনাকে একটু ভিতরের দিকে নিয়ে গেল। বলল, কি রে, কাউকে বলিস নি ত!

—না।

—তুই আমাকে পিসি বলতে পারিস না! আমি তো তোর কত বড়।

—পিসি ডাকতে আমার লজ্জা লাগে অমলা।

—তবু তুই আমাকে পিসি ডাকবি। মান্য করবি, কেমন!

সোনা জবাব দিল না।

—আজ আসবি সন্ধ্যার পর ছাদে।

—ধ্যৎ। বলেই সে এক দৌড়ে পালিয়ে গেল।

আর সেই নাটমন্দিরে এখন কাটা মোষ পড়ে। মণ্ডপে দশটা পাঁঠার মাথা,

মাঝখানে মোষের মাথা। মাথায় প্রদীপ, প্রদীপ জলতে জলতে কোনটা নিভে গেছে। সবক'টা মাথার চোখ এখন দেবীর দিকে তাকিয়ে আছে। এখন ভিড়টা নেই। একটু রক্ত হাড়কাঠে পড়ে নেই। ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে। সোনা সোজা দীঘির পাড়ে চলে এল। রোদ উঠেছে খুব। শরতের বৃষ্টি সকালে হয়ে গেছে। সবকিছু তাজা, ঘাস ফুল পাখি সব। তবু কেন জানি সোনার কিছু ভাল লাগছে না। সে তখন দেখল পাগল জ্যাঠামশাই ময়ূরের ঘরটাতে বসে রয়েছেন। উত্তরের আকাশে একটা কালো মেঘ। সেই মেঘ দেখে ময়ূর পেখম মেলেছে। পাগল জ্যাঠামশাই সেই ময়ূরের পেখম দেখতে দেখতে কেমন তন্ময় হয়ে গেছেন।

সোনা ডাকল, জ্যাঠামশাই!

মণীন্দ্রনাথ যেন ধরা পড়ে গেছেন এমনভাবে তাকালেন। কেমন অপরাধী মুখ। সোনা সেসব লক্ষ্য করল না। শুধু চুপি চুপি বলল, চলেন, বাড়ি যাই গিয়া। ওর যে ভাল লাগছে না আর, এমন কথা বলল না।

কিন্তু মণীন্দ্রনাথ যেন ধরতে পেরেছেন সোনা কিছু খায় নি এখন পর্যন্ত। ওর ক্ষুধায় চোখ মুখ কোথায় ঢুকে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন তিনি। এবং সোনাকে নিয়ে সোজা রান্নাবাড়িতে ঢুকে কোনদিকে আর তাকালেন না। দুটো কলাপাতা নিজেই নিয়ে এলেন। মাটির গ্লাসে জল রাখলেন। তারপর বারান্দা পার হয়ে ঠাকুরকে হাত তুলে ইশারা করলেন।

নকুল বুঝতে পারছে, এই পাগল মানুষ তার নাবালক ভাইপোটিকে খেতে দিতে বলছেন। মহাপ্রসাদ এখনও নামে নি। বড় উঠোনে লম্বা পাত পড়ছে। সেখানে সে উঠে যেতে বলতে পারত। কিন্তু তিনি যখন এসেছেন তখন কার সাধ্য না দেয়। নকুল নিজেই ওকে ভাত বেড়ে দিল। পাগল মানুষ নিবিষ্ট মনে ভাত মেখে সোনাকে বড় বড় গ্রাসে খাওয়াতে লাগলেন। জল খেতে দিচ্ছেন। নুন মেখে দিচ্ছেন। যেমনটি করলে সোনার খেতে ভাল লাগবে তেমনটি করছেন।

অথচ সোনা খেতে পারল না। কারণ আসার সময় সে মণ্ডপের সামনে কাটা মোষটাকে পড়ে থাকতে দেখেছে। এমন কুৎসিত দৃশ্য আর এই পাঁঠার মাংস—ওর কেমন ভিতর থেকে ওক উঠে আসছিল।

জ্যাঠামশাই খেয়ে এলে সে ওর সঙ্গে ঘুমাতে পারল না। সে দেখল পাগল জ্যাঠামশাই চুপচাপ একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন বারান্দায়। আশ্বিনের কুকুরটার জন্য তিনি ভিন্ন খাবার এনেছেন ঠোঙা করে। পেটভরে খেয়ে কুকুরটা পায়ের কাছে ঘুমাচ্ছে। তিনি ঘুমান নি। মেজ জ্যাঠামশাই সারাদিন পর দুটো খেয়ে শুতে না শুতেই নাক ডাকাচ্ছেন। সে বুঝল এই সময় বের হয়ে যাওয়ার। সে জ্যাঠামশাইকে নিয়ে এখন পিলখানার দিকে চলে যাবে। এই সময়। হাতিটার কাছে গিয়ে একটু বসা যাবে। সেখানে গেলে বুঝি এই যে ভয়, এক

ভয়, কাটা মোষ পড়ে আছে, কাটা মোষের ভয়ে সে যেন হাতিটার কাছে চলে যাচ্ছে। অথবা এখন দেখে মনে হবে সে তার পাগল জ্যাঠামশাইকে হাতি দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। হাতি দেখিয়ে, ঘাস ফুল পাখি দেখিয়ে সে তার পাগল জ্যাঠামশাইকে নিরাময় করে তুলবে।

বাগানের ভিতর দিয়ে ওরা হাঁটতে থাকল। সামনে শীতলক্ষা নদী। নদীর পাড়ে পাড়ে ওরা হাঁটবে। মাথার ওপর নির্মল আকাশ। দু'পাশে পাম গাছ। আর নদীর পাড়ে পাড়ে কত মানুষ। ওরা প্রায় পালিয়ে হাতি দেখতে চলে যাচ্ছে। কেউ দেখছে না এমনভাবে চুপি চুপি সোনা জ্যাঠামশাইর হাত ধরে চলে যাচ্ছে। কেবল কাছারিবাড়ি পার হলে যাত্রা পার্টির অধিকারী মানুষটি দেখে ফেলল। সে রামায়ণ পাঠ করছিল, চশমার কাচ ঘষে বাগানের ভিতর দিয়ে কারা যাচ্ছে লক্ষ্য করতেই বুঝল সেই পাগল মানুষ তার নাবালকের হাত ধরে কোথায় যাচ্ছেন। এই মানুষকে দেখলেই কেন জানি রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা মনে হয় অধিকারী মানুষটির। গাছপালার ভিতর দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। আবছা আবছা মুখ, হাত-পা এবং কুকুরের ছায়া চোখে পড়ছে। সে যেন সারা জীবন পালাগানে এমন একজন উদাস মানুষের ভাব ফুটিয়ে-তুলতে চেয়েছে—যে কেবল সামনের দিকে হাঁটে, কোনদিকে তাকায় না। সে পারে নি। মানুষটাকে দেখেই ওর কেমন বড় একটা নিশ্বাস উঠে এল।

সোনা কিন্তু জ্যাঠামশাইর সঙ্গে বের হতে পেরেই যাবতীয় দুঃখ ভুলে গেল। সে আগের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। সে বার বার জ্যাঠামশাইকে সাবধান করে দিচ্ছে, যেন হাতির সঙ্গে জ্যাঠামশাই কোন দুষ্টুমি না করে। করলেই সে তার বাবাকে, না হয় মেজ জ্যাঠামশাইকে বলে দেবে এমন ভয় দেখাতে লাগল।

ওরা কালীবাড়ি যাবার পথে এসে পড়ল। বাজারের ভিতর দিয়ে কালীবাড়ি যাবার একটা রাস্তা আছে। কিন্তু পিলখানায় যেতে হলে অতদূরে যেতে হবে না। ডানদিকের উমেশবাবুর মঠ, মঠের উত্তরে সুপুরির বাগিচা। বাগিচা পার হলেই একটা আমবাগান। বাগানের ভিতর হাতিটা বাঁধা থাকে। কিন্তু সে এখন কোথাও জায়গাটা আবিষ্কার করতে পারছে না। সে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েই ঘণ্টার শব্দ পেল। এবং মনে হল বাগানের ভিতর ঢুকে গেলেই সে হাতিটাকে আবিষ্কার করে ফেলবে। কিন্তু কোন্‌দিকে যে হাতিটা আছে! তারপরই মনে হল সকালে পিলখানায় থাকে, দুপুর হলে জসীম হাতিটাকে নদীতে স্নান করাতে নিয়ে যায়, তারপর বনের ভিতর কিছুক্ষণ বেঁধে রাখে। খাবার দেওয়া হয়। কলাগাছ আর ষত মাঁদারের ডাল। দশমীর দিনে হাতি এখানে থাকবে না। সকাল হলেই জসীম বাবুদের বাড়ি বাড়ি হাতি নিয়ে যাবে। চালচিড়া মুড়ি মোয়া সন্দেশ হাতির জন্য চেয়ে নেবে। খুব সকাল সকাল সে

হাতিটার কপালে চন্দনের তিলক পরাবে। শোলার রঙ-বেরঙের লালনীল অথবা জরির চাঁদমালা বেঁধে দেবে মাথায়। কমলা বলেছে ওরা কাল হাতির পিঠে চড়ে দশহরা দেখতে যাবে। অমলা বলেছে, সোনা, তুই আমাদের সঙ্গে যাবি। সোনা কিছু বলে নি। সে এখন হাতিটা কোন দিকে, কোন বনের ভিতর এবং মাঠের পাশ দিয়ে যাবে, না সোজা দৌড়াবে বুঝতে পারল না। কেবল কুকুরটা সোজা বনের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে এবং ঘেউঘেউ করছে। সে বুঝল, কুকুরটা হাতিটাকে দেখে ফেলেছে।

তাড়াতাড়ি ওরা কুকুটাকে অনুসরণ করে ভিতরে ঢুকে গেল। বনের ভিতর ঢুকে সোনা দেখল হাতিটা দুলছে, সামনে পিছনে দুলছে। এই বন গাছপালা পাখি নিয়ে তার হাতি বেশ আছে। হাতির পায়ে শেকল। সে বেশিদূর এগোতে পিছুতে পারছে না। সোনা, জ্যাঠামশাইর পাশে—যেন ওরা দুই মুগ্ধ বালক হাতিটাকে নিবিষ্ট মনে দেখছে। তখনই হাতিটা হাঁটুমুড়ে বসে পড়ল। এবং সোনাকে, পাগল জ্যাঠামশাইকে চিনতে পেরে সেলাম দিল।

আর আশ্বিনের কুকুরটাও হিজ্‌ মাস্টার্স ভয়েসের মতো ওদের পাশে বসে ঘেউঘেউ করে উঠল। যেন বলতে চাইল, আমাকে চিনতে পারছ না, আমি আশ্বিনের কুকুর। সোনাদের বাড়িতে আমি থাকি। তোমার সঙ্গে একবার নদী পার হয়েছিলাম, মনে নেই!

সোনা এবার হাতি না দেখে জ্যাঠামশাইর মুখ দেখল। শিশুর মতো হাতির দিকে তাকিয়ে হাসছেন তিনি। এই হাসি দেখে সহসা কেন জানি মনে হল, জ্যাঠামশাই ভাল হয়ে যাচ্ছেন। চোখে মুখে সরল অনাবিল হাসি। সে মায়ের কথা, অমলা কমলার কথা অথবা ফতিমার কথা ভুলে আনন্দে জ্যাঠামশাইর পিঠে দু'হাতে গলা জড়িয়ে দুলতে থাকল। সোনা বলল, জ্যাঠামশাই বলেন ত, এক। পাগল মানুষ বলল, এক। বলেন দুই। তিনি বললেন, দুই। হাতিটা তখন শুঁড় দোলাচ্ছে। গলায় তার ঘণ্টা বাজছিল। জ্যাঠামশাই এক-দুই-তিন করে ক্রমান্বয়ে ঠিক ঠিক গুণে যাচ্ছেন। সোনা পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক দুই তিন অথবা একে চন্দ্র, দু'য়ে পক্ষ, তিনে নেত্র—যেন দুই নাবালক বনের ভিতর জীবনের নামতা পাঠ নূতন করে ফের আরম্ভ করেছে—সোনা সুর করে পড়ে যাচ্ছে, জ্যাঠামশাই ঠিক ঠিক অবিকল উচ্চারণ করে নামতা পড়ছেন।

সোনা হঠাৎ এই নির্জন বনের ভিতর আনন্দে দু'হাত তুলে চিৎকার করে উঠল, বাবা-মা, মেজদা বড়দা, ছোটকাকা, জ্যেঠিমা, আমার জ্যাঠামশয় ভাল হইয়া গ্যাছে। এই বলতে বলতে সে বনের ভিতর ছুটে ছুটে ঘুরে বেড়াতে থাকল। কুকুরটাও ছুটে বেড়াচ্ছে। হাতির গলায় ঘণ্টা বাজছে। পাগল মানুষ চুপচাপ বসে কেবল গুণে যাচ্ছেন—এক দুই তিন, চার পাঁচ ছয়, সাত আট নয়।

সেই যে মালতী শুয়ে থাকল আর উঠল না। মালতীর তিন দিন পরে জ্ঞান ফিরেছে। চোখ মেলে তাকিয়েছে। কি যেন বলতে গিয়ে ঠোঁট কেঁপে উঠছে। বলতে পারছে না। আঁচল দিয়ে মালতী নিজের মুখ ঢেকে রেখেছে। যত জোটন আঁচল ফেলে কথা বলতে চেয়েছে, তত মালতী মুখের ওপর আঁচল তুলে দিয়ে কেমন শক্ত হয়ে পড়ে থাকছে।

মালতীর জ্ঞান ফিরলে, এই যে জোটন—যার যৌবন নেই শরীরে, যে পীরের দরগায় এসে গেছে এবং যার স্বভাব ছিল পান-সুপারি অথবা সামান্য খুদ-কুঁড়ার জন্য বাড়ি বাড়ি ধান ভেনে দেওয়া, চিঁড়ে কুটে দেওয়া, সেই জোটনকে দেখে প্রথম মালতীর যেন হাতে আকাশ পাবার মতো অবস্থা। তার ওপর কি মনে হতেই মালতী সব ভবিতব্য ভেবে শক্ত হয়ে গেল। এবং এখন মনে হচ্ছে জোটন ওর বড় শত্রু। বনবাদাড়ে, সে কোথায় যে ছিল মনে করতে পারছে না। কি ভাবে এখানে এলো তাও মনে করতে পারছে না, কেবল মনে পড়ছে সে হোগলার বনে ঢুকে লুকিয়ে ছিল। তারপর তিন জীব, মনুষ্যকুলের যেন তারা কেউ নয়, তাদের দেখে সে সংজ্ঞা হারিয়েছিল। তারপর এখানে। এবং এ জোটনের কাজ। সে আস্তানাসাবের দরগায় এখন। তাকে ওরা বনবাদাড়ে ফেলে চলে গেছে। এই জোটন ওর এত বড় শত্রুতা কেন করল! বনবাদাড়ে পড়ে থেকে এক সময় মরে গেলে অন্ততঃ এ পোড়ামুখ আর দেখাতে হত না কাউকে। সে জোটনের কথায় সেজন্য কোন উত্তর দিচ্ছে না।

ফকিরসাব দুধ এনে গাছতলায় বসে আছেন। এই দুধটুকু এখন গরম করে খেতে হবে। মালতীকে স্নান করতে হবে। মালতী হিন্দু বিধবা যুবতী। ভিজা কাপড়ে দুধটুকু গরম করে খেতে হবে। এই মাচান এবং ছই সব কিছুতেই এক অপবিত্র ভাব, মালতী জেগে গেলেই টের পাবে। জোটন ডাকল, ওঠ মালতী, তারপর সে বলতে চাইল, যেন উঠে স্নান করে আসে মালতী। কাঠ, নতুন সরা, দুধ সব ঠিক আছে, যেন গরম করে মালতী দুধটুকু খেয়ে নেয়। দুধটুকু গরম করে দিতে জোটন সাহস পাচ্ছিল না। কারণ হিন্দু বিধবার আচার-নিয়ম অনেক। জোটন সব ঠিক করে রেখেছে। কাঠ, উনুন, নতুন পাতিল সব। যেন বলার ইচ্ছা, এই যে মেয়ে তুমি এত কাল যৌবন বাইন্দা রাখছ, স্বপ্ন দ্যাখছ, সোয়ামির মুখ দেইখা মামদোবাজি খেলা খেলছ—আর এখন কিনা কিছু জান না। অর্থাৎ যেন বলার ইচ্ছা—কি আছে, আর যা হইবার হইছে। এডা ত আর হাড়ি-পাতিল না। এডা ত সোনার অঙ্গ।

ছুঁইয়া দিলে জাত যায় না। কার জাত! তোমার না মানুষের? জোটন নানাভাবে মালতীকে বুঝ-প্রবোধ দিচ্ছিল।—ওঠ মালতী, উইঠা খা। দুধ গরম কইরা খা।

মালতী উঠল না। শক্ত হয়ে পড়ে থাকল।

জোটন ফকিরসাবকে বলল, কি করন যায়?

—কি করতে কন?

—নরেন দাসরে একটা খবর দিতে হয়।

—তবে ছান।

—আমি দিমু কি কইরা? আমি একলা যাইতে পারি! জোটন দুঃখের গলায় বলল।

—এই যে কইলেন, পানিতে নাও ভাসাইলে আপনে লগি বাইবেন। দুগগা ঠাকুর দ্যাখতে যাইবেন কইলেন।

—তামাশা রাখেন। কি করবেন কন্!

—আমি কি কমু।

—যা মনে লয় করেন। বলে জোটন বিরক্ত মুখে ছইয়ের নিচে ঢুকে বলল, ওঠ মালতী। লক্ষ্মি, আমার সোনা। দুধ গরম কইরা খা। তারপরে ল তরে দিয়া আসি।

মালতী এবার বিস্ময়ের চোখে তাকাল।

—তরে দিয়া আমু।

মালতী ধড়ফড় করে উঠে বসল।

—আমি আর ফকিরসাব তর লগে যামু।

মালতী দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে থাকল। এ-পোড়ামুখ নিয়ে সে যাবে কি করে। সে ভিতরে ভিতরে হাহাকারে ডুবে যাচ্ছিল। না না, আমি কোথায় যাব! কার কাছে যাব। আমি যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব জোটন। আমি জলে ডুবে মরে যাব।

—কি হইছে তর? কিছু হয় নাই।

এই প্রথম কথা বলল মালতী।—আমি কই যামু?

ফকিরসাব এবার গাছতলা থেকে এলেন।—যাইবেন না তো খাইবেন কি? আমি ফকির মানুষ। গাছ পাতা খাইয়া বাঁচি, আপনেরে কোনখান থাইকা দুধ ঘি আইনা খাওয়ামু?

মালতী এই মানুষের মুখ দেখে ভয়ে ফের বিবর্ণ হয়ে গেল। পাকা দাড়ি থেকে এখন জল টপটপ করে পড়ছে। ভিজা গামছা পরে বসে আছেন। হাতে গলায় বড় বড় পাথরের মালা। রসুনগোটার তেলে কাজল, সেই কাজলে সুর্মা টেনেছেন ফকিরসাব। জোটন ছইয়ের ভিতর বসে হাসছিল। ফকিরসাব প্রায়

তেড়ে আসার মতো মাচানের কাছে উঠে এলেন। বললেন, ওঠেন কইতাছি। ওঠেন। সান করেন, দুধ গরম কইরা খান। বুড়া মানুষ আমি, পানি ভাইঙা সাঁতার কাইটা দুধ লইয়া আইছি। তাইন এখন খাইবেন না!

মালতী নড়ল না।

ফকিরসাব এবার চোখ গরম করে চোখ লাল করে ভয় দেখালেন মালতীকে। —খাইবেন না আপনে। আপনের চোদ্দ গুষ্টি খাইব। বলে, ফকিরসাব আস্ত একটা কাঠ এনে বললেন, ওঠেন। আমি কিন্তু পাগল মানুষ। এহনে সান কইরা দুধ গরম কইরা না খাইলে আগুন লাগাইয়া দিমু।

জোটন ফকিরসাবের কথায় সায় দিল। আ ল ওঠ তুই। পাগল ক্ষেইপা গেলে রক্ষা নাই। তুই না খাইলে সব ফিরা পাবি! পাইলে আমি তরে খাইতে কইতাম না। ওঠ।

ফকিরসাব বললেন, কার অঙ্গ! অঙ্গ আপনের, সোনার অঙ্গে কালি লাগলে ধুইয়া ফেলান। সোনার অঙ্গে কালি ততক্ষণ লাইগা থাকে! ঠাইরেন, গাঙ্গের পানিতে কত কিছু ভাইসা যায়, কিন্তু ঠাইরেন, মা জননীর কি কিছু হয়? যেন ফকিরসাবের বলার ইচ্ছা, মাগো জননী, নদীতে এঁটো থাকে না, বরফে এঁটো থাকে না। মাগো জননী, আপনেরা নিজের জলে নিজে ধুয়ে যান।

তবু মালতী উঠল না। ছইয়ের নিচে নেমে এল না। মাথা গুঁজে এক কোণায় বসে থাকল।

জোটন ফকিরসাবকে বলল, কি করবেন। চোখ মুখ কই গ্যাছে গিয়া। ক'দিন না খাইয়া আছে কে জানে! কিছু ত কয় না।

ফকিরসাব বললেন, যাই একবার। পানি ভাইঙ্গা যাই। বড় মিঞার কোষা নাওটা আনতে পারি কি না ছাখি। তারপর চলেন আল্লার নামে তরী ভাসাই।

এক ক্রোশ পথ সাঁতার কাটলে ডাঙায় হাঁটলে সেই দুই চার ঘর বসতি। পথে যেতে যেতে একবার বমি করলেন ফকিরসাব। এই বর্ষা এলে বড় অনটন ফকিরসাবের। দুই ছাগল, তার দুধ আর শাপলা শালুক। এখন সে জল সাঁতরে মুসকিলাশান নিয়ে যেতে পারে না, যা কিছু পায় ইন্তেকালের সময়। শাপলা শালুক খেয়ে পেট কেমন ভার হয়ে আছে।

কোষা নৌকা নিয়ে আসতে আসতে বেলা হয়ে গেল। ফকিরসাব কিছু খেলেন না। জোটন এক বদনা পানি ঢক ঢক করে খেল। দুধটুকু সঙ্গে নিল। সরা এবং কাঠ সব তুলে নিল পাটাতনে। একটা মাটির উনুন পর্যন্ত। সব ঠিক করে ফকিরসাব বললেন, ঠাইরেন, মা জননী, ওঠেন আইসা। ছাগল দুটোকে এনে মাচানের নিচে বেঁধে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

এবার কিন্তু জোটন মালতীকে তুলতে গিয়ে দেখল, উঠতে পারছে না

মালতী। কোমরে ভীষণ ব্যথা। রসুন গোটার তেল এক শিশি নিল সঙ্গে। মালতীকে বলে দিল এটা যেন বাড়িতে মালিশ করে।

জোটন মালতীকে শক্ত করে ধরল। মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারে। কি চেহারা হয়ে গেছে! চোখমুখে কালি পড়ে গেছে। সোনার অঙ্গে কে আগুন ধরিয়ে চলে গেল। জোটন ভয়ে এখন মালতীর দিকে তাকাতে পারছে না। যেন আত্মহত্যার কথা ভেবে এই মেয়ে এখন বসে আছে। সুযোগ সুবিধা পেলেই আত্মহত্যার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ভিতরে ভিতরে কষ্ট ফকিরসাবের। ফকির মানুষ বলেই অসুখ বিসুখ থাকতে নেই। জোটন এসে একদিনও মানুষটাকে অসুস্থ দেখে নি। এই সকালে পেটে এমন গণ্ডগোল—কিন্তু কারে বলা যায়? ভিতরে ভিতরে যন্ত্রণা হচ্ছে, কি যেন এই পেটের ভিতর হচ্ছে জ্বালা মত এক ভাব, তিনি যেমন অন্য সময়ে লতাপাতার রস খান, তেমনি বনের ভিতর ঢুকে দু'হাতে পাতা কচলে মুখের ভিতর কিছু রস ফেলে দিলেন। এই রস খেলেই শরীরের সব যন্ত্রণা মরে আসবে। ধীরে ধীরে নিরাময় হবেন তিনি।

ফকিরসাব জোটনকে বললেন, আপনে দুইডা যা হয় কিছু মুখে দিয়া লইতে পারতেন। আমার ক্ষিদা নাই।

জোটন বলল, কি কইরা খাই কন। মালতী খাইল না। আমি খাই কি কইরা!

ফকিরসাব এবার খোলামেলা জায়গায় মালতীকে ভাল করে দেখলেন। সত্যি ওকে ভাল দেখাচ্ছে না। ফিসফিস করে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে দিলেন, যেন জোটন ওকে ধরে বসে থাকে। লক্ষণ ভাল না! কি যে হবে! কি যে করা! এখন এই যুবতীর মাথা ঠিক নেই। পাগল পাগল চেহারা। যুবতী নারী সতী হলে যা হয়। নদীর পাড়ে ফকিরসাব বালক বয়সে এক নারীর সতী হবার গল্প শুনেছিলেন। গল্পের সেই চোখ-মুখের চেহারা এই মালতীর চোখে মুখে। সারাক্ষণ বসে বসে কেবল আত্মহননের কথা ভাবছে।

জোটন মালতীকে কোষা নৌকার মাঝখানে বসাল। ফকিরসাব মুসকিলা-শানের লম্ফ নিলেন সঙ্গে। যখন বের হয়েছেন, দু'চারদিন কি দু'চার হপ্তাও হতে পারে। গাঁয়ে গাঁয়ে লম্ফ নিয়ে ঘোরা যাবে। কোষা নৌকা আনতে গিয়ে বলেছেন ফকিরসাব, যেমন বলে থাকেন, যামু একবার বিবিরে লইয়া, নদী-নালায় কয় রাইত ভাইসা থাকমু, তেমন এবারেও বললেন, লম্ফ নিয়া যাইতেছি পেটে টান পড়ছে বিবির। আর কি য্যান কয়, বিবি কয় বাপের বাড়ি দুগগা ঠাকুর ছাখতে যাইব। তা একবার ছাখাইয়া আনি। ফকিরসাব ইচ্ছা করেই মালতীর কোন খবর কাউকে বলেন নি। এমন খবর পেলে লোকজন ছুটে আসতো দরগায়। তবে এই দরগাতেই থানা পুলিস আরম্ভ হয়ে যাবে। অথবা

নাও হতে পারে। কারণ এখন জাত মান কুল নিয়ে কথা। মালতীর মুখে চোখে সেই জাত মান কুলের কলঙ্ক লেপ্টে আছে অথবা সে এক কলঙ্কিনী যেন—হায়, কি যেন তার কেবল জলে ভেসে যায়। রঞ্জিত, ছোট ঠাকুর, নরেন দাস এবং গ্রামের সকলে ওর চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন। এই মেয়ে বনবাসে যাবে। এই মেয়ের জাত মান নেই। কলঙ্কিনী। এমন সব কথা মনে আসছিল মালতীর।

সহসা ফকিরসাব দেখলেন, পাটাতনে মালতী অঝোরে কাঁদছে। এটা ভাল। কেঁদেকেটে আকুল হলে মনের সব গ্লানি মরে আসবে। আবার ধরণী সুজলা সুফলা মনে হবে।

মালতী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। যেন মনে মনে রঞ্জিতকে উদ্দেশ্য করে বলা, ঠাকুর, আমার সব হরণ কইরা নিছে। তোমারে কি দিমু ঠাকুর।

সারারাত শকুনের মতো তাকে নিয়ে কারা যেন কাড়াকাড়ি করেছিল। বোধ হয় আকাঙ্ক্ষা সব জলের মতো মরে যাচ্ছিল। কেবল পিচ্ছিল রক্তাক্ত শরীরে কারা যেন সারারাত নৃত্য করে গেছে ভূতের মতো। তিন অমানুষ নরকে ডুব দেবার লোভে পশুর মতো হামলে পড়েছিল—আর সেই অসংখ্য কালো সরীসৃপ সারারাত ওর শরীরের ওপর হেঁটে বেড়াচ্ছিল। যার শেষ নেই, শেষ হবে না। আঁচড়ে কামড়ে, খাবলে খুবলে কোথা থেকে কোথায় যে টানতে টানতে নিয়ে গেল, মালতী এখন কিছুতেই তা মনে করতে পারছে না। কেবল মনে পড়ছে তারা সেই কবরভূমির অন্ধকারে মাংসের লোভে—কোনো শেয়াল যেমন মৃত মানুষের গন্ধে কবরে ঢুকে যায়—ওরা তেমনি পারলে ওর শরীরের ভিতর সদলবলে প্রবেশ করতে চেয়েছিল। মালতী এখন কষ্ট পাচ্ছে। হাত দিতে পারছে না। বসতে পারছে না মালতী। ফুলে ফেঁপে আছে। তার বেহুঁশ শরীরের ওপর সেই সব দৃশ্য ভাবতেই গলা থেকে ওক উঠে এল।

ফকিরসাব দেখলেন মালতী ওক দিচ্ছে।

জোটন বলল, না খাইলে বমি হইব না, কন!

মালতী কেবল ওক দিচ্ছে। এখন আর অঝোরে কাঁদছে না। ধানখেতের ভিতর ফকিরসাব লগি মারছেন। লগি মারতে মারতে মাঠের ভিতরে নেমে এলেন। সূর্য ক্রমে মাথার ওপর উঠে আসছে। গায়ের জোব্বা খুলে নিয়েছেন। কেবল এক নেংটি পরনে ফকিরসাবের। গলায় এবং হাতের কব্জিতে, কনুইতে সেই সব পাথরের মালা-তাবিজের শব্দ। এবং মনে হয় তিনি যেন এক প্রাচীন পুরুষ, তপোবনে মহর্ষি কণ্বদেব, শকুন্তলাকে নিয়ে রাজার কাছে যাচ্ছেন। যে কোন ভাবে গ্রামে তাকে পৌঁছে দিতে হবে। ভিতরে ভিতরে হাঁসফাঁস করছেন, কিন্তু কাউকে কিছুতেই বুঝতে দিচ্ছেন না। বেহুঁশের মতো লগি মারছেন কেবল।

জোটন বলল, মালতী, ইট্টু দুধ খা। মালতী, না খাইলে ত তুই মইরা যাইবি।

মালতী কিছু বলল না। ওক দিতে দিতে পাটাতনে শুয়ে পড়ল।

এত দূরের পথ লগি মেরে এ বয়সে যে আর পার হওয়া যায় না, মাঠে নেমে যেন তিনি তা ধরতে পারছেন। সোজা পথে পাড়ি দিলেও রাত অনেক হয়ে যাবে। জল নেমে যাচ্ছে। ভাদ্র মাসের শেষ থেকেই জল নামতে শুরু করে। সোজা পথে যাওয়া যাবে না। মাঝে মধ্যে ডাঙ্গা ভেসে আছে। মেঘনাতে পড়ে বাদাম দিলে পথ ঘুরতে হবে বেশি। তিনি বরং সনকান্দার পাশ দিয়ে নৌকা বাইবেন। গড়িপরদির মঠের পাশে নদীতে পড়তে পারলে আর কষ্ট থাকবে না। জলে উজানি স্রোত মিলে যেতে পারে। তবু ভিতরে ভিতরে কষ্ট। জ্বালা। পাতার রসে পেটের জ্বালা মরছে না। কেমন গলা এবং বুক শুকিয়ে উঠছে।

জোটন বুঝতে পারছিল মানুষটার কষ্ট হচ্ছে। সে তামুক সাজল। মানুষটা তামুক টানলে আবার গতরে শক্তি পাবে। সে ফকিরসাবকে তামাক খেতে দিয়ে নিজেই লগি বাইতে থাকল।

জোটন বলল, মালতী ত দুধ খাইল না। আপনে খান। খাইলে বল পাইবেন। এত দূরের পথ না হইলে যাইবেন কি কইরা!

—না গ বিবি, তা হয় না। বলে ঢক ঢক করে বর্ষার জল তুলে এক গলা খেয়ে ফেলল।

এই ফকিরসাব এবং জোটন মালতীর জন্য প্রাণপাত করে যাচ্ছে। দরগায় কোন অমানুষ ফেলে রেখে গেল মালতীকে, মালতী কিছুই বলছে না, কিছু বললে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। শরীরে অত্যাচারের চিহ্ন ভেসে উঠলে মালতী মাথা ঠিক রাখতে পারছে না। দরগায় এমন একটা কাণ্ড, ফকিরসাব মনে মনে নিজেকে অপরাধী ভাবলেন। তিনি তো রাতে কবর ভূমিতে লম্ফ জ্বেলে ঘোরাফেরা করেন, দূরের মানুষেরা কবর ভূমিতে সেই আলখেল্লা পরা মানুষের হাতে মুসকিলাশান দেখলে ভয়ে পালায়, আর কোথাকার কোন বেজন্মা মানুষ দরগা অপবিত্র করে রেখে গেছে। সব দায় যেন এখন ফকিরসাব আর জোটনের। মানুষ না মরলে, ইন্তেকাল না হলে ফকিরসাবের দাম বাড়ে না। দিনে দিনে তার অন্নাভাব বাড়ছে। দুধটুকু পাটাতনে রেখেছে জোটন। এত পীড়াপীড়িতেও দুধটুকু খাচ্ছে না মালতী। কি দামী আর মহার্ঘ বস্তু এই দুধটুকু। একটু দুধ উপছে পড়লে রাগে হাত পা কাঁপছে ফকিরসাবের।

প্রথম ফকিরসাব ঘাট চিনতে ভুল করলেন। অনেক দিন তিনি এ অঞ্চলে আসেন নি। নবমীর চাঁদ ডুবে গেছে! নিঝুম মনে হচ্ছিল। আঁধারে ধানখেতের ভিতর সেই এক কোড়াপাখির ডাক। দূর থেকে—প্রতাপ চন্দের

দুর্গোৎসবের ডে-লাইট চোখে পড়ছিল। এখন নাও সোনালী বালির চরে। চর থেকে ফকিরসাব আলো লক্ষ্য করে এগোচ্ছেন। চোখ-মুখ ঘোলা। হাত পা শিথিল হয়ে আসছে। অন্ধকারে হড় হড় করে বমি উঠে এসেছে। সবার অলক্ষ্যে তিনি বমি করে মুখ ধুলেন। যেন জল কুলকুচা করছেন এমন শব্দ অন্ধকারে। গাছের ফড়িং ধানের ফড়িং অন্ধকারে উড়ে এসে পড়ছে! প্রতাপ চন্দের ঘাট পার হয়ে এসে নরেন দাসের ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে ফকিরসাব বললেন, আপনেরা নামেন।

মালতী সেই যে পাটাতনে শুয়েছিল আর ওঠে নি। কোথায় এই নৌকা ভেসে যাচ্ছে, কিসের উদ্দেশ্যে ফকিরসাব নৌকা বাইছেন, জোটন হাল ধরছে, সে যেন বুঝতে পারছে না। ঘাটে এসে নৌকা ভিড়লেই ওর সংবিৎ ফিরে এল। আরে, এই ত সেই ঘাট। সে এখানে হাঁস ছেড়ে সকালবেলা বসে থাকত। মাথার ওপর একটা কদম ফুলের গাছ। গাছে কি অজস্র ফুল ফুটে থাকে বর্ষায়। অথচ এই দু'তিনদিনে তার কাছে এরা সবই যেন অপরিচিত, সে একটা নূতন দেশে এসে গেছে।

এমন আঁধারে সহসা খবর দেওয়ার একটা বিড়ম্বনা আছে। আজ কতদিন মালতী নিখোঁজ কে জানে। সহসা নেমে নরেন দাসকে ডাকলে সে হাউমাউ করে চিৎকার চেঁচামেচি করতে পারে। মালতীকে দেখলে পাড়ার লোক জড় করে ফকিরসাবকেই বেঁধে রাখতে পারে। তুমি তারে পাইলা কোনখানে? আরে মিয়া, মনে মনে তোমার এই খোয়াব আছিল! উপকার করতে এসে দায়ে অদায়ে ফেঁসে যাওয়া। সুতরাং কাজটাকে নির্বিঘ্নে করার জন্য গা মুছে ফেললেন। মুসকিলাশানের লম্ফ থেকে—যা তিনি অন্য সময় হলে করতেন অর্থাৎ মুখে চোখে তেল কালি মেখে বীভৎস করে ফেলা—এ সময়ে তিনি সেই সাজে সাজতে চাইলেন। যেন তিনি এই গ্রামে মালতীকে নিয়ে আসেন নি, মুসকিলাশানের লম্ফ নিয়ে এসেছেন। বাড়ি বাড়ি উঠে যাবার মতো আলখেল্লা গায়ে দিয়ে সারা মুখে কালি লেপ্টে দিতেই চোখ দুটো বড় বড় আর লাল দেখাতে থাকল। তিনি এখন যথার্থ আর এ দুনিয়ার মানুষ নন। মালা তাবিজের ভিতর, কালো শতচ্ছিন্ন আলখাল্লার ভিতর এখন এক হারমাদ মানুষ। হাতের মশালে ইচ্ছা করলে যেন এই গাছপালা পাখি সব ভস্ম করে দিতে পারেন। অথবা তিনি যেন সেই মানুষ দূরে দূরে হেঁটে যান, হাতে মশাল, কিসের উদ্দেশে তিনি যেন ক্রমাগত হেঁটে যাচ্ছেন। আসমানকে আলো দিচ্ছেন, দু'লাফে ইচ্ছা করলে সমুদ্রে চলে যেতে পারেন। প্রায় এখন এক অলৌকিক মানুষের মতোই টলতে টলতে হাতে লম্ফ নিয়ে দাসের বাড়ির দিকে উঠে যেতে থাকলেন। এখন তাকে মনে হয় এক মানুষ, সেই যেন চাঁদবেনের পুত্রবধূ অথবা ঈশা খাঁর সোনাইবিবির মতো এক কিংবদন্তির মানুষ। নিশুতি রাতে

এমন কে গৃহস্থ আছে যার বুক এই মানুষের হাঁকে না কেঁপে ওঠে। তিনি তখন যথার্থ ই আর মানুষ থাকেন না। রসুলের মতো যেন আকাশ মাটি এবং মাঠের অন্ধকার ভেদ করে উঠে আসেন। কিন্তু ফকিরসাব ভিতরে ভিতরে শক্তি পাচ্ছেন না। চোখে মুখে অন্ধকার দেখছেন। তবু রাতের আঁধারে সকলকে ভয় দেখাবার নিমিত্ত (হাতে পায়ে শক্তি নেই, পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে) তিনি কিছুই পরোয়া না করে প্রায় মাটি ফুঁড়ে ওঠার মতো হেঁকে ওঠলেন—মুসকিলা শা···ন আসান ক···রে। মনে হল তাঁর যত জোরে হেঁকে ওঠার কথা ছিল, তিনি যেন গলা থেকে তত জোরে হাঁক দিতে পারলেন না আরও জোরে, এ তল্লাটের সব মানুষের বুক কাঁপিয়ে হাঁক দিতে হয়—আমি এক মানুষ, যার নিবাস আস্তানাসাবের দরগাতে, যার কাম কাজ ইন্তেকালের সময় মোমবাতি জ্বালানো আর গাছের মগডালে আলো জ্বালিয়ে অলৌকিক এক জীবনের ভিতর ঘুরে বেড়ানো। মা জননীরা, জন্মমৃত্যুর মতো এই বেঁচে থাকাও অলৌকিক এক ঘটনা আর ঈশ্বরের মতো সুখঃদুখের জীবনে মুসকিলাশান আসান করে মা জননীরা বলে তিনি প্রায় তাঁর যৌবনকালের মতো বুক চিতিয়ে হাঁটতে চাইলেন। কিন্তু পারলেন না। কিছুটা গিয়েই তিনি কেমন হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন। লম্ফটা তিনি কিছুতেই লাঠির ডগা থেকে নামাচ্ছেন না। ওঁর হাঁটু দুর্বল হলে লাঠি আর লম্ফতে তিনি শক্তি খোঁজেন। তিনি হামাগুড়ি দিতে পারতেন, দিলে ভাল হত—ওঁর বমিটা বুঝি তবে হড় হড় করে আবার উঠে আসত না। কিন্তু বমিটা হড়হড় করে উঠে এলেই বিবি তাঁর দেখে ফেলবে, ফকির মানুষের আবার ব্যামো কি—তিনি তাড়াতাড়ি আলোটা মাথার ওপর তুলে দিয়ে নিচে যে অন্ধকার মিলে গেল সেই অন্ধকারে বমিটা সেরে ফের এগুতে থাকলেন। জল আর শাপলা উঠে আসছে পেট থেকে। আশ্বিনের টানে পচা জল নামছে নদীতে, সেই জলের গন্ধ পর্যন্ত উঠে এল ওকের সঙ্গে।

নরেন দাস দরজা খুলে দেখতে পেল উঠোনের ওপর ফকিরসাব। হাতে সেই মুসকিলাশান। উঁচু লম্বা মানুষ। মাথায় পাগড়ি। সাদা চুল, সাদা দাড়ি, মুখ কালো, চোখ লাল। আলোটা গনগন করে মুখের কাছে জ্বলছে। কেমন চোখ ঊর্ধ্ব নেত্র। স্থির। বিড়বিড় করে মন্ত্র উচ্চারণের মতো গৃহস্থের মঙ্গলের জন্য নানা রকমের বয়াৎ। লাল নীল হলুদ রংয়ের পাথর গলাতে ঝুলছে। সেসব পাথর চকচক করছে। শোভা আবু দরজার বাইরে বের হতে ভয় পাচ্ছে। পিসী নিরুদ্দেশ হবার পর থেকে রাতে কোন শব্দ হলেই ওরা জেগে যায়। নরেন দাসের চোখে ঘুম নেই। কারা যেন বাড়িটার চারপাশে ফিসফিস করে কথা বলে বেড়াচ্ছে।

নরেন দাস কাছে গেলে একটা কাঠিতে সামান্য কাজল তুলে টিপ দিল কপালে। দাস একটা পয়সা ফেলে দিল লম্ফের ভিতর। মাটির লম্ফ। ছোট

ছোট মুখ লম্ফের। এক মুখে আলো, অন্য মুখে কাজল, এবং আর একটা মুখে পয়সা ফেলার ফোকর। নরেন দাস ফোঁটা নেবার জন্য আভারানীকে ডাকল, শোভা আবুকে ডাকল। ওরা ফোঁটা নিয়ে ঘরে ঢুকে গেলে খপ করে অন্ধকারের ভিতরে হাতটা চেপে ধরলেন ফকিরসাব।—দাস, আপনের বইনের খোঁজ আছে।

—আমার বইনের খোঁজ!

—আছে। মা লক্ষ্মীরে আমি দরগার মাটিতে পাইছি।

—কি কন আপনে! অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে চিৎকার করে উঠতে চাইল দাস।

—হ, পাইছি। মায় আমার বনদেবীর মত আর্তনাদ কইরা ছুটছিল। চিৎকার—বাঁচান বাঁচান। কেডা আছেন আমারে বাঁচান।

—আপনে বাঁচাইলেন?

বাঁচাইলাম! বলেই আকাশ ফুঁড়ে দিতে চাইলেন যেন হাঁকে।—পীর মানুষ দরবেশ মানুষ আমি, এই গ্যাখেন ফুস মন্তরে হাজির মা জননী আমার সামনে হাজির। জননীরে কেউ অসতী করতে পারে নাই—ফকিরসাব মালতীর জন্যে মিথ্যা কথা বললেন। তারপরই সঙ্গে সঙ্গে ওক উঠে এল। লম্ফ ওপরে তুলে দিলেন। নিচে ছায়া ছায়া অন্ধকার। নরেন দাস একটু দূরে দাঁড়িয়ে যেন তামাশা দেখছে। সামনে মালতী নেই। কেউ নেই। পাগলের সামনে যেন দানের প্রতীক্ষায় দাস দাঁড়িয়ে আছে, এমন একটা ভাব মুখে। পীর সাহেব মুখটা আলখেল্লার ভিতর লুকিয়ে ওক দিয়ে কি সব বার করছেন। টক দুর্গন্ধে সামনে যাওয়া যাচ্ছে না।

এসব দেখে নরেন দাস কেমন হাবা গোবা মানুষ হয়ে গেল। ফকিরসাবের অনেক হিম্মতের গল্প সে শুনেছে। এবার সে এই হিম্মত দেখে বুঝি আশ্চর্য বনে যাবে। যা অবিশ্বাস্য, এই মানুষ বলছে মালতীকে পাওয়া গেছে। সে কেমন বিহ্বলভাবে আবুর মাকে ডাকছে, শুনছ আবুর মা, মালতীরে পাওয়া গেছে। ফকিরসাবের সামনে আছে। তুমি আমি গ্যাখতে পাইতাছি না।

নরেন দাসের চোখমুখ দেখে ফকিসাব বুঝতে পারলেন ওর হাঁকডাকে কাজ হচ্ছে। রহস্যজনকভাবে ওরা ফকিরসাবকে দেখছে। যেন মানুষটা এখন এইমাত্র আকাশ থেকে নেমে এসেছে। উঠোনের ওপর দাঁড়িয়ে ওদের ডেকে তুলে বলছে—এই নাও মালতীরে। দিয়া গেলাম। লম্ফটা এত বেশি জ্বলছে যে মুহূর্তে এই বাড়িময় আগুন ধরে যেতে পারে, সব দিকে আলোতে আলোময়। কেবল পূবের দিকে ঠিক কুলগাছের নিচটা অন্ধকারে ডুবে আছে। ফকিরসাব পেছন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কুলগাছের নিচে অন্ধকারে মালতীকে ধরে জোটন দাঁড়িয়ে আছে।

ফকিরসাব পাওয়া গেছে কথাকে বিশ্বাস করানোর জন্য লা ইলাহা ইল্লাল্লার মতো অথবা বিসমিল্লা রহমানে রহিমের মতো বলতে থাকলেন,দাস, মায় আমার বনদেবীর মত ছুইটা যায়, কি ত্বরিতে ছুইটা যায়! তখন নদীর জলে স্রোত থাকে না, তখন পাখি বনে কূজন করে না, ময়নামতির হাটে তখন দোকানি লম্ফ জ্বালে না—মায় আমার দাস, ছুইটা গ্যালে গ্রাম মাঠ গাছপালা কবর সব হায় হায় করতাছিল। দাস, আমি তাইনরে তুইলা আনলাম।

মালতী কুলগাছের অন্ধকার থেকে সব শুনছে। জোটনের ফকিরসাব, মেলাতে বান্নিতে যে মানুষ গাজির গিদের বাজানদারের মতো হেঁটে বেড়ায়, যে মানুষ পীর দরবেশ বনে যাবার জন্য মেলাময় ঘোড়দৌড়ের বাজিতে ছুটে বেড়ায়, সেই মানুষ অভাগী মালতীর জন্য মিছা কথা কয়।

আভারানী ঘর থেকে গলা বাড়িয়ে বলল, ফকিরসাব, তাই কোনখানে? সামনে কিছু গ্যাখতে পাই না ফকিরসাব।

আছে। যদি দোষ না নেন, হাজির করি।

নরেন দাস বলল, মিছা কথা কইবেন না ফকিরসাব। বিশ্বাস হয় না।

—হয়। বলে ফকিরসাব ডাকলেন, মায় কইগ আমার! বেলতলা ফুলতলায় মায় আমার যেইখানে থাকেন একবার আবির্ভূতা হন মা। বলে লম্ফের সলতে উসকে দিতেই পেটে আবার কামড়। তলপেট শক্ত হয়ে আসছে। ক্রমে কুঁকড়ে যাচ্ছিলেন ফকিরসাব। কিছুতেই আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। মনে হচ্ছে তাবৎ সংসারের ধর্মাধর্ম এই মুহূর্তে পেটের ভিতর বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তবু কোন রকমে চোখ তুলে তাকালেন। হাসলেন জোরে। হাত পা ছুঁড়ে বললেন, আসেন, আসেন,—মা জননী, আসেন। আসমানে থাকেন, বাতাসে থাকেন নাইমা আসেন। প্রায় যেন ভোজবাজির খেলা দেখাচ্ছেন ফকিরসাব। প্রায় যেন এই গভীর রাতে কেউ যখন জেগে নেই তখন ফকিরসাব ভোজবাজির মতো নরেন দাসের উঠোনে খেলা দেখিয়ে দিলেন। প্রতিবেশীরা দূরে, দীনবন্ধুর বৌ এবং দীনবন্ধু, ওর দুই ছোট-বড় বৌ টের পেয়েছে, ফকিরসাব মুসকিলাশানের লম্ফ নিয়ে এসেছেন। তখন দেবীর মতো মালতী উঠোনের অন্ধকারে হাজির। আলোটা ঘুরিয়ে দিতেই আভারানী এবং নরেন দাস দেখল ক্লান্ত মালতী, চোখ বুজে আসছে মালতীর, যেন পড়ে যাবে মাটিতে—ওরা ছুটে গিয়ে ধরে ফেলতেই ফকিরসাব ফুঁ দিয়ে আলো নিভিয়ে দিলেন। সুরুৎ করে টপকে পার হয়ে এলেন ঘাটে। জোটন সঙ্গে সঙ্গে গাবতলা পার হয়ে ঘাটে চলে এল। ফিসফিস করে বলল, জলদি নাও ভাসান পানিতে। দেরি কইরেন না।

অন্ধকার পাটাতনে মলমূত্রে কাপড় ভেসে যাচ্ছিল। ফকিরসাব কিছু বললেন না জোটনকে। পেট সাফ হয়ে নেমে যাচ্ছে। তারপর কেবল শুধু

মল, মূত্রের দেখা নেই। জোটন দুর্গন্ধে বসতে পারছে না। নদীর মুখে নৌকা ছেড়ে দিতে পারলে ভাটি পাওয়া যাবে। ফকিরসাব সেই ভাটিতে নৌকা ছেড়ে দিতে বললেন। আর কিছু বলতে পারছেন না। ওলাওঠাতে এখন প্রাণ সাবাড়ের সময়। স্রোতের মুখে নাও ছেড়ে বসে থাকতে পারলে ভাটি পাওয়া যাবে। শেষরাতের দিকে আলিপুরা গ্রাম পাওয়া যাবে। বাকি ক্রোশের মতো পথ নিশ্চয়ই জোটন রাত শেষ হতে না হতে দরগায় টেনে নিয়ে যেতে পারবে। স্রোতে এসে নৌকা পড়তেই ফকিরসাব কিছু কথা বললেন জোটনকে লক্ষ্য করে—বিবি, আমার প্রাণপাত হইতাছে। আমারে আপনে রাইত থাকতে দরগাতে তুইলা দিয়েন। সকাল হইলে হাউমাউ কইরাকাইন্দেন না। আলিপুরা খবর দিবেন, ফকিরসাবের রাইতে ইন্তেকাল হইল। যদি কয়, রাইত কয়টায়?

জোটন বুঝতে পারছে না কেন এমন বলছেন তিনি। পাটাতনে এখন মানুষটা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে। হাত দিতেই বুঝল, আলখেল্লা, জোব্বা সব ভেসে যাচ্ছে। জোটনের ভিতরটা হায় হায় করে উঠল। সে বুক থাবড়ে বলল, রাইত কয়টায় কমু?

—রাইত দুই প্রহর শেষ না হইতে।

—তখন ত আপনে দাসের বাড়িতে আছিলেন।

—আপনের এত কথায় কাম কি বিবি। বলেই মানুষটার কথা বুঝি একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

জোটন হাউমাউ করে কাঁদতে চাইলে হাত তুলে ঈশারায় ডাকলেন কাছে। জোটন মাথা কোলে নিয়ে বসে থাকল। নাও জলের টানে দ্রুত নেমে যাচ্ছে। শুধু হালটা কোনরকমে এক হাতে ধরে আছে জোটন। অন্য হাতে ধীরে ধীরে জামা-কাপড় ছাড়িয়ে দিচ্ছে। ধুয়ে-পাখলে দিচ্ছে। খালি গায়ে মানুষটা লম্বা এই পাটাতনে হাত দুটো বুকে তুলে অপলক অন্ধকারে কি যেন দেখছেন। কাছে এলে বললেন. কাইন্দেন না। ভাল না লাগলে দরগায় যাইবেন না। বলতে বলতে ফকিরসাবের গলা বসে আসছে।

অন্ধকারে নদীর জল ধূসর। গ্রামে মাঠে জোনাকি জলছে। জোটনের কেন জানি মানুষটাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা হল। আকাশে কত নক্ষত্র জলছে। অন্ধকারে এত সব নক্ষত্র যেন তাকিয়ে তাকিয়ে ফকিরসাবের ইন্তেকাল দেখছে। কতকাল থেকে এই মানুষ, এক মানুষ—দিন নাই রাইত নাই, মাঠে মাঠে বনে বনে অথবা অনাহারে দিন কাটিয়েছে, কবে শোনা যায় কোন এক হত্যার দায়ে এই মানুষ তার ঘর ছেড়েছিল। বিটি-বেটাদের ছেড়ে, জমি-বাড়ি, গোলা এবং পুকুরের পাড়ে পাড়ে অর্জুন গাছ, ধানের গোলাতে পাখি উড়ে বেড়াত, সেই মানুষ, খুনের দায় এড়াতে বরিশালের ভোলা অঞ্চল থেকে

হেঁটে পাড়ি দিয়েছিল। তারপর দীর্ঘদিন সংগোপনে এখানে সেখানে বসবাসের পর—আস্তানাসাবের দরগাতে এক রাতে রাত যাপন। দূর থেকে মানুষেরা এসেছিল কবর দিতে। কবরের কিছু মোমবাতি সে তুলে এনে এই বনের ভিতর ঘুরতে ঘুরতে কখন রাজা-বাদশার মতো মনে মনে এক ইচ্ছা পূরণের পালা। দিন যায় রাত যায়, বনের পাখ-পাখালি এবং গাছপালা বৃক্ষ মানুষটার কাছে ক্রমে দোসর হয়ে যায়। তিনি একটা কুঁড়েঘর বানিয়ে ফেললেন। বরিশালের কোথায় নিবাস ছিল মনে থাকল না। তিনি একটা মাটির লম্ফ সংগ্রহ করলেন। কিছু হদিস এবং ধর্মাধর্মের ছোট-বড় কথা কি করে যেন গড়-গড় করে বলে ফেলতে পারলেন। তারপরের মানুষটা আর খুনী মানুষ থাকল না। ফকির মানুষ বনে গেল।

এই মানুষের এখন ইন্তেকাল হচ্ছে। জোটন বলল, আপনের ডর নাই ফকিরসাব। আপনে মানুষ আছিলেন না, পীর আছিলেন। এই বলতেই কেমন সাহস এসে গেল তার প্রাণে। এই মানুষকে রাতে রাতে দরগায় হাজির করতে হবে। ঠিক যেখানে বড় নিমগাছটা আছে, উঁচু মতো ভিটা জমি, তার ওপর শুইয়ে রাখতে হবে। যারা আউশ ধান কাটতে এদিকে আসবে নৌকা নিয়ে তারা দেখবে জোটন গাছের নিচে এক মরা মানুষ নিয়ে জেগে আছে। কে এই মানুষ!—এই মানুষ ফকিরসাব। ফকিরসাবের রাইতের বেলা ইন্তেকাল হইল। রাইতে মানুষটা নিজের ভিতর ডুব দিল। এই বয়স পর্যন্ত মানুষটার কোন রোগ-শোক জরা ছিল না। শেষ বয়সের এই জরাকে প্রশ্রয় দিতে নেই। কিছুই যেন হয় নি, জোটন তাকে ধুয়ে পাখলে একেবারে নতুন মানুষ করে ফেলল। শরীরে কোন মল-মূত্রের গন্ধ থাকতে দিল না। ওলাওঠাতে প্রাণ গেছে বুঝতে দিল না। যেন এইবেলা জোটনের কসম, আপনে পীর বইনা গ্যালেন ফকিরসাব।

বিকেলের রোদ এখন জানালায়। বৃন্দাবনী সব দরজা খুলে দিচ্ছে। এই ঘরে আয়নার সামনে অমলা কমলা এখন সাজবে। বারান্দায় অমলা কমলা দাঁড়িয়ে আছে। দূরে শীতলক্ষার পাড়। পাড়ে পাড়ে কাটা মোষ নিয়ে যাচ্ছে যারা, অমলা কমলা তাদের দেখছিল।

বৃন্দাবনী ডাকল, বড় ঠাকুরানী, আসুন।

ওরা দেখল বৃন্দাবনী বড় আলমারি খুলছে। ওদের ফ্রক বের করছে। এখন সে ওদের চুল বেঁধে দেবে। বেলা পড়ে আসছে। অন্দরে ল্যাণ্ডো লেগে রয়েছে। ওরা বিকালে অন্যান্য বাবুদের বাড়ি ঠাকুর দেখতে যাবে। সঙ্গে যাবে রামসুন্দর। আর বৃন্দাবনী ডাকলেই ওদের যেন এক খেলা আরম্ভ হয়ে যায়। মার্বেল পাথরের মেঝে—খুব একটা জোরে ছোটা যায় না। অথচ এই দুই মেয়ে কি সুন্দর মসৃণ মেঝের ওপর ছুটতে পারে। বৃন্দাবনী ডাকলেই—ওরা ছুটে পালাবে, কারণ সে ওদের চুল এত আঁট করে বেঁধে দেয় যে, চুলে বড় লাগে।

সুতরাং বৃন্দাবনী আর ডাকল না। ডাকলেই ওরা পালাবে। সে পা টিপে টিপে কাছে গিয়ে ধরে ফেলবে ভাবল। কিন্তু তার আগেই দুষ্টু মেয়েরা টের পেয়ে গেছে। ওরা সেই খেলায় মেতে গেল—ঠিক যেন ওরা ছোট্ট দুই পরী হয়ে যায়—ওরা মেঝের ওপর সুন্দর পা টিপে টিপে হাতের অদ্ভুত ব্যালেন্স রেখে ছুটতে থাকে—ঠিক ব্যালেরিনা যেন। হাত তুলে, নদীর পাড়ে অথবা অদ্ভুত কায়দায় ওরা যেন ক্ষণে ক্ষণে মসৃণ বরফে পা তুলে তুলে নাচে। তখন বৃন্দাবনীর রাগ হয়। সে কেন ওদের ছুটে ধরতে পারবে! তখন সে অভিমান করে দাঁড়িয়ে থাকে। কথা বলে না। ওর মুখ দেখলে ওরা টের পায় সে রাগ করেছে। তখন ওরা আর দেরি করে না। এসে ধরা দেয়। কারণ এই বৃন্দাবনীর কাছেই ওরা শিশুবয়স থেকে বড় হয়ে উঠছে।

অমলা বলল, আমি আজ চুল বাঁধব না পিসি।

বৃন্দাবনী একবার কাজের ফাঁকে চোখ তুলে তাকাল। কিছু বলল না।

অমলার ইচ্ছা ওর চুল ফাঁপানো থাকুক। ঘাড় পর্যন্ত বব করা চুল। চুলটা পিঠের নিচে নামলেই কেটে ফেলা ঠিক নয়। এখন তোমাদের বয়স হচ্ছে মেয়ে। এই বয়সে চুল আর একটু বড় হতে দাও। আমি বেশ এঁটে বেণী বেঁধে দি। তবে চুলের গোড়া শক্ত হবে। মাথা থেকে, বড় হলে ঝুর-ঝুর করে চুল উঠে যাবে না।

অথচ ওদের মুখ বব কাটা চুলে বড় সুন্দর দেখায়। তাজা ডেফোডিলসের

মতো। কতবার ভেবেছে মাথা ন্যাড়া করে দেবে, ন্যাড়া করে দেবে শুনলেই ওরা পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে। বৃন্দাবনীর তখন কষ্ট হয়। মেজবাবুকে আর চুল কাটা নিয়ে পীড়াপীড়ি করে না।

মেজবাবুকে বৃন্দাবনী যেমন ছোট থেকে বড় করে তুলেছে, যে যত্ন এবং সেবা ছিল প্রাণে—সেই যত্নে এই দুই মেয়ে বৃন্দাবনীর হাতে ক্রমে মানুষ হচ্ছে। ওরা ফের ছুটতে চাইলে বৃন্দাবনী ধমক দিল। রাগ করতে চাইল। দুমদাম আলমারির দরজা বন্ধ করে দিতে চাইল। মেয়েরা আসছে না। যে যার মতো সারা ঘরে ফের ছুটে বেড়াচ্ছে।

কলকাতার বাড়িতে হলে বৃন্দাবনী জোর ধমক দিতে পারত। কিন্তু এখানে সে কিছু পারে না। কলকাতার বাড়িতে সে-ই সব। সে না থাকলে এই দুই মেয়ে মায়ের মতো ব্যবহারে কিঞ্চিৎ অন্যধর্মী হত। কি সুন্দর বাংলা বলে ওরা। পূজা-আর্চায় অগাধ ভক্তি। পূজা এলেই ওরা কবে দেশের বাড়িতে যাবে এই বলে মেজবাবুকে পাগল করে দেয়। সন্ধিপূজার সময় বাড়ির সব মেয়ের মতো করজোড়ে চিকের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে। মোষ বলি হলে রক্তের ফোঁটা কপালে, ফোঁটা দিলেই শরীরের সব পাপ মুছে যায়, শুধু তখন পবিত্র এক ভাব থাকে শরীরে। বৃন্দাবনী যেন ওদের মুখ দেখলেই তা টের পায়।

মেজবাবুর স্ত্রী এসব পছন্দ করেন না, করেন কি করেন না সেও সে ভাল করে জানে না, তবু প্রতিবারে ওদের পূজা দেখতে আসা নিয়ে একটা মনোমালিন্য এবং ক্রমে তা প্রকট হচ্ছে হতে কখন জানি ওরা দুজনই পরস্পর দূরের মানুষ হয়ে যান। বৃন্দাবনী টের পায়—মেজবাবু ওদের নিয়ে স্টিমার ঘাটে নামলেই একেবারে সরল বালক, যেন কতদিন পর ফের আসা, নদীর পাড়ে নেমেই জন্মভূমিকে তিনি গড় হয়ে প্রণাম করেন, মেয়েদের বলেন, এই তোমার দেশ, বাংলাদেশ, এই তোমাদের পিতৃভূমি, তারপর চুপচাপ হাঁটেন। গাড়িতে উঠে তিনি বাড়ি যান না। চারপাশে নদীর জল, মাঠের ঘাস এবং সারি সারি আমগাছের ছায়ায় নিজের বাল্যকাল স্মরণ করে কেমন অভিভূত হয়ে যান। এই পথে তিনি কৈশোরে কতদিন ঘোড়ায় চড়ে নদীর পাড়ে পাড়ে কতদূর চলে গেছেন!

বৃন্দাবনী দেখেছে, এই নিয়ে কোন বচসা হয় না, মেজবাবু কলকাতা থেকে রওনা হবার আগে ক'দিন সকালে মহাভারত পাঠ করেন শুধু। সন্ধ্যায় ক্লাবে যান না। মেজবৌরানী তখন গীর্জায় যান। ফাদার আসেন বাড়িতে। দক্ষিণের দিকে যে দোতলা সাদা পাথরের হলঘর আছে সেখানে ফাদারের পায়ের নিচে তিনি বসে থাকেন।

আর অমলা দেখেছে, বাবা পূজার আগের ক'দিন মার ঘরের দিকে যান নি এবার। মার মুখ ভীষণ বিষণ্ণ এবং ক্লান্ত। রাতে বাবা নিচের ঘরে শুয়ে

থাকেন। দুপুর রাতে সহসা বাবা ফ্লুট বাজান। কেন যে এমন হচ্ছে দু'জনের ভিতর—ওরা তা কিছুই অনুমান করতে পারত না। সকাল হলেই দু' বোন চুপচাপ স্কুলে চলে যায়। স্কুল থেকে এসে আর সারা বাড়িতে ছুটতে সাহস পায় না। মার মুখ বিষণ্ণ প্রতিমার মতো হয়ে গেছে। মা ক্রমে পাথর হয়ে যাচ্ছেন। এ-দেশে মা যেন বাবার সঙ্গে কিসের অন্বেষণে সমুদ্র পার হয়ে চলে এসেছিলেন। চোখ দেখলে মনে হয় তিনি তা পান নি। অথবা কখনও কখনও মনে হয় কোথাও তিনি কিছু ফেলে চলে গেছিলেন, এদেশে ফিরে আসায় তা আবার তাঁর মনে হয়েছে। তিনি সারাক্ষণ মাঠের দিকের বড় জানালাটায় দাঁড়িয়ে থাকেন। মাঠ পার হলে সেই দুর্গ, দুর্গের মাথায় হাজার হাজার জালালি কবুতর উড়ছে। মা সে-সব দেখতে দেখতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যান। কি যেন খোঁজেন সব সময়।

এই যখন দৈনন্দিন সংসারের হিসাব তখন বৃন্দাবনী দুই মেয়েকে বাংলাদেশের মাটির কথা শোনায়। শরৎকালে শেফালি ফুল ফোটে, স্থলপদ্ম গাছ শিশিরে ভিজে যায়, আকাশ নির্মল থাকে, রোদে সোনালী রঙ ধরে—এই এক দেশ, নাম তার বাংলাদেশ, এ-দেশের মেয়ে তুমি। এমন দেশে যখন সকালে সোনালী রোদ মাঠে, যখন আকাশে গগনভেরি পাখি উড়তে থাকে, মাঠে মাঠে ধান, নদী থেকে জল নেমে যাচ্ছে, দু' পাড়ে চর জেগে উঠেছে, বাবলা অথবা পিটকিলা গাছে ছেঁড়া ঘুড়ি এবং নদীতে নৌকা, তালের অথবা আনারসের তখনই বুঝবে শরৎকাল এ-দেশে এসে গেল। তুমি অমলা কমলা এমন এক দেশে নীল চোখ নিয়ে জন্মালে। সোনালী রঙের চুল তোমার। তুমি যদি কোনদিন কোন হেমন্তের মাঠ ধরে ছুটতে থাক তবে তুমি এক লক্ষ্মীপ্রতিমা হয়ে যাবে। এমন মেয়েরা দুষ্টুমি করে না। এস তোমাদের চুল বেঁধে দি।

বৃন্দাবনী ওদের এবার নিখুঁতভাবে সাজিয়ে দিল। ওরা যতক্ষণ সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে না গেল ততক্ষণ সে তাকিয়ে থাকল। ওরা ঘুরে ঠাকুমার ঘর হয়ে গেল। কাকিমাদের ঘরে দেখা করে গেল। মেজবাবু এই সংসারে ম্লেচ্ছ মেয়ে বিয়ে করার জন্য নানারকমের অবহেলা পাচ্ছেন—এই বলে হয়তো এই দুই মেয়ে যারা উত্তরাধিকার-সূত্রে সম্পত্তির একটা বড় অংশ দখল করে আছে, অথচ কিছুই হয়তো শেষপর্যন্ত পাবে না—এমন কিছু ভাবভাবনা থাকায়, কিছু করুণা, কিছু ভালবাসা এই মেয়েদের প্রতি কম-বেশি সকলের। ওরা এমন তাজা আর স্নিগ্ধ এত বেশি অকারণ হাসে, আর এমন অমায়িক—মনে হয় কেবল দুই জাপানী কল দেওয়া পুতুল, কেবল হাত পা তুলে ঘুরছে ঘুরছে ঘুরছে। সুতরাং তারা নিচে নেমে গেলেই, কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে অন্দর।

ওরা ক্রমে নামছে, আর চারিদিকে তাকাচ্ছে। সোনাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। একবার দুপুরের দিকে সিঁড়ির মুখে সোনাকে পেয়েছিল, কিন্তু কপালে রক্তের ফোঁটা দিতে না দিতেই ছুটে পালিয়েছে। সে যে গেল কোথায়!

নিচে নেমে দেখল খালেক মিঞা গাড়িতে বসে নেই। হাতির মাহুত জসীম এসেছে গাড়ি নিয়ে। পিছনে রামসুন্দর তকমা এঁটে দাঁড়িয়ে আছে।

অমলা খালেককে না দেখে বিস্মিত হল। বলল, তুমি, জসীম!

—হ্যাঁ, মা ঠাইরেন। আমি।

—খালেক কোথায়?

—অর অসুখ মা-ঠাইরেন।

—কি হয়েছে?

—জ্বর, কাশি।

সকালের রামসুন্দর আর এই রামসুন্দরকে চেনাই যায় না। এ-দিনের জন্য সে কারো বান্দা নয়। কেবল দেবীর বান্দা। কিন্তু যেই শুনেছে বড় খুকুরানী আর ছোট খুকুরানী যাবে পুজো দেখতে, অন্য বাবুদের নাটমন্দিরে যাবে, কুলিন পাড়ার ঠাকুর দেখতে যাবে—সে তখনই উর্দি পরে দৌড়েছে। এখন দেখলে মনে হবে রামসুন্দরকে সে দেবীর বান্দা আর বান্দা এই দুই মেয়ের।

রামসুন্দর নাগরা জুতো পরেছে, সাদা উর্দি পরেছে, কোমরে পিতলের বেল্ট। বেল্টের পিতলের পাতে এই পরিবারের প্রতীক চিহ্ন। ওর মাথায় নীল রঙের পাগড়ি, জরির কাজ করা পাগড়ি একটা বুলবুল পাখির বাসার মতো। ভিতরটা উঁচু হয়ে টুপির মতো উঠে গেছে। সোনা এখন দেখলে বলত, রামসুন্দর তুমি কোন দেশের রাজা?

অমলা কমলা এসব কিছুই দেখল না। খুব গম্ভীর মুখে গাড়িতে উঠে গেল। বাড়ির দাসী বাঁদী অথবা ভৃত্যদের সামনে, অথবা বের হবার মুখে কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়, সে ভয়ে দুই বোনই একেবারে চুপচাপ পাশাপাশি বসে আবার চারিদিকে কাকে যেন খুঁজল। সোনা যে কোথায়? অথবা এ অবেলায় সে কি ঘুমোচ্ছে! অমলার বলতে পর্যন্ত সাহস হল না গাড়ি কাছারিবাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে যাবে। এখানে এলেই কিছু আইনকানুনে পড়ে যেতে হয়। যেখানে সেখানে একা একা গেলে ঠাকুমা রাগ করেন। যে বাবা ওদের এত ভালবাসেন তিনি পর্যন্ত অন্দরের বাইরে বের হতে দেখলে বলেন, তোমরা এখানে কেন। ভিতরে যাও। অথচ কলকাতার বাড়িতে এমন কিছু একটা নিয়মের ভিতর ওরা মানুষ হচ্ছে না। মালীদের ছেলেরা ওদের হয়ে কতরকমের কাজ করে দেয়। পুতুলের ঘর বানিয়ে দেয়। এবং ওরা বাড়িময়, সেও তো বড় বাড়ি, বড় প্রাসাদের মতো বাড়ি, ছুটে শেষ করা যায় না, তেমন এক বাড়িতে ওরা মানুষ হচ্ছে বলে এখানে এইসব নিয়ম মাঝে মাঝে ওদের খুব দুঃখী রাজকুমারী করে রাখে। অমলার বড় ইচ্ছা হচ্ছিল সোনাকে নিয়ে পূজা

দেখতে যায়। দু' বোনের মাঝে সোনা বসে থাকবে—কি যে ভাল লাগবে না, সোনার শরীরে চন্দনের গন্ধ লেগে থাকে, এমন একটা গন্ধ যে সে পায় কোথায়? অথবা কেন জানি মনে হয়েছে, গত রাতে দাতাকর্ণের পালা হয়েছে, বৃষকেতুর সেই সুন্দর উজ্জ্বল মুখ, টানা লম্বা চোখ, ছোট মানুষ এবং কি অসীম পিতৃভক্তি, সোনা যেন ওর কাছে সারাক্ষণ বৃষকেতু হয়ে আছে। গত রাতে অমলা চিকের আড়াল থেকে দেখেছে, সোনা তার পাগল জ্যাঠামশাইর পাশে বসে ছিল আসরে। যাত্রা দেখতে দেখতে সে পাগল জ্যাঠামশাইর হাঁটুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কি আশ্চর্য সেই মানুষ পাগল ঠাকুর! সারাক্ষণ শক্তভাবে মেরুদণ্ড সোজা করে বসেছিলেন। হাত পা নড়লেই সোনার ঘুম ভেঙে যাবে। আর অমলা দেখছিল, ওদের পিসিরা অথবা কাকীমারা—সবাই ফাঁকে ফাঁকে চুরি করে পাগল মানুষটাকে দেখতে দেখতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। ঝাড়লণ্ঠনে তখন নানারকমের লাল নীল আলো জ্বলছিল।

গাড়িটা ক্রমে গাছের ছায়ায় নুড়ি বিছানো পথে বের হয়ে যাচ্ছে। ঘোড়ার পায়ে ক্লপ ক্লপ শব্দ হচ্ছে। দীঘির নিরিবিলি জলে কিছু পদ্মফুল ফুটে আছে। আর শরতের বিকেল মরে যাচ্ছে। নীল আকাশ, গাছের ফাঁকে ফাঁকে অজস্র মানুষ দেখা যাচ্ছে নদীর পাড়ে। সবাই ঠাকুর দেখতে বের হয়ে পড়েছে।

অমলা কেমন বিরক্ত গলায় বলল, সোনাটা যে কি না!

—কেন কি হয়েছে!

—ওকে দেখছি না কোথাও!

অমলা দীঘির এ-পাড় থেকে ও-পাড়ের কাছারিবাড়ি লক্ষ্য রাখছে। মঠের সিঁড়িতে সে যদি একা বসে থাকে, অথবা ময়ূরের কিংবা হরিণের ঘরগুলো পার হয়ে সে যদি কুমিরের খাদে উঁকি দেয়। না কোথাও গাছের ফাঁকে অথবা পাতার অজস্র বিন্দু বিন্দু জাফরিকাটা খোপের ভিতর সে সোনাকে আবিষ্কার করতে পারল না। তখন কমলা বলল, সোনা আর আমাদের কাছে আসবে না।

এমন কথায় অমলার বুকটা কেঁপে উঠল।—আসবে না কেন রে!

—ও রাগ করেছে।

—আমরা তো ওকে কিছু বলি নি।

—রাগ না করলে এমন হয়! আমাদের দেখলেই পালায়।

অমলার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর সেরে গেল। সোনা আবার কমলাকে বলে দেয় নি তো!

এখন গাড়িটা নদীর পাড়ে এসে পড়েছে। দুই সাদা ঘোড়া গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তেমনি ক্লপ ক্লপ শব্দ ঘোড়ার পায়ে। তেমনি সূর্য অস্ত যাচ্ছে

শীতলক্ষার পাড়ে, তেমনি মানুষজন, গাড়ি দেখেই দু'পাশে দাঁড়িয়ে এই প্রতিমার মতো দুই বালিকাকে গড় করছে। রাস্তা একেবারে ফাঁকা। ঘোড়া দুটো নিঃশব্দে দুলে দুলে কদম দিচ্ছে।

অমলা বলল, সোনাকে কোথাও দেখলেই এবারে সাপ্টে ধরব, বুঝলি। জোর করে ধরে আনব। দেখি ও যায় কোথায়।

কমলা বলল, তুই ওর হাত দুটো ধরবি, আমি পা দুটো। চ্যাঙদোলা করে ছাদে তুলে নিয়ে যাব। সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে দিলে সোনা কি করে দেখব!

অমলা ভাবল সোনাকে রাগালে চলবে না, ওকে তোয়াজ করে রাখতে হবে। সে যে কি করে ফেলল সোনাকে নিয়ে! সে এমনটা কমলাকে নিয়ে কতবার করেছে। কিন্তু সোনাকে নিয়ে। সে যেন আলাদা রোমাঞ্চ। আলাদা স্বাদ। ওর ভয়, সোনাকে কমলা না আবার লোভ দেখিয়ে হাত করে ফেলে। সে বলল, ওকে চ্যাঙদোলা করে ছাদে তুলে আনব না। সোনা খুব ভাল ছেলে। ওকে আমি ভালবাসব।

কমলা দিদির দিকে তাকিয়ে বলল, আমিও তবে ভালবাসব।

অমলা এমন কথায় কি যেন দুঃখ পেল ভিতরে।—তোর এটা স্বভাব কমলা। আমার যা ভাল লাগবে সেটা তোর চাই।

—আমার না তোর!

অমলা আর কথা বলল না। পিছনে রামসুন্দর দাঁড়িয়ে আছে। সে প্রায় একটা কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সামনে শীতলক্ষার চর। চরে মনে হল সেই পাগল মানুষ একা একা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন।

কমলা বলল, ঐ দ্যাখ দিদি, সোনার পাগল জ্যাঠামশাই।

অমলা পিছন ফিরে দেখল সেই বালক, সঙ্গে সেই আশ্বিনের কুকুর। নদীর চর পার হয়ে ওরা কোথাও যাচ্ছে।

কমলা বলল, পিছনে সোনা না!

অমলা বলল, রামসুন্দর, পিছনে কে, সোনা না?

রামসুন্দর বলল, আজ্ঞে তাই মনে হয়।

—জসীম, গাড়ি চালাও। জোরে চালাও। বলে অমলা ফ্রক টেনে ঠিকঠাক হয়ে বসল।

পুরানো মঠ নদীর পাড়ে। মঠের ত্রিশূলে একটা পাখি বসে আছে। সোনা এবং তার পাগল জ্যাঠামশাই মঠ পর্যন্ত উঠে আসতে না আসতেই ওরা মঠের আগে উঠে যাবে। স্টিমার ঘাট পার হয়ে যাবে। এবং সোনা আর তার জ্যাঠামশাইকে ধরে ফেলবে। সোনাকে সঙ্গে নেবে, ওর পাগল জ্যাঠামশাই সঙ্গে থাকবে। ওরা চারজন, ঠিক চারজন কেন, রামসুন্দর জসীম আর আশ্বিনের কুকুর মিলে সাতজন, এই সাতজন মিলে বাড়ি বাড়ি দুগগা ঠাকুর

দেখে বেড়াবে। সব শেষে যাবে পুরানো বাড়ি, সে বাড়ির ঠাকুর দেখা শেষ হলেই ওরা ল্যাণ্ডোতে একটা বড় মাঠে নেমে যাবে। আশ্বিনের শেষাশেষি সময় বলে হিম পড়বে সাঁজ নামলেই। সাদা জ্যোৎস্না থাকবে। ওরা সকাল সকাল না ফিরে একটু রাত করে ফিরবে। সঙ্গে রামসুন্দর আছে—কি ভয়! সে উর্দি পরে একেবারে বীরবেশে ল্যাণ্ডোর পিছনে কাঠের পুতুলের মতো সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে।

আর তখন সোনাও দেখতে পেল, নদীর পাড়ে দুই ঘোড়া কদম দিচ্ছে। গাড়ির পিছনে যাত্রাপার্টির মানুষের মতো কে একজন সোজা দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকে সোনা, রামসুন্দর যে এমন একটা রাজার বেশে দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে থাকতে পারে ভাবতে পারল না। অমলা কমলা হাত তুলে ওকে ইশারায় ডাকছে।

সোনা তাড়াতাড়ি জ্যাঠামশাইর হাত টেনে ধরল। সোনাকে দেখেই পুরানো মঠের পাশে ওরা ল্যাণ্ডো থামিয়ে দিয়েছে। যেন সোনাকে তুলে নেবার জন্য ওরা দাঁড়িয়ে আছে। সে আর ওদিকে হাঁটল না। আবার সে পিলখানা মাঠের দিকে উঠে যাবে। সে জ্যাঠামশাইর হাত ধরে ঠিক উল্টোমুখে হাঁটতে থাকল।

অমলা বলল, রাম, তুমি যাবে। সোনাকে নিয়ে আসবে।

কমলা বলল, দেখলি, কেমন সোনা আমাদের দেখেই পালাচ্ছে।

রামসুন্দর গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামল। সে সারি সারি পাম গাছের আড়ালে আড়ালে এসে সোজা চরে নেমে গেল। এখানে বাবুরা নদীর পাড় বাঁধিয়ে দিয়েছেন। সে সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে কাশবনের দিকে ছুটতে থাকল।

সোনা দেখল, সেই রাজার বেশে মানুষটা চরের ওপর দিয়ে ওদের দিকে ছুটে আসছে। কাশবনের আড়ালে পড়ায় ওকে আর দেখা যাচ্ছে না। সে তাড়াতাড়ি জ্যাঠামশাইকে নিয়ে সেই কাশের বনে কোথাও লুকিয়ে পড়বে ভাবল। অমলা কমলা ওকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য পাঠিয়েছে মানুষটাকে। কিন্তু সে পালাতে গিয়েই দেখল কুকুরটা লেজ নাড়ছে, আর ঘেউঘেউ করছে। কুকুরটা রামসুন্দরকে তেড়ে যাচ্ছে।

সোনা আর পালাতে পারল না। সে তাড়াতাড়ি চরের ওপর দিয়ে ছুটতে থাকল। সে কাছারিবাড়িতে উঠে গিয়ে মেজজ্যাঠামশাইর পাশে গদিতে বসে থাকবে চুপচাপ। সে কিছুতেই অমলা কমলার সঙ্গে আর কোথাও যাবে না, লুকোচুরি খেলবে না।

তখন বেশ মজা পাচ্ছিল আশ্বিনের কুকুর। পাগল জ্যাঠামশাই একা একা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তালের আনারসের নৌকা যাচ্ছে। হাঁড়ি-পাতিলের নৌকা পাল তুলে যাচ্ছে। নৌকা যাচ্ছে উজানে। কেউ কেউ গুণ

টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পাগল মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছেন। সোনাকে নিয়ে চরের ভিতর এখন ছুটোছুটি আরম্ভ হয়ে গেছে, অমলা কমলা পর্যন্ত নেমে এসেছে—তিনদিক থেকে তিনজন ধীরে ধীরে সাঁড়াশি আক্রমণ করে সোনাকে ছেঁকে তুলবে, তারপর ল্যাণ্ডোতে নিয়ে উধাও হবে—সে সব তিনি খেয়াল করছেন না। তিনি যেন এখন নদীতে যেসব পালের নৌকা যাচ্ছে তা এক দুই করে গুনছেন।

মজা পেয়েছে আশ্বিনের কুকুর। সূর্যাস্তের সময় এ-একটা আশ্চর্য খেলা। সে পাড়ে দাঁড়িয়ে ঘেউঘেউ করছে। এদিক ওদিক ছুটছে সোনা, ছুটে পালাবার চেষ্টা করছে। সোনার সঙ্গে সেও ছুটোছুটি করছে।

রামসুন্দর বলল, আপনেরা ক্যান নাইমা আইলেন!

অমলা বলল, এই সোনা, শোন। সে রামসুন্দর কি বলছে শুনছে না।

সোনা বলল, আমি যামু না।

—আমরা দুগগা ঠাকুর দেখতে যাচ্ছি।

—যাও। আমি যামু না। সে তিনদিকে তিনজনের ভিতর আটকা পড়েছে। ওর আর পালাবার উপায় নেই।

রামসুন্দর বলল, আপনে না গ্যালে ওনারা কষ্ট পাইব।

—আমি যামু না। সে কেমন একগুঁয়ে জেদি বালকের মতো একই কথা বার বার বলে চলল।

তখন অমলা ছুটে এসে খপ করে সোনাকে জড়িয়ে ধরল।—কোথায় যাবি!

আর আশ্চর্য, সোনা এতটুকু নড়তে পারল না। কি কোমল সুগন্ধ শরীরে, কি আশ্চর্য রঙের চোখ মুখ, সব নিয়ে অমলা সোনাকে নদীর চরে জড়িয়ে ধরেছে। এমনভাবে জড়িয়ে ধরলে কেউ বুঝি কখনও কোথাও আর ছুটে যেতে পারে না।

—চল, আমাদের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে যাবি। ফেরার পথে বড় মাঠে নেমে যাব। সাদা জ্যোৎস্না থাকবে। তোকে তখন একরকমের পাখি দেখাব। কেবল পাখিগুলি উড়ে উড়ে ডাকে। কি সাদা রঙ পাখিগুলোর! তুই দেখলে আর নড়তে পারবি না।

সোনা বলল, কিন্তু তুমি আমারে...। বলেই সে অমলার মুখ দেখে কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল। চোখে কি মিনতি মেয়ের, কি করুণ মুখ-চোখ করে রেখেছে অমলা। সোনা যথার্থই আর কিছু বলতে পারল না। সে জ্যাঠামশাইকে ডাকল, চলেন আবার আমরা ঠাকুর দেইখা আসি। ল্যাণ্ডোতে যামু আর আমু।

পাগল জ্যাঠামশাই এবার মুখ ফেরালেন। সোনা মেজবাবুর মেয়েদের সঙ্গে উঠে যাচ্ছে। তিনি তাড়াতাড়ি নৌকা গোনা বন্ধ করে দিলেন যেন। তিনি সোনাকে ধরার জন্য উঠে যেতে লাগলেন।

অমলা বলল, তোর জ্যাঠামশাইকে সঙ্গে নিবি ?

সোনা পিছন ফিরে দেখল, জ্যাঠামশাই সুবোধ বালকের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। সে বলল, যাইবেন ?

কোন জবাব না দিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন তিনি।

কমলা বলল, তুই আমার পাশে বসবি।

অমলা বলব, যা, সে কি করে হবে। বাকিটুকু বলতে না দিয়ে সোনা বলে ফেলল, আমি জ্যাঠামশাইর পাশে বসমু।

কমলা বলল, বসমু কিরে? বসব বলবি।

—বসব। সোনা কথাটা শেষ করতেই জসীম দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

সোনা বলল, কি জসীম, আমারে, জ্যাঠামশয়রে চিন না!

—আপনের মায় ক্যামন আছে ?

সোনা তো জানে না মা তার কেমন আছে! এ ক'দিনেই মনে হয়েছে দীর্ঘদিন সে মাকে ছেড়ে চলে এসেছে। এবং মাঝে মাঝে ওর কেন জানি মনে হয় বাড়ি গিয়ে সে আর মাকে দেখতে পাবে না। সে গেলেই দেখবে, জ্যেঠিমা চুপচাপ ঘাটপাড় দাঁড়িয়ে আছে, আর কেউ নেই। কেন জানি এটা তার বার বার অমলার সঙ্গে এমন একটা ঘটনা ঘটে যাবার পর থেকে মনে হয়েছে। সে কিছু জবাব দিতে পারল না। সে জোর করে বলতে পারল না, ভাল আছে।—আমরা কবে যাব, এমনও সে বলতে পারছে না মেজ জ্যাঠামশাইকে। বার বার মেজদা বড়দা ওকে শাসিয়েছে, ভ্যাক করে কেঁদে দিলে চলবে না। বাড়ি যামু আমি, বললে চলবে না। যখন নৌকা ছাড়বে ঘাট থেকে তখন তুমি যেতে পারবে। সে বার বার কেন জানি আজ ঈশমের নৌকায় উঠে যাবে ভাবল। সেই নৌকায় গিয়ে বসে থাকলে ওর মনে হয়, সে তার গ্রাম মাঠের কাছাকাছি আছে।

জসীম সোনাকে জবাব না দিতে দেখে বললে, মার জন্য মনটা আপনের ক্যামন করতাছে।

জসীম ঠিক বলেছে। মার জন্য তার মনটা কেমন আশ্চর্য রকমের ভারি হয়ে আছে।

জসীম ফের বলল, আবার যামু আপনেগ ত্যাশে। শীতকাল চইলা আইলেই হাতি নিয়া চইলা যামু। আপনের মার হাতে পিঠাপায়েশ খাইয়া আমু।

সোনা এসব কিছুই শুনছে না। সে ঘোড়ার দিকে মুখ করে বসে আছে। দুই ঘোড়া, সাদা রঙের ঘোড়া পায়ে ক্লপ ক্লপ শব্দ, পিছনে রাজার বেশে রামসুন্দর, মাথার ওপর কত সব সবুজ গাছপালা পাখি এবং নিরন্তর এই ঘোড়া যেন তাকে নিয়ে কোন দূরদেশে চলে যেতে চাইছে। সে দেখল, অমলা

অপলক ওকে চুরি করে দেখছে। সে লজ্জা পেয়ে অমলার দিকে রাতের ঘটনা মনে করে ফিক করে হেসে দিল।

অমলাও হাসল।—আমার পাশে বসবি ?

সোনা জ্যাঠামশাইর মুখ দেখল। মুখে যেন তাঁর সায় নেই। সে বলল, না।

অমলা বলল, কাল দশমী। বাবা বিকেলে ফ্লুট বাজাবেন। তুই আমি আমাদের ব্যালকনিতে বসে বাবার ফ্লুট বাজনা শুনব।

সোনা এখন নির্মল আকাশ দেখছে। সে শুনতে পাচ্ছে না কিছু।

অমলা ফের বলল, বাবা ফ্লুট বাজাবেন। কত লোক, হাজার হাজার মানুষ আসবে নদীর পাড়ে। বাবার ফ্লুট বাজনা শুনতে আসবে। আমাদের ব্যালকনিতে তুই আমি আর কমলা। কি, আসবি ত!

সোনা বলল, পিসি, পুরানো বাড়ি কতদূর!

কমলা বলল, এ কিরে দিদি, সোনা তোকে পিসি ডাকছে।

অমলা কেমন গুম মেরে গেল। সে সংক্ষেপে বলল, অনেকদূর।

সোনা অমলার দুঃখটা যেন ধরতে পেরেছে। সে বলল, আমি বিকালে যাব।

কমলা বলল, বিকাল না রে, ওটা হবে বিকেল।

—আমি জানি।

—বলতে পারিস না কেন ?

—মনে থাকে না।

—তুই আমাদের সঙ্গে কলকাতা গেলে কথা বলবি কি করে!

সোনা চুপ করে থাকলে কমলা ফের বলল, তুই এভাবে বললে, তোকে সবাই বাঙাল বলবে।

কলকাতার কথা মনে হলেই কোন রাজার দেশের কথা মনে হয়। কত বড় বড় সব প্রাসাদের মতো হাজার হাজার বাড়ি, গাড়ি, ঘোড়া, দুর্গ, রেমপার্ট, জাদুঘর, হাওড়া ব্রীজ, এসব ভাবতে ভাবতে সে একটা গোটা সাম্রাজ্যের কথা ভেবে ফেলে। রাজা পৃথ্বিরাজের কথা মনে হয়। রাজা জয়চন্দ্রের কথা মনে হয়। স্বয়ম্বর সভার কথা মনে হয়। সে যেন কোন বন-উপবনে তার ঘোড়া লুকিয়ে রেখেছে। রাজকন্যা দেউড়িতে এসে মূর্তিতে মাল্যদান করলেই ঘোড়ার পিঠে তুলে সে দ্রুত ছুটবে। আর কেন জানি দৃশ্যটাতে একটা সাদা ঘোড়া, ঘোড়ার পিঠে সে এবং তার পেছনে অমলা বসে রয়েছে। সে যেন অমলাকে নিয়ে নদী বন মাঠ পার হয়ে জ্যাঠামশাই-র নীলকণ্ঠ পাখি খুঁজতে যাচ্ছে। সোনা এবার পাশের মানুষটির দিকে মুখ তুলে তাকাল। তিনি চুপচাপ নিরীহ শান্ত মানুষের মতো বসে আছেন।

সোনা বলল, অমলা, তুমি ঘোড়ায় চড়তে জান না ?

কমলা বলল, এই ত বেশ কথা বলতে পারিস।

সোনা বলল, আমার জেঠিমা কলকাতার ভাষায় কথা বলে।

—তা হলে তুই এতদিন বলিস নি কেন।

—আমার লজ্জা লাগে।

কমলা বলল, দিদি খুব ভাল ঘোড়ায় চড়া শিখেছে। খিদিরপুরের মাঠে সকাল হলেই ঘোড়া নিয়ে বের হয়ে যায় দিদি।

সোনা চুপচাপ। বাড়ি বাড়ি ঠাকুর দেখে ফের মাঠের পাশ দিয়ে বড় মাঠে নেমে যাওয়া। মাঠময় সাদা জ্যোৎস্না, পাশে নদীর চর, কাশ ফুল। অস্পষ্ট নদীর জল, আকাশে অজস্র নক্ষত্র। তার প্রতিবিম্ব নদীর জলে। ঘোড়া সেই সাদা জ্যোৎস্নায় ছুটছে। ওদের গলায় ঘণ্টা বাজছিল। আশ্বিনের কুকুর সেই ঘণ্টার শব্দে নেচে নেচে আসছে। ওরা মাঠের ভিতর নেমে যেতেই ওপারের বাঁশবন থেকে কিছু পাখি উড়ে আসছে মনে হল। ওরা গাড়িতে বসে রয়েছে। বড় বড় পাখি সাদা জ্যোৎস্নায় উড়ে উড়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আর কক্ কক্ করে ডাকছে। কেমন ভয়াবহ মনে হয়। অজস্র পাখি এই রাতে যেন বিশ্ব চরাচরে উড়ে উড়ে কিসের নিমিত্ত শোক জ্ঞাপন করছে।

তখনই মনে হল নদীর চরে একটা ঘূর্ণি ঝড় উঠছে। রাশি রাশি কাশ ফুল উড়ে আসছে। পাখিগুলো বনের ভিতর হারিয়ে গেল। পাখিদের আর কোন শব্দ নেই। শুধু কাশফুলের রেণু, অজস্র রেণু প্রায় তুষারপাতের মতো ওদের ওপর এখন ঝরে পড়ছে।

কমলা বলল, সোনা, চোখ বন্ধ কর। কাশফুলের রেণু চোখে পড়লে অন্ধ হয়ে যাবি।

সোনা চোখ বুজে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে সবাই চোখ বুজে বসে থাকল। যতক্ষণ তুষারপাতের মতো এই কাশের রেণু বন্ধ না হচ্ছে ততক্ষণ ওরা চোখ বুজে থাকবে। অমলা না বললে গাড়ি ঘুরবে না বাড়ির দিকে। অমলা সোনাকে একটা আশ্চর্য ছবি দেখাতে এনেছে। সে জ্যোৎস্নায় তার ঘড়ি দেখল। স্টিমার আসার সময় হয়ে গেছে। স্টিমারের আলো এই মাঠে যখন পড়বে, ডান দিক অথবা বাঁ দিকে আলোটা যখন পাশের ডাঙা, নদীর চর খুঁজবে তখন মাঠে পাখিগুলির শরীরেও এসে আলো পড়বে। অদ্ভুত মায়াবিনী এক রহস্যময় দৃশ্য ফুটে ওঠে তখন। সে উজ্জ্বল আলোর ভিতর পাখিদের চোখ, নীলাভ চোখ, সাদা ডানা এবং হলুদ রঙের পা যেন গভীর নীলজলে অজস্র রূপালী মাছের মতো, একটা ঘূর্ণি স্রোতে মাছগুলো ঘুরে ঘুরে নেমে আসছে—অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আবার ঘুরে ঘুরে ফিরে আসছে। কি এক নেশায় পেয়ে যায়। দাঁড়িয়ে কেবল দেখতে ইচ্ছা হয়—প্রায় ছায়াছবির মতো ঘটনাটা। সোনাকে সে

সেই দৃশ্য দেখাতে এনেছে। স্টিমারের আলো দূর থেকে দেখলেই পাখিগুলো মাঠের ওপর চক্রাকারে উড়তে থাকে।

অমলা চোখ বুজেই বলল, সোনা, তোকে আমরা আজ কত খুঁজেছি।

সোনা কিছু বলল না। সে এবার চোখ খুলে তাকাল। আর দেখল সকলেই কেমন সাদা হয়ে গেছে। সে কাউকে চিনতে পারছে না। ওরা যেন সবাই গল্পের দেশের মানুষ হয়ে গেছে। অথবা সেই যে, সে একটা ছবির বই দেখেছিল—ইংরেজি ভাষায় ছোটদের গল্পের বই, কেবল পাইন গাছ, গাছে গাছে বরফ পড়ছে, এক বৃদ্ধ সেই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে, ছোট এক বালক দাঁড়িয়ে আছে হাত ধরে, ওদের পোশাকের ওপর, মাথায় বরফের কুচি পড়ে সাদা হয়ে গেছে—সে যেন তেমনি। সে একা কেন হবে, সকলে। জ্যাঠামশাই চোখ খুলছেন না, সোনা বললেই চোখ খুলবেন—তিনি সেই বুড়ো মানুষ হয়ে গেছেন। এতক্ষণ শুধু ঘোড়া দুটোই সাদা ছিল, এখন ঘোড়া, গাড়ি, রামসুন্দর, জসীম সকলে তার সেই গল্পের দেশের মানুষ। আশ্বিনের কুকুর পর্যন্ত সাদা হয়ে গেল!

তখনই সোনা দেখল এক অদ্ভুত আলো, চারপাশের আকাশ, নদী, নদীর চর, কাশবন এবং মাঠের সব গাছপালা আলোকিত করে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। সোনা চিৎকার করে উঠল, ঐ আলো, ইস্টিমারের আলো।

সকলে চোখ মেলে সেই আলো দেখল। ওদের গাড়িতে এসে আলো পড়েছে। বলা যায় হাজার ডে লাইট যেন জেলে দেওয়া হয়েছে সর্বত্র, সেই আলোতে আবার বন থেকে পাখিরা উড়ে এসেছে। ওরা সাদা হয়ে গেছে, মাঠে সাদা জ্যোৎস্না, সাদা পাখি এবং নীলাভ চোখ, সোনা অপলক দেখছে, দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যাচ্ছে। পাগল মানুষ নিজেকে দেখছেন। সে কি সহসা পলিনের দেশে চলে এসেছে! এত কাশফুল তুষারপাতের মতো, চার পাশে সাদা আর সাদা—আর নীলাভ চোখ পাখিদের। জ্যাঠামশাই সেই পাখিদের ধরার জন্য কেমন লাফ দিয়ে নামতে চাইলেন। জসীম বুঝতে পেরে বলল, এবারে গাড়ি ফিরাতে হয় মা ঠাইরেন।

রামসুন্দর বলল, তাই হয়।

কিন্তু অমলা কিছু বলছে না। ঘূর্ণি ঝড় এসে ওদের এমন একটা গল্পের দেশের মানুষ করে দিয়ে যাবে সে নিজেও তা ভাবতে পারে নি। সে বলল, সোনা, কি দেখছিস ?

—পাখি দেখছি।

—আলো দেখছিস না!

—দেখছি।

—আর কি দেখছিস ?

সোনা বলল, ইস্টিমার।

কিন্তু অমলা পাগল মানুষকে কিছু বলছেন না বলে কেমন ক্ষেপে যাচ্ছেন তিনি। তিনি কি বলতে যাচ্ছিলেন, তখনই মনে হল কি যেন একটা অতিকায় জীব উঠে আসছে চর থেকে। প্রথমে ওরা কিছুই বুঝতে পারে নি, একটা সাদা রঙের জীব, প্রায় হাতির মতো উঁচু লম্বা, এই মাঠের দিকে উঠে আসছে। সোনা এবং সবাই হতবাক হয়ে দেখছে। অমলা বলছে, ওটা কি জসীম ! ওটা কি উঠে আসছে ! আলোটা এতক্ষণে সরে গেছে। কিন্তু সকলের আগে পাগল মানুষ চিনতে পেরেই লাফ দিয়ে নেমেছেন—সেই হাতি, কাশফুলে সাদা হয়ে গেছে—সেই অজস্র বন কাশের। ফুলে ফুলে হাতিটা পর্যন্ত সাদা হয়ে গেছে। এবং শেকল ছিঁড়ে সে ছুটে পালাচ্ছে। অথবা জসীম ওর কাছে যায় নি বলে সে জসীমের জন্য এই মাঠে চলে এসেছে।

সোনা তাড়াতাড়ি নেমে জ্যাঠামশাইর হাত চেপে ধরল। সে এ-ভাবে ধরলে তিনি কোথাও যেতে পারেন না। অথচ চোখে কি মিনতি তার। তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও। হাতিতে চড়ে আমি আবার কোথাও চলে যাব।

সোনা পাগল মানুষের হাত ছাড়ল না। জসীম বলল, আমি চলি রে, ভাই। সে রামসুন্দরকে উদ্দেশ্য করে বলল, আবার লক্ষ্মী আমার খেইপা গেছে। বলে সে লাফ দিয়ে নামল এবং হাতিটা যেদিকে ছুটে যাচ্ছে ক্রমে সে চিৎকার করতে করতে সেদিকে ছুটে গেল। আর ওরা দেখল জসীমের ডাক শুনেই হাতিটা কেমন সাদা জ্যোৎস্নায় পলকে থেমে গেছে, থেমে দাঁড়িয়ে আছে আর দুলে দুলে শুঁড় নাড়ছে।

সোনা বলল, জ্যাঠামশাই, আমি বড় হলে আপনাকে নিয়ে কলকাতা চলে যাব। আপনি এখন গাড়িতে ওঠেন।

এই শুনে মণীন্দ্রনাথও একেবারে শান্ত হয়ে গেলেন। চুপচাপ হাতিটা দেখতে দেখতে মগজের ভিতর নিরন্তর যে ছবি পোরা আছে তা আবার চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখলেন—যেন সেই নদীর জলে ময়ূরপঙ্খী ভাসে, দুর্গের গম্বুজে পাখি ওড়ে এবং হুগলী নদীর দু-পাড়ে চটকলের সাইরেন—আর তখন ইডেনের নীল রঙের প্যাগোডার নিচে পলিন তাকে পাশে নিয়ে বসে থাকে। হাতে হাত রেখে বলে—তুমি অনেক বড় হবে মণি। বাবা তোমার কাজে খুব খুশি। বাবাকে বলে তোমার বিলেত যাবার ব্যবস্থা করব। একবার ঘুরে এলেই তুমি কত বড় হয়ে যাবে, আরও বড় কাজ পাবে। কার্ডিফে আমাদের বাড়ি আছে। ক্যাসেলের গা ঘেঁষে ছোট্ট ব্রীজ, তারপর রাউন্ড ইনজিনিয়ারিং ডক এবং দূরে এক পাহাড়, পাহাড়ের মাথায় লাইট হাউস। গ্রীষ্মের বিকেলে তুমি আমি লাইট হাউসের নিচে বসে থাকব। সমুদ্র দেখব। আমরা জাহাজে যাব, জাহাজে ফিরে আসব, মাই প্রিন্স। শুধু তুমি রাজী হলেই হয়ে যাবে।

এবং ঠিক তক্ষুনি অমলা এসে সোনার পাশে বসেছে। ওর শরীর থেকে কাশফুলের রেণু তুলে দিতে দিতে ওকে জড়িয়ে ধরেছে। এবং ফিসফিস করে কি বলছে। এই মেয়ের মুখ দেখলেই পলিনের অনুভূতি পাগল মানুষের মাথায় ফিরে ফিরে আসে—যেন তাঁর সামনে ছোট্ট পলিন, তিনি যে এখন কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না—কারণ পলিন ওকে সন্ত মানুষের মতো হতে বলছে। পলিন সে রাতে অধীর আগ্রহে পিয়ানো বাজাচ্ছিল। উজ্জ্বল সাদা রঙের সিল্কের গাউন পরেছিল পলিন। ওর চাঁপা ফুলের মতো নরম আঙুল কি দ্রুত চলছে ! অধীর উন্মত্ত এক ইচ্ছা—সে রাত পলিন সারারাত ঘুমোতে পারে নি, আমাকে বাড়ি যেতে হবে পলিন। বাবা টেলিগ্রাম করেছেন। বাবা বড় অসুস্থ। এ-যাত্রায় তোমার সঙ্গে আমার বুঝি যাওয়া হল না। তারপর কি, তারপর আর ভাবা যাচ্ছে না—আবার সব ঘোলা ঘোলা অস্পষ্ট। সে কিছুতেই আর কিছু মনে করতে পারল না।

অমলা এবার আরও কানের কাছে মুখ লাগিয়ে বলল, কাউকে বলিস নি তো !

সোনা কেমন বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। জসীম হাতি নিয়ে পিছনে ফিরছে। রামসুন্দর বাড়ির দিকে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দিয়েছে। ওরা হাতি নিয়ে ঘোড়া নিয়ে মিছিল করে রাজার মতো ফিরছে।

—তুই না সোনা, কিছু বুঝিস না !

তখনই পাগল মানুষ এক রহস্যময় কবিতা আবৃত্তি করতে থাকলেন—

> Still, still to hear her tender taken breath, And to live ever—or else swoon to death. Death, Death, Death—

বার বার পুনরাবৃত্তি—ডেথ, এবং ঘোড়ার পায়ের শব্দ ক্লপ ক্লপ। হাতিটা সকলের পিছনে আসছে। আশ্বিনের কুকুর সকলের আগে যাচ্ছে। মাঝখানে দুই সাদা ঘোড়া, গাড়ি, প্রাসাদে যেন রাজা ফিরছেন। নিজেকে আজ সোনার উপকথার নায়কের মতো মনে হচ্ছে।

সকাল থেকেই বিসর্জনের বাজনা বাজছে। দেবীর চোখে মুখে বিষণ্ণতা। তিনি আবার হিমালয়ে চলে যাচ্ছেন। আগমনী গান যে যার গাইবার এতদিন গেয়েছে। আর গাইবার কিছু নেই।

এইদিনে সব কিছুতেই একটা বেদনার ছাপ। এত যে রোদ ঝিলিমিলি আকাশ, এত যে উজ্জ্বল দিন, কোথাও মালিন্য নেই—তবু কি যেন সকলের হারিয়ে যাচ্ছে। এই মণ্ডপের সামনে সকলেই এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে। বড় হুজুর সকাল থেকেই নাটমন্দিরে একটা বাঘের চামড়ার ওপর বসে আছেন। পরিধানে রক্তাম্বর। কপালে রক্ত চন্দনের তিলক। এই দিনে—মা ভুবনময়ী, ভুবনমোহিনী, হে মা জগদীশ্বরী, তুই একবার নয়ন ভরে তাকা মা—হেন প্রার্থনা এই মানুষের।

মেজবাবু এবারেও প্রতিবারের মতো ফ্লুট বাজাবেন। নগেন ঢালি এসেছিল ঢোল নিয়ে। সে গতকাল হাটে-বাজারে-গঞ্জে ঢোল পিটিয়ে চলে এসেছে।

গ্রাম গ্রামান্তরে এই খবর রটে গেলে চাষী বৌ'র মুখের রঙ বদলে যায়। সকাল সকাল খেয়ে নিতে হবে। সেই শীতলক্ষার তীরে গাঁ। জমিদার বাবুদের সব দালান-কোঠা নদীর পাড়ে পাড়ে। আঁচলে একটা চৌ-আনি বেঁধে, পানে ঠোঁট রাঙা করে ঘোমটা টেনে মুখে দশহরায় যাবে, যাবার আগে দীঘির পাড়ে বসে মেজবাবুর ফ্লুট বাজনা শুনবে। সকাল সকাল বের না হতে পারলে জায়গা পাওয়া যাবে না। নদীর পাড়ে পাড়ে যেসব গাছ আছে, সেসব গাছের নিচে রাত থাকতেই লোক এসে জমতে শুরু করেছে। চাষা মানুষেরা অথবা বৌ-রা সামিয়ানার নিচে যেতে পারবে না। কাছ থেকে দেখবে মেজবাবুকে এমন সখ এইসব চাষী বৌয়ের। কিন্তু সিপাইগুলো এমন করে, লাঠি নিয়ে তাড়া করে, কার সাধ্য ওরা সামিয়ানার নিচে গিয়ে বসে। কতবার চাষী বৌ ভেবেছে লুকিয়ে চুরিয়ে সে চলে যাবে সামিয়ানার নিচে, কাছ থেকে দেখবে মেজবাবুকে, ফ্লুট বাজনা শুনবে—কিন্তু তার মানুষ বড় ভীরু, সে কিছুতেই তার বৌকে ভিতরে ঢুকতে দেবে না। একটা ঝাউগাছের নিচে বসে ওরা বাবুর ফ্লুট বাজনা শুনবে। যতক্ষণ না নদীর জলে, সব গ্রামের প্রতিমা বিসর্জন হবে, ততক্ষণ মেজবাবু ক্রমান্বয় ফ্লুট বাজিয়ে যাবেন। একের পর এক সুর, সবই বড় তখন করুণ মনে হয়, নিরিবিলি এক জগৎ সংসারে কি যে কেবল বাজে, প্রাণের ভিতর কি যে বাজে—ফ্লুট শুনতে শুনতে তারা দুঃখী মানুষ শুয়ে যায়।

সকাল থেকেই জায়গা নেবার জন্য দূর গ্রামান্তর থেকে লোকজন আসতে

আরম্ভ করেছে। আমলা কর্মচারীদের কাজের বিরাম নেই। মঞ্চ করা হয়েছে। দীঘির পাড়ে এক মঞ্চ, রোশনচৌকি যেন বাজবে সেখানে। সে মঞ্চে তিনি শীতলক্ষার ও-পারে সূর্য ঢলে পড়লেই উঠে যাবেন। কলকাতা থেকে তাঁর আরও দু'জন শিষ্য এসেছে। ওরাও বাজাবে। এখন খালেক কোথায়! খালেক পীড়িত। কাছারিবাড়ি পার হলে এক অশ্বশালা আছে, কিছু ঘোড়া আছে, সাদা রঙের কালো রঙের ঘোড়া সেখানে অস্তাবলের এক পাশে খালেকের ছোট্ট ঘর। আলো নেই, বাতাস আসে না। সূর্য দেখা যায় না। খালেক সেই ঘরে শীর্ণকায় মানুষের মতো অনাহারী, দুঃখী এবং চোখেমুখে ক্লিষ্ট এক ভাব। খালেক মিঞা শরীর শক্ত করে পড়ে আছে। খালেক আজই সূর্যাস্তের সময় মারা যাবে। সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। হাত পা স্থবির। পাষাণের মতো ভারি লাগছে সব। দশমীর দিনে সেও ফ্লুট বাজায়। সেও মেজবাবুর পাশে বসে থাকে। আজ সে তার আঙুল-গুলো এই দিনে নেড়ে নেড়ে দেখতে চাইছে—পারছে না। ভারি ভারি—পাষাণের মতো ভারি। ইব্রাহিম একবার দেখে এসেছে। ভূপেন্দ্রনাথ দু'বার দেখে এসেছে। ওষুধ বা পথ্য সে কিছুই খাচ্ছে না। সে টের পেয়ে গেছে সূর্যাস্তের সময় ফ্লুট বাজলেই সে এক অদ্ভুত সুরলহরীর ভিতর ডুবে যেতে যেতে পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখ ভুলে যাবে। সে মরে যাবে। তবু সে এই দুঃসময়ে এটা তার দুঃসময় কি সুসময়, সে মনে মনে এটা সুসময় জানে, সে যেন কার পদতলে বসে সারাজীবন ফ্লুট বাজাবে, তার জন্য তৈরি হচ্ছে।

যখন একটা মানুষ মরে যাবে বলে চিৎপাত হয়ে অশ্বশালার পাশে পড়ে আছে তখন একজন মানুষ, আদ্যিকালের এক তালপাতার পুঁথি সামনে রেখে পড়ে চলেছেন—জয়ং দেহি, যশো দেহি। এই মানুষ মহালয়ায় চণ্ডীপাঠ করেন না। বিসর্জনের দিন চণ্ডীপাঠ। এমন উল্টো ব্যাপার ভূভারতে কবে কে দেখেছে। তিনি পদ্মাসন করে বসেছেন। বাঘছালের ওপর বসে। সামনে দেবীপ্রতিমা। বিসর্জনের বাজনা বাজছে। তিনি উচ্চৈস্বরে বললেন, হে জগদম্বে, হে মা ঈশ্বরী, বলে সুর ধরে যেন বলে চললেন, অপরাধ ক্ষমা করতে আজ্ঞা হয় মা। তুই আজ চলে যাবি, অ মা উমা, এই বুঝি তোর ইচ্ছা ছিল, বলে শিশুর মতো করজোড়ে তিনি কাঁদতে থাকলেন। এবং কাঁদতে কাঁদতে তিনি শুম্ভ-নিশুম্ভ বধে চলে এলেন। কখনও মধুকৈটভ বধে। দেবীর গা থেকে কি তেজ বের হচ্ছে। শরীরে কাঁটা দিয়েছে। কি গ মা, তুই ভয় পেলি, তিনি পাঠ করতে করতে মাঝে মাঝে এইসব স্বগতোক্তি করছেন।—হে মা, তুমি এখন মধু পান কর। থেমে তিনি বললেন, মধু পান নিমিত্ত শরীরে অপার শক্তি সঞ্চয় করেছ—যা দেবী সর্বভূতেষু, দেবী তোমার নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে হাজার হাজার দেবসৈন্য সৃষ্টি হচ্ছে, তারা যে সব মুহূর্তে বিনাশ হয়ে গেল মা! মহিষাসুর

নিমেষে সব ধ্বংস সাধন করছে। মা, তোর বুঝি এই কপালে ছিল, মায়াপাশে আবদ্ধ করতে পারলি না! বলে তিনি যেসব ভক্ত পাশে বসে চণ্ডীর ব্যাখ্যা শুনছিল, তাদের ব্যাখ্যা করার সময়ই দেখলেন, এক বালক নাটমন্দিরের পশ্চিমের বারান্দায় বড় একটা থামের আড়ালে ঈশমের গল্পের মতো মনোযোগ দিয়ে চণ্ডীপাঠ শুনছে। সেই এক কিংবদন্তি, গর্জে গর্জে, কে গর্জন করছে! দেবীর গর্জন, না অসুর।

এই বৃহৎ সংসারে তিনিই সব। অমলা কমলার ঠাকুরদা প্রতাপশালী মানুষ। একমাত্র দেবীর সামনে এসে তিনি শিশু বনে যান। শিশুর মতো কাঁদেন। কেবল ক্ষমাভিক্ষার মতো মুখ। সেই মুখে, চণ্ডীপাঠের সময় গর্জে গর্জে এমন শব্দ উচ্চারণে সোনা হেসে ফেলেছিল। তক্ষুনি চীৎকার। যেন গোটা বাড়িটা কাঁপছে। সকলে ছুটে এসেছে।—কে হাসে! সোনা পালিয়ে যাবে ভেবেছিল! কিন্তু চক্ষু রক্তবর্ণ, নাসিকা ঈগল পাখি প্রায়, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা এবং কাপালিক সদৃশ মুখ—ক্ষণে ক্ষণে মুখের কি পরিবর্তন—সোনা আর নড়তে পারে নি। বললেন, অঃ তুই। দেবীমহিমা শুনতে ভাল লাগছে!

সোনা ঘাড় কাত করে দিল।

—তবে দাঁড়া।

সোনা একটা থামের মতো দাঁড়িয়ে থাকল।

অনেকক্ষণ পরে হুঁশ হল কমলা ওকে পিছন থেকে চুপি চুপি ডাকছে।—সোনা, এখানে তুই কি করছিস!

সে বলতে পারল না চণ্ডীপাঠ শুনছে। ঋষি পুরুষেরা নানারকম কিংবদন্তি লিখে গেছে তালপাতার পুঁথিতে, এখন সে সবই দেবীমহিমা হয়ে গেছে। ওর কাছে প্রায় সবটাই ঈশমের সেই যে এক সূর্য আছে না, জলের নিচে এক রূপালী মাছ আছে, মাছটা সূর্য মুখে অথবা সেই মাছটা কি জালালি? যে কেবল বিল পার হয়ে নদী পার হয়ে সাগরে চলে যায় সূর্য মুখে। সকাল হলেই পুবদিকে সূর্যটাকে লটকে ডুব দেয় ফের। সাগরে সাগরে মহাসাগরে ঘোরা-ফেরা তার।

সে বলতে পারত, ঋষি পুরুষেরা কিংবদন্তি লিখে গেছে তালপাতার পুঁথিতে। আমি তাই শুনছি। বলতে পারত, আমাদের ঈশম ওর চেয়ে অনেক বেশি ভাল ভাল কিংবদন্তি জানে। সে ভাবল, বড় হলে তালপাতার পুঁথিতে সেও তা লিখে রাখবে। সুতরাং সে চণ্ডীপাঠ শুনছে, না কিংবদন্তি শুনছে পুরাকালের, এখন এই মেয়ে কমলাকে তা প্রকাশ করতে পারল না।

সোনা কিছু বলছে না দেখে ফের কমলা বলল, পাঁচটায় হাতি আসবে। হাতিতে আমরা দশরা দেখতে যাব। তুই আমাদের সঙ্গে যাবি।

সোনা বস্তুত এখন ঈশমের সেই কালরাত্রি, মহারাত্রি বলা যেতে পারে—

জালালিকে তুলে আনছে বিলের পাড় থেকে এমন একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে। জ্যোৎস্না রাত, শীতে পাগল জ্যাঠামশাইর মুখ সাদা ফ্যাকাসে—ঠিক জ্যোৎস্নার মতো রঙ, এখন সোনার এসব মনে হওয়ায় সে কমলার কথা কিছুই শুনতে পাচ্ছে না।

—এই, শুনছিস আমি কি বলছি?

—কি!

—আমাদের সঙ্গে হাতির পিঠে দশরা দেখতে যাবি?

—যাব।

—একটু সকাল সকাল ভিতরে চলে আসবি। আমরা তোকে সাজিয়ে দেব। পাউডার মেখে দেব।

সোনা হাঁটতে থাকল।

—কি রে, মনে থাকবে ত?

সে ঘোড়া কাৎ করে বলল, মনে থাকবে তার। তারপর বলল, আর কে কে যাবে?

—আমি, দিদি, সোনাদি, রমা, বাচ্চু।

—আর কেউ যাবে না?

—আর কে যাবে জানি না। তুই কিন্তু আগে আগে চলে আসবি। মুখে তোর পাউডার মেখে দেব।

সোনা তার এই বয়স পর্যন্ত মুখে পাউডার মাখে নি। সে বেটাছেলে। বেটাছেলে পাউডার মাখে না, বাড়িতে একটা এমন নিয়ম আছে। মা জেঠিমা কদাচিৎ মুখে পাউডার মাখেন। সে পাউডার মাখতে প্রায় দেখেই নি বললে চলে। দূর দেশের আত্মীয়-বাড়িতে যেতে হলে হেজলিন স্নো মেখেছে, শীতকালে মা তার মুখে স্নো মাখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই গরমের সময় সে পাউডার মাখবে এবং ওর মুখ আরও সুন্দর দেখাবে ভাবতেই লজ্জায় গুটিয়ে গেল।

সে বলল, জ্যাঠামশাই যাবে না?

—না।

—জ্যাঠামশাই না গেলে আমিও যাব না।

—তুই কি রে, সোনা। যারা ছোট তারাই যাবে। বড়রা হেঁটে যাবে। ঠাকুমা তোকে নিয়ে যেতে বলেছে। এই বলে যেমন দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসেছিল তেমনি দ্রুত ওপরে উঠে গেল। সিঁড়ির মুখে অমলা দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, কি রে, পেলি সোনাকে?

—হ্যাঁ।

—কি বলল?

—বলল, যাবে।

—বলেছিস ত সকাল সকাল আসতে! পাউডার মেখে দেব মুখে, বলেছিস?

—সব বলেছি। তুই না দিদি, কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। বাবা এদিকে আসছেন। বাবা এ ক'দিন ধুতি-চাদর পরে একেবারে বাংলাদেশের মানুষ হয়ে যান। তারপর কলকাতায় যাবার দিন এলেই একেবারে সাহেবসুবো মানুষ। তখন তিনি বাংলাতে পর্যন্ত কথা বলেন না। তখন বাবাকে বরং বেশি পরিচিত মানুষ মনে হয় ওদের। ওরা বাবার সঙ্গে সহজেই তখন কথা বলতে পারে।

কিন্তু এখন ওরা পালাবার পথ খুঁজছিল। এই অসময়ে ওরা নাটমন্দিরের কাছে চলে এসেছে—এটা ঠিক না। দেখলেই বাবা ধমক দেবেন। সুতরাং ওরা যতবারই সোনাকে কাছারিবাড়ির দিকে খুঁজতে গেছে, খুব সন্তর্পণে গেছে। এমন কি অন্দরের দাসী-বাঁদীদের চোখেও যেন না পড়ে। প্রায় লুকোচুরি খেলার মতো চলে যাওয়া, তারপর সোনাকে না পেলে বিমর্ষ হয়ে ফিরে আসা।

বাবা এখন করিডোর পার হয়ে যাচ্ছেন, তিনি এখন নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেবেন। বাবার ঘরটা বাবা না থাকলে সব সময় তালা দেওয়া থাকে। বড় বড় আলমারি—কত বই সব এবং কাচের জানালা, দরজায় নানা-রকমের কারুকাজ। বাবার ঘরে পুরানো আমলের লম্বা আবলুস কাঠের খাট এবং পালঙ্ক বলা চলে, কতকাল থেকে পালঙ্ক খালি। বাবা এলে এই পালঙ্কে না শুয়ে ছোট একটা তক্তপোশে শুয়ে থাকেন। ডানদিকের ঘরটাতে বিলিয়ার্ড টেবিল। অবসর সময় বাবা একাই টেবিলে লাল-নীল রঙের বল নিয়ে খেলা করেন। আর দেয়ালে বাবার কোর্টের ছবি। গভর্নরের সঙ্গে বাবার ভোজ খাওয়ার ছবি। বিলাতে লিঙ্কন হলে পড়ার সময়কার ছবি। মায়ের সঙ্গে তোলা ফটো—বোধহয় জায়গাটা ওয়েলসের কোন একটা গ্রামের। মামাবাড়িতে যাবার সময় বড় একটা ক্যাসল পড়ে। একটা ক্যাসলের ছবিও এ-ঘরে রয়েছে। ছাত্রাবস্থায় বাবার সেই সতেজ মুখ দেখার জন্য দুই বোন চুরি করে এই ঘরে ঢুকে যায়। বাবার কাছে ধরা পড়লে দু' বোন ছুটে পালায়। সোনা বলেছিল বাবার ঘরটা দেখবে। অমলা বলেছিল দেখাবে। কিন্তু কি করে দেখানো যায়! সোনার বুদ্ধি নেই মোটেই। কেবল কথা বললেই হাসে। চুপি চুপি দেখে যে চলে যাবে তেমন সে নয়। এটা কি, ওটা কেন, এই লাল-নীল রঙের বল দিয়ে কি হয়? আমি দুটো বল নেব। অথবা সে ওসব দেখতে দেখতে এমন অন্যমনস্ক হয়ে যাবে যে ধরা না পড়ে যাবে না। সোনা এমন ছেলে যে, ওকে নিয়ে কিছু করা যায় না। পালানো যায় না। সে বোকার মতো বার বার ধরা পড়ে যায়।

সোনা তখন ভূপেন্দ্রনাথকে বলল, জ্যাঠামশায়, দশরাতে যামু। কমলা আমারে নিয়া যাইব। হাতিতে চইড়া যামু কইছে।

দশমীর দিন এই হাতি আসে বিকালে। জসীম জরির পোশাক পরে। মাথায় তার জরির টুপি। বাড়ির বালক এবং বালিকারা সকলে মিলে দশরা দেখতে যায়। হাতির শুঁড়ে শ্বেতচন্দনে ফুল-ফল আঁকা থাকে। কপালে পানপাতা এবং শরীরে নানারকমের কলকা আঁকা অথবা ধানের ছড়া এবং লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ। গলায় কদম ফুলের মালা। যেই না মেজবাবুর ফ্লুট বাজনা আরম্ভ হবে, হাতিটা নিয়ে জসীম রওনা হবে পিলখানার মাঠ থেকে। তারপর সোজা অন্দরমহলের দরজায়। সেখানে হাতিটা দাঁড়িয়ে থাকবে। কপালে চাঁদমালা তার। তখন বাড়ির বৌরানীরা সোহাগ মেগে নেবে প্রতিমার। প্রতিমার পায়ে সিঁদুর ঢেলে নিজের নিজের কৌটায় পুরে রাখবে। সম্বৎসর এই সিঁদুর কপালে দেবে। আর মেজবৌরানীর জন্যেও সিঁদুর আসে সোনার কৌটায়। সেটা মেজবাবু কলকাতা যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যান। মেজবৌরানী কপালে সিঁদুর দেন না। লম্বা গাউন পরেন। গীর্জায় যান। তবু এক ইচ্ছা এই পরিবারের—বিশেষ করে বৌঠাকুরানীর অর্থাৎ মেজবাবুর মার মন আদৌ মানে না। তিনি সব বৌদের জন্য যেমন সোনার কৌটায় দেবীর পা থেকে সিঁদুর কুড়িয়ে রাখেন তেমনি মেজবৌরানীর জন্যও সিঁদুর কুড়িয়ে নেন। মেজবাবুকে দেবার সময় অনুরোধ করবেন একবার অন্তত সিঁদুরটা যেন কপালে ছোঁয়ায় বৌ। মেজবাবু তখন সামান্য হাসেন। তারপর যার জন্য দেবীর পা থেকে সিঁদুর সঞ্চয় করা—সে এই হাতি। সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী এই পরিবারের। দশমীর দিনে কপালে নিজ হাতে বৌঠাকুরানী সিঁদুর পরিয়ে দেন। চাঁদমালা পরিয়ে দেন। তারপরই বাজনা বাজে। ঢাকের বাজনা, বিসর্জনের বাজনা। পরিবারের সব-বালক-বালিকারা সেজেগুজে হাতিতে চড়ে বসে। প্রতিমা নিরঞ্জনের লোকেরা, জয় জগদীশ্বরী, জয় মা জগদম্বা আর জয় বাড়ির বড় হুজুরের—এই সব জয় দিতে দিতে প্রতিমা বের করে নিয়ে যায়। এইসব জয়ের ভিতর শোনা যায় মেজবাবু মঞ্চের ওপর বসে ফ্লুট বাজাচ্ছেন। দক্ষিণের দরজা দিয়ে প্রতিমা যায়, উত্তরের দরজা দিয়ে হাতি যায়। আর মাঝখানে বড় চত্বর। তারপর দীঘি। দাঘির পাড়ে রোশনচৌকির মতো মঞ্চ, ক্রমান্বয়ে এক সুরে বেজে চলেছে। নদীতে এক দুই করে প্রতিমা নামছে। ক্রমে সন্ধ্যা নামছে নদীর চরে কাশফুলের মাথায়। দশমীর চাঁদ আকাশে। আর ঢাক বাজছে, ঢোল বাজছে। নৌকায় সারি সারি দেবী প্রতিমা, বিসর্জনের বাজনা, হৈচৈ, আলো-আঁধারির খেলা। হাউই পুড়ছে, আলো ফুটছে কত রকমের। থেকে থেকে মেজবাবুর ফ্লুট বাজনা—করুণ এক সুর এই বিশ্বচরাচরে অপার মহিমা নিয়ে বিরাজ করছে। মেজবাবু বুঝি এই সুরের ভিতর ফ্লুট বাজাতে বাজাতে স্ত্রীর ভালবাসার জন্য কাঁদেন।

আজ আবার সেই দিন এসে গেছে। নিত্যকার মতো ভূপেন্দ্রনাথ সকাল

সকাল স্নান করে এসেছে নদী থেকে। নিত্যকার মতো ময়ূরের ঘর, বাঘের খাঁচা এবং হরিণেরা যে যেখানে থাকে সেসব জায়গায় ভূপেন্দ্রনাথ ঘোরাঘুরি করেছে। সাফসোফ ঠিকমতো হয়েছে কিনা, এসব যদিও ওর দেখার কথা নয় —তবু এতগুলি জীব এই প্রাসাদে প্রতিপালিত, প্রতি মানুষের মতো তাদের সুখ-দুঃখ বুঝে ভূপেন্দ্রনাথ নিজে দেখেশুনে সব বিধিমত ব্যবস্থা করে থাকে। তা ছাড়া আজ দেবী চলে যাচ্ছেন হিমালয়ে। কি এক বেদনা সব সময় সকাল থেকে প্রতিবারের মতো ওকে বিষণ্ণ করে রাখছে। তারপর নিত্যকার মতো মঠের সিঁড়ি ভেঙে ভিতরে ঢুকে শিবের মাথায় জল, বৃষের পায়ে জল এবং শেকল টেনে এক দুই করে শতবার ঘণ্টাধ্বনি।

খালেকের অসুখ। কুলীন পাড়া থেকে ডাক্তার এসে দেখে গেছে। আর এখন যারা বিদায় চাইছে, যেমন,পুরোহিত এবং অন্য অনেকে,তারা এখন সবাই কাছারিবাড়িতে ভূপেন্দ্রনাথের অপেক্ষায় বসে আছে। তা'ছাড়া গত সন্ধ্যায় যারা কাটা মোষ নিয়ে গিয়েছিল তারা আসবে নতুন কাপড়ের জন্য। যে সব প্রজাদের জমি বিলি করার সময় ঠিক ছিল মায়ের পূজায় পাঁঠা অথবা মোষ এবং দুধ-কলা, আনাজ যার যা কিছু ফসলের বিনিময়ে দেবার কথা—তারা তা দিয়েছে কিনা, না দিলে তাদের ডেকে পাঠানো, এসব কাজও ভূপেন্দ্রনাথের জন্য পড়ে থাকে। আর এমন সব কাজের ভিতরই ভূপেন্দ্রনাথের দুপুর গড়িয়ে গেল। কিছুই আজ তার ভাল লাগছে না। বিষাদ-বিষণ্ণ প্রতিমার পায়ে সে চুপচাপ অনেকক্ষণ একা একা দাঁড়িয়ে ছিল। সে বড়বৌ এবং ধনবৌর জন্য দেবীর পা থেকে সিঁদুর তুলে নিয়েছে। আবার সেই নির্জনতা এই বাড়িকে গ্রাস করবে। এ ক'দিন কি ব্যস্ততা! কি সমারোহ! গোটা প্রাসাদ সারাদিন গম-গম করছে! আজ কারো কোন ব্যস্ততা নেই। দীঘির চারপাশে সকলে জমা হচ্ছে।

বিকেলেই জসীম হাতিটার পিঠে পিলখানার মাঠে চেপে বসল। তখন গরদের কাপড় পরছেন মেজবাবু। গরদের সিল্ক। হাতে হীরের আংটি। কালো রঙের পাম্পশু জুতো। মেজবাবু তার ঘর থেকে বের হচ্ছেন। তিনি ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছেন। আগে-পিছনে পরিবারের আমলা কর্মচারী। আতরের গন্ধ সকলের গায়ে। সবার আগে ভূপেন্দ্রনাথ। পরে রক্ষিতমশাই এবং সকলের শেষে বাবুর খাস খানসামা হরিপদ। যেন একটা মিছিল নেমে যাচ্ছে দক্ষিণের দরজায়। ওরা নেমে এল নাটমন্দিরে। এখানে মেজবাবু গড় হলেন। দেবীর পায়ের বেলপাতা অঞ্জলির মতো করে নিলেন। ওরা বড় বড় থামের ওপাশে এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেলে সোনার মনে হল, দেবী এখন ওর দিকে তাকিয়ে নেই। দেবী তাকিয়ে আছেন ওদের দিকে। চোখমুখ কাঁপছে। ঘামের মতো মুখটা চকচক করছে। সে আরও কাছে গেল। দুর্গাঠাকুরের চোখের জল পড়ছে কিনা দেখার জন্য একেবারে মণ্ডপের ভিতরে ঢুকে গেল।

সে প্রথম সিংহটাকে একবার ছুঁয়ে দেখল। দীঘির পাড়ে সকলে এখন যে যার জায়গা নিচ্ছে বলে কেউ আর মণ্ডপে নেই। এই সময়, সুসময়ও বলা চলে, একবার ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখা দেবীকে, অসুর অথবা সেই বাচ্চা ইঁদুরটাকে। গণেশের পায়ের কাছে যে একটা কাঁটালতায় বসে আছে। সে সিংহের মুখে প্রথম হাতটা ভরে দিল। অসুরের বুক থেকে যে রক্ত এ ক'দিন গড়িয়ে পড়েছে সে সেটা হাত দিয়ে দেখল—কেমন শুকনো হয়ে গেছে রক্তটা। এবং সিংহটা খাবলা খাবলা মাংস তুলে নিয়েছে। ওর কেন জানি এই অসুরের জন্য মায়া হল। সে অসুরের মাথায় হাত দিয়ে কোঁকড়ানো চুলে আদর করার মতো দাঁড়িয়ে থাকল। এবার মজা দেখাচ্ছি। সিংহটার চোখে সে একটা চিমটি কেটে দিল। কিছু রং উঠে এল নখে। দেবীর মহিমায় সিংহটা সোনাকে ভয় পাচ্ছে না। সে এবার উঁকি দিয়ে দেবীর চোখ দেখল, জল পড়ছে। তা তোমার এত কষ্ট যখন থেকে গেলেই হয়। সে দেবীর সঙ্গে কথা বলতে চাইল মনে মনে। ওর ভয় ছিল, কাছে গেলেই দেবী রাগ করবে। কিন্তু কি ভালবাসার চোখ! সে বলল, তা তোমার এমন জীব কেন বাহন মা। আমি ওকে সুড়সুড়ি দেব নাকে। এই বলে সে ছোট একটা কাঠি যেই না নাকের কাছে নিয়ে গেছে অমনি এক শব্দ হ্যাঁচ্চো। কেউ নেই আশে-পাশে—অথচ হ্যাঁচ্চো দিল কে। সিংহটা সত্যি তবে হাঁচি দিল! সে থতমত খেয়ে ছুটে পালাতে গিয়ে দেখল পাগল জ্যাঠামশাই মণ্ডপের সিঁড়িতে। তিনি হাঁচি দিয়েছেন। পাগল মানুষের ঠাণ্ডা লাগে না। সোনা এই প্রথম জ্যাঠামশায়ের ঠাণ্ডা লাগায় ভাবল তিনি তবে ভাল হয়ে যাচ্ছেন। সে জ্যাঠামশাইর হাত ধরে বলল, আমি হাতিতে চড়ে দশরা দেখতে যাব।

দীঘির পাড়ে তখন মেজবাবু ফ্লুট বাজাচ্ছেন। সোনার মনে হল ওর দেরি হয়ে গেছে। সে পাগল জ্যাঠামশাইকে ফেলে কাছারিবাড়িতে ছুটে গেল। জামা-প্যান্ট বদলে নিতে হবে তাড়াতাড়ি।

যারা প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য নাটমন্দিরে এসেছে তারা সবাই গামছা বেঁধেছে কোমরে। ওরা ঠাকুর কাঁধে নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। রামসুন্দর যাচ্ছে মাথায় ঘট নিয়ে। ঠাকুর নদীর চরে নামানো হবে। সেখানে আরতি হবে, ধূপধুনো জ্বলবে। বড়দা মেজদা ঠাকুরের সঙ্গে নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে। সে যেতে পারছে না। ওর জন্য অমলা কমলা বসে রয়েছে। সে যাবে হাতিতে।

ভূপেন্দ্রনাথ সোনাকে জামা-প্যাণ্ট পরিয়ে দিল। মাথা আঁচড়ে দিল। সোনা আর দাঁড়াতে পারছে না। সে কোনরকমে ছুটতে পারলে বাঁচে। সবাই সব নিয়ে চলে যাচ্ছে। ওর জন্য কেউ বুঝি কিছু রেখে যাচ্ছে না।

এখন রোদ নেমে গেছে। সেইসব হাজার হাজার লোক নদীর পাড়ে বসে আমগাছ অথবা ঝাউগাছের ছায়ায় নিবিষ্ট মনে ফ্লুট বাজনা শুনছে। হাজার

হাজার মানুষ, মানুষের মাথা গুনে বলা দায় কত মানুষ—এসেই যে যার মতো জায়গা করে মেজবাবুর ফ্লুট বাজনা শুনতে বসে যাচ্ছে।

অশ্বশালার পাশে এক মানুষ আছে—তার বুঝি ইন্তেকাল হবে এবার। সেও এক মনে, দু'হাত বুকের ওপর রেখে সেই সুরের ভিতর ডুবে যাচ্ছে। সে চিৎপাত হয়ে, গঞ্জে শহরে যেমন সে ফ্লুট বাজাত, তেমনি বুকের ওপর দু'হাত নাড়ছে। সেও বুঝি শেষবারের মতো মেজবাবুর সঙ্গে মনে মনে ফ্লুট বাজাচ্ছে। এমন আশ্বিনের বিকেলে এই পৃথিবীর বুকে সে ফ্লুট না বাজালে আর কে বাজাবে! সে দু'হাত অনেক কষ্টে ওপরে তুলে রাখল। যথার্থই সে আজ ফ্লুট বাজাচ্ছে। তারপর হাত দুটো ওর ক্রমে অসাড় হয়ে যাচ্ছে। বুকের ওপর হাত, চোখ বোজা,—মানুষটার দুনিয়াতে কেউ নেই, আছে শুধু দুই ঘোড়া,এক ল্যাণ্ডো আর এক ফ্লুট। সে চুরি করে মেজবাবু না থাকলে নিশুতি রাতে নদীর চরে একা বসে ফ্লুট বাজাত। সে নানারকম সুরের ভিতর তন্ময় হয়ে থাকত। তেমনি আজও সে তন্ময় হয়ে যাচ্ছে। দীঘির পাড়, শীতলক্ষার চর, নদী মাঠ সব যেন এই সুরের ভিতর হাহাকার করছে। সে মেজবাবুর ফ্লুট বাজনা শুনতে শুনতে চোখ বুজে, এক আল্লা, তার কোন শরিক নেই···শরিক নেই···নেই···সে আর শ্বাস নিতে পারছে না। অসহ্য এক যন্ত্রণা ভিতরে। সে হাত দুটো আর ওপরে রাখতে পারল না। অবশ হয়ে আসছে সব। এক আশ্বিনের বিকেল ক্রমে এভাবে মরে যাচ্ছে। কেউ খেয়াল করছে না।

তখনই সোনা ছুটছিল। হাতিটা অন্দরে এসে গেছে। জসীম হাতির পিঠে বসে প্রতীক্ষা করছে নিশ্চয়। সবাই ওর জন্য হাতির পিঠে নদীর পাড়ে এখনও নেমে যেতে পারছে না। হাতি বুঝি ওকে ডাকছে। ফ্লুট বাজছে। দীঘির পাড়ে হাজার মানুষ। বিচিত্র বর্ণের মেলা। ইব্রাহিম কলের ঘরটাতে বসে আছে। সময় হলেই আলো জেলে দেবে।

সোনা সে তার পাগল জ্যাঠামশাইকে খুঁজতে গিয়ে দেরি করে ফেলেছে। যেন তার পাগল জ্যাঠামশাই, সে যা বলবে তাই শুনবে। জ্যাঠামশাই মেলায় চলে যাবে একা একা। সে জ্যাঠামশাইর সঙ্গে মেলাতে মেলা দেখবে। হাতির পিঠে বসে থাকবে না। ফেরার সময় দু'জন হেঁটে হেঁটে লাড্ডু খেতে খেতে ফিরে আসবে।

কিন্তু জ্যাঠামশাই না দীঘির ঘাটে, না সেইসব মানুষের ভিতর। এদিকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। হাতিটা অন্দরে দাঁড়িয়ে এখন শুঁড় নাড়ছে। কান দোলাচ্ছে। অমলা কমলা বিরক্ত হচ্ছে। জসীমকে হাতি ছাড়তে বারণ করে দিচ্ছে বুঝি। সে প্রাণপণে কাছাড়িবাড়ির মাঠ পার হয়ে এল। দারোয়ানদের ঘর অতিক্রম করে সেই নাটমন্দিরের উঠোন। সে এখানে এসে শ্বাস নিল। দেখল পকেটের পয়সাগুলি পড়ে গেল কিনা ছুটতে গিয়ে। সে চোদ্দটা তামার চকচকে পয়সা

পেয়েছে। দশরা দেখার জন্য বৌরানীরা বাড়ির সব বালক-বালিকার মতো ওর হাতে একটা করে তামার পয়সা দিয়েছে। সে বলেছে, সে একা নয়। ওরা দু'জন। সে এবং তার পাগল জ্যাঠামশাই। সে পাগল জ্যাঠামশাইর জন্য একটা একটা পয়সা গুনে ভিন্ন পকেটে রেখে দিয়েছে। মেলা দেখা হলেই জ্যাঠামশাইর পকেটে পয়সাগুলি দিয়ে দেবে। কিন্তু সে কোথাও জ্যাঠামশাইকে পেল না। ওঁকে খুঁজতে গিয়ে ওর এত দেরি হয়ে গেল। সে সিঁড়ি ভেঙে ছুটছে। ওর বড় দেরি হয়ে গেল! সে লম্বা বারান্দা পার হয়ে গেল রান্নাবাড়ির। এই পথে গেলে সে তাড়াতাড়ি উত্তরের দরজায় ঢুকে যেতে পারবে। ওরা ওর মুখে পাউডার মেখে দেবে—সে পাগল জ্যাঠামশাইর ওপর মনে মনে ভীষণ রাগ করছে। মুখে ওর পাউডার মাখা হল না। দুঃখে ওর এখন কান্না পাচ্ছে। সবাই এখন নিশ্চয়ই উত্তরের দরজাতে আছে। সে অমলা কমলাকে তাদের ঘরে গিয়ে পাবে না ভাবল। সে পড়ি মরি করে জোর ছুটতে থাকল। আর পৌঁছেই দেখল, কেউ নেই। না হাতি, না জসীম, না অমলা কমলা। বাড়ির সব আলো জ্বলে উঠেছে। সবাই ওকে ফেলে বুঝি চলে গেল। সে একা পড়ে গেল। সে যে এখন কি করে! তবু একবার অমলাদের ঘরে খোঁজ নিতে হবে। দাসীবাঁদি কেউ নেই যে বলবে, ওরা গেল কোথায়? সে দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেল। বাড়ি ফাঁকা মনে হল। দু-একটি অপরিচিত মুখ। কেউ ওকে দেখে কথা বলছে না। সে ভয় পাচ্ছে। কোন-রকমে অমলাদের ঘরটাতে যেতে পারলেই আর তার দুঃখ থাকবে না। অমলা কমলা ওকে ফেলে হাতিতে চড়ে মেলা দেখতে যাবে না। এমন সময়ই সে দেখল প্রাসাদের সব আলো নিভে গেছে। এত যে ঝাড় লণ্ঠন, এত যে বৈভব সব কেমন নিমেষে অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। দীঘির পাড়ে ফ্লুট বাজছে না। সেই ময়না পাখিটা তখনও অন্ধকারে ডাকছে, সোনা তুমি কোথায় যাও। কেউ নেই সোনা। আঁধার আঁধার।

এমন অন্ধকার সোনা জীবনেও দেখে নি। এক হাত দূরের মানুষটাকে দেখা যায় না। কেবল ছায়া ছায়া ভাব। ছায়ার মতো মানুষেরা ছুটাছুটি করছে। ওর পাশ দিয়ে একটা লোক ছুটে বের হয়ে গেল। প্রায় অদৃশ্যলোকে সে যেন এসে পৌঁছে গেছে। সে ভয়ে ভয়ে ডাকল, অমলা!

তখন একটা শক্ত হাত অন্ধকার থেকে বের হয়ে এল। এবং ওর হাত চেপে ধরল—কাকে ডাকছ?

—অমলাকে।

—তুমি কে?

—আমি সোনা।

—কোথায় যাবে?

—অমলার কাছে। ওরা আমাকে নিয়ে দশরাতে যাবে বলেছে। আমার মুখে কমলা পাউডার মেখে দেবে বলেছে।

—ওদের ঘরে তুমি যেতে পারবে না। বারণ। কেউ ঢুকতে পারবে না।

সোনা বলল, না, আমি যাব।

—না। সেই শক্ত হাত কার সোনা টের পাচ্ছে না। তবু সে যে স্ত্রীলোক সেটা সোনা বুঝতে পারল। সে বৃন্দাবনী হতে পারে। সোনা ভয়ে বিমূঢ়। রেলিঙে এসে দাঁড়াল। যদি কেউ ওকে এখন কাছারিবাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসে। মনে হল সিঁড়ির মুখে লণ্ঠন। সে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল মেজবাবু উঠে আসছেন। সামনে ওর খাস খানসামা হরিপদ। সে ফের এখান থেকে ছুটে পালাতে চাইল। মেজবাবুকে ধরে ধরে নিয়ে আসা হচ্ছে। শোকাচ্ছন্ন মুখ। সোনা অবাক। এই সেই মানুষ, যাকে সে কিছুক্ষণ আগে দেখে এসেছে মঞ্চে নিবিষ্ট মনে ফ্লুট বাজাচ্ছেন। এখন তিনি মূর্ছিত এক প্রাণ। সোনার ভিতরটা হাহাকার করে উঠল। অমলা কমলার কিছু হয় নি তো! ওদের ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। মনে হচ্ছে ভিতরে অমলা কমলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

হাতিটা একা অন্ধকার প্রাসাদ থেকে ফিরে গেল। কেউ দশরাতে যেতে পারল না। কোন দুঃসংবাদ এ বাড়িতে চলে এসেছে। কি সেই দুঃসংবাদ কেউ যেন বলতে পারছে না। পরিবারের বিশেষ দু-একজন ব্যাপারটা জেনেছে। এবং ভূপেন্দ্রনাথ তাদের অন্যতম। সে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে। অন্ধকার প্রাসাদে সব বিসর্জন হয়ে গেছে, এখন একা এক নির্জন মাঠের ভিতর দিয়ে শুধু হেঁটে যাওয়া।

সোনা জেদী বালকের মতো বলল, অমলার কাছে যাব।

বৃন্দাবনী বলল, না। না।

সুতরাং সোনা বাইরের দিকে চলে এসে ওদের জানালার দিকে মুখ করে মাঠে বসে থাকল। আলো জ্বললেই ওরা জানালা থেকে সোনাকে দেখতে পাবে। দেখতে পাবে সে হাঁটু মুড়ে ঘাসের ওপর ওদের সঙ্গে দেখা করার জন্য বসে আছে। কি যেন এক টান তার এই দুই মেয়ের জন্য, সোনা মনে মনে ভাবছে, ওদের কিছু হয়েছে, সে সবটা না জেনে কিছুতেই এখান থেকে নড়বে না ভাবল।

তখনও হাতিটা যায়। অন্ধকারে গাছগাছালির ভিতর দিয়ে হাতিটা যায়। ইব্রাহিম কলঘরে একটা টর্চ নিয়ে বসে আছে। কোথায় যে কি হল! সে আলোর ঘর অন্ধকার করে বসে থাকল। শুধু হাতির কানের শব্দ ভেসে আসছে। হাতিটা এখন নদীর পাড়ে নীরবে হেঁটে চলে যাচ্ছে।

আর কোথাও বোধ হয় প্রতিমা বিসর্জন হচ্ছিল। পাগল জ্যাঠামশাই

কোথায় আছে কে জানে! সোনা কারও জন্য জীবনে কিছু কিনতে পারল না। দু' পকেটে ওর চকচকে তামার পয়সা। ওপরে জানালা বন্ধ। তখন নদীতে শেষ প্রতিমা বিসর্জন। নদীতে যে আলো, ধূপধুনো, ঢাকের বাদ্যি ছিল এবার তা নিভে গেল। কোথাও আর কিছু জ্বলছে না। শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। ওপরে আকাশ, নির্মল আকাশে সেই অন্তহীন হাজার হাজার নক্ষত্র। নক্ষত্রের আলোতে সে যেন পৃথিবীর যাবতীয় শুভবোধকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। জানালা খুলে গেলেই সে ওদের জন্য কিছু করতে পারে। সে ওদের মুখ দেখার জন্য ঘাসের ভিতর বসে আছে। দু' হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজে বসে আছে।

বিসর্জনের পর ভূপেন্দ্রনাথের হুঁশ হল। সোনা কোথায়! ওকে পাওয়া যাচ্ছে না। সকলের ফের অন্ধকারে ছুটোছুটি। রামসুন্দর আবিষ্কার করল সোনা মেজবাবুর দালানবাড়ির নিচে শুয়ে আছে। সোনা সেখানে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সকালে অন্দর থেকে একটা চিঠি পেল সোনা—আমরা ভোর রাতের স্টিমারে চলে যাচ্ছি সোনা। তোর সঙ্গে আমাদের আর দেখা হল না।

কাছারিবাড়ির সিঁড়িতে সে সারাটা সকাল একা চুপচাপ বসে থাকল। তার কিছু আজ ভাল লাগছে না। তার মনে হল নদীর চরে কাশের বনে বনে কেবল কে যেন আজ চুরি করে ফ্লুট বাজাচ্ছে।

এবার ওদের ফেরার পালা। ঈশম সকাল সকাল দুটো রান্না করে খেয়ে নিয়েছে। সে খুব সকালে গোটা নৌকার পাটাতন ধুয়েছে। গলুইতে জল জমে ছিল, সব ফেলে দিয়ে একেবারে নৌকা হাল্‌কা করে রেখেছে। পাল যেখানে যা সামান্য ছেঁড়া ছিল গতকাল সারাটা দিন সেখানে সযত্নে স্থঁচ-স্থতা দিয়ে মেরামত করে নিয়েছে। কোন কারণেই যেন নৌকা চালাতে কষ্ট না হয়। গুণ টানার দড়ি ঠিকঠাক করে সে বসে থাকলে দেখল, মেজকর্তা আসছেন সকলের আগে। মাঝে সোনা লালটু পলটু, পাগল কর্তা, আশ্বিনের কুকুর পিছনে।

এখন স্টিমার ঘাটে খুব ভিড়। যে যার মতো পূজার দিনগুলি গ্রামে কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। এই গ্রাম প্রায় শহরের সামিল। এখানে হাইস্কুল আছে। পোস্টঅফিস আছে। বাজার-হাট, আনন্দময়ীর কালীবাড়ি আর বড় বড় জমিদারদের প্রাসাদ মিলে এক জাঁকজমক এই পূজার কটা দিন—তারপর ফের বাবুদের কেউ ঢাকা চলে যান, কলকাতায় যান, গ্রাম থেকে একে একে সবাই চলে গেলে—পুরী খাঁ-খাঁ করে।

ভূপেন্দ্রনাথের এমনই মনে হচ্ছিল। ওরা চলে যাচ্ছে। সকাল সকাল ওরা সেদ্ধভাত খেয়ে নিয়েছে। ভূপেন্দ্রনাথ পাড়ে দাঁড়িয়ে ওদের বিদায় দিল। যতক্ষণ নৌকাটা শীতলক্ষার বুকে দেখা গেল ততক্ষণ সে পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকল। ওর আর কেন জানি এ সময় কাছারিবাড়িতে ফিরতে ইচ্ছা হল না। সে হেঁটে হেঁটে কালীবাড়ির দিকে চলে এল। ভাবল, চুপচাপ সে বারান্দায় এসে মাকে দর্শন করবে। পুরোহিত কালু চক্রবর্তী মাঝে মাঝে এসে নানারকম কুশল সংবাদ নিলে হুঁ হাঁ করবে। আর বারান্দায় বসে সেই ভাঙা প্রাচীর শ্যাওলাধরা দুর্গের মতো বাড়িটাতে কোন মন্দিরের সাদৃশ্য খুঁজে পায় কিনা দেখবে। কি সাহস মৌলবীসাবের যে, এখানে হাজার লক্ষ মানুষ নিয়ে এসে নামাজ পড়তে চায়? কোরবানী দিতে চায়। এসব করলেই এ অঞ্চলে আগুন জ্বলে উঠবে! সে বলল, মা, তুমি শক্তিদায়িনী। তুমি শক্তি দিও মা। সে মনে মনে যেন কোন ধর্মযুদ্ধের স্বপ্ন দেখছে। যেন এই মা, আনন্দময়ী, শক্তিদায়িনী মা হাজার হাজার দেবসৈন্য তৈরি করবে শরীর থেকে। এবং মহিষাস্থর বধের মতো সব বধে উদ্যত হবে। যুগে যুগে মা তুমি মুণ্ডমালাধারিণী।

তারপর ভূপেন্দ্রনাথ মনে মনে হাসল। অবহেলায় ওর মুখ কুঁচকে উঠল। থানার দারোগা, পুলিশসাহেব সদরের, মায় ম্যাজিস্ট্রেট সব বাবুদের হাতে। একটা তার করে দিলেই স্টিমার বোঝাই করে সৈন্যসামন্ত হাজির হবে। সে

অবহেলায় মুখ কুঁচকে রাখল। ভিতরে ভিতরে সে এত বেশি উত্তেজিত যে হাঁটতে হাঁটতে সে নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলছে। সে যেন একটা রণক্ষেত্রের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

তখন ঈশম হালে বসে সোনাকে বলল, কি গ কর্তা, মুখ কালা ক্যান?

সোনা মুখ ফিরিয়ে রাখল। যেন ঈশম ওর মুখ দেখতে না পায়।

—আর কি, এইবারে নাও ঘাটে লাগাইয়া দিমু। আপনের মায় ঠিক ঘাটে খাড়াইয়া থাকব। গেলেই আপনারে কোলে তুইলা নিব।

পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ নৌকার গলুইয়ে বসে আছেন। রোদ মাথার ওপর। ঈশম বার বার অনুরোধ করছে ছইয়ের ভিতরে বসতে—তিনি বসেন নি। একেবারে অচঞ্চল পুরুষ। পদ্মাসন করে বসে আছেন। রোদে মুখ লাল হয়ে গেছে। সোনার এখন এসব ভাল লাগছে না। সে বাড়ি যাচ্ছে। অমলা কমলা এখন কত দূরে! সে বাড়ি গিয়ে মাকে কেমন দেখবে তাও জানে না। কেমন এক পাপবোধ ওকে সেই থেকে দুঃখ দিচ্ছে। অমলা কমলার কান্না, অথবা সেই রাত্রি ওকে যেন আরও বেশি সচেতন করে দিয়েছে। কেউ যেন বলছে, তুমি এটা ভাল কর নি সোনা। সে যে জন্য চুপচাপ সারাক্ষণ বসেছিল নৌকায়।

বাড়ির ঘাটে নৌকার শব্দ পেয়েই ধনবৌ ছুটে এসেছিল। বড়বৌ এসেছে। সে খবর পেয়েছে পাগলমানুষ সাঁতার কেটে, কখনও গ্রামের পথে হেঁটে মুড়াপাড়া চলে গেছেন। যেদিন সোনা ফিরবে সেদিন তিনিও ফিরবেন।

সোনা নৌকা থেকে লাফ দিয়ে নেমেই মাকে জড়িয়ে ধরল। এতক্ষণ যে মনটা ভারি ছিল, এখন তা একেবারে হাল্‌কা হয়ে গেছে।

বড়বৌ বলল, কি সোনা, মার জন্য কাঁদিস নি ত!

সোনা ঘাড় কাত করে না করল।

—ঠিক কেঁদেছিস! তোর চোখমুখ বলছে। কিরে লালটু, সোনা কাঁদে নি?

—না, জেঠিমা।

—তা'হলে আর কি, এবার জ্যাঠামশাইর মতো হয়ে গেলি। যেখানে খুশি চলে যাবি। কারো জন্য মায়া হবে না।

বড়বৌ যেন এই কথায় পাগল মানুষকে সামান্য খোঁচা দিল। আর পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথও যেন সে খোঁচা ধরতে পেরে তাকালেন বড়বৌর দিকে।

বড়বৌ বলল, এস। যেন বলতে চাইল, তুমি কোথাও চলে গেলে আমার ভারি কষ্ট হয়। ভয় হয়। আমার আর কে আছে!

সোনা প্রায় যেন বিশ্ব জয় করে ফিরেছে। তার নূতন অভিজ্ঞতা, হরিণ,

ময়ূর এবং বাইস্কোপের বাক্স, এসব তার সকলকে দেখাতে না পারলে অথবা বলতে না পারলে সে মনে মনে শান্তি পাচ্ছে না। প্রথম মালতী পিসিকে সে এসব দেখাবে ভাবল। গোপাটে ফতিমা এলে তাকে দেখাবে ভাবল।

সোনার মনে হল কত দিন পর সে এখানে ফিরে এসেছে, যেন সে দীর্ঘ দিন এখানে ছিল না। সবাইর সঙ্গে দেখা না করা পর্যন্ত সে স্বস্তি পাচ্ছে না। সে প্রথমে বড়ঘরে ঢুকেই ঠাকুমা ঠাকুরদাকে প্রণাম করল। তারপর উঠোনে নেমে এলে বড়বৌ বলল, সোনা, জামা-প্যাণ্ট ছেড়ে খেয়ে নাও।

সোনা এসব শুনল না। ওরা সেই কখন খেয়ে বের হয়েছে, সুতরাং খিদে পাবার কথা। ওরা হাত পা ধুয়ে এলেই বড়বৌ, খেতে দেবে। কিন্তু কেউ খেতে আসছে না। সোনা দৌড়ে পুকুর পাড়ে চলে গেল। অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়াল। দক্ষিণের ঘরে আবেদালি বসে আছে। ছোট কাকা বাড়ি নেই। পালবাড়ির স্বভাষের বাবা নেই। হারান পালের বাড়ি খালি। সোনা অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করল।

শুধু জলে এখন মালতী পিসির পাতিহাঁস সাঁতার কাটছে। সে পুকুর পাড় ধরে কয়েদ বেল গাছটার নিচে চলে গেল। এখান থেকে শোভা আবুদের বাড়ি চোখে পড়ে। সে হাঁটুজলে নেমে সোজা ওদের বাড়ি উঠে দেখল নরেন দাস বাড়িতে নেই। সব কেমন খাঁ-খাঁ করছে। শোভা আবু নেই। ওর মা নেই। এমন কি সে মালতী পিসিকেও দেখতে পেল না। কেবল মনে হল ওদের তাঁতঘরে কেউ বসে বসে তামাক কাটছে।

সোনার কেমন ব্যাপারটা ভূতুড়ে মনে হল। কেউ নেই। সে একা। সূর্য অস্ত গেছে। অথচ বাড়ির পর বাড়ি সে দেখছে খালি পড়ে আছে। ওর কেমন ভয় ধরে গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠোন পার হয়ে বাড়ির দিকে ছুটবে ভাবল, আর তখন দেখল মালতী পিসি একটা পিটকিলা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। একা। নির্জনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে।

সে কাছে গেল। অন্য দিন হলে মালতী পিসি ওকে জড়িয়ে ধরত, আদর করত। কিন্তু আজকে মালতী পিসির চোখ কঠিন। চুল বাঁধে নি। কেমন রুক্ষ চোখ-মুখ। মাঝে মাঝে থু-থু ফেলছে। মাঝে মাঝে ঠিক নয়, যেন এক অশুচি ভাব সারাক্ষণ শরীরে—সব সময়ই সে থু-থু ফেলে শরীর পবিত্র রাখতে চাইছে। এবং কার সঙ্গে যেন বিড়বিড় করে কথা বলছিল। সোনাকে দেখে আর কথা বলছে না। একেবারে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। সে যে সোনাকে চেনে এমন মনেই হচ্ছে না। সুতরাং সোনা গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়াল। সোনা এসেছিল ওর বাইস্কোপের বাক্স দেখাতে, আর এখন এমন একটা চেহারা দেখে সে কথা পর্যন্ত বলতে পারল না। মালতী পিসির কি একটা অসুখ হয়েছে।

অসুখ হলে মানুষের চোখ-মুখ এমন হয়। সোনা আর দাঁড়াতে পারল না। সে ছুটে এসে জেঠিমাকে বলল, মালতী পিসি গাছের নিচে···সে বলে শেষ করতে পারল না। জেঠিমা বললেন, ওর কাছে যাবে না। ওকে বিরক্ত করবে না।

সে জেঠিমাকে জিজ্ঞাসা করল, ছোটকাকা কোথায়? শোভা, আবু, নরেন দাস কোথায়? পালবাড়ির স্বভাষের বাবা নেই কেন! এসব শুনে বড়বৌ এক ফকিরের দরগায় মেলা বসেছে এমন বলেছে। গ্রাম ভেঙে মানুষ-জন দেখতে গেছে মেলা।

জেঠিমার কথা শুনে সোনার মনে হল এই পৃথিবীতে আবার একটা কিংবদন্তি সৃষ্টি হচ্ছে।

এ এক অলৌকিক ক্রিয়া। কারণ, এক রাতে দুটো ঘটনা ঘটে কি করে! ঘটে না, ঘটতে পারে না। রাতের মাঝামাঝি সময় ফকিরসাবের অলৌকিক আবির্ভাব নরেন দাসের বাড়িতে। সাক্ষাৎ মা-লক্ষ্মী, অথবা জননীর মতো ফকিরসাব মালতীকে রেখে গেল। আর আশ্চর্য, দরগার মানুষেরা অথবা যারা ইন্তেকালে এসেছিল কবর দিতে তারা দেখেছে, ফকিরসাবের বিবি, লম্ফ জ্বেলে সেই রাতে বসে আছে। পাশে কফিনের ভিতর ফকিরসাবের মৃতদেহ। অলৌকিক ঘটনা না ঘটলে এমন হয় না। দশ ক্রোশের ফারাক—নদী-নালার দেশ। জোয়ারের জল কখন আসে কখন যায় কেউ টের পায় না। সেই জলে জলে ফকিরসাবের বিবি দিনমানের পথ মুহূর্তে পাড়ি দিয়েছিল। মানুষের মনে তেমন একটা অবিশ্বাস গড়ে উঠতে পারে নি। গ্রাম-মাঠের জায়গা, নদী-নালার দেশ, খবর পৌঁছাতে সময় লাগল না। নরেন দাস সকলকে ফকিরসাবের অলৌকিক আবির্ভাবের কথা রটিয়ে দিয়েছিল। মধ্যরাতে, আল্লা রহমানে রহিম বলে সেই উঁচু লম্বা মানুষের আগমন এবং মৃত্যুর খবর শুনতেই নরেন দাসের মনে হয়েছিল, যোজন দূরে মাথা উঠে গেছে ফকিরসাবের, দুঃখিনী মালতীকে তিনি আলখেল্লার ভিতর থেকে ছোট একটা পুতুলের মতো বের করে দিয়ে নিমেষে হাওয়ায় লীন হয়ে গেছেন। এই ঘটনায় ফকিরসাব রাতে-রাতে পীর বনে গেলেন। আবার কিংবদন্তি। ধর্মের মতো, অথবা সেই তালপাতার পুঁথির মতো কেবল কিংবদন্তি। বিশ্বাস নিয়ে নিরন্তর বিবদমান দুই সাম্রাজ্য। একপাশে সোনা। মাঠ পার হলে গোপাট, গোপাটের ওপাশে ফতিমা।

ফতিমা এলেই সোনা সেদিন সেই সন্ধ্যায় বাইস্কোপের বাক্স তাকে দিয়ে দিল।

—কেডা দিল সোনাবাবু।

—অমলা।

—ক্যান দিল।

—খুব ভালবাসে আমারে।

ফতিমা অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে চুপচাপ বাবুর মুখ দেখল। তারপর বলল, বাইস্কোপের বাক্স আমার লাগে না।

সোনা বলল, ক্যান লাগে না!

—লাগে না। আমি নিমু না।

সোনা বলল, ক্যান নিবি না?

ফতিমা কথা বলল না। সোনাবাবু মুড়াপাড়া থেকে ফিরে এসেছে শুনেই সে জল ভেঙে চলে এসেছে এখানে। এখন জল বেশি নেই গোপাটে। পায়ের পাতা ডুবে যায় এমন জল। ফতিমা বাবুর সঙ্গে কথা না বলে শাড়িটা একটু ওপরে তুলে, জলে নেমে গেলে সোনা বলল, অমলা আমার পিসি হয়।

ফতিমা ঘাড় কাত করে তাকাল এবং উঠে এসে বাইস্কোপের বাক্সটার জন্য হাত পাতল।

সোনা দেবার আগে ফতিমাকে খোপে চোখ রাখতে বলল। সে ছবি পাল্টে পাল্টে দেখাচ্ছে। ফতিমা এই ছবিগুলোর ভিতর আরব্য রজনীর রহস্যময় জগৎ আবিষ্কার করে কেমন বিমূঢ় হয়ে গেল। যেন এবার ওর চোখ তুলে বলার ইচ্ছা—সোনাবাবু, এতদিন কোথায় ছিলেন। তারপর ওর চোখ মুখ দেখলেই টের পাওয়া যায়, সে বিকেল হলেই ওদের পুকুরপাড়ের পেয়ারা গাছটার নিচে এসে দাঁড়িয়ে থাকত। সেই গাছটার নিচ থেকে মাঠের এপারে এই অর্জুন গাছ স্পষ্ট। অর্জুন গাছের নিচে কেউ এসে দাঁড়ালেও স্পষ্ট। কেবল পাট গাছগুলো জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে বড় হয়ে গেলে দুটো গাছের নিচই ঢাকা পড়ে যায়। কেউ কাউকে দেখতে পায় না। পেয়ারা গাছের নিচে দাঁড়ালে এপারে অর্জুনের ছায়ায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে কিনা বোঝা যায় না। পাট কাটা হলে সব আবার খালি। ফতিমা বিকালে গাছের নিচে দাঁড়ালেই টের পায় সোনাবাবু কোথায়? সে বিকেলে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থেকেছে। অথচ সে বাবুর মুখ দেখতে পায় নি একবার। কেমন একটা অভিমান ভিতরে ভিতরে ছিল। বাইস্কোপের বাক্সটা দিতেই অভিমান ওর জল হয়ে গেল।

ফতিমা বলল, নানী কইছে একবার যাইতে।

সোনা বলল, বলবি নানী বলেছে যেতে।

—এটা ত বইয়ের ভাষা।

—বইয়ের ভাষার কথা বলতে শিখবি!

—আমার লজ্জা লাগে।

—আমারও। বলে সে হা হা করে হেসে উঠল। অমলাপিসি জেঠিমার মত কথা বলে। আমাকে বলে, সোনা, যামু কিরে, যাব বলবি।

—আপনে কি কইলেন?

—কইলাম লজ্জা লাগে।

—আমারও লাগে। বলেই ফতিমা নেমে গেল জলে, তারপর সারা মাঠে জল ছিটিয়ে মাঠের ওপারে উঠে পেয়ারা গাছটার নিচে হাত তুলে দিল। সোনাও হাত তুলে দিল। সিগনাল পেয়ে যার যার গাড়িতে যে যার বাড়িমুখো রওনা দিল।

সোনা দক্ষিণের ঘরে ঢুকে দেখল, অলিমদ্দিও নেই। আবেদালি শুধু বসে রয়েছে। অলিমদ্দি এবং ছোটকাকার ফিরতে দেরি হবে। ফকিরের দরগায় গেছে ওরা। সুতরাং এতবড় বাড়িতে কোন পুরুষমানুষ থাকবে না, রাতে চোর-ছ্যাচোড়ের উপদ্রব, সেজন্য শচীন্দ্রনাথ আবেদালিকে রেখে গেছে বাড়ি পাহারা দিতে। আবেদালি থাকবে, খাবে, এবং বাড়ি পাহারা দেবে। সোনা নিজে একটা হারিকেন এনে বৈঠকখানার দাওয়ায় রেখে দিল।

সোনা আবেদালিকে বলল, আপনে গ্যালেন না?

—কোনখানে?

—ফকিরসাবের দরগায়।

—কাইল যামু।

কারণ ঈশম যখন এসে গেছে তখন আর তার থাকবার কথা নয়। সবাই যাবে দরগাতে। সময় পেলেই চলে যাবে।

কোথাও যাবার নাম শুনলে সোনারও যাবার ইচ্ছা হয়। মেলার কথা মনে হলেই সেই সার্কাসের কথা মনে হয়, দুই বাঘের কথা মনে হয়। সে কি ভেবে এবার হারিকেনের ওপর ঝুঁকে বসল। আজও পড়া থেকে ওদের ছুটি। কাল থেকে, ঠিক কাল থেকে নয়, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা শেষ হলে রাত-দিন জেগে পড়া। স্কুল খুললেই পরীক্ষা। সুতরাং সে একটু সময় পেয়ে আবেদালির মুখ দেখছে।

আবেদালি কেমন নির্জীব মানুষ হয়ে গেছে। জব্বর এখনও নিখোঁজ। আবেদালির শরীর ক্রমে ভেঙে আসছে।

জালালি মরে যাবার পর থেকে দ্বিতীয় পক্ষের বিবিটা ওর অভাব অনটন বুঝতে চায় না। কেবল খাই-খাই ভাব। যা রাঁধবে, নিজে একা খাবে, ওকে পেট ভরে খেতে দেবে না। সে এই বাড়িতে আজ রাতে পেট ভরে খেতে পাবে। ওর কাঁচাপাকা দাড়ির ভিতর পেট ভরে খাবার লোভী মুখটা ধরা পড়ছে। কেবল চোখ দেখলে টের পাওয়া যায়, জব্বরটা ওকে বড় ছোট করে দিয়ে গেছে। থানা-পুলিশ হত, কিন্তু ফকিরসাবের এমন অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের পর সবাই সব ভুলে গিয়ে দরগায় মেলা নিয়ে মেতে উঠেছে।

আর সবচেয়ে আশ্চর্য এই মালতী। সে-রাতে ফিরে এলে মালতী, হল্লা করে

লোক জড় করল নরেন দাস। চেঁচামেচিতে বোঝা দায় সব—তবু ওর যা কথা তাতে বোঝা যাচ্ছে—ফকিরসাব, আর সাধারণ মানুষ ছিলেন না। ফুসমন্তরে জ্বলে উঠেছিল এক অগ্নিশিখা—শিখার প্রচণ্ড আলোতে ঋষিগণের সহস্র মুখ যেন সারা উঠোনে ভেসে বেড়াচ্ছিল—যেন বলছে— ফকিরসাব, আমার জননীরে কেউ অসতী করে নাই নরেন দাস। তারে তুমি তুলে লহ। প্রায় গোটা ব্যাপারটা নরেন দাসের কাছে সীতার বনবাসের মতো মনে হয়েছিল।

মালতী অন্ধকারে চুপচাপ। সে কোন কথা বলছিল না। পাষাণ প্রতিমার মতো তার শক্ত মুখ। চোখ দুটো কেবল জ্বলছিল। তাকে প্রশ্ন করলে কোন জবাব পাওয়া যাচ্ছে না সে ক্রমে শক্ত হয়ে যাচ্ছে। সে চুপচাপ, অর্থহীন দৃষ্টি, সে বারান্দায় চিড়িয়াখানার জীবের মতো বসে থাকল। পাড়া-প্রতিবেশীরা তাকে দেখে যাচ্ছে এবং ভিন্ন ভিন্ন মন্তব্য ছুঁড়ে দিচ্ছে। ফকিরসাবের মতো মানুষ হয় না। আল্লার বান্দা তিনি।

এভাবে একদিন গেল। দু'দিন গেল। নরেন দাস তার বোনকে কেন জানি আর জলচল করে নিতে পারল না। জাতিতে যবন, এরা মানুষ না, ওরা চুরি করে নিয়ে গেছে, সুতরাং বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, যবনে ছুঁলে ছত্রিশ। সে মালতীর জন্য ঢেঁকিঘরের বারান্দায় একটা খুপরি করে দিল। সেই খুপরিতে ঠিক একটা পাতিহাঁসের মতো মালতী এক সকালে ঢুকে গেল।

আর আশ্চর্য, খুপরি ঘরে এমন এক সুন্দরী বিধবা একা থাকতে সাহস পেয়ে গেল। শরীরে তার আর কি আছে যা মানুষ জোর করে কেড়ে নিতে পারে! সে এতদিন সোহাগে সব লালন করছিল। এবং আকাশে নানারকম নক্ষত্রের ছবি দেখলে তার যার কথা বেশি মনে হত, সেই রঞ্জিত, যুবক এক, তাকে না বলে চলে গেছে, সে তাকে আর কিছু দিতে পারল না। এই উচ্ছিষ্ট শরীরের কথা ভাবলেই ওর মুখে থুথু উঠে আসে। সারাদিন জলে ডুবে থাকতে চায়। জলে নামলেই মনে হয় তার শরীর পবিত্র হয়ে যাচ্ছে। জলে ডুবে গেলে মনে হয়, আহা, কি শান্তি মা জননী জাহ্নবীর কোলে। সে ডুবে গেল কিনা, তার আঁচল অথবা চুল ভেসে থাকল কিনা, কি শীতের রাত, কি গ্রীষ্মের দাবদাহে শুধু তার এমন এক প্রশ্ন।

প্রতিবেশী বালকদের এটা একটা খেলা হয়ে গেল। মালতী পিসি কেবল ভোঁস ভোঁস করে একটা উদবিড়ালের মতো ডুবত ভাসত। ওরা পাড়ে দাঁড়িয়ে খেলা করত অথবা ঠাট্টা-তামাশা করত, পিসির আঁচল ভেসে আছে বলত। অথবা চুল, না না চুল না, তোমার পায়ের আঙুল দেখা যাচ্ছে, হাতের আঙুল, তোমার কাপড় জলের ভিতর বাতাস পেয়ে পাল তুলে দিতে চেয়েছে। তোমার সব ডুবে যায় নি, তুমি কেবল কিছু না কিছু নিয়ে জলের ওপর ভেসে আছ। এমন যখন বলত বালকেরা, তখন মালতীর কি করুণ মুখ! আমার সব তবে ডোবে না, আমার কিছু না কিছু ভাইসা থাকে! ছাখ ছাখ সোনা, ডুবে আছি কিনা ছাখ।

সোনা বলত, পিসি, তুমি ডুইবা গ্যাছ।

তারপরই মালতী সারা ঘাটে জল ছিটিয়ে উঠে আসত। চারপাশে শুধু অপবিত্র এক ভাব। সে বালতি থেকে জল ছিটাত আর ঘরের দিকে এগিয়ে যেত। শুচিবাইগ্রস্ত মালতী এভাবে ক্রমে জলে ডুবে থাকতে থাকতে এক সময় শ্রীহীন রুক্ষ, এবং পাগল প্রায় হয়ে গেল। সারা রাত অভিমানে চোখ ফেটে জল আসে। চোখে ঘুম থাকে না। সোনা যখনই এসেছে, দেখেছে মালতী পিসি জলে সাঁতার কাটছে। জল থেকে কিছুতেই উঠতে চাইছে না। মুখ বড় করুণ। তার শরীর থেকে কারা যেন তার প্রাণপাখি নিয়ে পালিয়েছে। নরেন দাস বকে বকে জল থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

এভাবে শরৎকালটা কেটে গেল সোনার। শশিভূষণ পূজার ছুটি শেষ হলে চলে আসবে। হেমন্তের দিনে পড়ার চাপ বেশি। ওকে সকালে এবং রাতে বেশিসময় শশিভূষণ নিজের কাছে পড়ার জন্য বসিয়ে রাখবে। পাগল জ্যাঠামশাই কিছুদিন হল কোথাও যাচ্ছেন না। সোনার ধারণা সেই জ্যাঠামশাইকে শান্ত এবং ধীর-স্থির করে তুলছে। জ্যাঠামশাই সেই যে হাতি দেখতে গিয়ে ভাল হয়ে যেতে থাকলেন, যেন ক্রমে তিনি সেই থেকে ভাল হয়ে যাচ্ছেন। সে মাঝে মাঝে জ্যাঠামশাইকে তামাক সেজে দেয়। তামাক খান তিনি। বসে বসে আপন মনে সেই কবিতা আবৃত্তি করেন। স্নানের সময় স্নান, আহারের সময় আহার। রাতে তিনি ওদের পড়ার টেবিলের একপাশে ছোট্ট পড়ুয়ার মতো সরল বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে বসে থাকেন। যেন খুব নিবিষ্ট পড়াশোনায়। তিনি কখনও সোনার স্লেট নিয়ে পেনসিলে নানা রকমের প্রজাপতি, অথবা শূন্য একটা সাঁকো, মাঠের ছবি আঁকেন। কাউকে তিনি আর বিব্রত করেন না। সোনা লক্ষ্মীপুজোর জন্য টুনিফুল আনতে গিয়েছিল। জ্যাঠামশাই নৌকা বাইছিলেন। এবং যেখানে এই দুর্লভ টুনিফুল পাওয়া যায় ঠিক সেখানে, তিনি তাকে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এইসব জীবনের ভিতর সোনা দেখেছে বড় জেঠিমা খুশি। তিনি সারাদিন সংসারের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করছেন। জ্যাঠামশাই বাড়ি থাকলে, জেঠিমার আর কোন দুঃখ থাকে না। কপালে বড় গোল করে সিঁদুর, মাথায় লম্বা সিঁদুর, লাল পেড়ে কাপড়, কি ধবধবে এবং সাদা, আর শ্যামলা রঙের জেঠিমাকে কখনও কখনও রামায়ণে বর্ণিত নারী চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছা হয়।

এইভাবে কার্তিক পূজার দিন এসে গেল। ফতিমা অর্জুন গাছের নিচে এসে একদিন বলে গেছে, ওর জন্য এবার দুটো শ্রীঘট রাখতে হবে। সে মাকে বলেছে, জেঠিমাকে বলেছে। সে ওদের প্রত্যেকের কাছ থেকে শ্রীঘট নিয়ে রাখবে।

এবং কার্তিক পূজার পরদিন ফতিমা এলে দুটো নয়, এবার চারটা দেবে। যেমন অমলা-কমলা ওকে নানাবিধ দ্রব্য দিয়ে খুশি করতে চেয়েছে, সে তেমনি এই মেয়ে—কি যে মেয়ে, পায়ে মল, নাকে নোলক, ডুরে শাড়ি পরা মেয়ে তার জন্য অপেক্ষায় থাকে—সে তাকে কিছু দিতে পারলেই মহৎ কিছু করে ফেলেছে, এমন ভাবে।

আর কার্তিক পূজার দিনই ঘটনাটা ঘটল।

ওরা বিকেলে গেছে মাঠে। সন্ধ্যার সময় চারপাশের জমিগুলোতে আগুন জ্বালানো হয়েছে। 'ভাল বুড়াতে' আগুন দিচ্ছে সবাই। সংসারের যাবতীয় পাপ মুছে, পরিবারের মানুষেরা হেমন্তের মাঠ থেকে পুণ্য তুলে আনতে গেছে। অলক্ষ্মী ফেলে লক্ষ্মী আনতে গেছে সবাই। সোনা লালটু পলটু তিনজন তিনটা 'ভাল-বুড়াতে' আগুন দিয়ে এখন মাঠের ওপর ছুটছে। ওরা ওদের সবচেয়ে যে জমি ভাল ফসল দেয় সেখানে আগুনের দণ্ডগুলো পুঁতে দিল। তারপর চাই কার্তিক পূজার জন্য সবচেয়ে পুষ্ট ধানের ছড়া। এখন ওরা তিনজন এই হেমন্তের মাঠে সেই পুষ্ট ছড়ার জন্য জমি থেকে জমিতে ক্রমে সোনালী বালির নদীর চর পার হয়ে চলে যাবে। যে যত বড় ছড়া নেবে সে তত বেশি পুণ্য বহন করবে সংসারের জন্য। এভাবে এক প্রতিযোগিতা—সোনা একটা বড় ছড়া কেটে বলল, কি বড়, দ্যাখ দাদা! আর তখন পলটু বলল, কৈ দ্যাখি। দেখে বলল, বড় না ছাই। বলে সে একটা বড় ছড়া দেখাল। এবং ক্রমে এভাবে ওরা ছড়ার জন্য দূরের মাঠে নেমে গেল। পছন্দ হচ্ছে না। মনে হয় এ জমি পার হয়ে গেলে বড় মিঞার জমি, জমিতে ফসল হয় সবার সেরা, অথবা কোথাও এমন জমি আছে যেখানে তাদের জন্য পুষ্ট ছড়া নিয়ে মা-লক্ষ্মী অপেক্ষা করছেন। ওরা এখন মাঠে মাঠে মা-লক্ষ্মীকে খুঁজছে।

ওরা তিনজন এভাবে অনেকদূরে চলে এল। পুষ্ট এবং বড় ধানের ছড়া না নিতে পারলে গৌরব করা যাবে না। বড় জেঠিমা বলবেন ও মা, দ্যাখ ধন, তোর ছেলে কত বড় ছড়া এনেছে! এই মাঠে পুষ্ট ধানের ছড়াটির জন্য ওরা জমি থেকে জমিতে ঘুরছে। আবছা অন্ধকার। হেমন্তের মাঠ বলে সামান্য কুয়াশা। অস্পষ্ট জ্যোৎস্না আকাশে বাতাসে। ওরা নুয়ে একটা একটা করে ধানের ছড়া হাতে নিয়ে দেখছে আর রেখে দিচ্ছে। হাত দিয়ে মাপছে। না, বড় ছোট! প্রায় হাত লম্বা না হলে কার্তিক ঠাকুরের গলায় মালার মতো ঝোলানো যাবে না।

তখন লণ্ঠন হাতে কারা যেন নদীর পাড়ে পাড়ে হেঁটে এদিকে আসছে। লণ্ঠনের আলো দেখে মনে হল ওরা অনেক দূরে চলে এসেছে। ওদের খেয়ালই ছিল না, ওরা নদীর চর ভেঙে হাইজাদির মাঠে পড়েছে। লণ্ঠনের আলো দেখে ওদের বাড়ি ফেরার কথা মনে হল।

কাছে এলে সোনা দেখল ফেলু যাচ্ছে। মাথায় বড় একটা ট্রাঙ্ক। সে এক হাতে মাথায় বড় ট্রাঙ্ক নিয়ে চলে যাচ্ছে। পিছনে সামসুদ্দিন। এবং সবার পিছনে ফতিমা। ফতিমা আজ শালোয়ার পরেছে। লম্বা ফুল হাতা ফ্রক সোনালী রঙের। কাল ফতিমার আসার কথা অর্জুন গাছটার নিচে। সে ফতিমার জন্য চারটা শ্রীঘট রেখে দেবে। এ-সময়ে কোথায় যাচ্ছে ফতিমা সেজেগুজে। সে ফতিমাকে দেখেও কিছু বলতে পারল না।

সামসুদ্দিন এত বড় মাঠে ওদের তিনজনকে দেখে কেমন একটু বিস্মিত হল। সে বলল, আপনেরা!

—ধানের ছড়া খুঁজতে আইছি।

সামসুদ্দিনের এতক্ষণে মনে পড়ল আজ কার্তিক পূজা। সবাই বের হয়ে পড়েছে পুষ্ট ধানের ছড়া খুঁজতে মাঠে। সে বলল, পাইছেন নি!

ওরা যা সংগ্রহ করেছিল দেখাল।

সামসুদ্দিন হাসল।—মা-লক্ষ্মী এত ছোট হইব ক্যান। আসেন আমার লগে।

ওরা ফের হাঁটছিল। সোনা কিছুতেই কিছু বলছে না। সে ফতিমার পাশাপাশি হাঁটছে তবু কথা বলছে না। ফতিমাও কিছু বলছে না। সে আর বেশিক্ষণ অভিমান নিয়ে থাকতে পারল না। বলল, তুই ছিরাঘট নিবি না!

—রাইখা দিয়েন। ঢাকা থাইকা আইলে নিমু।

—তুই ঢাকা যাইবি?

—আমরা সবাই ঢাকায় যামু। আমি স্কুলে পড়মু। বাড়িতে নানী একলা থাকব।

সোনা বলল, কৈ তুই আগে কস নাই ত!

—কমু কি! বা'জি সকালে সব কইল।

সোনা জানে ফতিমার বাবা বাড়ি এলে সে কোথাও যায় না। সোনা আবার চুপ করে গেল। ফতিমাও কিছু বলছে না। সে বলল, সোনাবাবু, আপনে আমারে চিঠি দিবেন।

—যা! চিঠি দিমু কিরে।

—আপনে কেমন থাকেন জানাইবেন।

—ছোট কাকায় বকব।

ফতিমা বলল, বিকালে আমি কানতে ছিলাম, বা'জি কইল, তুই কান্দস ক্যান?

—তর আবার কান্দনের কি হইল!

—কিছু হয় নাই কান্দনের?

তখন সামসুদ্দিন বলল, এই দ্যাখেন পুষ্ট ধানের ছাড়া। সে বিলের জলে একটা গামছা পরে নেমে গেল। এতবড় ধানের ছড়া কোনখানে খুঁইজা পাইবেন না। এই বলে সে তিনজনের হাতে তিন গুচ্ছ বড় বড় ধানের ছড়া দিয়ে বলল, জলে

না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার। কি বলেন কর্তা? লক্ষ্মীরে আনতে গেলে কষ্ট লাগে। এই বলে সে গামছা দিয়ে শরীর মুছে ফেলুকে বলল, তরা হাঁটতে থাক আমি অগ দিয়া আসি। অরা পথ চিনা বাড়ি উইঠা যাইতে পারব না।

সামসুদ্দিন অর্জুন গাছটা পর্যন্ত এল। পুবের বাড়ি সামনে এবং সেখানে মালতী আছে—জব্বর মালতীকে চুরি করার তালে ছিল, ফকিরসাব ওকে এখানে রেখে গেছেন—এবং জব্বর ওর দলের পাণ্ডা—সুতরাং এই অপরাধের জন্য সে কিছুটা দায়ী, ওকে দেখলে এমন মনে হয়। সামসুদ্দিন ভিতরে ভিতরে এই অসম্মানের জন্য পীড়িত। সে নিজেকে বড় অসহায় বোধ করল। সে নানাভাবে মুসলমান মানুষের ভিতর আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে, যা এতদিন নসিব বলে মেনে আসছিল সবাই, সে তা আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়েছে—ওটা নসিব নয়। ওটা আপনাদের অসম্মান। আপনারা এতদিন তা গায়ে মাখেন নি। কিন্তু জাতির আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনতে গেলে কিছু কঠিন উক্তি তাকে সময়ে অসময়ে করতে হয়েছে। কিন্তু তার বিনিময়ে জব্বরের এমন ইতর কাজ! ভিতরে ভিতরে তার জন্য সে জ্বলে-পুড়ে খাক হচ্ছিল। সহসা গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়া নানা মানুষ নানাভাবে ব্যাখ্যা করবে। সে যাচ্ছে। যেন এখানে থাকলেই ওর মালতীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। সে কিছু বলতে পারবে না। সে মাথা নুয়ে অসম্মানের দায়ভাগ কাঁধে তুলে নেবে শুধু। মালতীর সামনে পড়ার ভয়েই বোধ হয় সে দেশ ছেড়ে যাচ্ছে। অবশ্য সে হাজিসাহেবের ছোট ছেলে আকালুকে দলের পাণ্ডা করে দিয়ে গেছে। শহরে কাজের চাপ তার বেড়ে গেছে। সে এখন থেকে শহরেই থাকবে।

সামসুদ্দিন আর উঠে আসতে সাহস পেল না। নরেন দাসের বাড়িতে কোন লম্ফ পর্যন্ত জ্বলছে না। সে একা দাঁড়িয়ে থাকল অর্জুন গাছটায় নিচে। যতক্ষণ না ওরা উঠে গিয়ে বলল, আপনে যান, ততক্ষণ সে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বার বার লক্ষ্য রাখছে নরেন দাসের বাড়িতে লম্ফ জ্বলছে কিনা। সে কেমন এখানে ভীতু মানুষের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বার বার লম্ফের আলোতে মালতীর মুখ দেখার ইচ্ছা। মালতী, তুই আমার কসুর মাপ কইরা দেইস, এমন বলার ইচ্ছা। সে আবার মাঠের দিকে হেঁটে গেলে গাছের নিচটা কেমন খালি হয়ে গেল।

সোনা বাড়ি উঠে এসে দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় দেখল মাস্টারমশাই দাঁড়িয়ে আছেন। শশিভূষণ দেশ থেকে চলে এসেছে। ওদের দেখেই তিনি বললেন, কি, তোমরা অলক্ষ্মী ফেলে লক্ষ্মী এনেছ। দেখাও তো লক্ষ্মীরে।

ওরা ধানের ছড়া আলোতে তুলে দেখাল।

—খুব বড় ছড়া দেখছি। কোথায় পেলে?

সোনা ওর ছড়াও দেখাল। ওরটা সবার বড় কিনা, না ছোট, সে তার মাস্টারমশাইর কাছ থেকে ছড়া দেখিয়ে তার সার্টিফিকেট চাইল।

শশিভূষণ সোনার ইচ্ছা বুঝতে পেরে বলল, সবার বড় সোনার ছড়া। সোনা সেই না শুনে ছুটে গেল ভিতরে। মা জেঠিমা কার্তিক পূজার ঘরে নানারকম আলপনা দিয়েছে। হ্যাজাকের আলো জ্বলছে। জলচৌকিতে কার্তিক ঠাকুর। নিচে সারি সারি শ্রীঘট। ঘটে আতপ চাল, ওপরে জলপাই। সে তার ধানের ছড়া মাকে দিল। মা দু'হাতে সোনার হাত থেকে ধানের ছড়া বরণ করে নিলেন।

কিন্তু শশিভূষণকে দেখেই সোনার বুকটা কেঁপে উঠেছিল। সে আর খুব একটা এ পূজায় উৎসাহ পেল না। মাস্টারমশাই বড় কড়া প্রকৃতির লোক। তিনি খুব সকালে উঠবেন। সবার দরজায় গিয়ে ডাকবেন, সোনা ওঠ। লালটু ওঠ। পলটু ওঠ। হাত-মুখ ধোবে। তিনি সবাইকে ঘুম থেকে তুলে মাঠে নিয়ে যাবেন। প্রাতঃকৃত্যাদি হলে, মটকিলার ডাল দেবেন। দাঁত মাজতে বলবেন। তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দাঁত মাজা হলে বলবেন, উঠে এস। তার জন্য একটা তক্তপোশ দিয়েছেন শচীন্দ্রনাথ। বড় তক্তপোশ। সে সেখানে রাজ্যের সব গাছগাছড়া জড় করে রেখেছে। পেটের পীড়া, দাঁত ব্যথা, বাত এবং মাথাধরা এবং অন্যান্য যাবতীয় রোগে সে ওষুধ দেবে। ওরা মুখ ধুয়ে এলেই ভিজা ছোলা দেবে। গুনে গুনে দেবে। এবং গুনে গুনে ফ্রি হ্যাণ্ড একসারসাইজ করাবে। পড়া হলে স্নান। তেল মেখে দেবে সোনার মাথায়। সকলকে নিয়ে সে পুকুরঘাটে সাঁতার কাটবে। তারপর গরম ভাত ডাল, বেগুন ভাজা এবং হেঁটে স্কুলে যাওয়া। শশিভূষণ এলেই ওরা একটা নিয়মের ভিতর আবার মানুষ হবে এমন ঠিক থাকে।

এই নিয়মের ভিতর শশিভূষণের যত রাগ লালটুর ওপর। লালটুর ডন-বৈঠক একশ দশ বার। সোনার পঞ্চাশবার। আর পলটুর একশ কুড়িবার। পলটু ঠিক ওঠ-বোস করে কাজ সেরে নেয়। সোনাও। কিন্তু লালটু দেরি করে ওঠ-বস করবে। মাঝে মাঝে উঠতে বসতে ওর প্যাণ্ট হড়হড় করে নেমে আসে। শশীভূষণ তখন কান ধরে তুলে দেয়। এবং চিৎকার করতে থাকে, ধনবৌদি ধনবৌদি!

চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ধনবৌ ছুটে এলে দেখতে পায়, লালটু উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উঠতে বসতে ওর প্যাণ্ট খুলে গেছে। প্যাণ্টে ওর দড়ি নেই।

—এটা কি!

—আমি কি করমু কন! ওর প্যাণ্টে কিছুতেই ডোর থাকে না।

—আচ্ছা, দেখছি। বলে তিনি পাট দিয়ে বেশ শক্ত করে সুতলি পাকিয়ে ওর প্যাণ্টে ডোর ভরে দিতেন। লালটু ভয়ে ভয়ে আর প্যাণ্ট থেকে দড়ি খুলে ফেলত না। লালটু জব্দ এই মাস্টারমশাইর কাছে।

সোনা শশিভূষণকে দেখলেই এসব মনে করতে পারে।

ওপরে হেমন্তের আকাশ। নিচে ধান্নের মাঠ। আর রাতের অজস্র তারার আলো এবং মানুষজনের ভিড় চারপাশে। মালতী মুনের নিচে শুয়ে আছে। যেন ঘুম যাচ্ছে। সোনা রাত বাড়লে আর জেগে থাকতে পারে নি। সে যে শতরঞ্চ পাতা আছে দক্ষিণের ঘরে সেখানে এসে শুয়েছিল। কিন্তু কেন জানি তার ঘুম এল না। এবং সে ফের যখন সেখানে গিয়ে দাঁড়াল, আশ্চর্য, দেখল, রঞ্জিত মামা একটা লাঠি হাতে ভিড়ের ভিতর দাঁড়িয়ে আছেন। ছোটকাকা মামাকে কি সব বলছেন।

রঞ্জিত মালতীর পায়ের কাছে এসে বসল। ওর এটাচিটা সোনা এনে বড় জেঠিমাকে দিয়ে দিল। মুখে ওর খোঁচ খোঁচা দাড়ি। ক' রাত জেগে জেগে হেঁটে হেঁটে এতদূর এসেছে। ক্লান্ত এবং ঘুম যাবে বলে উঠে এসেছিল। ভিড় এবং হ্যাজাকের আলো রঞ্জিতকে প্রথম বিস্মিত করেছিল, কিন্তু এই বিস্ময় প্রচণ্ডভাবে ওকে নাড়া দিয়েছে। ওর মনে হল নরেন দাসই এই আত্মহত্যার জন্য দায়ী। নরেন দাস ওকে একটা খুপরিতে রেখে দিয়েছে। অথবা সেই জব্বর। সে এখন কোথায়! ওর অবশ্য এসব কথা ভাববার বেশি সময় ছিল না। সে ডান হাতটা মুনের ভিতর থেকে বের করে আনল। নাড়ি দেখল। ভালর দিকে। সে পায়ের পাতায় কতটুকু গরম আছে দেখার জন্য মুন সরাল। পাতায় আলতার দাগ। ভিতরটা রঞ্জিতের ভীষণ কেঁপে উঠল। মালতীর মুখ দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে। সে মুখ থেকে মুন সরিয়ে দিল।

এখন শেষ রাত। এখন সে একা পাহারায় আছে। মুন সরাতেই ওর কেন জানি মনে হল সে বড় বড় শ্বাস ফেলছে। ওর কপালে সিঁদুর, মাথায় সিঁদুর। কে বলে মালতী বিধবা। মালতীর এই সুন্দর মুখ এবং শরীর দেখে রঞ্জিত বিমূঢ়ের মতো বসে থাকল। সে কপালে হাত রাখল। চিবুক দেখল। ভাগ্যিস সে বুঝিয়ে সকলকে ঘুমোতে পাঠাতে পেরেছে। সবাই এক সঙ্গে জেগে কি লাভ। সে মালতীকে চুরি করে ভালবাসার চেষ্টায় আকাশের দিকে তাকাতেই মনে হল ভোর হয়ে আসছে। সে এবার মালতীকে মুন থেকে একেবারে আল্‌গা করে দক্ষিণের ঘরে নিয়ে গেল এবং শতরঞ্জিতে শুইয়ে দিল। ডাকল, মালতী, আমি এসে গেছি।

বস্তুত এই জলাজমির দেশের মাটি আর মানুষ জলের নিচে আশ্রয় খোঁজে। মালতী প্রাণ ধারণে কোন আর উৎসাহ পাচ্ছে না। সে জলের নিচে তার সেই প্রিয় নিরুদ্দিষ্ট হাঁসটিকে খোঁজার জন্য বুঝি ডুব দিয়েছিল। আমি আর ভাসব না জলে, জলের নিচে ডুবে যাব, এই ছিল তার আশা।

সকাল হলে রঞ্জিত থানা-পুলিশের ভয়ে একবার শচীন্দ্রনাথকে থানায় যেতে বলল। ছ' ক্রোশের মতো পথ। সুতরাং কিছুটা হেঁটে থানায় যাবার জন্য সে প্রস্তুত হল।

শচীন্দ্রনাথ থানায় চলে গেলে রঞ্জিত নরেন দাসের কাছে গেল। বলল, ওকে এ-ঘরে ফেলে রেখেছেন কেন?

নরেন দাস তানা হাঁটছিল। মালতী এখন ক্রমে গলগ্রহ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সে উত্তর করল না।

রঞ্জিত বুঝতে পারল, নরেন দাসের ইচ্ছা নয় মালতী বড় ঘরে থাকুক। লক্ষ্মীর পট আছে, ধর্মাধর্ম আছে। নরেন দাস এখন এসবে মাথা ঘামাতে চাইছে না। রঞ্জিত আর কিছু বলতে সাহস পেল না। সে মালতীর কে! সামান্য খুপরি ঘরেই এখন থাকার আস্তানা মালতীর। তাকে আর ভিতর বাড়িতে নেওয়া যাবে না। জীবনে তার আর খোলা বাতাস, মুক্ত মাঠ, বর্ষার বৃষ্টিতে উদোম গায়ে ভেজা হবে না। সব তার হারিয়ে গেল।

স্টীমারেও একজন মানুষ অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। সে রেলিঙে দাঁড়িয়ে বিশাল মেঘনা নদী দেখতে দেখতে কেবল মালতীর কথা ভাবছে। দু' পাড়ে কত গাছগাছালি। স্টীমারটা যত এগুচ্ছে তত যেন এক কৈশোরের বালিকা গাছগাছালির নিচে নদীর পাড় ধরে ছুটছে। ওর চুল উড়ছে। খালি গা। কোমরে প্যাঁচ দিয়ে শাড়ি পরেছে। ক্রমান্বয়ে ছুটছে। দামোদরদির মঠ পিছনে। সামনে এবার উদ্ধবগঞ্জ পড়বে। কিন্তু মানুষটা কিছু দেখছে না— দেখছে শুধু নিরন্তর এক বালিকা মাঠ পার হয়ে যাচ্ছে। কি যেন ছুঁতে চাইছে, পারছে না। সামসুদ্দিন, মালতী নিখোঁজ হবার পর থেকেই কেমন যেন ভেঙে পড়েছিল। জব্বর তার জাতভাই, লীগের পাণ্ডা। সামান্য অর্থের লোভে সে কাজটা করেছে। একটা ফুলের মতো জীবনকে নষ্ট করে দিয়েছে। যে তার কৈশোরে সারা মাস কাল নানাভাবে ফুল ফুটিয়েছিল, সে এখন নির্জীব পাগল প্রায়। এবং শিগগিরই যেন কি একটা দুর্ঘটনা ঘটবে—সে ভয়ে ভয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

তখন ফেলু তার বাছুরটা নিয়ে মাঠে নেমে যাচ্ছে। হেমন্তের সকাল। ধানের মাঠ শুধু চারপাশে। সে বাছুরটাকে ধানের মাঠের আল্‌গা ছেড়ে দিতে পারছে না। আল্‌গা ছেড়ে দিলেই ধান খেতে অথবা কলাই খেতে মুখ দেবে। এ মাসেই দু'বার গৌর সরকারের বান্দা লোক আবদুল বাছুরটাকে খোঁয়াড়ে দিয়ে এসেছে। সে পঙ্গু বলে কেউ আর তাকে ভয় পাচ্ছে না। জীবনে সে বহু গুণাহ করেছে। আল্লা তার ফল হাতে-নাতে দিচ্ছেন, এমন ভাবে সব মানুষ। ওর মনে হয় তখন শালা এ-দুনিয়ার হালফিলে যত মাঝি-মাল্লা আছে, সকলের রক্ত সে খোঁচা দিয়ে দেখে—কিন্তু হায়, পারে না। হাতে

তার শক্তি আর নেই। কালো-কড়ি তারে বাঁধা হাত মরার মতো শরীরের এক পাশে ঝুলে থাকে। একে সময় মনে হয় দেবে এক কোপে শেষ করে। গলা হ্যাৎ করার মতো শরীর থেকে হাতটা বাদ দিয়ে দেবে। কিন্তু পারে না। এই মরা হাতটার জন্যে তার বড় মায়া হয়। রোদে হাত নিয়ে বসে থাকলে হাতটাকে তার নিজের সন্তানের মতো লাগে।

সে দড়ি ধরে হাঁটতে থাকল। বাছুরটা কিছুতেই এগোতে চাইছে না। হাড় বের করা এই গরুর বাচ্চাটাকে সে কিছুতেই পেট ভরাতে পারে না। তার পঙ্গু হাত আর এই বাগি (ভাগে) বাছুর তাকে পাগল করে দিচ্ছে। আর দিচ্ছে আন্নু। সে তো আর ফেলু নেই, হা-ডুডু খেলোয়াড়ও নয়—বিবি তার এখন অন্য বাড়ি যায়—কারে সে কি কবে! রাতের বেলা বিবি পাশে না থাকলে চোখে ঘুম থাকে না। বিবি তার কোথাও রঙ্গরসে ডুবে আছে। হাজি-সাহেবের ছোট বেটা আকালু বাঁশবনে লুকিয়ে থাকে। সে বাছুর নিয়ে বের হলে অথবা ফসল চুরি করতে গেল—এবং যখন সে দূরে দূরে মনের দুঃখে বনবাসে যায় তখন যুবতী তার রঙ্গরসে ডুবে থাকে!

অথবা এখন সে যে কি করে খায়, দু' পেটের সংসার, সে কোন কোন দিন মনের দুঃখে নদীর পাড়ে হেঁটে বেড়ায়—বাছুরটা সঙ্গে থাকলে সে ছুটতে পারে না। সে বাছুরটা নিয়ে হাঁটে, এবং ফসলের শীষ কেটে নেয়—ঠিক জোটনের মতো। কলাই গাছ তুলে আনে রাতে। যব গমের দিনে যব গম। সে একা পারে না। বিবি তার মাঝে মাঝে সঙ্গে থাকে। বিবি তার জ্যোৎস্না রাতে মাঠের ভিতর চুরি করে ফসল কাটে আর সে আলে দাঁড়িয়ে থাকে। মাঝে মাঝে জমির আল থেকে হাঁক আসে, কে জাগে? শিস দেবার মতো জবাব আসে, আমি জাগি।

—সঙ্গে কে জাগে?

—মিঞাসাব জাগেন। আন্নু খুশি থাকলে সে ফেলুকে মিঞাসাব বলে। আন্নু যেন এসময় তার নিজের আন্নু। পীরিত করে কার সনে—সে কথা তার মনে থাকে না। এই আন্নুকে নিয়ে ফসল চুরি করতে বের হলে ফেলু বুঝতে পারে, বিবি তার ঘরেই আছে। কিন্তু একা মাঠে নেমে এলে তার সন্দেহটা বাড়ে। বিবি তার চুরি কইরা অন্য বাড়ি যায়। সে তখন দুঃখে এবং অক্ষমতার জন্য বাগি বাছুরটার পাছায় লাথি মারে।—হালার কাওয়া, আমারে ডরায় না! এবং চারপাশে মাঠ, মাঠের দিকে তাকাতেই এক মানুষ হেঁটে হেঁটে যায়। মাথায় তার নানা রকমের পাখি ওড়ে। সে তখন কর্কশ গলায় হাঁকতে থাকে, ঠাকুর, তুমি আমারে কানা কইরা দিলা!

শুধু সে ডান হাত সম্বল করে বাছুরটাকে টানছে। বাছুরটা হিজল গাছটার নিচে এসেই শক্ত হয়ে গেল। ফেলু বাছুরটাকে টেনে এতটুকু হেলাতে পারছে

না। এমন এক ছোট্ট জীবকে সে হেলাতে পারছে না। রাগটা তার ক্রমে বাড়ছে। বাছুরটা মাঠে কি দেখে ভয় পাচ্ছে! সে আবার চারপাশে তাকাল। হালার হালা, খোদাই ষাঁড়! হাজিসাহেবের খোদাই ষাঁড়টা দু'পা সামনে দু'পা পিছনের দিকে ঠেলে লেজ খাড়া করে শিঙ দিয়ে মাটি তুলছে। ফেলুর বাগি বাছুরটাকে ভয় দেখাচ্ছে। অমিত তেজে সে যে ঘোরাফেরা করে—ফসল খায়, কেউ কিছু বলতে পারে না, শিঙ দিয়ে মাটি তুলে তা পরীক্ষা করছে। ধারালো শিঙ। ছুরির ফলার মতো। চক্‌চক্ করছে সব সময়। সে ছাড়া থাকে, ধর্মের ষাঁড় বলে কেউ কিছু বলে না। রাজা বাদশার মতো এখন শিঙে ধার দিয়ে ঘাড় গর্দান লম্বা করে দাঁড়িয়ে আছে মাঠে। ধানের মাঠে এমন এক জীব, জবরদস্ত জীব দেখলে ফেলুর প্রাণটা শুকিয়ে যায়। বাগি বাছুরটাকে দেখলেই তেড়ে আসার স্বভাব। কোনদিন বাছুরটার পেট এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেবে। সে তবু ফেলু বলে, (তার ভয় ডর নাই বলে মানুষ জানে) সামান্য এক জীবকে সে মনুষ্যকুলের কেউ বলে ডরায় না। ফেলু এমন একটা ভাব দেখাবার জন্য খোদাই ষাঁড়টাকে বলল, হালার পো হালা!

সে ধর্মের ষাঁড়কে হালার পো হালা বলল। তার কেন জানি কোরবানির চাকুটা পেলে বিশমিল্লা রহমানে রহিম বলে জবাই করতে ইচ্ছা হয় ষাঁড়টাকে। এটা যে সে এখন কাকে ভেবে বলছে বোঝা দায়। কোন ষাঁড়টা বেশি বেইমান—এই সামনে দাঁড়িয়ে থাকা, না আকালু, কে বড় দুশমন ওর! সে বলল, হালার কাওয়া। হালার আকালু। খোপকাটা লুঙ্গি পরে দাড়িতে আতর মেখে সে যায় উঠোন পার হয়ে। ফেজ টুপি মাথায়। লাল রঙের লম্বা ফেজ টুপি, একটা দাঁড়কাকের মতো, তুমি মিঞা আমার বিবির গায়ে হাত ছ্যাও। হালার কাওয়া। উঠানের ওপর দিয়া আবার যাও কি কইরা ছাখি। বলেই সে ফিরে এসে উঠোনের ওপর মান্দারের ডাল দিয়ে বেড়া দিয়ে দিল।—এডা পথ না মিঞা। এডা সদর রাস্তা না। কিন্তু সকাল হলেই ফেলু দেখেছিল, সব মান্দারের ডাল কারা তুলে ফেলে দিয়ে গেছে। সে তখন বিবির মুখের দিকে তাকাতে পারে না পর্যন্ত। যেন প্রশ্ন করলেই ফ্যাচ করে উঠবে—আমি কি কইরা কই, কেডা মান্দারের ডাল তুইলা ফ্যালাইছে আমি তার কি জানি!

—হালির হালি! তুই আবার না জানস কি! ফেলু তখন চিল্লাচিল্লি করতে পারত। কিন্তু কাকে বলবে! সে যে পঙ্গু হাতে বিবিকে এখন ভয় পায়। সেই কবে জব্বর সবুজ রঙের ডুরে শাড়ি কিনে দিয়ে গিয়েছিল, গন্ধ তেল দিয়েছিল—বিনিময়ে জব্বর আন্নুর কাছ থেকে কি নিয়ে গেছে কে জানে। তবু সে হাত পঙ্গু বলে সব হজম করেছে। এখন বিবির এক গামছা আর ছেঁড়া শাড়ি সম্বল। মাঠে ফসল চুরি করতে যাবার সময় সে ছেঁড়া

শাড়িটা পরে যায়। আর দিনমান আতাবেড়ার আড়ালে সে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ এক খাটো গামছা সম্বল। কখনও কখনও গামছাটা ভিজে গেলে আতাবেড়ার ওপর শুকাতে দেয়। তখন আন্নু একেবারে উলঙ্গ। আতাবেড়ার আড়াল। সামনে ঝোপ জঙ্গল! উঠোনের ওপর দিয়ে গেলে কেউ টেরই পায় না আতাবেড়ার ও-পাশে ফেলুর অন্দরে বিবি তার উলঙ্গ হয়ে বসে ধান সেদ্ধ করছে, গম ভাজছে, কাওন জলে ভিজাচ্ছে। যখনকার যা অর্থাৎ যা সব ফসল চুরি করে আনছে তা দিয়ে সম্বৎসর থাবে এই ভেবে দিনমান কাজ করে যাচ্ছে বিবি।

যতক্ষণ বিবিটা এভাবে উলঙ্গ হয়ে অন্দরে ঘোরাঘুরি করবে ততক্ষণ সে উঠোনে বসে থাকবে, গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানবে—আর মনোহর সব দৃশ্য, আতাবেড়ার ভিতর বিবির যৌবন কচি কলাপাতার মতো। অপটু হাতের ব্যবহারে সব নষ্ট করে ফেলেছে ফেলু। বিবির চুলে তেল থাকে না। চোখে সুর্মা টেনে দিতে পারে না। পার্বণের দিনে বিবি ধার করে মাথায় মুখে তেল দিলে ফেলু যে ফেলু, তার পর্যন্ত আন্নুকে নিয়ে নৌকা ভাসাতে ইচ্ছা হয়।

যতক্ষণ সে বাড়ি থাকবে, দাওয়ায় বসে থাকবে। সে পাহারায় থাকবে। কেউ এলে তুড়ি বাজাবে হাতে। দু'বার তুড়ি বাজালেই আন্নু টের পায়। তাড়াতাড়ি হাতের কাজ ফেলে ডুরে শাড়ি পরে বসে থাকা। সব শস্যদানা হাঁড়িপাতিলে ঢেকে রাখে। কেউ যেন টের না পায় ওরা রাত-বিরাতে ফসল চুরি করে আনছে।

এসব দৃশ্য দেখতে বড় মজা। সে চুরি করে আতাবেড়ার এ-পাশ দেখে আর মজা পায়। কখনও বিবির শরীরে জ্যাল জ্যাল গামছা—প্রায় চিকের মতো। হাজিসাহেবের ঘাটের ও-পারে ঝোপের ভিতর যেমন সে ফণা তুলে বসে ছিল মাইজলা বিবিকে দেখবে বলে, সে ঘরের ভিতর তেমনি কখনও কখনও বসে থাকে। নিজের বিবির উলঙ্গ শরীর চুরি করে দেখতে ফেলু বড় মজা পায়।

এত অভাব অনটনেও বিবিটা যে কি করে এমন লাবণ্য জিইয়ে রেখেছে শরীরে—হায়, তখন ফেলু আকালুর লম্বা শরীর, শক্ত বুক, লাল রঙের ফেজ টুপি কেবল মরীচিকার মতো দেখতে পায়। খুসবু আতর মাখে দাড়িতে আকালু। আকালু বড় চালাক। সে যখন রাস্তা দিয়ে যায়, আতর মেখে যায় দাড়িতে। বিবি আতরের গন্ধ পেলেই আতাবেড়ার এ-পাশে নেচে ওঠে। মানুষ তার এসে গেছে। সে টের পায় আতরের গন্ধে এক মানুষ এই রাস্তায় জানিয়ে গেল সে বাঁশবনের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। বিবিটা তখন সবুজ রঙের জব্বরের নেওয়া শাড়িটা পরে যায়—কই যাও তুমি! যাই মতিউরের কাছে। চিড়ার ধান ভিজাইছে। চিড়া ভাইজা দিলে তুই খোলা চিড়া দিব।

—আর কিছু দিব না!

—আর কি দিব?

—ক্যান, চুমা দিব না তরে?

বিবি বুঝতে পারে মানুষটা ওকে সন্দেহ করছে। আতরের গন্ধ সে টের পেয়ে গেছে। তা আল্লা মানুষটার শক্তি হরণ কইরা নিলা, ঘ্রাণ হরণ কইরা নিলা না ক্যান। জান হরণ কইরা নিলা না ক্যান। আন্নু কখনও কখনও ভালবাসার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে।

ফেলু টের পায় এ-ভাবে আকালু তার বিবির ভালবাসা হরণ করে নিচ্ছে। সে কোরবানির চাকুটার তালাশে থাকে তখন। কিন্তু কোনদিন দুপুরের রোদে সে দেখতে পায় মাঠের ওপর আকালু মাথায় লম্বা লাল রঙের ফেজ টুপি পরে কালো রঙের ফিন্‌ফিনে আদ্দি গায়ে, খোপকাটা লুঙ্গি কোমরে—আকালু আর একটা ধর্মের ষাঁড় হয়ে গেছে। যেন তিন ষাঁড় তিনদিক থেকে ওকে পাগল করে দিচ্ছে। এক আকালু, দুই হাজিসাহেবের খোদাই ষাঁড়, তিন পাগল ঠাকুর। সে বাছুরটাকে ফের টানতে থাকল।

মাঝে মাঝে ফেলু কোরবানের চাকুটা চালাঘরের এ-বাতায় ও-বাতায় লুকিয়ে রাখে। আন্নু ওর গলা কেটে সটকে পড়তে পারে। নিশিদিন ঘরের ভিতর এক অবিশ্বাস, বাতাস অথবা চালের শনের ভিতর সে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দেখে—ওটা ঠিক আছে কিনা, না আকালু, বিবিকে দিয়ে ওটাও হরণ করে নিয়েছে।

সে এ-ভাবে বাছুরটাকে টেনেও নড়াতে পারল না। ধর্মের ষাঁড়টা একইভাবে চারপায়ের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মহান জীব যেন সে। কোনদিকে তার দৃকপাত নেই। মাঝে মাঝে ষাঁড়টা তার চোখের ওপর মিঞা আকালুদ্দিন হয়ে যাচ্ছে। ষাঁড়টা তার বাছুরটাকে তেড়ে আসবে বলে লেজ তুলে দিচ্ছে।

ষাঁড়টা এবার শিঙ উঁচিয়ে এদিকে ছুটে আসতে পারে। ষাঁড়টা ছুটে এলেই বাছুরটাও ছুটবে। ছুটে বাড়ির দিকে উঠে যাবে। ফেলু দড়ি ধরে থাকলে টানতে টানতে তাকেও নিয়ে বাড়ি তুলবে। ঐ শালা ষণ্ড, এক মহাজীব, জীবের চোখ লাল—যেন তার সামনে অথবা দূরে যা কিছু মাঠ, যা কিছু ফসল এবং কচি ঘাস সব তার ভোজনের নিমিত্ত। আর কে আছে এ মহা-পৃথিবীতে আমার ফসলে ভাগ বসায়। আমার সামনে দিয়ে যায়। ফেলু জোর খিস্তি করল, ও হালা বাগি বাছুর সামনা দিয়া যাইতে ডর পায়।

বাগি বাছুরের আর দোষ কি। ফেলু নিজেও ভয় পাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি একটা ছিটকিলার ডাল ভেঙে ফেলল। এক হাতেই সে ডাল থেকে পাতা ফেলে ওটাকে একটা পাচনের মতো করে নিল। সে হাতের ওপর ডালটা ঘোরাতে থাকল। ষণ্ডটা দেখুক ফেলুর কি সাহস আর শক্তি। সে লাঠি

ঘুরিয়ে এখন ষণ্ডটাকে ভয় দেখাচ্ছে। এবং বাগি বাছুরটার কাছে সে নিজের প্রতিপত্তি কত বেশি, সে যে ফেলু, এক হাত গিয়েও সে ফেলুই আছে এমন বোঝাতে চাইছে। জীবটা কাছে এলেই থোতামুখ ভোঁতা করে দেবে। একদিন ফেলু দেখছে ষণ্ডটা ওর বাছুরটাকে তাড়া করে আসছে। সে পঙ্গু হাতে পেরে উঠছে না। বাছুরটা ওকে টেনে নিয়ে বাড়িতে তুলেছে। ষণ্ডটা তখন মহামারীর মতো তেড়ে এসে একেবারে উঠোনে উঠে গেছে। বাছুরটাকে সে চুরি করে ঘাস খাওয়াচ্ছিল। ষণ্ডের প্রতাপ কত, ষণ্ডটা উঠোনে উঠে এলেই হায় হায় রব। গেল গেল। চিৎকার চেঁচামেচি। বাছুরটা ঘরে ঢুকে গেছে। বোধ হয় ঢুঁ মেরে ফেলুর কুঁড়েঘর উড়িয়ে দিত। কিন্তু আন্নুর হাতে ছিল গরম ফ্যানের গামলা। সে জীবের রোষমূর্তি দেখে ভয়ে সব ফেনটা ছুঁড়ে দিল ষণ্ডের মুখে। আর তখন জীবটা হাম্বা হাম্বা করে ডাক দিল। মুখটা পুড়ে গেছে। মহাষণ্ড মাঠের ওপর দিয়ে তখন লেজ তুলে ছুটছে। সেই থেকে জীবটা তার সীমানায়। ফেলু নিজের সীমানায়। দুই জীব। পোড়া মুখ ষণ্ডের। এক চোখ গলে কপালের ভিতর ঢুকে গেছে। ফেলুর বসন্তে গেছে একটা চোখ। দুই জীব এখন এক চোখে সময় পেলেই লড়ছে।

কি যে ডর ফেলুর! তবু হাতে লাঠি থাকায় ডর কমে গেল। সে বাছুরটাকে নিয়ে আবার হাঁটতে থাকল। ভাল ঘাস সে খুঁজছে। দেখল মাঝিদের মাঠে আলের ওপর নরম ঘাস। সে বাছুরটার দড়ি ধরে বসল। চারপাশে ধান ক্ষেত। সে আলে আলে বাছুরটাকে ঘাস খাওয়াচ্ছে। ঘাস খেতে খেতে বাছুরটার ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ, ফুৎফাৎ শব্দ। লেজ নেড়ে নেড়ে বাছুরটা নিশ্চিন্তে খাচ্ছে। এই ঘাস খাওয়া দেখতে দেখতে ফেলু কেমন আবিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এবং কেন জানি তার গত রাতের কথা মনে হচ্ছে বার বার। সে কাল সারা রাত ভয়ে ঘুমোতে পারে নি। আন্নু সন্ধ্যার পর ঘরে ছিল না। ছেঁড়া ডুরে শাড়ি পরে বিবি তার যে কোথা গেল! সে তাকে এ-বাড়ি ও-বাড়ি খুঁজেছে। সে হাজিসাহেবের বাড়ি যেতে পারে না। গেলেই মাইজলা বিবি, ওলো সই ললিতে ও-গানটা গায়। পাচনের গুঁতো মারতে পারে হাজি-সাহেব। সে ফিরে এসেছিল। না কোথাও নেই। আন্নু যখন এল তখন রাত অনেক। মাথায় তার এক বোঝা কলাই গাছ। সে গাছ চুরি করে এনেছে হাজিসাহেবের জমি থেকে। এনেছে, না, দোষ ঢাকবার জন্য এক বোঝা কলাই গাছ দিয়েছে আকালু সে বুঝতে পারছে না।

না বলে না কয়ে গেলেই ফেলুর মনে হয় বিবি তার মসকরা করতে গেছে। অথবা আকালুর সঙ্গে বনে মাঠে পীরিত করতে গেছে। গতকাল রাতে কোথাও যাবার কথা নেই অথচ না বলে না কয়ে চলে গেল। লালসা পেটে পেটে। ফেজ টুপি মাথায় আনধাইর রাইতে দাড়িতে খুসবো মেখে আকালু নেমে

গেছে। বিবি, কোন অন্ধকারে খোপকাটা লুঙ্গি পরে আকালু দাঁড়িয়ে থাকে গন্ধ শুঁকে শুঁকে টের পায়। সে সেদিন গৌর চন্দের বাড়ি। ফিরতে রাত হবে কথা ছিল। সেই ফাঁকে বিবিটা বনে মাঠে নেমে গেল।

না কি বিবি তার কাজ কারবার হয়ে গেলে, বাছুরের ঘাস নেই বলে অন্ধকারে সব কলাই তুলে এনেছে জমি থেকে। কি যে হচ্ছে! গাঁয়ের মানুষও জানে জবরদস্ত ফেলুর বিবি এখন পীরিত করছে। জবরদস্ত ফেলুর এই অবস্থা। বিবি তার পীরিত করে অন্য জনার সঙ্গে। সে ভিতরে ভিতরে আগুন। বিবি ঘাস মাথা থেকে নামাতে পারে নি। কোমর বরাবর লাথি। পা তো তার আর পঙ্গু নয়। বরং হাতের শক্তি এখন তার পায়ে এসে জমেছে। লাথি খেয়ে আন্নু সামলাতে পারে নি। উল্টে মুখ থুবড়ে পড়েছে। আন্নুকে মারলেই সে দাওয়ার বসে আগে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদত। মড়া মরেছে বাড়িতে এমন কান্না। কান্নার সঙ্গে নানারকম অশ্লীল শব্দ সুর করে গাওয়া, মাঠের ধার দিয়ে কেউ গেলেই বুঝতে পারত শালা ফেলু আবার ক্ষেপে গেছে।

নিত্যকারের ব্যাপার বলে কেউ আসে না। আবার ছাখো কি পীরিত দু'জনায়।

কিন্তু আজকাল সবাই যেন টের পেয়েছে আন্নু মতিহার সাদাপাতা দাঁতে মাখছে। আন্নু গতকাল মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েও কাঁদে নি। কোথায় সে একটা শক্ত জায়গা পেয়েছে পা রাখবার। কাঁদলে-কাটলে কটূক্তি করলে ফেলুর ডর থাকে না। আজ সে কোন কটূক্তি করছে না। কোনদিকে সে এবার যথার্থই চলে যাবে। ফেলু শুধু জানে সে তালাক না দিলে বিবি কোথাও যেতে পারবে না। আকালু চায় ফেলু তালাক দিক। তালাক দিলে কিছু পয়সা পর্যন্ত মিলে যাবে ফেলুর এমন লোভ দেখিয়েছে আকালু। ফেলুর মুখ দেখলে তখন মনে হয় এই যে কথায় কথায় মারধোর করা সবই দাম তোলবার জন্য। কত দাম দিবা মিঞা। কিন্তু ফেলুর অন্তর জানে সে এ-সব পারে না। আন্নু না থাকলে সে মরে যাবে।

কিন্তু ফেলু যখন আন্নুর দাম দর নিয়ে মাথা ঘামায়, এক চোখে মুচকি হাসে, বসন্ত দাগ মুখের চারপাশে খোপকাটা লুঙ্গির মতো, তখন তার দাড়ির ভিতর গোটা মুখ কি যে বীভৎস—তা মিঞা বরাবর হইয়া যাউক। যুবতীর বিনিময়ে টাকা আসে। যতদিন বিবি আছে ততদিন অভাবে অনটনে টাকা ধার—আন্নু না থাকলে শালা হারামের ছাও ফেলুকে ভিটেমাটি ছাড়া করে ছাড়ত। তখন ক্ষণে ক্ষণে ইচ্ছা হয় ফেলুর, ভাঙা মরা হাতে মারে এক বাড়ি। শালা ইতরের বাচ্চার পীরিত ছুইটা যাউক। পরক্ষণেই মনে হয় ওর হাত নেই—এক হাত সম্বল। তেড়ে গেলে হারামের বাচ্চা ওর ঘাড়টা ধরে ফেলবে এবং এমন মোচড় দেবে পঙ্গু হাতে যে ফেলু একটা পাগলা কুকুরের মতো চিৎকার

করতে থাকবে। সেজন্য আকালু গেলে সে হাসি হাসি মুখে বলবে—কৈ যান ভাইসাব? মাঠে ধান কেমন হইল? কার্তিকশাল ধানের ভাত কতকাল খাই না। ধান উঠলে আন্নুরে পাঠাইয়া দিমু। দুই কাঠা ধান দিয়া দিয়েন।

আকালুর চোখে সর্ষে ফুল ফুঠে ওঠে। ফেলুটা তক্কে তক্কে আছে কবে ধান উঠবে। সে কি বলবে ভেবে পায় না। আন্নুটা কোথায়? আতাবেড়ার ফাঁকে চোখ ঠেলে দেয়। সে কি তার দাড়ির আতরের গন্ধ পায় নি? বাধ্য হয়ে আন্নুকে দেখার জন্য উঠোনে দাঁড়ায়। কিছু কথা বলতে হয়। সে চোখ এধার ওধার করতে করতে বলল, বিবিরে পাঠাইয়া দিয় মিঞা। দুই কাঠা ধান দিমু। গুয়া দিমু। তামুক পান যা লাগে দিয়া দিমু। তারপর আন্নুকে যে চুরি করে দেখার তালে আছে সেটা ধরা পড়লেই মিঞার মুখে থুথু দিয়ে চলে যাবার ইচ্ছা। আন্নুর কি জ্বালা এই মানুষকে নিয়ে। কিছুতেই ছেড়ে আসতে পারছে না। কি করে কোথা থেকে যে এমন একটা খুবসুরত বিবি ধরে এনেছে! কেউ জানে না বললে ঠিক হবে না, জেনেও জানে না যেন—এতদিন এটাই নিয়ম হয়ে গেছে ফেলুর বিবি আন্নু। ফেলু নিয়মমাফিক তালাক না দিলে সে ঘরে তুলে নিতে পারবে না। পারে এক কোনদিকে চলে যেতে, আন্নুকে নিয়ে কোন গঞ্জে চলে গেলে কেউ টের পাবে না।

ফেলু যেন তখন টের পায় বিবি তার যথার্থই ভাগবে। শুধু ভাগবে না, যেমন সে হ্যাং করে মিঞাসাহেবের গলা দু'ফাঁক করে দিয়েছিল, তেমনি বিবি, তার গলা দু'ফাঁক করে ভাগবে। এবং এই ভেবে বসে বসে সে কেবল বিবির মুখ দেখছিল। একবার বিবি কাঁদল না! শক্ত হয়ে সারাক্ষণ কুপির আলোতে মুখ নিচু করে গোঁজ হয়ে বসে থাকল। ভয়ে ফেলু রাতের প্রথম দিকে ঘুম যেতে পারল না। হোগলা বিছিয়ে সে শুয়ে চুপিচুপি বিবির মুখ দেখছে। কঠিন মুখ শক্ত চোখ বিবর্ণ। চোখ জ্বলছে। বাইরে তখন কি একটা পাখি ডাকছিল। হেমন্তের মাঠে শিশির পড়ছে। কোড়া-পাখিদের ডিম ফুটে নিশ্চয়ই এতদিনে বাচ্চা হয়েছে। ফেলু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতেই মনে হল বিবি নড়েচড়ে বসেছে। এবং এবার তার বুঝি একটু মায়া হল। বড় জোরে সে মেরেছে। সে বলল, কই গ্যাছিলি?

—মরতে গ্যাছিলাম।

—মরতে কই গ্যাছিলি?

—মাঠে।

—ক্যান, কি কামডা মাঠে?

—ঘাস না আনলে তর সাধের বাছুরডা খাইত কি। সারাদিন কি খাইতে দিছ।

মনে হয় বিবির রাগটা কমে আসছে। সে উঠে বসল। —দে, দুইডা খাইতে দে।

—পারমু না।

—ক্যান পারবি না। কেডা তরে ভাত দ্যায়। বলেই সে তেড়ে যাবে ভাবল। কিন্তু সেইরকমের গোঁজ হয়ে বসে থাকা দেখে সে উঠতে সাহস পেল না। বাতার যেখানে কোরবানির চাকুটা লুকিয়ে রেখেছিল সেটা সেখানে ঠিকমতো আছে কিনা দেখল। কিন্তু চাকুটা নেই। সে উদ্‌বিগ্ন চোখেমুখে তাকাচ্ছে। একটা চোখে দেখতে হয় বলে ঘাড় পুরোটা না ঘুরালে সে দেখতে পায় না। একবার মনে হল অন্য কোথাও রেখেছে। সে অযথা বিবির ওপর রাগ করছে। খুঁজে দেখলেই হবে। তা ছাড়া সে বিবিকে কি সুখটা দিল! ক্ষণে ক্ষণে মায়া পড়ে যায়। ক্ষণে ক্ষণে তার অবিশ্বাস। সে মায়া পড়ে গেলে কাছে গিয়ে বসল। পিঠে হাত দিয়ে আদর করতে চাইল। সাপ্টে ধরে আদর করতে চাইল। আন্নু যেন এবার গলা কামড়ে ধরবে। সাপের মতো ফুঁসে উঠছে। মিঞা, তুমি আমারে ছুইবা না, তুমি ইবলশি। তুমি না-পাক।

—কি কইলি! আমি ইবলিশ, না-পাক মানুষ। ফেলু তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। ওকে যেন বিবি এতদিন পর চিনিয়ে দিচ্ছে—তুমি ইবলিশ, তুমি শয়তান। তোমার ধর্মাধর্ম জ্ঞান নাই।

ফেলুর পায়ের রক্ত চড়াৎ করে মাথয়ে উঠে গেল। সে বুঝি কঠোর কঠিন কিছু একটা এবার করবে। সে বাইরের অন্ধকারে নেমে এল। ঘরে থাকলে এক্ষুণি হত্যাকাণ্ড ঘটবে। সে চালের বাতায় সেটা খুঁজল। না নেই। আমি, আমি ইবলিশ, না-পাক মানুষ, সে খুঁজতে খুঁজতে এমন সব বলল। নামাজ পড়ি না, আল্লার নাম মুখে আনি না, আমার গুনার শেষ নাই। তা তুই এহনে এগুলান কবি। বলেই সে লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকে বিবির সামনে ধপাস করে বসে পড়ল। তারপর বাঁ-হাতটা ডান হাতে তুলে মরা সাপের মতো বিবির চোখের সামনে দোলাতে থাকল। বলল, বিবি, তর সাহসের বলিহারি যাই। এডা আমার মরা হাত, হাত তরে সাহস দিছে। তুই আমারে না-পাক কইলি! না হইলে কার হিম্মত আছে, কাইন্দা মরে কত বান্দা লোক—তুই ত মাইয়া মানুষ আন্নু! হাসুয়াডা কোনখানে রাখছস! কোরবানের চাকুডা।

—ক্যান, তুমি আমার গলা কাটবা?

—দিলে দেহন যায় গলা তর কাটে কি না!

আন্নু এবার আরও শক্ত হয়ে গেল। —এই আছিল তর মনে! বলে সে খড়ের ভিতর থেকে হাসুয়া এবং কোরবানির চাকুটা ফস করে বের করে ফেলল। —আইনা দিলাম। ইবারে চালাও দ্যাহি। করছ একখানা কাম

তবে বুঝি ! বলে সে দুই চোখ বিস্ফারিত করে যেন রণরঙ্গিণী, ডুরে শাড়ি খুলে ফেলে প্রায় উলঙ্গ আন্নু সামনে গলা বাড়িয়ে দিল।—হিম্মত মিঞা নাই ! পার না পোচাইয়া গলা কাটতে ! বলেই সে ফের কেমন শক্ত হয়ে গেল। ফেলুর যা মেজাজ, এক্ষুণি সে গলা চেপে নলি কেটে দিতে পারে। এক্ষুণি সে কিছু একটা করে ফেলবে ! কিন্তু আন্নু এতটুকু ভয় পাচ্ছে না। কারণ চোখ দেখে সে টের পাচ্ছে—মানুষটার ডরে ধরেছে। সে আগের মতো দুই চোখ বিস্ফারিত করে, যেন আগুন জলছে চোখে—মাঠের ভিতর স্বামীর হত্যার কথা শুনে সে যেমন হা হা করে হেসে উঠেছিল পালিয়ে আসার সময়, আজ আবার তেমনি পাগলের মতো হাসতে থাকল।

সঙ্গে সঙ্গে ফেলু তার মরা হাতের মতো নিস্তেজ হয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি অস্ত্র দুটো হাতের পিছনে লুকিয়ে ফেলল। সে গোপনে অস্ত্র দুটোকে খড়ের গাদায় লুকিয়ে রাখল অন্ধকারে। আন্নু কঠিন চোখে দেখছে জবরদস্ত মানুষটা ক্রমে রাতের পোকা হয়ে যাচ্ছে। সে কঠিন গলায় বলল, পারলা না, মিঞা। জানে আর হেকমত নাই।

—নাই বিবি।

—তা'হৈলে পোড়ামুখ মাইনসেরে আর দ্যাখাইয় না।

ফেলুর মনে হল, সত্যি তার আর বাঁচার অর্থ হয় না। নিজের মুণ্ডু নিজে কেটে দণ্ড দিতে পারলে অথবা দু' হাতে মুণ্ডু নিয়ে নাচতে পারলে যেন বিবির কথার সঠিক জবাব দেওয়া হত। কিন্তু অন্ধকার, ও-পাশের গোয়ালে বাছুরের চোখ এবং চুরি করে ধান অথবা ফসল কেটে আনা—সবই কেমন মায়াময়—সে কিছুতেই কাটামুণ্ডু নিয়ে এখন আর নাচতে পারে না। সে বিবির অলক্ষ্যে অস্ত্র খড়ের গাদায় লুকিয়ে হোগলাতে শরীর টান করে দিয়েছিল। তারপর প্রায় সারারাত সে ঘুমোতে পারে নি। সে ঘুমিয়ে পড়লেই বিবি ঘরে আগুন জালিয়ে বুঝি ভেগে পড়বে। এক পোড়া মানুষ কুঁকড়ে থাকবে আগুনে—আগুন, হত্যার ছবি—ফেলু একেবারে পাগল বনে যেত, যদি সে না দেখত এক সময় বিবিটা আঁচল পেতে এক পাশে শুয়ে আছে। সে সন্তর্পণে কাছে উঠে গেল। দেখল আন্নু যথার্থই ঘুমোচ্ছে কিনা, না, ঘুমের ভান করে মটকা মেরে আছে। সে কুপির আলোতে দেখল আন্নু যথার্থই ঘুমোচ্ছে। ওর মনটা সহসা অদ্ভুত বিষণ্ন হয়ে গেল। বিবিকে আদর করার ইচ্ছা হচ্ছে। সে মুখটা কাছে নিয়ে গিয়েও ফিরিয়ে আনল। ডর, বড় ডর। নাগিনীর মতো ডর। আদর করলেই গলা কামড়ে ধরবে। সে বিবির পাশে গামছা পেতে শুয়ে পড়েছিল। এবং সকালে আন্নুই তাকে ডেকে দিয়েছে—বাছুরডারে মাঠে দিয়া আস।

মাঠে বাছুর নিয়ে নেমে এলে এই কাণ্ড। এই ষণ্ড চার পায়ের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল মাঠ, ধানক্ষেত, সোনালী বালির নদীর চর উপেক্ষা করে ফেলুকে ভয় দেখাচ্ছে।

এবং হাজিসাহেবের ছোট বেটা, যত লম্বা মানুষ না, তার চেয়ে বেশি লম্বা হবার সখ। লাল রঙের টুপি মাথায়। খোপকাটা লুঙ্গি পরে তাজা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে আছে। দাড়িতে খুসবো আতরের গন্ধ। বিবি বেমালুম গত রাতের পাছায় লাথি ভুলে বাঁশ বনে নেমে যাচ্ছে।

সে এবং ষণ্ড আর আকালুদ্দিন, পাগল ঠাকুর সবাই ক্রমে পরস্পর প্রতিপক্ষ হয়ে যাচ্ছে। এক মহিমামণ্ডিত মানুষ হেমন্তের সকালে সোনালী বালির নদীর চরে শুয়ে আছে। কেবল তিনিই জানেন, ষণ্ডটা কত বেগে ছুটলে ফেলুর পেট এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে পারে।

যেন ষণ্ডটা ফেলুকে দেখে, পায়ের ওপর মরণ নাচন নাচছে। এবার ষণ্ডটা বুঝি ছুটবে।

তখন মালতী হাসছিল। রঞ্জিতের কথা শুনে হাসছিল। এমন দুঃখ থাকে হাসিতে, রঞ্জিত মালতীর মুখ না দেখলে যেন টের পেত না। কি করুণ আর অসহায় মুখ মালতীর। কি কঠিন হাসি!

খুপরি ঘরটার ভিতর মালতী একটা পাতিহাঁসের মত বসেছিল। হেমন্তের শেষ রোদ নেমেছে ওর ঝাপের দরজায়। হেমন্তের শেষ বলে শীতশীত করছে। একটা পাতলা কাঁথা গায়ে মালতী ছোট কম্বলের আসনে বসে আছে। অশৌচের শরীর যেন। অবজ্ঞা চারপাশে। নরেন দাস রোদ থেকে খড় তুলে এক জায়গায় জড় করছে। আভারানী ধান ঝাড়ছে। শোভা আবু বাড়ি নেই।

মালতী সহজে ঘর থেকে আজকাল বের হতে চায় না। মাঝে মাঝে বাড়ির নিচে এক ছোট গাব গাছ আছে, সেখানে গিয়ে বসে থাকে।

রঞ্জিত এলেই ঝাঁপটা খুলে দিয়েছিল মালতী। কারণ এই ঝাঁপ থাকলে অন্ধকার থাকে চারপাশে। সে ক্রমে অন্ধকার ভালবাসছে। চিড়িয়াখানার জীবের মতো আর বেঁচে থাকতে পারছে না। সে যে এখন কি করবে! ভিতরে তার কি যে হয়েছে! সারাক্ষণ শীতশীত ভয় ভয়! বুকটা কাঁপে। কঠিন হাসি হাসলে নরেন দাস ভয় পায়। রঞ্জিতের সঙ্গে দেখা হলেই বলে, যান, গিয়া ছ্যাখেন, পাগলের মত হাসতাছে।

এমন শুনেই রঞ্জিত এসেছিল। এলেই মালতী বিনীত বাধ্যের যুবতী হয়ে যায়! সে একটা জলচৌকি ঠেলে দেয় বাইরে। মাথা নীচু করে বসতে বলে। রঞ্জিত বসলেই যেন মালতী কেমন বল পায় শরীরে। তার একমাত্র মানুষ, যাকে সে কথাটা বলবে বলে সে স্থির করেছে। সে যে এখন কি করবে বুঝতে পারছে না। বুঝতে পারছিল না বলেই চোখে মুখে দীনহীন চেহারা। সে কিছুতেই কথাটা বলতে পারে না। সে কেমন মানুষটার মুখ দেখতে দেখতে মুহ্যমান হয়ে যায়।

রঞ্জিত বলল, তুমি এখন পাগলামি করলে চলবে কেন মালতী!

—কি পাগলামি ঠাকুর?

—মাঝে মাঝে তুমি গাব গাছতলায় ছুটে যাও। সেখানে চুপচাপ বসে থাক। কিছু খাও না।

—কিছু খেতে ভাল লাগে না ঠাকুর।

—ভাল না লাগলে তো চলবে না। খেতে হবে বাঁচতে হবে।

—তোমারে ঠাকুর কইলাম একটা চাকু দিতে। তুমি কিছুতেই দিয়া গ্যালা না।

—আবার তোমার এক কথা।

—আমার আর কোন কথা নাই।

—তুমি এমন করলে নরেনদা কি করে তোমাকে নিয়ে!

—আমারে নিয়া কারো কিছু করতে হইব না।

—এমন বলে না। বলতে নেই। যেন অসুস্থ মালতীকে রঞ্জিত বুঝ-প্রবোধ দিচ্ছে।

—তোমার কি মনে হয় ঠাকুর আমারে ভূতে পাইছে?

—তুমি তো জান মালতী, এ-সব আমি মানি না।

—তবে তুমি দাদার কথা বিশ্বাস কর ক্যান?

—করি, কারণ তোমার মুখ দেখলে আমার ভয় হয়।

—কি ভয়?

—কেমন অস্বাভাবিক চোখমুখ তোমার। তুমি তো এমন ছিলে না মালতী। তুমি মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকো। তিনি তোমার সব ভাল করে দেবেন।

—ঠাকুর, তোমার বিশ্বাস এত ভগবানে!

—এখন আমি আর কি বলব তোমাকে। আমার কেবল ভয় হয় তুমি কোনদিন আবার মরে যাবে!

—আমি মরতে চাই না ঠাকুর। বিশ্বাস কর, আমি মরতে চাই না। তুমি কাছে থাকলে আমি মরতে পর্যন্ত সাহস পাই না। তারপর সে কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, যদি চাকুটা দিতা। তোমরা আমাকে মরতে পর্যন্ত দিলা না। আমি এখন কি যে করি!

রঞ্জিতের মাথায় এখন হেমন্তের রোদ। আর কোথাও কোন পরিচিত পাখির ডাক। ঘরে যুবতী মেয়ে অন্ধকারে বসে আছে। সে যেন দীর্ঘদিন থেকে রঞ্জিতকে কিছু বলবে বলে ঘুম যেতে পারছে না। চোখের নিচে কালি। হাত পা শীর্ণ। মুখে ক্লান্তি। এবং চারপাশে অদ্ভুত এক নির্জনতা। অথচ বার বার সে চাকুর প্রসঙ্গে ফিরে আসছে।

সে বলল, মালতী, তুমি কপালে সিঁদুর দিয়েছিলে। পায়ে আলতা। কি যে সুন্দর লাগছিল!

মালতী জবাব দিল না।

—তোমার এমন সুন্দর চোখ মালতী। আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারছি না। তোমাকে আর কি বলব।

মালতী মাথা নিচু করে রাখল। কিছু যেন ভাবছে।

রঞ্জিত বলল, আমি চলে যাব মালতী। তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে কিনা জানি না। কবে দেখা হবে তাও বলতে পারি না। আমার

অজ্ঞাতবাস শেষ হয়ে গেল। যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করে গেলাম।

মালতীর চোখ বড় বড় দেখাচ্ছে। সে বলল, আমি জোরে জোরে পাগলের মত হাসি ক্যান জিগাইলা না?

—কি জিজ্ঞেস করব। কিছু করতে পারছি না। জিজ্ঞেস করে লাভ, কি!

মালতী বলল, তোমার অজ্ঞাতবাস শেষ। মালতীর বুকটা বলতে গিয়ে ধড়াস করে উঠল।

—শেষ। পুলিশ খবর পেয়ে গেছে আমি এখন এ-অঞ্চলে আছি। আজ কি কাল পুলিশের সঙ্গে এনকাউণ্টার হতে পারে ভেবে পালাচ্ছি।

মালতী এনকাউণ্টার শব্দটা বুঝল না। সে এখন নিজের যে এক অতীব দুঃখ আছে ভুলে যাচ্ছে। সে কেবল তার প্রিয়জনের মুখ দেখছিল। এই মানুষ তার কাছে এলে কোন সন্দেহের কারণ থাকে না। কারণ সে এই মেয়েকে কতদিন লাঠি খেলা ছোরা খেলা শিখিয়েছে। রঞ্জিত এক মহান আদর্শে নিমজ্জিত। সামান্য এক বিধবা যুবতী তার কাছে কিছু না। বরং মালতীর কঠিন চোখমুখ সে এলেই সহজ হয়ে যায়। নরেন দাসের ধারণা এবং অন্য সকলের ধারণা মালতী রঞ্জিতকে ভয় পায়। এখন সেই যুবক ফের নিরুদ্দেশে যাবে। নিরুদ্দেশে গেলে তার আর থাকল কি। সে এখন সবই ওকে বলে দিতে পারে। অথচ কিভাবে বলবে! এমন একটা কথা, যা নরেন দাস জেনেও বেমালুম চেপে যাচ্ছে। মালতী এবার কান্না কান্না গলায় বলে ফেলল, ঠাকুর, আমি মরতে চাই না। তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে চল।

রঞ্জিত দেখল চোখ ফেটে জল পড়ছে মালতীর।

ক্রমে বিকাল মরে আসছে। মাঠ থেকে ধানের গন্ধ আসছিল। যেন মনে হয়, এই যে মাঠ চারিদিকে, ফসল সর্বত্র এবং কলাই খেতের নীলচে রঙের ফুল এবং ধান উঠতে আরম্ভ করেছে, দূরের মাঠে ধান কাটার গান শোনা যাচ্ছিল—সবই অর্থহীন মালতীর কাছে। মালতী কি করবে এখন, শোনার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে।

এতদিন রঞ্জিত তার সমিতির নির্দেশে কত বড় বড় কাজ অবহেলায় সমাধান করেছে। কুমিল্লাতে সে হাডসন সাহেবকে খুন করে পলাতক। পুলিশের লোক জানে সে আগরতলা হয়ে শিলচর এবং শিলচর থেকে আসামের কোথাও উধাও হয়েছে। নিখোঁজ। তার শৈশবের পরিচয় দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও পুলিশ সংগ্রহ করতে পারে নি। সে রঞ্জিত, সে-ই সুখময় দাস, সে-ই কখনও চরণ মণ্ডল এবং সে যে নদী পার হতে একবার নীলের বাক্স বাজিয়েছিল গোপাল সামন্ত নামে—সে-সব পুলিশ খবর রেখেও রঞ্জিত নামে এক বালক এখানে কৈশোর কাটিয়ে পলাতক তা তারা জানে না। এ-অঞ্চলের মানুষেরা জানে রঞ্জিত

দেশের কাজ করে বেড়ায়—এই পর্যন্ত। এখন মালতী তার সামনে গোঁজ হয়ে বসে রয়েছে এবং জীবনপাত করে যে আদর্শ সবই অর্থহীন। মালতীর গোঁজ হয়ে বসে থাকা সে একেবারে সহ্য করতে পারছে না। সে বড় দুর্বল বোধ করছে।

তার সামনে কত বড় মাঠ, শস্যক্ষেত্র। সে সামান্য ফসলের জমি নিয়ে কি করবে! মালতীকে সে কোথাও পৌঁছে দিতে পারছে না। এই নিয়তি মালতীর। কিছু বলতে পারল না। মাথা নিচু করে হেঁটে হেঁটে গাছপালার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

মালতী যেমন খুপরি থেকে একটা হাঁসের মতো বের হয়ে এসেছিল তেমনি সে ধীরে ধীরে ভিতরে ঢুকে বসে থাকল। একটু পরে এল শোভা। বাঁ হাতে ওর লণ্ঠন। ডান হাতে কলাই করা থালাতে খই এবং গুড়, মালতীর রাতের আহার। খেতে দিলেই মালতী ঝাঁপ বন্ধ করে দেবে। তারপর এক অন্ধকার নিয়ে, চোখ কোটরাগত করে সে শুয়ে থাকবে। ঘুম নেই চোখে। কেবল মনে হয়, কোন মরুপ্রান্তে একটা পত্র-পুষ্পহীন বৃক্ষ তাকে হাতছানি দিচ্ছে।

রঞ্জিত হাঁটতে হাঁটতে পুকুর পাড়ে চলে এল। সেই এক অর্জুন গাছ, গাছটা ডালপালা মেলে বড় হয়ে যাচ্ছে। চারপাশে ক্রমে অন্ধকার নামছে। দক্ষিণের ঘরে শশীমাস্টার ছেলেদের পড়াচ্ছে। সোনা খুব জোরে জোরে পড়ে। সে তার কঠিন কঠিন শব্দ রঞ্জিত বাড়ি এলেই শুনিয়ে শুনিয়ে পড়ে। সে যে কত বড় হয়ে গেছে এবং কত সব কঠিন কঠিন শব্দ জেনে ফেলেছে এই বয়সে, সে রঞ্জিত মামাকে তা জানাতে চায়। সে এত দুঃখের ভিতরেও মনে মনে হাসল। সে চলে যাবে। এসব ছেড়ে যেতে ওর সব সময়ই কেমন কষ্ট হয়। দিদির কাছে সে মানুষ বলে যা-কিছু টান এই দিদির জন্য। এবং স্বামী তার পাগল বলে সব সময়ই মনের ভিতর নানারকমের চিন্তা—মানুষটা এভাবে সারাজীবন বাঁচবে, আর কবিতা আবৃত্তি করবে, দিদির জীবনটা বড় দুঃখে কেটে গেল। এখানে এলে সে নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছে এমন ভাবে। সব মাঠঘাট চেনা। তাই যেন যাবার আগে সব ঘুরে ঘুরে একটু দেখে যাওয়া। পুকুরপাড় থেকেই সে দক্ষিণের ঘরের আলোটা দেখতে পেল। শশীমাস্টার দুলে দুলে পড়ান। ইতিহাস থেকে তিনি—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী ছেলেদের বলার সময় কেমন মাটি এবং মানুষের নিমিত্ত তিনি উত্তাপ পান। শশীমাস্টার এই তিন ছেলেকে সন্তানের মতো স্নেহ করেন।

সে অন্ধকার থেকে এবার উঠে এল। সংসারে আপনজন বলতে তার দিদি। আর কেউ নেই। স্বামী পাগল মানুষ। সে সোজা বাড়ি উঠে এল এবার। নিজের ঘরে ঢুকে পোশাক পাল্টাল। ওর স্যুটকেসের ভিতর যা যা থাকার কথা ঠিক আছে কিনা দেখে নিল। মহেন্দ্রনাথ নিজের ঘরে বসে আছেন।

এ-সময় তিনি সামান্য গরম দুধ খান। দিদি নিশ্চয়ই মহেন্দ্রনাথের পায়ের কাছে বসে আছে।

সে দিদিকে বলে দুটো খেয়ে নিল। মহেন্দ্রনাথের ঘরে ঢুকে প্রণাম করার সময় বলল, আমি আজই চলে যাচ্ছি।

বড়বৌ আর এখন এসবে বিস্মিত হয় না। সে কখন কোথায় থাকবে অথবা যাবে কেউ জানতে চাইলে চুপচাপ থাকে। আগে বড়বৌ এ-নিয়ে সামান্য অশান্তি করত রঞ্জিতের সঙ্গে। এখন আর করে না। অসময়ে কোথাও চলে যাচ্ছে বললে বিস্মিতও হয় না। বরং সে সব ঠিকঠাক করে দেয়। কথা বেশী বলে না। রঞ্জিত বুঝতে পারে দিদি তার এই চলে যাওয়া নিয়ে ভিতরে ভিতরে কষ্ট পাচ্ছে। দিদি চুপচাপ থাকলে সে টের পায়, চলে গেলে নিশ্চয়ই দিদি তার কাঁদবে। সে যাবার আগে যেমন প্রণাম করে থাকে, এবারেও তা করল। তারপর বিষণ্ণ মুখ দেখে যেমন বলে থাকে, কই তুমি হাসলে না। আমি যাব অথচ তুমি হাসলে না। না হাসলে যাব কি করে?

বড়বৌ জোর করে হাসে তখন। হেসে বিদায় দেয় এই ছোট ভাইটিকে।

—এই তো আমার দিদি। বলে সে সকলের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য প্রথমে দক্ষিণের ঘরে ঢুকে গেল। শশীমাস্টারকে বলল, চলে যাচ্ছি। সোনার মাথায় কি ঘন চুল হয়েছে, সে চুলে হাত ঢুকিয়ে আদর করল সোনাকে। বলল, যাচ্ছি আমি। তোমরা ভাল হয়ে থেক। মার কথা শুনবে। জ্যাঠামশাইকে দেখে রাখবে।

শশীমাস্টার বলল, তা'হলে আবার নিরুদ্দেশে যাচ্ছেন।

—যেতে হচ্ছে।

—ফিরবেন কবে?

—বোধ হয় আর এখানে ফিরতে পারব না।

—কেন?

—অসুবিধা আছে।

—আপনি স্বদেশী মানুষ, আপনাদের সব জানার সৌভাগ্য আমাদের হয় না। কিন্তু মাঝে মাঝে আপনার মতো নিরুদ্দেশে যেতে ইচ্ছা হয়। জাতির সেবা করতে ইচ্ছা হয়।

—জাতির সেবা তো আপনি করছেন। এর চেয়ে বড় সেবা আর কি আছে।

—কিন্তু কি জানেন, বলে শশীমাস্টার উঠে দাঁড়াল। দেশ স্বাধীন যে কবে হবে বুঝতে পারছি না।

—হয়ে যাবে।

—হবে ঠিক। তবে দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছি না বলে দেরি হচ্ছে।

রঞ্জিত এমন কথার কোন জবাব দিতে পারল না।

—আপনার কি মনে হয়?

—কিসের ব্যাপারে বলছেন।

—এই দেশ স্বাধীনতার ব্যাপারে।

—সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লে সংসার চলবে কি করে?

—তা ঠিক বলেছেন। কিন্তু লীগ যে ভাবে উঠেপড়ে লেগেছে, তাতে যে শেষপর্যন্ত কি হয়!

—রঞ্জিত এ-কথার জবাব দিতে হবে বলেই অন্য কথায় চলে এল। —এরা কিন্তু আপনার খুব ভক্ত। এরা আজকাল যত্ন নিয়ে দাঁত মাজছে।

শশীমাস্টার বলল, দাঁতই সব। আপনার দাঁত দেখি।

অন্য সময় হলে রঞ্জিত কি করত বলা যায় না। কিন্তু এখন সে চলে যাচ্ছে বলে খুব সরল সহজ হয়ে গেছে। তাই সে কোন কুণ্ঠা প্রকাশ না করে শশী মাস্টারকে দাঁত দেখাল।

শশীমাস্টার লণ্ঠন তুলে সবক'টা দাঁত দেখল। যেন কুশলী ডাক্তার ওর দাঁত দেখছে। মাড়ি টিপে টিপে দেখল। তারপর পলটুকে এক ঘটি জল আনতে বলে রঞ্জিতের মুখের দিকে তাকাল।—আপনার নিচের পাটির দাঁত কিন্তু ভাল না।

রঞ্জিত হাসতে হাসতে বলল, কি করলে ভাল হবে?

—রোজ রাতে একটা করে হরতুকি খাবেন। বলে সে বাইরে গেল। হাত ধুল। তারপর ফিরে এসে বলল, হরতুকিতে দাঁত শক্ত হয়। লিভারের কাজ ভাল হয়। সুনিদ্রা হবে। এবং পরিপাকে এত বেশি সাহায্য করবে—বলে একটু থামল। কি যেন খুঁজে খেরোখাতাটা পেয়ে পাতা উল্টে গেল। 'হ' এই শব্দের পাতা থেকে হরতুকি কত নম্বর পাতায় আছে খুঁজে হরতুকির গুণাগুণ ব্যাখ্যা করে শোনাতে থাকল।

রঞ্জিত দেখল লম্বা খাতায় নানারকম আয়ুর্বেদীয় ফুল-ফলের নাম। তাদের উপকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ। রঞ্জিত বলল, এদের এসব বলুন। এ দেশের মাটিতে যা হয় পৃথিবীর কোথাও তা পাওয়া যায় না।

শশীমাস্টার বলল, কি লালটু-পলটু, মামা কি বলছেন! তোমার মামা তো আজ চলে যাবেন। প্রণাম কর।

সকলে একসঙ্গে উঠে এসে কে আগে প্রণাম করবে, দুপদাপ প্রণাম সেরে কে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে সবার আগে বসবে তার প্রতিযোগিতা যেন। রঞ্জিত বলল, পরীক্ষা পাশের সময় এটা চাই। সবার আগে যেতে হবে। সবকিছুতে জিততে হবে। এবং এ সময়ই দেখল রঞ্জিত ও-পাশের অন্ধকার বারান্দায় বাড়ির পাগল মানুষ চুপচাপ বসে আছেন। সে তাঁর কাছে গিয়ে বলল, জামাইবাবু, আমি আজ চলে যাচ্ছি। বলে সে দু'পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম

করল। প্রণাম করার সময় বলল, আশীর্বাদ করবেন, আমি যেন ভাল কিছু করতে পারি।

তিনি বসেছিলেন। বসে থাকলেন। কোন উচ্চবাচ্য নেই। তাঁর চোখ অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। তবু বোঝা যায় সারাজীবন ধরে মানুষটি এক সোনার হরিণের পেছনে ছুটছেন। মানুষটার দিকে তাকালেই রঞ্জিতের চোখ ছলছল করে ওঠে।

সে তাড়াতাড়ি এবার পশ্চিমের ঘরে ঢুকে গেল। ধনবৌকে প্রণাম করার সময় বলল, ধনদি, আজ চলে যাচ্ছি।

ধনবৌ বলল, সাবধানে থাইক।

তারপর সে শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে খুব ঘন অন্ধকারের ভিতর মাঠে নেমে গেল। শশীমাস্টার, সোনা, লালটু, পলটু হারিকেন নিয়ে পুকুরপাড় পর্যন্ত এসেছিল। তারপর আর যায় নি। রঞ্জিত নিজেই বলেছে, আপনারা ফিরে যান মাস্টারমশাই। অন্ধকারে আমি ভাল দেখতে পাই। আলো থাকলে বরং চোখে ঝাপসা লাগে।

অন্ধকার নেমে আসতেই আবার সেই মাঠ, সোনালী বালির নদী, তরমুজের জমি এবং ওপরে আকাশ, চিত্র-বিচিত্র সব নক্ষত্র আর মাঠের এক নির্জনতা ওকে শৈশবের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। শৈশবে সে, সামসুদ্দিন আর মালতী—মালতীকে নিয়ে এরা নদীতে সাঁতার কাটত। সাঁতার কেটে ও-পারে উঠে যেত। গয়না নৌকার নিচে কখনও কখনও রঞ্জিত লুকিয়ে থাকলে মালতী ভয় পেত। সে ডাকত, ঠাকুর!

কে যেন তেমনি মনে হয় এখনও তার পিছনে ডাকছে। ঠাকুর তুমি আমাকে কার কাছে রেখে গেলে। তুমি দেশের কাজ করে বেড়াও, আমি কি তোমার দেশ না? তোমার এই জলা-জমি অথবা মাটিতে আমি বড় হয়ে উঠি না! আমার সুখ-দুঃখ তোমার সুখ-দুঃখ না! ঠাকুর, ঠাকুর, কি কথা বলছ না কেন?

রঞ্জিত যত দ্রুত হাঁটবে ভেবেছিল, সে তত দ্রুত হেঁটে যেতে পারছে না। কে যেন তাকে কেবল নিরন্তর ডেকে চলেছে। আমি কি করি ঠাকুর। মনে হল সে যেতে যেতে কোন গাছের ছায়ায় অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে পড়ছে। যত তাড়াতাড়ি সে এ-অঞ্চল ছেড়ে যাবে ভেবেছিল, কেন জানি সে তত তাড়াতাড়ি যেতে পারছে না। বস্তুত ওর পা চলছিল না। তার মাথার ওপর বড় এক আকাশের মতো পবিত্রতা নিয়ে মালতী জেগে রয়েছে। সে আর এক পা বাড়াতে পারল না।

মনে মনে সে আজ জীবনে যা ভাবে নি, যা-কিছু স্বপ্ন ছিল সব মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অন্য জীবনে ঝাঁপিয়ে পড়বে। দেশ উদ্ধারের চেয়ে কাজটা কেন জানি কিছুতেই কম মহৎ মনে হচ্ছে না।

সে সেই অশ্বত্থ গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে থাকল। অন্ধকার কি ঘন! আর কি প্রাচীন মনে হয় এই সব তরুলতা! সে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কিছু প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করছে। বিন্দু বিন্দু সব আলো গাঁয়ের ভিতর জ্বলছে নিভছে। রাত এখনও তেমন গভীর নয়। ভুজঙ্গ এবং কবিরাজকে লাঠিখেলা ছোরা খেলার সব নির্দেশ, আর কি আখড়া খুলতে হবে নূতন, সে গেলে কার সঙ্গে ওদের যোগাযোগ রাখতে হবে সবই সে ঠিকঠাক বলেছে কিনা আর একবার এই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ভেবে নিল। কোথাও তখন কোন কুকুর আর্তনাদ করছে। শেয়ালেরা ডাকছে। জালালির কবরে এক ঝোপ কাশের বন সৃষ্টি হয়েছে এতদিনে। সেই কাশের সাদাফুল এই অন্ধকারে এক ফালি জ্যোৎস্নার মতো দুলছে চোখে। বেঁচে থাকার জন্য আপ্রাণ জীবন সংগ্রাম ছিল জালালির। মৃত্যুর পর একখণ্ড ভূমি পেয়ে সে এখন কি মনোরম হাসছে। কারণ রঞ্জিতের মনে হচ্ছিল, অন্ধকারে, না কাশফুল, না জ্যোৎস্না, যেন একখণ্ড জমির জন্য ভালবাসা ছিল জালালির। সে তা পেয়ে ছোট্ট শিশুটির মতো হাসছে। কাশফুলের মতো পবিত্র হাসিটি মুখে লেগে আছে জালালির।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মন হল, এই একখণ্ড জমি সকলের প্রাপ্য। সবাইকে এই দিতে হবে। অভুক্ত এবং ভূমিহীন মানুষ, ভূমিহীন বলতে পায়ের নিচে মাটি নেই এমন মানুষ সে ভাবতে পারে না। তার ঘর থাকবে, চাষ-আবাদের জমি থাকবে, সে কিছু খাবে, খেতে পাবে, খেতে না পেলে মানুষের স্বাধীনতার অর্থ হয় না। মানুষের স্বাধীনতা বলতে সে এই বোঝে। তার কেন জানি এবার মনে হল, সে একখণ্ড জমি মালতীকেও দেবে।

অথবা এই অন্ধকারে, ঘন অন্ধকারে দাঁড়ালেই সে কেমন সাহসী মানুষ হয়ে যায়। ওর মৃত্যুভয় থাকে না। রাতের পর রাত, এমন সব মাঠ-জঙ্গল, নদী-বন, যদি কোথাও পাহাড় থাকে, সিংহ-শাবকের মতো পাহাড় বেয়ে ওঠা, যেন নিরন্তর এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে অভিযান—দুঃসহ এইসব অভিযান তাকে মাঝে মাঝে বড় বেশি বাঁচার প্রেরণা দেয়। কিছু না করতে পারলেই মনে হয় সে মৃত। একঘেয়ে জীবন তখন। বাঁচার কোন প্রেরণা থাকে না। উৎসাহ-বিহীন মানুষের মতো তাকে অধার্মিক করে ফেলে। হাডসন সাহেবকে হত্যার পর সে আবার নতুন কিছু করতে যাচ্ছে। প্রায় এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে অভিযানের মতো এই ঘটনা। অন্ধকার থেকে নরেন দাসের বাড়ি স্পষ্ট। বিন্দু বিন্দু আলো এখনও জ্বলছে। বোধ হয় নরেন দাস গোয়ালে গরু বাঁধছে। এবং আভারানী ঘাট থেকে বাসন মেজে এলেই সে এগুতে পারবে। ওদের এবার শুধু শুয়ে পড়তে দেরি। মালতীকে নিয়ে ভয়ডর তাদের কমে গেছে। কারণ মালতীর শরীরে আর এখন ঘোড়া দৌড়ায় না। মালতী রুগ্ন, শীর্ণকায়, অবসন্ন। এবং শরীরের ভিতর মালতীর ধর্মাধর্ম এখন ঢাকঢোল বাজাচ্ছে। মালতীকে

ঘরে জায়গা দিচ্ছে না নরেন দাস। মালতী এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাবে।

ক্রমে রাত বাড়ছে। ভোর রাতের দিকে ঠাকুরবাড়ি পুলিশে ঘিরে ফেলবে। এমন খবরই তার কাছে আছে। সন্তোষ দারোগা নারানগঞ্জে গেছে আর্মড ফোর্সের জন্য। সামান্য একজন মানুষকে ধরবার জন্য সন্তোষ দারোগা গোপনে গোপনে মহোৎসবের ব্যাপার করে ফেলছে। ভীষণ হাসি পেল দারোগার ভয় এত বেশি ভেবে।

কে সেই মানুষ, সে এখন ভেবে পাচ্ছে না—যারা তাকে ধরিয়ে দিচ্ছে। এখানে তার কার সঙ্গে শত্রুতা! কয়েক ক্রোশ দূরে থানা। যেতে আসতে সময় অনেক। জলা জায়গা বলে কেউ বড় এদিকটাতে আসতে চায় না। সে এখানে বেশ অজ্ঞাতবাসে কাটিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু চুপচাপও বসে থাকা যায় না। সমিতির কাছে সে নির্দেশ চেয়ে পাঠাল। তাদের নির্দেশমতো একের পর এক আখড়া খুলে চলেছিল গ্রামে গ্রামে। তারপর এক খবর, এক মানুষ বাউল সেজে চিঠি দিয়ে গেল—পুলিশ তার সূত্র আবিষ্কারে ব্যস্ত। তাকে পালাতে হবে।

এবারে মনে হল নরেন দাসের বাড়ির যে বিন্দু বিন্দু আলো জ্বলছিল, তা নিভে গেছে। সে গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি গায়ে দিয়েছে। ওপরে জহর কোট। কোটের নিচে হাত রেখে দেখল—না, ঠিক আছে। সে এবার সন্তর্পণে এগুতে থাকল। তার আর এখন কোন ভয় নেই। দেখল সামনের অন্ধকারে একটা জীব ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে। সে রিভলবারটা চেপে ধরতেই মনে হল, ওটা বাড়ির আশ্বিনের কুকুর। সে চলে যাচ্ছে বলে তাকে বিদায় জানাতে এসেছে।

রঞ্জিত বলল, বাড়ি যা। এখানে কি।

কুকুরটা তবু পায়ে পায়ে আসতে লাগল।

সে বলল, তুই যা বাবা। আমি এতদিনে একটা ভাল কাজ করতে যাচ্ছি। কিন্তু কুকুরটা পাশে পাশে হাঁটছেই।

—কি, বলছি যে শুনতে পাচ্ছিস না?

কুকুরটা এবার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

—হ্যাঁ হয়েছে। খুব হয়েছে। এবারে যা।

কুকুরটা যথার্থই এবার ছুটে পুকুরপাড়ে উঠে গেল। এবং অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে রঞ্জিত কোন্‌দিকে যাচ্ছে দেখল।

রঞ্জিত মালতীর দরজার সামনে সন্তর্পণে দাঁড়াল। ঝাঁপের দরজা। টর্চ জেলে সে ঝাঁপের দরজায় ফাঁক আছে কিনা দেখল। সে কোন ফাঁক খুঁজে পেল না। সুতরাং ধীরে ধীরে বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকল, মালতী। মনে হল তখন ভিতরের জীবটা জেগে আছে। সামান্য ডাকেই তার সাড়া মিলেছে।

সে উঠে বসেছে। গলার স্বর চিনতে পেরে মালতীর বুক কাঁপছিল। সে কাঁপা হাতেই ঝাঁপ খুলে দিল।

—আমি।

মালতী কথা বলল না।

—এবার আমরা যাব।

মালতী বুঝতে পারছে না—আমরা যাব বলে রঞ্জিত কি বুঝাতে চাইছে। সে মাথা নিচু করে ঠিক একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

—আমার সঙ্গে তুমি যাবে।

—কোথায়? সহসা মালতী রঞ্জিতের মতো প্রশ্ন করল।

—যেদিকে দু'চোখ যাবে।

—কিন্তু আমার যে কথা ছিল ঠাকুর।

—এখন আর কোন কথা না মালতী। দেরি করলে আমরা ধরা পড়ে যাব।

—কিন্তু আমার ভয় করছে। তোমাকে সবটা বলতে না পারলে—

—রাস্তায় সবটা তোমার শুনব। তুমি তাড়াতাড়ি এস।

মালতী এবার খুপরির ভিতর ঢুকে দুটো সাদা থান, সেমিজ এবং পাথরের থালা নিল সঙ্গে।

—এত নিয়ে পথ হাঁটতে পারবে না।

সে পাথরের থালা রেখে দিল।

রঞ্জিত বলল, আমাদের রাতে গজারির বনে গিয়ে ঢুকে পড়তে হবে।

ওরা নদীর চরে নেমে আসতেই শুনল টোডারবাগের ওপাশে কারা টর্চ জ্বালিয়ে আসছে। ঘোড়ার খুরের শব্দ। রঞ্জিত বুঝতে পারল, রাতে রাতে সন্তোষ দারোগা গ্রাম ঘিরে ফেলছে। সে মালতীকে বলল, জলে ঝাঁপিয়ে পড়।

পুলিশের লোকগুলি টর্চ এবার নিভিয়ে দিল। ওরা চলে যাচ্ছে।

রঞ্জিত বলল, জলে ডুবে থাক।

ওরা জলের ভিতর যখন ডুব দিল, তখনই মনে হল কেউ টের পেয়ে গেছে। সে বলল, মালতী, সাঁতার কাটতে হবে। যত জোরে সম্ভব। বলে সাঁতার কেটে ওরা নদীর পাড়ে উঠলে দেখল টর্চের আলো এসে এ-পাড়ে পড়েছে। বুঝি রঞ্জিত ধরা পড়ে গেল। টর্চের আলোতে বুঝি ওকে খুঁজছে।

রঞ্জিতের এমন একটা ভয়াবহ ব্যাপারে যেন ভ্রূক্ষেপ নেই। মালতীকে নিয়ে যা সামান্য অসুবিধা। সে মালতীকে বলল, বুঝতে পারছ ওরা কিছু টের পেয়েছে। ওরা আগে আগে এসে গেল।

মালতী কিছু বুঝতে পারছে না। সে বসে বসে এখন ওক দিচ্ছে।

—কি হয়েছে তোমার?

মালতী বলল, ঠাকুর, তুমি পালাও। দেরি করলে ওরা ধরে ফেলবে।

রঞ্জিত যেমন স্বভাবসুলভ হাসে, তেমনি হাসল। সে বলল, এটা তুমি পরো। এটা আমাকে বিপদ থেকে অনেকবার রক্ষা করেছে।

মালতী দেখল, কালো রঙের একটা বোরখা। ওরা বনের ভিতর ঢুকে পোশাক পাল্টে ফেলল। সে তার স্যুটকেস থেকে এক এক করে সব বের করল। বলল, এখানে টিপলে গুলি বের হবে। এই ছাখো। এটাকে বলে ট্রিগার। সে আলো জেলে সব বোঝাল। এই ট্রিগার। ভাল হোল্ডিং চাই। এমিঙ খুব তীক্ষ্ণ দরকার। কিন্তু একি মালতী, ওক দিচ্ছ কেন? মালতী ওক দিতে দিতে কথা বলতে পারছে না।

রঞ্জিত বলল, তোমার কি হয়েছে মালতী, তুমি ঠিক করে বল। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

মালতী যা এতদিন বলবে ভাবছিল, ঘৃণায় যা বলতে পারছিল না, এখন এই দুঃসময়ে রঞ্জিতকে সে তা মরিয়া হয়ে বলে ফেলল।

—ঠাকুর, আমি মা হইছি। তিন অমানুষ আমারে জননী বানাইছে। আর কিছু বলতে পারছে না। মালতী উপর্যুপরি ওক দিচ্ছে কেবল।

অন্ধকারে রঞ্জিত কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। মালতী পায়ের কাছে বসে ওক দিচ্ছে। ওপারে অজস্র টর্চের আলো। বনের ভিতর আলো ঢুকছে না। সেই আলোর কণা শুধু বৃষ্টিপাতের মতো পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঢুকছে। রঞ্জিত এবার হাঁটু গেড়ে বসল। মাথায় হাত রাখল মালতীর। বলল, আমাদের অনেক পথ হাঁটতে হবে মালতী। আমরা কোথায় যাব জানি না। তুমি ওঠ।

এভাবে নদীর পাড়ে যে বন, যে বনে একবার সোনা পাগল জ্যাঠামশাইর সঙ্গে হাতিতে চড়ে অতিক্রম করেছিল, সে বনে মালতী এবং রঞ্জিত সারারাত সকাল হবার আশায় গাছের নিচে পাশাপাশি শুয়েছিল। রঞ্জিত আর একটা কথাও বলে নি। মালতী ভয়ে ঘাসের ভিতর মুখ লুকিয়ে রেখেছে। দু'জনই সারারাত জেগে ছিল। এরপর কি কথা বলে যে আবার স্বাভাবিক হওয়া যায় রঞ্জিত ভেবে উঠতে পারছে না। কোথায় যাবে, কার কাছে নিয়ে যাবে এবং সে এমন এক মেয়ে নিয়ে এখন যে কি করে? গাছের শাখা-প্রশাখা বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে। শেষ রাতের জ্যোৎস্না গাছের পাতায় পাতায়। সেই যেন পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির। অথবা কে যেন আবার উচ্চস্বরে পড়ে চলেছে—এট লাস্ট দি সেলফিস জায়েণ্ট কেম। খুব সকালে আকাশ ফর্সা না হতে মালতীই ডেকে দিয়েছে। রঞ্জিতের চোখে তোর রাতের দিকে ঘুম এসে গেছিল।

রঞ্জিত ধড়ফড় করে উঠে বসল। সে নিজে একটা লুঙ্গি পরল। সে তার স্যুটকেস থেকে আঠা এবং রঙিন কিছু পাট বের করে একেবারে সে অন্য মানুষ সেজে গেল। বোরখার নিচে বিবি, আর রঞ্জিত এক মিঞাসাব। ভাঙা ছাতি বগলে। মিঞা-বিবি মেমান বাড়ি যাচ্ছে এমনভাবে রঞ্জিত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে থাকল।

যেতে যেতে মালতী বলল, তুমি ঠাকুর আমাকে জোটনের কাছে রাইখা যাও।

রঞ্জিত কথা বলল না। এ অবস্থায় ওকে কোথায় আর নিয়ে যাওয়া যাবে। সে দরগার উদ্দেশ্যে হাঁটতে থাকল। দিনমান হাঁটলে সে মালতীকে নিয়ে জোটনের দরগায় পৌছাতে পারবে। মালতীকে আপাতত জোটনের কাছে রেখে সে কোথাও চলে যাবে ভাবল।

আর সে হাঁটতে হাঁটতেই কার ওপর আক্রোশে বনের ভিতর সহসা চিৎকার করে উঠল, বন্দেমাতরম্। আক্রোশের প্রতিপক্ষ জব্বর, না সন্তোষ দারোগা, ওর চোখমুখ দেখে তা ধরা গেল না।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত